প্রকাশক :

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টার

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বসাক

শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস

১০, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

'ক্ব নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো
জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥'

—কুমারসম্ভব, ৪।৬

সর্ব্বানন্দ'র পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যসমালোচনার পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য লইয়া এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আলোচনায় খানিকটা ধারাবাহিকতা থাকিলেও ইহা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাস নহে। ঐতিহাসিকের বিষয় নির্ব্বাচনে কোন স্বাধীনতা নাই। তাঁহাকে ছোটবড়, ভালমন্দ সকল সময়ের সকল রচনার আলোচনা করিতে হইবে। আমি সেই সকল লেখককেই বাছিয়া লইয়াছি এবং আমার আলোচনার সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি যাঁহারা আমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ সমালোচক, যাঁহারা কোন সম্প্রদায় বা ভাবধারার প্রতিনিধিস্থানীয় অথবা যাঁহারা পাঠকসমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে একবার শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের উল্লেখ করিলেও শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কোন জীবিত লেখকের রচনার বিস্তৃত আলোচনা করি নাই। জীবিত লেখকদের বাদ দেওয়ার কারণ সহজেই অনুমেয়। একজনের সম্পর্কে কেন ব্যতিক্রম করিলাম সেই প্রশ্নের উত্তর আশা করি গ্রন্থমধ্যেই পাওয়া যাইবে।

বাংলা সাহিত্যসমালোচনার বয়স কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর ইহার কালানুক্রমিক বা বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। সেই কারণে সন তারিখের খুব বেশী উল্লেখ করি নাই, যাহা করিয়াছি তাহাও একেবারে ঠিকঠাক নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আলোচনার সুবিধার জন্য এবং প্রসঙ্গের প্রয়োজনে একই সমালোচক বা সমালোচনাকে নানা পরিবেশে বিচার করিতে হইয়াছে। যে অপেক্ষিত অনপেক্ষা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই সমালোচনার গতি নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেই সূত্র এবং আনুষঙ্গিক তত্ত্বও বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। পাঠক এই অনিবার্য্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন; তবে প্রসঙ্গ বা বিতর্কের নূতনত্বের জন্য এই দোষ তেমন মারাত্মক হইবে না ভরসা করি।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে দুইজন কনিষ্ঠ সহকর্ম্মীর নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। ইঁহারা উভয়েই বাংলা সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক—শ্রীভবতোষ দত্ত ও শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য। ইঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বোধ করি ইহাও বলা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থে প্রকাশিত মতামতের সঙ্গে ইঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত 'নির্দেশিকা' প্রস্তুত করিয়াছেন।

ইতি
বিনীত
শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য সমালোচনার ধারা

॥ ১ ॥

কোন পার্থিব বস্তুই অনাদি নয়। যাহাকে আমরা প্রথম বলিয়া মানিয়া লই বস্তুতঃপক্ষে সেও বহু বিবর্ত্তনের ফলেই উদ্ভূত হইয়াছে। তবু আলোচনার সুবিধার জন্য কোন একটা জায়গায় আরম্ভ করিতেই হইবে। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য দেশে প্লেটো ও আমাদের দেশে ভরতমুনিকে প্রথম সূরি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। পণ্ডিতেরা মনে করেন ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে। প্লেটো জন্মিয়াছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪২৮ অব্দে, তাঁহার মৃত্যু হয় ৩৪৭ অব্দে। সুতরাং দেখা যাইতেছে গ্রীক সাহিত্যশাস্ত্র ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। আমরা সকল বিষয়েই পূর্ব্বগামিতার দাবি করি, কিন্তু আমাদের অলংকারশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত নবীন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন ইউরোপের সবচেয়ে প্রভাবশালী সমালোচক অ্যারিষ্টটল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে কোথাও অ্যাবিষ্টটলের পোয়েটিক্সের প্রভাব দেখা যায় না। পোয়েটিক্সের আরবি অনুবাদ বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল; এমন কি এখনও ইহা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু প্রাক্-আধুনিক যুগে কোন ভারতীয় সাহিত্যসমালোচক এই গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন মনে হয় না। ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথের রসগঙ্গাধর পর্য্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যসমালোচনা নিজস্ব পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। শুধু অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবাদের সঙ্গে ক্রোচের অভিব্যক্তিবাদের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিতান্ত আধুনিক কালের ব্যাপার। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র এবং ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্র—উভয়েরই উদ্দেশ্য কাব্য, নাটক প্রভৃতির তত্ত্ব-উদ্ঘাটন ও মূল্য-বিচার। বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা, সুতরাং ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায়

হউক আমরা সংস্কৃতের গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারি না। আমরা কাব্য বা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই, সংস্কৃত জানি আর না জানি, উপমা, রূপক, শ্লেষ, প্রসাদগুণ, রস ও ব্যঞ্জনা প্রভৃতির উল্লেখ করি, 'রস' বাংলা সমালোচনায় সর্ব্বাধিক প্রচলিত শব্দ। আবার আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে ইংরেজি তথা ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত; কেহ কেহ মনে করেন আধুনিক বাংলা সমালোচনাসাহিত্য ইউরোপীয় শাস্ত্রের প্রভাবেই জন্ম নিয়াছে এবং সেই প্রভাবেই পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই দুই ধারার সমন্বয়ের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয় নাই। অতুলচন্দ্র গুপ্তের আলোচনা মৌলিকতায় ভাস্বর, কিন্তু তিনি শুধু পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। বাংলা সমালোচনার বিস্তৃত আলোচনার পূর্ব্বে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাহিত্য-আলোচনার পদ্ধতি বিবৃত করিতে হইবে। এই দুই পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের রস-বিচারের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

॥ ২ ॥

ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের উদ্ভব প্লেটোর জিজ্ঞাসায়। প্লেটো গদ্যে লিখিতেন এবং তাঁহার বিষয় ছিল দর্শন। কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভা ছিল, তাই অ্যারিষ্টটলের আমল হইতে তাঁহার রচনা কাব্য বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তিনি কাব্যের মূল্য সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন; সেই প্রশ্নগুলিই ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের গতি নির্দ্ধারিত করিয়াছে। সুতরাং এই প্রশ্নগুলি স্পষ্ট করিয়া উপস্থাপিত করিতে হইবে:

(১) কবি অর্দ্ধোন্মাদ এবং তাঁহার কল্পনা এই উন্মাদনারই অভিব্যক্তি। কিন্তু এই উন্মাদনা ঐশী উন্মাদনা; ইহা দিব্যদৃষ্টি দান করে। তাই অর্দ্ধোন্মাদ কবি সত্যের নিহিত তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারেন; এই সকল তত্ত্ব ধীর, অবিকৃত বুদ্ধির অনধিগম্য। প্লেটোর অন্যতম ব্যাখ্যাতা এ. ই. টেইলার বলিয়াছেন এই দাবির মধ্যে খানিকটা ব্যঙ্গের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। তাই ইহাকে অগ্রাহ্য করাও যাইবে না আবার খুব বেশি বড় করিয়া কবিপ্রতিভাকে নির্ব্বিচারে শিরোধার্য্য করিলেও চলিবে না। প্লেটোর এই উক্তি ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের একটি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছে। কবির কল্পনা

নিরঙ্কুশ ; তাহা আপনার বেগে নূতন বস্তু রচনা করিয়া চলে, কিন্তু তাহা কি বিচারবুদ্ধির সঙ্গে অসম্পৃক্ত ? যদি বলা যায় যে, মানুষের বিচারবুদ্ধির দ্বারা কল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে কবির জগতের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া যায়, কাব্য দর্শন-বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়ে। আবার যদি কবির কল্পনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে কবির সৃষ্টি আকাশকুসুমের অধিক মূল্য পাইবে না। কিন্তু কবি যে ভাবেই সৃষ্টি করুন, সাহিত্যপাঠক সাহিত্যের বিচারকও। তাঁহার কল্পনা কখনও বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। এমন কি কবি যখন নিজের কাব্য ব্যাখ্যা করেন তখন তিনিও বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাই দিয়া থাকেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাঁহার সৃজনী কল্পনা কি বুদ্ধির অনুশাসনমুক্ত হইতে পারে ?

প্লেটো তাঁহার রিপাব্লিক নামক গ্রন্থে কাব্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্র হইতে কবিদিগকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি যে যুক্তি দিয়াছিলেন তাহা উপরি-উক্ত প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। প্লেটোর মতে পারমার্থিক সত্য কতকগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষ, সার্ব্বভৌম আইডিয়া (eidos) বা ভাবমূর্ত্তি ; বাস্তব জগতে আমরা যে টুক্‌রো-টুক্‌রো, পৃথক বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হই তাহারা সার্ব্বভৌম ভাবমূর্ত্তির বা **Form**-এর প্রতিচ্ছবি মাত্র। ইহার অধিক মূল্য তাহাদের নাই। মানবত্ব সার্ব্বভৌম সত্য। প্রত্যেক মানুষ এই সার্ব্বভৌম সত্যের ছায়ামাত্র। কাব্য কিন্তু এই সকল পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিদেরই কাহিনী রচনা করে অর্থাৎ ইহা তাহাদের খণ্ড জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কাব্য ছায়ার ছায়া, নকলের নকল ; ইহার সঙ্গে খাঁটি সত্যের সম্পর্ক খুবই ফিকে। প্লেটোর দর্শনে যে সকল ভাবমূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে তাহাদের অস্তিত্ব সবাই স্বীকার করিবে না এবং এইখানে সেই আলোচনা প্রাসঙ্গিকও হইবে না। কিন্তু ইহার সঙ্গে অপর যে প্রশ্নটি জড়িত আছে তাহা সাহিত্য ও কাব্যের পক্ষে মৌলিক। কাব্যের কলার সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক কি ? যদি কাব্য বাস্তবেরই অনুকরণ করে, তাহা হইলে কাব্যপাঠে মনোনিবেশ করিয়া লাভ কি ? নকল ছাড়িয়া আসলের প্রতি মনোনিবেশ করাই ভাল। হেগেল বলিয়াছেন যে, সাহিত্য যদি জীবনের অনুকরণ করিতে চায় তাহা হইলে সে শুধু হাস্যাস্পদ হইবে, মনে হইবে যেন গজেন্দ্রের পশ্চাতে নগণ্য কীট তাল রাখিয়া সঞ্চরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অথচ এই কথাও বলা শক্ত যে, জীবনের

সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নাই। সাহিত্যে সেতুবন্ধ, সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি আজগুবি কাহিনী থাকে, দেবতাপিশাচাদির অবতারণা করা হয়; তাহা হইলেও মনে হয় তাহার মধ্যে মানবজীবনের কাহিনীই রূপান্তরিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক, মরমী কবি; তিনিও বৈষ্ণব কবিকে প্রশ্ন করিয়াছেন:

এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।

(২) প্লেটো কবি ও কাব্যের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি তুলিয়াছেন সম্পূর্ণ নীতিগত কারণে। স্পার্টার সঙ্গে যুদ্ধে এথেন্স পর্যুদস্ত হইয়াছিল। প্লেটো হয়ত মনে করিতেন কবিদের কোমল কথা পড়িয়া ও শুনিয়াই এথেন্সের তরুণরা শৌর্য্যহীন হইয়াছিল। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, কবিতা মানুষের কোমল, করুণ প্রবৃত্তিগুলিকে প্রবুদ্ধ করে; সেইজন্য কাব্যপাঠ মানুষের পক্ষে হানিকর। শুধু কোমল প্রবৃত্তির কথাই বলি কেন? সুস্থ সবল মানুষ হৃদয়ের ভাবগুলিকে সংহত, সংযত রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কবিতা অনুভূতির অতিশয়িত বর্ণনা দিয়া মানুষকে ভাবালু করিয়া দেয়। সেই দিক্ দিয়া বিচার করিলে কাব্যপাঠ মানসিক স্বাস্থ্যের হানিকর। আর-এক দিক্ হইতেও কবিতা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। প্লেটো গ্রীক্ কাব্য সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, কবিরা দেবদেবীদের যে চিত্র আঁকেন তাহার দ্বারা দেবদেবীরা হাস্যাস্পদ ও ঘৃণ্যচরিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন। এই জাতীয় বর্ণনা পড়িলে পাঠকবর্গ দেবতাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করিবে এবং তাহাদের ধর্মবিশ্বাস শ্লথ হইবে। রামায়ণ-মহাভারতে ইন্দ্রাদি দেবতাদের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা সব সময় নীতিসম্মত হয় নাই। কালিদাস কুমারসম্ভব-কাব্যে হরপার্ব্বতীর মিলনের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি প্রাচীন কালেও সোচ্চার হইয়াছিল, এবং অনেকেই মনে করেন এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। আজকাল আমরা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু মৌলিক প্রশ্নটির সমাধান হয় নাই। সাহিত্য কি প্রচলিত নীতির সমর্থন করিবে? বার্ণার্ড শ' প্রভৃতি মনে করেন, সাহিত্য নীতিশিক্ষা দেয় প্রচলিত নীতিকে পরিহার করিয়া, নূতন নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া। অপর একদল বলেন সাহিত্য নীতি-দুর্নীতির ধার ধারে না। ইহা নীতি-নিরপেক্ষ—**amoral**।

উপরি-সন্নিবেশিত নাতিদীর্ঘ আলোচনায় তিনটি মৌলিক প্রশ্ন উল্লিখিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই প্রশ্নগুলি এইভাবে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে: প্রথমতঃ, কবির কল্পনায় বিচারবুদ্ধির স্থান আছে কি? দ্বিতীয়তঃ, ইহা স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায় যে, কাব্যের বিষয়বস্তু বা মালমশ্‌লা জীবন হইতেই সংগৃহীত হয়। কিন্তু সাহিত্য কি জীবনের প্রতিচ্ছবি দিবে (বাস্তববাদী বা রিয়ালিষ্টদের মত)? না, জীবন হইতে মালমশ্‌লা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে রূপান্তরিত করিবে (আইডিয়ালিষ্ট বা আদর্শবাদীদের মত)? তৃতীয়তঃ, সাহিত্যের সঙ্গে ধর্ম ও নীতির সম্পর্ক কি?

প্লেটো ছিলেন প্রধানতঃ দার্শনিক, সাহিত্যসমালোচক নহেন; দর্শন ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি কবি ও কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন এবং সেই মন্তব্যই ইউরোপীয় সমালোচনা সাহিত্যের ধারা নিয়মিত করিয়াছে। তাহার কারণ তাঁহার শিষ্য অ্যারিষ্টটলের অভ্যাগম। অ্যারিষ্টটল দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়—এক ইতিহাস-ভূগোল ছাড়া—লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এক সময় সকল বিষয়েই তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হইত। গ্যালিলিও, ব্রুণো, বেকন প্রভৃতির অভ্যাগমে দর্শনবিজ্ঞানে তাঁহার প্রাধান্য টুটিয়া গিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ছোট্ট একখানা সমালোচনা গ্রন্থের দৌলতে সাহিত্য জগতে তাঁহার একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রথম সমালোচক এবং এখনও বহুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বহু বিরোধী মন্তব্য সত্ত্বেও তাঁহার প্রাধান্য অপ্রতিহত রহিয়াছে।

পোয়েটিক্স গ্রন্থে তিনি কোথাও গুরু প্লেটোর নামোল্লেখ করেন নাই কিন্তু তিনি প্লেটো-উত্থাপিত সমস্যার সমাধান করিতে ও বিপরীত মতসমূহের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবিপ্রতিভা যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা এবং তাহা যে যুক্তির অধিগম্য নহে তাহা তিনি মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই স্বতঃসিদ্ধ প্রতিভা বা স্বজ্ঞা (Intuition) যুক্তির অনধিগম্য হইলেও ইহা যুক্তি বা বুদ্ধি-বৃত্তিকে বাদ দিয়া সঞ্চারিত হয় না, ইহাকেও সম্ভাব্যতার নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। কবি যাহা সৃষ্টি করেন তাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানলব্ধ নহে, কিন্তু তাহাকে বিশ্বাসযোগ্য বা সম্ভাব্য হইতে হইবে এবং এইজন্য তাহার ধাপে ধাপে পরিণতির মধ্যে অনিবার্য্য নিয়মের সূত্র থাকিতে হইবে। ইহাই কবির সৃষ্টি ও উন্মাদের আকাশকুসুম কল্পনার মধ্যে পার্থক্য। এই জন্যই অ্যারিষ্টটল কাব্য, বিশেষ করিয়া নাটক লিখিবার কতকগুলি সূত্র নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে, পরবর্ত্তী লেখকেরা এই সকল নিয়মকানুন মানিয়া চলিলে সার্থক কাব্য রচনা করিতে পারিবেন, অবশ্য যদি তাঁহাদের জন্মগত কবিপ্রতিভা থাকে।

যেহেতু কবিপ্রতিভা উচ্ছৃঙ্খল কল্পনাবিলাস মাত্র নহে, সেই জন্যই তাহাকে মানুষের সমগ্র মনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে হইবে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সাধারণ বিচারবুদ্ধিকে আঘাত করিলে চলিবে না। যে নাটকে অপাপবিদ্ধ উন্নতচেতা নায়কের অধঃপতন অথবা পাপাসক্ত নায়কের শ্রীবৃদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে সেই নাটক পাঠে আমাদের এই সাধারণ বিচারবোধ আহত হইবে। সেইজন্য অ্যারিষ্টটল এই জাতীয় নাটককে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এইভাবে তিনি নীতিবোধের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইয়াছেন। তিনি অন্য ভাবেও কাব্যের সঙ্গে নীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্লেটো অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, কাব্য মানুষের মধ্যে ভাবালুতার সঞ্চার করে, বিশেষ করিয়া যে সকল ভাব সংযত করা উচিত তাহাদিগকে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করে। অ্যারিষ্টটল এই অভিযোগ অংশতঃ মানিয়া লইয়া ইহার খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহা সত্য যে, কাব্য নানা অনুভূতি সঞ্চারিত করে, কিন্তু ইহাদের পরিশোধন করিয়া পাঠক বা (নাটকের) দর্শকের চিত্ত পরিশোধনও করে। কেমন করিয়া এই চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হয়, তাহা লইয়া টীকাকারদের মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু অ্যারিষ্টটল যে কাব্যকে নীতিনিরপেক্ষ করিতে চাহেন নাই এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

অ্যারিষ্টটলের প্রধান অবদান অনুকরণবাদের রূপান্তরীকরণ। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অনুচিকীর্ষা মানবের অন্যতম আদিম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিই কাব্য ও শিল্প সৃষ্টি করিয়াছে—সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, অঙ্কনবিদ্যা, কাব্য সকল শিল্পই অনুকরণবৃত্তির অভিব্যক্তি। অনুকরণের আনন্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সেইদিক্ হইতে বিচার করিলে শিল্পচর্চ্চা অন্যফলনিরপেক্ষ। ইহাকে কলা-কৈবল্যবাদ বা **art for art's sake** বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অ্যারিষ্টটলের মতের এক অংশ মাত্র; তিনি যাহাকে শিল্প ও কাব্যের অনুকরণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা শুধু বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নহে। কোন বিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিরই অনুকরণ সম্ভব এবং সেই জাতীয় অনুকরণ বাস্তবের ছায়ামাত্র। সেই জাতীয় অনুকরণ সম্পর্কে প্লেটোর অভিযোগ প্রযোজ্য। কিন্তু কবি একটি বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর অনুকরণ করিতে যাইয়া যাহা রচনা করেন তাহা

বিশেষের চেয়ে বড, তাহা সর্বজনপ্রযোজ্য সত্য—universal (katholou) statement। পরবর্ত্তী সমালোচকেরা বলিয়াছেন যে, কবি যে রূপ সৃষ্টি করেন তাহা ব্যক্তির রূপ, কিন্তু তাহা সার্ব্বজনীন ভাব ও চিন্তার রূপক। এই সার্ব্বজনীনতা মানিয়া লইলে অনুকরণ ও রূপান্তরণের দূরত্ব কমিয়া যায়।

প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের উত্তরসূরিরা কেহ প্লেটোর অনুগামী হইয়াছেন, কেহ অ্যারিষ্টটলের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন, কেহ কেহ উভয়ের মতের সামঞ্জস্য করিয়া নূতন সূত্র আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা যে পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন কেহই তাহার বাহিরে যান নাই। কবি যে কাব্য রচনা করিলেন তাহা বাস্তবানুগ বা বাস্তবাতিশায়ী কিনা, কবির সৃষ্টি নীতির পরিপোষক কিনা অথবা নূতন নীতির প্রবর্ত্তক কিনা, কাব্যে যে ভাব প্রকাশিত হয় তাহার গভীরতা ও ব্যাপ্তি—এইসব প্রশ্নই ইউরোপীয় কাব্য বিচারে মুখ্য হইয়াছে—ইহারাই কাব্যতত্ত্বের বিষয়। কাব্য প্রকাশিত হয় ভাষার মাধ্যমে, সুতরাং উপযুক্ত ভাষারও প্রয়োজন, কিন্তু কাব্যের ভাষা হইল ভাবের আবরণ ও আভরণ। অ্যারিষ্টটল অনুকরণ-শিল্পকে তিন দিক্ হইতে দেখিয়াছেন—অনুকরণের উপজীব্য বিষয়, অনুকরণের উপায় ও অনুকরণের ভঙ্গি। এই বিভাগের ফলে ইউরোপীয় শিল্পবিচারে প্রথমেই একটা ভেদসৃষ্টি হইল—উপজীব্য ভাব ও তাহার বহিঃপ্রকাশক আঙ্গিক, এই দুইয়ের মধ্যে। ইংরেজিতে ইহাকে বলে content ও form-এর বিভেদ ও সংযোগ। ঠিক কোন্ অংশ ভাবের আঙ্গিনায় পড়িবে এবং কোন্ অংশ আঙ্গিকের বহিরঙ্গনে যাইবে তাহা বিতর্কের বিষয় এবং এই বিষয়ে মতৈক্য আশা করা যাইতে পারে না। একজন যাহাকে ভাব বলেন অপরে তাহাকে রূপের অঙ্গ বলিবেন। যে সব যুক্তির (dianoia) দ্বারা পাত্রপাত্রীরা নিজেদের কার্য্য সমর্থন করে অ্যারিষ্টটল নিজেই তাহাকে আঙ্গিকের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। তবে তাঁহার আমল হইতেই সমালোচনার অঙ্গ হিসাবে দুইটি শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে—একটি সাহিত্যশাস্ত্র বা পোয়েটিক্স আর একটি অলংকারশাস্ত্র বা রেটরিক।

এই বিভেদের জন্য ভাবের সৃষ্টি ও ভাষার আলোচনা পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। আর যেহেতু সাহিত্যের সৃষ্টি প্রধানতঃ ভাবের প্রকাশ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে সেইজন্য বিচারকের নিজের মনোভাব সাহিত্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, অনেক সময় মনে হয় যাহা সমালোচনা বলিয়া পরিবেশিত হইতেছে তাহা সহৃদয়ের মনের কথা, আলোচ্য কাব্য তাহাদের উপলক্ষ্য মাত্র।

সফোক্লিসের নাটক অ্যান্টিগোনের মধ্যে হেগেল দেখিয়াছেন দুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাবের সংঘাত এবং তিনি এই নাটকের মধ্যে সংঘাতের সমন্বয়ের সূত্রেরও সন্ধান করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, এই আলোচনা কি সফোক্লিসের নাটকের বিশ্লেষণ না হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের ব্যাখ্যা? কোল্‌রিজ প্রভৃতি রোমান্টিক সমালোচকগণ হ্যাম্‌লেটের যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া ডেনমার্কের রাজকুমারকে দুর্বল, চিন্তাশীল, কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক নায়ক বলিয়া মনে হয়, তিনি যেন কোল্‌রিজেরই আদিরূপ। নাটকে পাত্রপাত্রীগণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন ঘণ্টা দুই তিনেকের জন্য; ইহার মধ্যে সব সময় সবাই রঙ্গমঞ্চে থাকেন না। ব্র্যাড্‌লি এই টুক্‌রো টুক্‌রো প্রকাশকে একত্র করিয়া বাড়াইয়া গুছাইয়া শেক্সপীয়রের নায়ক নায়িকাদিগকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে বর্ণিত করিয়াছেন। ব্র্যাড্‌লির শেক্সপীয়র-আলোচনা খুব প্রসিদ্ধ, কিন্তু প্রশ্ন এই: ব্র্যাড্‌লি-বর্ণিত চরিত্রগুলি কি শেক্সপীয়রের নাটকে আছে? জনৈক নাট্যসমালোচক মন্তব্য করিয়াছিলেন, ব্র্যাড্‌লি দুইয়ে দুইয়ে যোগ করিয়া অর্দ্ধডজন যোগফলে উপনীত হইয়াছেন। অর্থাৎ শেক্সপীয়রের নাটকে দুই আর দুই (চরিত্রের বিভিন্ন দৃশ্যে প্রকাশ) বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে: ব্র্যাড্‌লি তাহাদিগকে একত্র যোগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যেখানে ফাঁক দেখিয়াছেন স্বীয় কল্পনার দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়াছেন এবং এই ভাবে দুই আর দুইয়ে মিলিয়া ছয় হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর সময় হ্যাম্‌লেট কোথায় ছিলেন, ম্যাক্‌বেথ বাল্যকালে কিরূপ লোক ছিলেন, ডান্‌ক্যানের হত্যা সম্পর্কে ম্যাক্‌বেথ দম্পতির মধ্যে পূর্ব্বে কিরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, সমালোচক এই জাতীয় জল্পনাকল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু শেক্সপীয়রের নাটকে ইহা নাই। এই সব আলোচনায় সহৃদয়-কল্পিত ভাব (content) কাব্যের form বা রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্ত্য সমালোচনায় একটা নূতন সুর ধ্বনিত হইতেছে। নানাকারণে দার্শনিক ও সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টি ভাষার বৈশিষ্ট্যের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে। দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে এক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে যাহারা বাক্যগঠনকে প্রাধান্য দিয়া থাকে। এই নব্য তর্কশাস্ত্রের পাশাপাশি ভাষাতত্ত্ব (linguistics) ও শব্দার্থ বিদ্যা বা semantics শাস্ত্রের খুব প্রসার হইয়াছে। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও নূতন হাওয়ার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক শ্রেণীর নব্য সমালোচকরা কাব্যকে নিছক কাব্য হিসাবেই

দেখেন ; তাঁহারা মনে করেন শব্দার্থই কাব্যের শরীর এবং ভাষার কারচুপি এবং image বা চিত্রকল্পের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়াই ইহার সারবস্তু আহরণ করা যাইবে। এই নব্যসমালোচকদের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব নাই, কিন্তু সবাই কবিতার শব্দ, বাক্যগঠন ও চিত্রকল্পের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কেহ কেহ শব্দের, পদবিন্যাসের বা বাক্যগঠনের চাতুর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া নানা অর্থের সন্ধান করেন এবং এই বহু অর্থের বৈচিত্র্যের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কবিতার তাৎপর্য্য দেখিতে পান, কেহ কেহ কোন একটি শব্দ বা একটি চিত্রের পুনরাবৃত্তির মধ্যে সমগ্র কবিতা বা গ্রন্থের রহস্য আবিষ্কার করেন, আবার কাহারও কাহারও কল্পনা কবির ভাষাকে নূতন দ্যোতনায় মণ্ডিত করে। এই সব সমালোচকদের সমালোচনা ভঙ্গিতে পার্থক্য থাকিলেও ইহারা প্রত্যেকেই কবির ভাষাকেই প্রাধান্য দেন। জনৈক ফরাসী কবি বলিযাছিলেন, কবিতা শব্দের দ্বারা লিখিত হয়, ভাবের দ্বারা নয়। ইহারা ভাবকে বাদ দেন না ; ভাষার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইতেই কাব্যের ভাবে উপনীত হয়েন। কিন্তু ইঁহাদের সম্পর্কেও পূর্ব্বোল্লিখিত অভিযোগ প্রযোজ্য এবং বেশি করিয়া প্রযোজ্য। ইঁহারা যে তাৎপর্য্যের সন্ধান করেন তাহা প্রধানতঃ স্বকপোলকল্পিত ; আলোচ্য কবিতা উপলক্ষ্য মাত্র। ব্র্যাড্‌লি দুইয়ে দুইয়ে যোগ করিয়া অর্দ্ধ ডজনে উপনীত হইয়াছিলেন এইরূপ আপত্তি করা হইয়াছিল ; নব্যসমালোচকেরা দুইয়ে দুইয়ে যোগ করিয়া পূর্ণ ডজনই পাইয়া থাকেন। কোল্‌রিজ-ব্র্যাড্‌লি-পন্থী সমালোচনা ও আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা—ইহাদের মধ্যে যে টানা-পোড়েন চলিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে বাক্ ও অর্থের বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ অতি প্রাচীন। প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল কাব্য সম্পর্কে বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু উভয়েই কাব্যের content ও form বা ভাব ও ভাষাকে পৃথক্ করিয়া দেখিয়াছিলেন। সেই বিচ্ছেদ জোড়া লাগে নাই।

॥ ৩ ॥

সংস্কৃত সাহিত্যে সমালোচকের পরিচয় পাওয়া যায় না। যাঁহারা সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিতেন বা উহার রস পরিবেশন করিতেন তাঁহারা টীকাকাররূপে আখ্যাত হইতেন। তাঁহাদের আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্লেষণমূলক ; সর্ব্বাপেক্ষা নামকরা টীকাকার হইলেন মল্লিনাথ আর তাঁহার শ্রেষ্ঠ টীকা মেঘদূতের

'সঞ্জীবনী'। প্রবাদ আছে মাঘ ও মেঘদূত কাব্যের (মাঘে মেঘে) টীকা রচনা করিতে তাঁহার বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছিল। মেঘদূতের টীকার প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন :

ইহান্বয়মুখেনৈব সর্ব্বং ব্যাখ্যায়তে ময়া।
নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নানপেক্ষিতমুচ্যতে ॥

আমি এখানে সবই অন্বয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ কর্তা কর্ম্ম ক্রিয়া প্রভৃতির সম্বন্ধ দেখাইয়া ব্যাখ্যা করিতেছি। এখানে মূলের সঙ্গে অসম্বদ্ধ কিছু থাকিবে না এবং অনপেক্ষিত অর্থাৎ স্বকপোলকল্পিত কিছু বলিব না। মনে হয় এখনকার মত তখনও অনেক লেখক কালিদাসের কাব্যের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া এমন অনেক কিছু লিখিতেন যাহার সঙ্গে মূলের সংস্রব নাই। মল্লিনাথ সেইপ্রকারের ব্যাখ্যায় তাঁহার আপত্তি জানাইয়াছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বই এই জাতীয় বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্লেষণাত্মক সাহিত্যালোচনার পরিপোষকতা করিয়াছে। সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌দের মতে কাব্য কাব্যই, ইহা ইতিহাসও নয়, শাস্ত্রও নয়; আর ইহার আস্বাদ অ-লৌকিক। এই কারণে লৌকিক নীতি ও দুর্নীতির প্রশ্ন ইঁহাদের বিচার-বিশ্লেষণে প্রাধান্য পায় নাই। কোন কোন রুচিবাগীশ দেবদেবীর সম্ভোগবর্ণনায় আপত্তি তুলিয়াছিলেন এই পর্য্যন্ত। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে ব্রহ্ম রসস্বরূপ এবং ব্রহ্মাস্বাদই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। পরিপূর্ণ আস্বাদ আস্বাদকারীর চিত্তবৃত্তিতেই লভ্য, কিন্তু নানা আবরণ বা বিঘ্নের জন্য চিত্ত আপনাকে আপনি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। চৈতন্য যেখানে ভগ্নাবরণ হয় সেইখানেই রসাস্বাদ সার্থক হয়। এই আবরণভঙ্গ বা বিঘ্নের অপসারণ ব্রহ্মাস্বাদেই পরিপূর্ণভাবে লাভ করা যায়। কাব্যরস ব্রহ্মাস্বাদেরই সহোদর। ইহা যোগীর জ্ঞানের মত তন্ময় বা নির্লিপ্ত নহে। কিন্তু ইহাও অ-লৌকিক; ইহাও আস্বাদস্বরূপ এবং সেইজন্যই লৌকিক নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন এখানে গৌণ। কাব্যচর্চ্চা চৈতন্যের বিঘ্ন অপসারণ করিয়া যে বিশুদ্ধি আনয়ন করে তাহা চতুর্ব্বর্গ লাভের সহায়ক হয়; কিন্তু কাব্যের আস্বাদ অ লৌকিক। কবি কি ইচ্ছা করেন সেই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু তাঁহার কাব্যে যদি নীতিকথা প্রাধান্য পায় অথবা নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহই যদি প্রাধান্য পায় তাহা হইলে নূতন বাধা বা আবরণের সৃষ্টি হইবে এবং রসাস্বাদ বিঘ্নিত হইবে।

কাব্য বাস্তবের অনুগমন করে, না বাস্তবকে রূপান্তরিত করে—এই প্রশ্ন প্লেটো-অ্যারিষ্টটল-প্রবর্ত্তিত সাহিত্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা। কিন্তু আমাদের

দেশের সাহিত্যশাস্ত্রে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াই অপনীত হইয়াছে। আলংকারিকেরা যে এই সমস্যা এড়াইয়া গিয়াছেন তাহার অন্তরালে একটি সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। কাব্যের আস্বাদ স্বসংবিদানন্দস্বরূপ অর্থাৎ তাহা স্বীয় চিত্তেই উদ্ভূত হইয়া পরিসমাপ্তি লাভ করে; ইহা ক্ষণজীবী, ইহার কোন পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। ইহা প্রমাণ শাস্ত্র নহে, তাই এখানে কার্য্যকারণ-সম্পর্ক নাই, ইহা পরের অনুকরণ করে না এবং অপরের সম্পর্কে কোন কিছু অনুমান (প্রমাণ) করে না। শঙ্কুক ও মহিমভট্ট অনুকরণ ও অনুমানের দ্বারা রসনিষ্পত্তির ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেই মত গ্রাহ্য হয় নাই। এই সম্পর্কে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার ধারা হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। তাই ইহাদের একটু ব্যাখ্যা দরকার। বাস্তবজীবনে যাহাকে বলে কারণ, কাব্যে তাহাকে বলা হয় বিভাব। শৃঙ্গাররসের কাব্যে দুষ্মন্ত শকুন্তলা মুখ্য নহেন, কবি সামাজিকের চিত্তে যে রস প্রতীত হয় ইঁহারা তাহা বিভাবিত করেন অর্থাৎ সামাজিকের চিত্তকে এই রসে অনুরঞ্জিত করেন। বাস্তবজীবনে ইঁহাদিগকে বলা যাইতে পারিত রসসৃষ্টির কারণ। রস যে সমস্ত ব্যাপারের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হয় তাহাদিগকে কার্য্য না বলিয়া অনুভাব বলা হয়। যে সমস্ত ক্ষণস্থায়ী ভাব সহচররূপে থাকে তাহাদিগকে বলা হয় সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। ভরতমুনি রসের সংজ্ঞা দিলেন এই বলিয়া, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাবের সংযোগ অর্থাৎ সম্মিলনে রসের নিষ্পত্তি হয়। পরবর্ত্তী টীকাকারেরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যদিও রতি, শোক প্রভৃতি ভাবই শৃঙ্গার, করুণ প্রভৃতি রসে পরিণত হয়, তথাপি সূত্রে ভাবেরই উল্লেখ নাই। ইহার কারণ পরের অর্থাৎ দুষ্মন্ত-শকুন্তলাদির ভাবের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ গৌণ; সেই ভাবকে জানা কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। বোধ হয় এই কারণেই মল্লিনাথ কালিদাসের দর্শন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন নাই। সাহিত্যশাস্ত্রে নায়ক নায়িকাদের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে কিন্তু আমরা যেমন হ্যাম্‌লেট, লেডি ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতির চরিত্রচিত্রণ করি কোন প্রাচীন আলংকারিক সেইভাবে দুষ্মন্ত-শকুন্তলাদির চরিত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই। নায়ক প্রভৃতির শ্রেণীগত লক্ষণ নির্দেশ করিয়াই থামিয়া গিয়াছেন।

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়, লৌকিক ভাব অলৌকিক রসে নীত হয়। ইহারা রসাস্বাদের উপাদান, যেমন

গুড়মরিচাদি পানক রসের উপাদান। সাহিত্যের ব্যাখ্যাতারা এই উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছেন; সেই কারণেই তাঁহাদের আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ হইয়াছে। ভরত নাট্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন এবং তিনি নাটকের শব্দবহির্ভূত আঙ্গিকেরও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কাব্য লিখিত হয় শব্দের দ্বারা, নাটক দৃশ্যকাব্য হইলেও কথোপকথনধর্মী কাব্য। অভিজ্ঞানশকুন্তলে পলায়মান মৃগের অঙ্গভঙ্গির অপরূপ বর্ণনা আছে; সেই সকল অঙ্গভঙ্গি বর্ণিত হইয়াছে শব্দের মাধ্যমে। কাজেই আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্রের প্রধান বিষয় শব্দ ও অর্থের সৌন্দর্য্যময় সন্নিবেশ। এই সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া আলংকারিকেরা উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, শ্লেষ প্রভৃতি নানা অলংকারের নামকরণ করিয়াছেন। কোন্ শক্তির বলে অলংকার অলংকৃতিত্ব লাভ করে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকে সৌন্দর্য্য দান করে এই প্রশ্নও এই সকল আলংকারিকদের মনে জাগিয়াছিল। তাই ভামহ বলিলেন, সমস্ত কাব্যের গোড়ার কথা বক্রোক্তি বা অতিশয়োক্তি; কবিরা অনেক সময়ই যে ছোট কথাকে বাড়াইয়া বলেন সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। অ্যারিষ্টটলও বলিয়াছেন যে, ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে আমরা কোন গল্প শুনিয়া যখন অপরের কাছে নিবেদন করি তখন একটু বাড়াইয়া বলি। এই প্রবৃত্তি কাব্যসৃষ্টিতে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু অতিশয়োক্তি ছাড়াও কাব্য রচনা করা যায়, ইহা যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য বিচার করিলেই দেখা যায়। তারপর, কাব্যে অতিশয়োক্তি থাকে—কিন্তু অতিশয়োক্তি মাত্রই কাব্য নহে। ভামহের পরবর্ত্তী আলংকারিক কুন্তক বক্রোক্তিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়া এই আপত্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনিও অবশ্য স্বভাবোক্তিকে মানিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন; তিনি দেখাইয়াছেন প্রচলিত প্রয়োগ হইতে বিভিন্ন উক্তিবৈচিত্র্যই সাধারণতঃ কাব্যসৌন্দর্য্য আনয়ন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি কুমারসম্ভব হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণবেশী মহাদেব পতিকামনায় তপস্যারত পার্ব্বতীর মনে কাম্য পতির প্রতি জুগুপ্সা সঞ্চার করিবার জন্য বলিতেছেন:

দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং
সমাগমপ্রার্থনয়া কপালিনঃ।
কলা চ সা কান্তিমতী কলাবত
স্ত্বমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী॥

[সম্প্রতি কপালী মহাদেবের আসঙ্গপ্রার্থনা করিয়া দুইজন শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—এক চন্দ্রের কান্তিমান কলা আর ত্রিলোকের নেত্রজ্যোৎস্নারূপিণী তুমি নিজে।]

এখানে অধিকাংশ শব্দই তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহাদিগকে বাদ দিয়া অন্য কোন প্রতিশব্দ বসাইলে সৌন্দর্য্যহানি হইবে। মহাদেবের সঙ্গে সমাগম যে কাকতালীয়বৎ আকস্মিক নয় 'প্রার্থনয়া'-শব্দ তাহাই সূচিত করিতেছে। পার্ব্বতীর মনে জুগুপ্সা-সঞ্চার এই শ্লোকের উদ্দেশ্য ; তাহা 'কপালিনঃ' শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।*

সুতরাং দেখা যাইতেছে কোন বিশেষ অলংকার নহে, শব্দের প্রয়োগ ও বিন্যাস বৈচিত্র্যই কাব্যশোভার মূল। এই যুক্তিতেই আমরা অলংকারবাদ অতিক্রম করিয়া গুণবাদ ও রীতিবাদে পঁহুছিব। এই শেষোক্ত আলংকারিকেরা মনে করেন পদসংঘটনা হইতে শব্দ ও অর্থ যে মাধুর্য্য, ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি গুণে ভূষিত হয় তাহাই কাব্যশোভার হেতু। অসমাসবদ্ধ পদবিন্যাস মাধুর্য্যগুণ আনয়ন করে, সমাসবদ্ধ পদ ওজস্বিতা বা দীপ্তিগুণের আধার। কিন্তু এখানেও দেখা যাইতেছে যে, কোন বিশেষ অর্থই কাব্যের উদ্দেশ্য, পদসংঘটনা সেই উদ্দেশ্যলাভের উপায় মাত্র। মহাদেব নিজের সম্পর্কে জুগুপ্সা উৎপাদন করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই 'কপালিনঃ'—শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই কারণেই গুণ প্রভৃতির সম্পর্কে কোন স্থির, সর্ব্বথাপ্রযোজ্য নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। বলা হইয়া থাকে যে, সমাসবদ্ধ পদবিন্যাস ওজস্বিতার পরিপোষক। কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি বিচার করা যাক্ :

যো যঃ শস্ত্রং বিভর্ত্তি স্বভুজগুরুমদঃ পাণ্ডবীনাং চমূনাং
যো যঃ পাঞ্চালগোত্রে শিশুরধিকবয়া গর্ভশয্যাংগতো বা।
যো যস্তৎকর্ম্মসাক্ষী চরতি ময়ি রণে যশ্চ যশ্চ প্রতীপঃ
ক্রোধান্ধস্তস্য তস্য স্বয়মপি জগতামন্তকস্যান্তকোঽহম্॥

(পাণ্ডবীয় সেনাসমূহের মধ্যে যে যে বাহুবলের অহংকার করিয়া শস্ত্র ধারণ করে, পাঞ্চাল বংশে শিশু, অধিকবয়স্ক অথবা গর্ভশয্যাশায়ী, যে যে সেই কর্মের সাক্ষী, আমি রণে অবতীর্ণ হইলে যে যে আমার বিরোধী হইবে তাহাদের মধ্যে যদি স্বয়ং জগতের বিনাশকও থাকেন তাহা হইলেও ক্রোধান্ধ আমি তাহাদের বিনাশ সাধন করিব।)

---

* পাঠান্তর 'পিনাকিনঃ' গ্রহণ করিলে এই ভাবটি পাওয়া যাইবে না।

জিঘাংসু অশ্বত্থামার উক্তিতে দীপ্তি বা ওজস্বিতার অভাব নাই, কিন্তু এখানে সমাসবদ্ধ পদ বিরল। অর্থের স্বরূপকে অপ্রধান করিয়া শব্দ বা অর্থের নিয়ম রচনা অসম্ভব। গুণবাদ সম্পর্কে যে সমালোচনা করা হইল তাহা রীতি ও বৃত্তি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। অর্থকে আশ্রয় করিয়াই উপনাগরিকাদি বৃত্তি ও বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতি তাৎপর্য্য লাভ করে। ইহাদের কোন নিজস্ব অস্তিত্ব নাই।

এই উপলব্ধিতেই আনন্দবর্দ্ধনের যুগান্তকারী ধ্বনিবাদের উদ্ভব। কাব্যের অর্থই প্রাণ; তাহাই অঙ্গী এবং রচনার গুণ অঙ্গী অর্থকে আশ্রয় করে। অলংকার রমণীর কটককেয়ূরাদির মতই বাহিরের ভূষণ। তাহাকে তখনই কাব্যের শোভা বলিয়া গ্রহণ করা যায় যখন তাহা অঙ্গী অর্থের অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়। প্রথমেই একটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। শাস্ত্র, ইতিহাসাদিতেও অর্থ থাকে; সেই অর্থকে সুন্দর ভাষায় সজ্জিত করিলেই কি কাব্য ও সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে? অধিকাংশ সমালোচক ও পাঠকের তাহাই মত। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, শাস্ত্রের বাক্য প্রভুসম্মিত, ইতিহাসাদির বাক্য বন্ধুসম্মিত এবং কাব্যের বাক্য কান্তাসম্মিত। পাশ্চাত্ত্য দেশেও এই মত নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন সাহিত্য সার্ব্বজনীন, কারণ যে সকল অনুভূতি ও বিশ্বাস আদিমকাল হইতে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে, যাহা নানারূপ আবরণের চাপে ঢাকা পড়িয়াছে কবির কাব্যে তাহাই উদ্ঘাটিত হয়। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, নীতি শিক্ষা দেওয়া অথবা চিরাচরিত নীতির দোষ ত্রুটি দেখানই কাব্যের উদ্দেশ্য। শুধু দর্শন ও প্রবন্ধ নীরস বলিয়া কবিরা সাহিত্যের সরস বচনভঙ্গি গ্রহণ করেন। কিন্তু আনন্দবর্দ্ধন ও তৎশিষ্য অভিনবগুপ্ত অন্যমত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতের একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

শব্দ উচ্চারণ করিলেই অর্থ অভিহিত হয়; শব্দ ও অর্থ পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের মতই নিত্যসম্পৃক্ত। সাধারণতঃ এই ভাবেই শব্দ ও অর্থের নিয়ত সম্পর্ক মানিয়া লওয়া হয়। মীমাংসকরা অর্থের কোনরকম সচলতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু আনন্দবর্দ্ধনের মতে শব্দ প্রাথমিক, বাচ্য অর্থ অভিহিত করিয়া আর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত করিতে পারে। শব্দের এই শক্তির উপরই ধ্বনি-বাদ প্রতিষ্ঠিত। এমন জায়গা আছে যেখানে প্রাথমিক অর্থ গ্রহণই করা যায় না। সেইখানে আভিধানিক অর্থ বাধা পাওয়ায় যে নূতন অর্থ উদ্ভূত হয় তাহাকেই

প্রাথমিক অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রাথমিক অর্থকে অতিক্রম করিয়া কখনও কখনও আর একটি অর্থ দ্যোতিত হয়। এই নূতন অর্থই—আনন্দবর্দ্ধনের ভাষায় প্রতীয়মান অর্থ—কাব্যের প্রাণ; ইহার মাধ্যমেই রস আস্বাদ্যমান হয়। একটি সরল দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে। মহর্ষি আঙ্গিরা ঋষিদের মধ্যে বাক্‌পটু ছিলেন। তিনি পিতা হিমালয়ের কাছে সবিস্তারে পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। সেই সময় পার্ব্বতী পিতার কাছেই ছিলেন। পার্ব্বতীর বর্ণনা কালিদাস দিয়াছেন এইভাবে:

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী।

ইহার বাচ্যার্থ খুব সহজ। দেবর্ষি অঙ্গিরা যখন বরের বিষয় বলিলেন তখন পার্বতী লীলাকমলের পত্র গণনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার ধ্বনিত অর্থ পুলকিত, প্রণয়ভীরু কুমারীর লজ্জা। এই কথা সোজা করিয়াও বলা যাইতে পারে, যেমন বলা হইয়াছে, নিম্নলিখিত শ্লোকে:

কৃতে বরকথালাপে কুমার্য্যঃ পুলকোদ্গমৈঃ
সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ॥

[বরসম্বন্ধীয় কথার আলাপ হইলে কুমারীরা অন্তর্লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া দেহে পুলক সঞ্চারের দ্বারা নিজেদের প্রণয়াভিলাষ সূচিত করে।]

ইহার মধ্যে প্রতীয়মানত্ব সামান্যই, কিন্তু কালিদাস লজ্জাবনতমুখী পার্ব্বতীর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার মধ্যে মনের কথা খোলাখুলিভাবে বিবৃত হয় নাই। প্রচলিত অর্থকে অতিক্রম করিয়াই কাব্যের অর্থ ধ্বনিত হইয়াছে। ইহাই ব্যঞ্জনা।

॥ ৪ ॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রসের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করিয়া ভারতীয় আলংকারিকেরা অনেক সমস্যাকে এড়াইয়া গিয়াছেন, কিন্তু এড়াইয়া গেলেই সমস্যার সমাধান হয় না। প্রথমে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কের কথাই ধরা যাক্ না কেন। আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন, বাচ্য অর্থ ব্যঞ্জনা বা ধ্বনির ভিত্তিভূমি, বাচ্য

অর্থ শাস্ত্র-ইতিহাসদির বাহন। অর্থাৎ শাস্ত্র-ইতিহাসাদি অথবা ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতার উপরই কাব্য প্রতিষ্ঠিত। অভিনবগুপ্ত রসের অলৌকিকত্ব প্রমাণ ব্যাপারে সব চেয়ে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তিনিও যোগীর ব্রহ্মাস্বাদের সঙ্গে রসচর্ব্বণার পার্থক্য করিয়াছেন। কবিসহৃদয়ের রসাস্বাদ যোগীর জ্ঞানের মত 'একঘন' নহে, সকল বৈষয়িক ব্যাপারের 'উপরাগ শূন্য' নহে। পরিপূর্ণ তন্ময়তা বা নির্লিপ্ততার জন্যই ব্রহ্মাস্বাদ কাব্যের আস্বাদের মত সৌন্দর্য্যময় হইতে পারে না। স্বয়ং ভরতমুনিও বলিয়াছেন, ইতিবৃত্ত কাব্যের শরীর। ইহা একটা তুলনা মাত্র ; কিন্তু ইহাও প্রমাণ করে, কাব্যের সঙ্গে ইতিবৃত্তের নিবিড় সম্পর্ক। দেহের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আত্মার সৌন্দর্য্যের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাও থাকিতে পারে, কিন্তু ইতিবৃত্তাদি বৈষয়িক ব্যাপারের সঙ্গে কাব্যের সৌন্দর্য্যের যে সম্পর্ক আছে তাহা অভিনবগুপ্তও পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতীয় আলংকারিকেরা কাব্য ও সাহিত্যকে যতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, ততটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা তাহাদের নাই। অভিনব-গুপ্ত কাব্যকে দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন ; দীপ শুধু নিজেকে আলোকিত করে না অপর বস্তুকেও উদ্ভাসিত করে। অর্থাৎ রস নিজেকে প্রকাশ করিয়া রত্যাদি বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। ইহা মানিয়া লইলে রসকে আস্বাদ মাত্র বলিয়া মনে করা ভুল হইবে। রস স্বয়ংসম্পূর্ণ আস্বাদস্বরূপ কিন্তু তাহা মানবজীবনের ও সমাজের বহু গুহাহিত রহস্যকে উদ্ঘাটিত করে। আত্মাই প্রধান বটে কিন্তু শরীর যদি না থাকে ? এই কারণেই সাহিত্য সুনীতি-দুর্নীতি সম্পর্কেও উদাসীন নয় ; জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে আলোকপাত করিতে পারে বলিয়াই আজগুবি গল্পও আমাদের কাছে সমাদর লাভ করে। অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আলংকারিকেরা বলেন রতি, হাস, শোকাদি ভাব আমাদের মনে বাসনাসংস্কাররূপে নিহিত থাকে ; ইহারাই গোচরীকৃত হইয়া রসতা প্রাপ্ত হয়—প্রাগ্বিনিবিষ্ট বাসনরূপো রত্যাদিরেব রসঃ (জগন্নাথ)। এই প্রাগ্বিনিবিষ্ট বাসনাগুলি তো লৌকিক ব্যাপার ; রসসৃষ্টির আদি ও অন্তে ইহাদিগকে পাওয়া যাইবে। ইহাদের গুণাগুণ বাদ দিয়া রসের বিচার করিতে গেলে সেই বিচার খণ্ডিত হইতে বাধ্য।

আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিকেরা বাচ্যার্থকে গৌণ করিয়া শুধু ধ্বনিপ্রধান কাব্যকেই শ্রেষ্ঠ বা উত্তমোত্তম কাব্য বলিয়া থামিয়া গিয়াছেন এবং

ধ্বনির অশেষ প্রকার ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না দিয়া শুধু চুলচেরা বিভাগ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অসংখ্য প্রকার কল্পনা করিয়াছেন। এই অগণিত শ্রেণীভেদের দ্বারা কাব্যের বিচার হয় না এবং যেহেতু শুধু এই একটি ব্যাপারের বিশ্লেষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে সেই জন্য তাঁহাদের বিশ্লেষণও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহারা শুধু শ্লোকের বিশ্লেষণের উপর জোর দিয়াছেন; সেই জন্য সমগ্র কবিতার বিচার না করিয়া এক একটি শ্লোককে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'সংস্কৃত শাস্ত্রে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি যাহাতে মনে হইতে পারে যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, উত্তরচরিত প্রভৃতি দীর্ঘ রচনার কাব্যদেহপরিব্যাপ্ত রসবৈশিষ্ট্যটি সমালোচকের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল? প্রত্যেকটি রেখার টান, বর্ণান্তররঞ্জনের সূক্ষ্মতম অনুমিশ্রণ যে কেন্দ্রীয় ভাবানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতনতা, কাব্যরসের সামগ্রিক বিচার সম্বন্ধে আগ্রহ কি প্রাচীন সমালোচনারীতিতে লক্ষ্য করা যায়?' এই প্রশ্ন আনন্দবর্দ্ধনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি ধ্বনিবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ধ্বন্যালোক-গ্রন্থের প্রথম তিন উদ্দ্যোতে এবং পরিশিষ্টাকারে লিখিত স্বল্পপরিসর চতুর্থ উদ্দ্যোতে ধ্বনিবাদের সামগ্রিক আবেদনের কথা তুলিয়াছেন। 'ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব বিবিধ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা থাকিলেও কবি এক রসাদিময় ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক ভাবে যত্নবান্ হইবেন।' ৪।৫ তিনি স্বীয় মতের পোষণার্থে রামায়ণ ও মহাভারতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, রামায়ণে শোক শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সীতার তিরোভাব পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া আদি কবি করুণ রসের প্রাধান্য দিয়াছেন। মহাভারত সম্পর্কে আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন, 'মহামুনি যাদব ও পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ তিরোধানজনিত সংসারবিতৃষ্ণাদায়িনী সমাপ্তির বর্ণনা দিয়া দেখাইয়াছেন যে, মোক্ষই পরম পুরুষার্থ এবং শান্তরসই তদীয় কাব্যের প্রধান বক্তব্য বিষয়।' আনন্দবর্দ্ধন উভয় মহাকাব্যেরই পরিণতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া এক রসাদিময় ব্যঙ্গ্য অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যের যাথার্থ্য মানিয়া লইলেও এইরূপ আলোচনায় মহাকাব্য দুইখানির সাহিত্যিক গুণাগুণের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়না। যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে, রামায়ণে করুণরস প্রধান্য পাইয়াছে বা মহাভারতে শান্তরস প্রাধান্য পাইয়াছে তাহা হইলেও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, অন্যান্য করুণরসাত্মক বা শান্তরসাত্মক কাব্য হইতে এই দুই মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য বা শ্রেষ্ঠত্ব কেমন করিয়া

নির্ণীত হইবে? এবং এই আলোচনায় প্রবিষ্ট হইলেই অন্যান্য ব্যাপারের অবতারণা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে।

যে সাহিত্য-তত্ত্ব শুধু প্রতীতি বা অভিব্যক্তিকে আশ্রয় করে তাহা কখনও কল্পনার তীব্রতা বা আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব মানিতে পারিবে না এবং সেই কারণে তাহা ভাসা-ভাসা আলোচনায় পর্য্যবসিত হইবে। আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনব-গুপ্তের ধ্বনিবাদের সঙ্গে ক্রোচের অভিব্যক্তিবাদের সাদৃশ্যের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ক্রোচে স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন, কবির ও অ-কবির **intuition** বা অনুভব বা স্বজ্ঞার কোন গুণগত পার্থক্য নাই। সমস্ত পার্থক্য বিস্তৃতিতে, জটিলতায় অথবা সংখ্যায়। যদি ইহাই মানিতে হয়, তাহা হইলে যে কাব্যে যত বেশী অলংকার, গুণ বা ধ্বনি থাকিবে সেই কাব্য তত বেশি বড় হইবে। এই জন্যই সর্ব্ব সম্প্রদায়ের আলংকারিকগণ অলংকার, গুণ, ধ্বনি প্রভৃতির প্রকারভেদ বাড়াইয়া চলিয়াছেন এবং কাব্যের সামগ্রিক আবেদন হইতে দৃষ্টি অপসারণ করিয়া শুধু অলংকার, গুণ, দোষ প্রভৃতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। এইসব আলোচনার সঙ্গে কাব্যের মূলীভূত সৌন্দর্য্যের সংস্রব কম এবং এখানে ধ্বনিবাদী ও অলংকারবাদীর পন্থার মধ্যে পার্থক্যও খুব বেশি নয়।

ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে একটা ক্রমিক সঙ্কোচন ও পরে অধোগতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই শাস্ত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল—রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ বাদ দিলেও—সেই পদ্ধতিতে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত এই শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান প্রবক্তা এবং ইঁহাদের নাম একই সঙ্গে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; বরং অভিনবগুপ্তই সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অভিনব গুরুর ধ্বনিবাদকে খানিকটা সঙ্কুচিত করিয়া অসামান্য ধীশক্তি বলে তাহার প্রচার করেন ও বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন করেন। পরবর্ত্তী লেখকরা মহা সম্ভ্রম সহকারে অভিনবগুপ্ততাতপাদাচার্য্য বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আলোচনার মধ্যেই ধ্বনিবাদের সঙ্কীর্ণতা ও ভঙ্গুরতার প্রথম আভাস পাওয়া যায়। আনন্দবর্দ্ধন একাধিকবার বলিয়াছেন যে, বাচ্য ব্যঙ্গ্যের ভিত্তিভূমি, বাচ্য অর্থ গৌণ হইয়া গেলেও অবলুপ্ত হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্র-ইতিহাসাদির সঙ্গে কাব্যের নিবিড় সংযোগ আছে। অভিনব এই ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করিয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিবেন ইহাই আশা করা যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি

সেই পথে যান নাই ; বরং তাঁহার ব্যাখ্যায় রসের অলৌকিকত্ব এত প্রাধান্য পাইয়াছে যে ইহার বাস্তবভিত্তি যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

অভিনবের যুক্তি এত শাণিত, উপলব্ধি এত তীক্ষ্ণ এবং বিশ্বাস এত দৃঢ় যে ক্ষয়িষ্ণুতার প্রারম্ভিক লক্ষণ তাঁহার রচনায় ধরা পড়ে না। কিন্তু তাঁহার আলোচনা হইতেই বোঝা যায় যে, ধ্বনিবাদ পরিসংখ্যানে পর্যবসিত হইবে। অভিনবের পরেই এই অধোগতির পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। অভিনবের পরবর্তী লেখকদের মধ্যে মম্মটভট্ট সমধিক প্রসিদ্ধ ; এক সময়ে তৎপ্রণীত কাব্যপ্রকাশ-গ্রন্থের টীকা গৃহে গৃহে রচিত হইত। কিন্তু এই গ্রন্থে ধ্বনিবাদ এক চুলও অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আনুষঙ্গিক ব্যাপারেই তাঁহার বিশ্লেষণনৈপুণ্য ব্যয়িত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের অনেকগুলি উল্লাস বা অধ্যায় আছে ; সর্বাধিক প্রসিদ্ধি পাইয়াছে দোষ-বিষয়ক সপ্তম উল্লাস। এইরূপ প্রবাদ আছে মম্মটভট্ট নৈষধচরিতকারকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, নৈষধকাব্য কাব্যপ্রকাশের পূর্বে প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে দোষাবলীর দৃষ্টান্ত দেখাইতে অন্যত্র যাইতে হইত না। এই বহুপ্রচলিত প্রবাদবাক্য এই জাতীয় সমালোচনার অন্তঃসারহীনতা প্রমাণ করে। আলংকারিকেরা যে সকল গুণ বা দোষের কথা বলেন তাহা কাব্যে থাকিতে পারে,কিন্তু সেই তুলাদণ্ডে কাব্যের মাহাত্ম্য পরিমাপ করা যায় না। বস্তুতঃপক্ষে কাব্যের কাব্যত্ব পরিমাপণীয় বা পরিসংখ্যনীয় বস্তু নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা শেক্সপীয়রের নাটকে অনেক ব্যাকরণগত ভুল এবং অলংকারশাস্ত্রের নিয়মভঙ্গের বহু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু শেক্সপীয়র শেক্সপীয়রই। মম্মটের পরে এই অধোগতি আরও স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় আলংকারিকদের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক পণ্ডিত জগন্নাথ ; তিনি নাকি দারা শেকোর সমসাময়িক ছিলেন অর্থাৎ তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। তাঁহার রসগঙ্গাধর গ্রন্থে রসবিচারে মৌলিকতা খুব বেশি নাই ; তিনি পুরাণ কথাকেই ন্যায়ের ও দর্শনের দুরূহ পারিভাষিক শব্দের আবরণে সজ্জিত করিয়াছেন এবং তাঁহার দৃষ্টিও মূল তত্ত্ব হইতে শাখা-প্রশাখায় নিবদ্ধ হইয়াছে। আমার হাতের কাছে রসগঙ্গাধর গ্রন্থের যে সংস্করণ আছে তাহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭০৬ ; তন্মধ্যে রসস্বরূপের ও ধ্বনিবাদের ব্যাখ্যা ৩৫ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়া গিয়াছে আর বাকি অংশ ভাব, ব্যভিচারী ভাব, অনুভাব, গুণ, অলংকার, ধ্বনির বিভিন্ন প্রভেদের বর্ণনায় নিয়োজিত হইয়াছে।

॥ ৫ ॥

এই অধোগতি বাঙ্গালীর রসোপলব্ধিকে কিরূপ ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহার একটি গল্প বলিয়া এই আলোচনা পরিসমাপ্ত করিব। মধুসূদনের সমসাময়িক পণ্ডিতদের মধ্যে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ অগ্রণী ছিলেন। কথিত আছে মধুসূদন 'শর্ম্মিষ্ঠা'-নাটক লিখিয়া তর্কবাগীশ মহাশয়কে পড়িতে দিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত দোষ ত্রুটি তিনি দেখিতে পান তাহা দাগ দিতে বলিয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়া তর্কবাগীশ বলিয়াছিলেন, দাগ দিতে গেলে গোটা বইটাই দাগ দিতে হয়। তবে মধুসূদনের চিন্তিত হইবার কারণ নাই, কারণ তাঁহার মত চোখ মাত্র দুই চার জনের আছে। তাঁহারা ফতে হইয়া গেলে মধুসূদনের কাব্য যথেষ্ট বাহবা পাইবে। নূতন চিন্তা, নূতন কল্পনা, নূতন পদবিন্যাস, নূতন ছন্দ—ইহা বুঝিবার জন্য যে মানদণ্ডের প্রয়োজন প্রাচীন অলংকারশাস্ত্র তাহা যোগাইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমালোচনার স্বরূপ

॥ ১ ॥

পূর্বেই বলা হইয়াছে আমরা আজকাল যাহাকে সাহিত্যসমালোচনা বলি আমাদের দেশে পুর্ব্বে তাহা ছিল না। দুই শ্রেণীর লোক সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতেন—আলংকারিক বা সাহিত্যশাস্ত্রী আর টীকাকার। এক দল রসতত্ত্বের বিচার করিতেন আর এক দল লোক কাব্যের অন্বয় করিয়া শব্দার্থের ব্যাখ্যা করিতেন এবং আলংকারিকদের সাহায্যে কাব্যকে অলংকার, গুণ, রীতি, ধ্বনি ও রসের অন্তর্ভুক্ত করিতেন। এখনকার দিনের পাঠক মল্লিনাথের টীকাকে অর্থপুস্তকের পর্য্যায়ে ফেলিবেন। আমরা যাহাকে সমালোচনা বা ব্যাখ্যা বলি তাহার অভাবের কারণ রসের সংজ্ঞার মধ্যেই পাওয়া যাইবে। রসের ব্যাখ্যাতারা কাব্যকে কবিহৃদয়ের প্রকাশ বলিয়া মনে করিতেন না। ভট্টনায়ক তো জোর করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রস অভিব্যক্ত হয় না। অভিনব রসের অভিব্যক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সীমিত, উপচরিত অর্থে। বাল্মীকির আদি কবিতা—মা নিষাদ ইত্যাদি—শোক প্রকাশ করে.ইহা তো সহজ কথা। কিন্তু অভিনব বলিয়াছেন, ইহা মুনির শোক নহে—ন মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্। তবে কি ইহা বিলপমান ক্রৌঞ্চের শোক? তাহাও নহে, কারণ ক্রৌঞ্চ ক্রন্দন করে, কবিতা লিখে না। অভিনবের ব্যাখ্যা এইরূপ—ইহা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, সাধারণীকৃত শোক; সেইজন্যই ইহা রসরূপ পাইয়াছে।

কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিতে হইবে। অভিনব ও অন্যান্য দার্শনিকেরা বলেন, আমাদের হৃদয়ের স্বভাব এই যে, ইহা বিগলিত বা দ্রবীভূত হয়, ইহা বিকশিত হয়, ইহা বিস্তার লাভ করে। এইখানেই রসাস্বাদের অংকুর। বাহিরের অভিজ্ঞতা—ব্যাধকর্তৃক ক্রৌঞ্চীর নিধন ও ক্রৌঞ্চের ক্রন্দন—দ্রুতি-বিস্তারবিকাশাত্মক হৃদয়কে জাগ্রত করিল, অভিনবের ভাষায়, অনুরঞ্জিত করিল। ভাব কবির অন্তঃস্থিত বস্তু; চিত্তের স্বাভাবিক নিঃষ্যন্দিতাগুণে বাহিরের অভিজ্ঞতার আঘাতে তাহা উছলিয়া পড়ে, পূর্ণকুম্ভ হইতে জল যেমন উছলিয়া পড়ে।

এই উচ্ছলিত হৃদয়াবেগের সঙ্গে ক্রৌঞ্চের সংযোগ আছে, কিন্তু ক্রৌঞ্চের

শোক কবির শোকের সঙ্গে মিশিয়া যাইয়া এমন একটি শোকের সৃষ্টি করিল যাহা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে, বিশ্বজনের সম্পদ্। ক্রৌঞ্চ এখানে গৌণ, কারণমাত্র। কবির হৃদয়ই রসাস্বাদের আধার, কিন্তু যে রস আস্বাদিত হইতেছে তাহার সঙ্গে তাঁহার নিজের আর কোন সম্পর্ক রহিল না। আমরা যাহাকে কবির জীবনচরিত বলি অথবা কবিমানস, কবির ব্যক্তিসত্তা বা কবিপুরুষ নামে সংজ্ঞিত করি তাহা এই আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। প্রশ্ন হইবে, কেমন করিয়া হৃদয় দ্রবীভূত, বিকশিত ও বিস্তারিত হইয়া স্বকীয় শোককে আস্বাদন করে বা চমৎকৃত হয়? ইহা শব্দ ও অর্থের ব্যাপার। সুতরাং কাব্যপাঠক বা কাব্যব্যাখ্যাতা শব্দ ও অর্থের এই শক্তির অনুসন্ধান করিবেন। কবির ভাব উচ্ছ্বলিত হয় ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি বাহিরের বস্তুর সংস্পর্শে; ইহারাই কবির হৃদয়ে 'সমর্পিত' হইয়া রসাস্বাদকে সম্ভব করিয়া তোলে। আমরা যেমন কাব্যনাটকাদির চরিত্রে মনোনিবেশ করি, প্রাচীন সাহিত্যশাস্ত্রীরা ততটা করিতেন না, কারণ রস আস্বাদিত হয় কবিসামাজিকের মনে; যে বস্তু বা ব্যক্তি এই আস্বাদ উদ্বোধিত বা 'অনুরঞ্জিত' করে তাহার স্থান গৌণ আবার যে ভাব রসরূপতা পায় তাহাও কবির নিজের ভাব নয়।

আমাদের কাছে এই জাতীয় আলোচনা তৃপ্তিকর মনে হইবে না; ইহা কাব্যকে, কাব্যস্থিত কোন চরিত্রকে সমগ্রভাবে দেখে না, কবির জীবনদর্শন, গভীর সুখদুঃখানুভূতি, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দেশ ও কালের সংযোগ, এমন কি কাব্যের সঙ্গে কবির সম্পর্ক—এই সকল জিজ্ঞাসার কোন উত্তরই এইখানে পাওয়া যায় না। মধুসূদন তো ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রাচীন পণ্ডিতেরা শুধু বলিতে পারেন, হাঁ, উত্তম উত্তম অলংকার আছে। কিন্তু এই জাতীয় ব্যাখ্যার একটা গুণও আছে। ইহা কাব্যকে কাব্য বলিয়া দেখে এবং তাহার শব্দার্থময় শরীর, রসাত্মা এবং সেই আত্মার আনুষঙ্গিক বিভাবাদির বিশ্লেষণ করে। ইহা অবান্তর বস্তু পরিহার করে এবং কাব্যের কাব্যত্বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। ইহার দৃষ্টিভঙ্গি যে সীমিত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; তবে এই সব ব্যাখ্যাতারা অমূল ও অনপেক্ষিত কিছুই বলেন না এবং ইহাই তাঁহাদের আলোচনার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ। কিন্তু কবির দৃষ্টি যে যোগীর দৃষ্টির মত বিষয়স্পর্শশূন্য নয় সেই কথা অভিনব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। শব্দ ও অর্থের মধ্য দিয়া জীবনের সমস্ত দিক্ প্রকাশিত হয়, কবির কাব্য কবির সমগ্র মনের সৃষ্টি এবং কবি যে বিভাবাদি কল্পনা করেন তাহারা অনুরঞ্জক

মাত্র নহে, তাহারা কবির সৃষ্টির অঙ্গ এবং রসের আশ্রয়। এই বিস্তৃত পরিধির মধ্যে শব্দার্থের রহস্যের সন্ধান করিলে প্রাচীন টীকা ও আধুনিক সমালোচনার ব্যবধান অনেকটা ঘুচিয়া যাইবে।

সেইভাবে সাহিত্যালোচনা করিলে যে অপরূপ রসজগতের সৃষ্টি হয় তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের শেক্সপীয়র ও চসার অধ্যাপনায়। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল; তাই তিনি শব্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য নিঙড়াইয়া লইতে পারিতেন। এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া শেক্সপীয়রের সৃষ্ট নরনারীরা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিত, তাহাদের সমস্যা আমাদের সমস্যা বলিয়া মনে হইত। আবার আমরা অতি সহজেই Friar, Pardoner, Wyf of Bath-অধ্যুষিত চসারের জগতে চলিয়া যাইতাম। শেক্সপীয়রের ধর্ম্মবিশ্বাস কি ছিল, শেক্সপীয়রের মধ্যে ইউরোপীয় রেণেসাঁসের লক্ষণ কতটা প্রকাশ পাইয়াছে, শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি বা কমেডির মূল সূত্র কি, চসার কতখানি আধুনিক, কতখানি মধ্যযুগীয়, চসারের হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য কি—অধ্যাপক এই সকল প্রশ্নে কখনও প্রবেশ করেন নাই, সম্ভবতঃ এই সকল বিষয়ে তাঁহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ইহা তাঁহার তথা এই জাতীয় সমালোচনার সীমা নির্দেশ করে, কারণ মানুষের মন এই সব প্রশ্নের উত্তর চায়। আবার ইহাও মানিতে হইবে যে, এই সকল তাত্ত্বিক প্রশ্নে প্রবেশ করিলে কবির কাব্যে তন্ময় হওয়া যায় না, এই সব আলোচনায় মনোনিবেশ করিলে অধ্যাপক ঘোষ যে মায়িক জগৎ রচনা করিতেন তাহা খণ্ডিত হইত, রসাস্বাদ বিঘ্নিত হইত।

অধ্যাপক ঘোষ কোন বই লিখেন নাই। তিনি যে অধ্যাপনা করিয়াছেন তাহা হুবহু নকল করিয়া রাখিলেও সেই সকল পঠন-পাঠনের সুষমা ও সৌন্দর্য বিধৃত হইত না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা মূলতঃ মল্লিনাথেরই পদ্ধতি; তবে সেই পদ্ধতি তাঁহার অসামান্য শক্তির জন্য নূতন রসে সঞ্জীবিত হইয়াছিল, নূতন রূপে দীপ্তি পাইত। কিন্তু তাহা হইলেও মনে হয়, এই পদ্ধতিও খণ্ডিত, ইহার মধ্যে কাব্যের সামগ্রিক রূপ ধরা পড়ে না, ইহার দ্বারা রসাস্বাদ যতটা হয়, রসবিচার ততটা হয় না। অথচ সাহিত্যপাঠক তো শুধু ভোক্তা নহেন, তিনি প্রমাতাও বটেন। সেইজন্য তাঁহাকে শুধু কাব্যপাঠ করিলেই চলিবে না, কবির মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, কবিপ্রতিভার সমগ্ররূপ আবিষ্কার করিতে হইবে।

॥ ২ ॥

যাঁহারা আধুনিক সমালোচনার সঙ্গে পরিচিত আছেন, তাঁহারা এই প্রসঙ্গে এ. সি. ব্র্যাড্‌লির শেক্সপীয়রের চরিত্র বিশ্লেষণের কথা মনে করিবেন। ব্র্যাড্‌লি শেক্সপীয়রের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত, পূর্ণাঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার ফলষ্টাফ চরিত্রের বিশ্লেষণ সম্পর্কে জনৈক ভক্ত উত্তরসূরি বলিয়াছেন, **Here, if anywhere out of Shakespeare, is Shakespeare's Sir John** (শেক্সপীয়রের নাটকের বাহিরে যদি শেক্সপীয়রের ফলষ্টাফ্‌কে পাইতে হয় তবে এইখানেই তাহাকে পাওয়া যাইবে।)—এই প্রশংসা ব্র্যাড্‌লির সমস্ত বিশ্লেষণ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কিন্তু এই প্রশংসায় ব্র্যাড্‌লির বিরুদ্ধবাদীরা সায় দিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, ব্র্যাড্‌লি চরিত্রগুলিকে যেরূপ সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন শেক্সপীয়রের নাটকে তাহাদের সেই সম্পূর্ণাঙ্গ রূপ নাই। যাহা নাটকে নাই, যে সকল অবস্থা বা ঘটনা শেক্সপীয়র নিজে বর্ণনা করেন নাই তাহা অনুমান করিবার অধিকার কোন সমালোচকের নাই। মল্লিনাথের ভাষায় বলা যাইতে পারে, এই জাতীয় সমালোচনার অনেক অংশ 'অমূল' ও 'অনপেক্ষিত' অথচ ইহার মধ্যে শেক্সপীয়রের নাটকের রসের যে আস্বাদ পাওয়া যাইতে পারে তাহা শুধু শব্দার্থ-সম্পর্কিত টীকা ও বিশ্লেষণে পাওয়া যাইতে পারে না। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যে ব্যাখ্যা করিতেন তাহার মধ্যেও এই প্রসারিত দৃষ্টি ছিল, যদিও তিনি সেই সম্পর্কে হয়ত ততটা সচেতন ছিলেন না, অন্ততঃ তত্ত্ব হিসাবে তাহা উপস্থাপিত করেন নাই। ব্র্যাড্‌লির শেক্সপীয়র সমালোচনায় যে রীতি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার অন্তরালে একটা গভীর বিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে এবং এই বিশ্বাসই এই সমালোচনাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। ব্র্যাড্‌লিই বলুন—আর অর্দ্ধ-প্রাচীনপন্থী অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষই বলুন—ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, কবির প্রতিভা যাহা সৃষ্টি করে তাহা প্রজাপতির জগতের মতই সম্পূর্ণ, অখণ্ড, জীবন্ত এবং মানবজীবনের আভ্যন্তরীণ সত্য ইহার মধ্যেই বিধৃত হইয়াছে। ব্র্যাড্‌লি বলিয়াছেন,'…**wherever the imagination is satisfied, there, if we had a knowledge we have not, we should discover no idle fancy but the image of truth'** অর্থাৎ অনিশ্চয়তাসংকুল জীবনে কবির কাব্যই সত্যের সন্ধান দিতে পারে।

ব্র্যাড্‌লি সমালোচনার যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাকে বলা যায়

রোমান্টিক। রোমান্টিক ও ক্ল্যাসিকাল—ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রে এই দুইটি বহু বিতর্কিত আইডিয়া। জনৈক সুপণ্ডিত অধ্যাপক ইহাদিগকে চিন্তা-বিভ্রমকারী শব্দ বলিয়া আখ্যাত করিয়া ইহাদের নির্ব্বাসন দাবি করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা টিকিয়া আছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমরা যখন কলেজে অধ্যয়ন করি তখন ক্ল্যাসিকাল বনাম রোমান্টিক তর্কটা খুব প্রবল ছিল, ক্রমশঃ সেই বিতণ্ডা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন ইহা ধরিয়াই লওয়া হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে চুলচেরা বিভেদ করা অসম্ভব হইলেও মোটামুটি-ভাবে বলা যাইতে পারে সাহিত্যের কতকগুলি ধর্ম্ম রোমান্টিক এবং কতকগুলি ধর্ম্ম ক্ল্যাসিকাল। সমালোচনার ক্ষেত্রে এক সময়ে মিড্‌ল্‌টন মারি এবং টি. এস. এলিয়ট দুই পক্ষের নেতৃত্ব করিতেন। এলিয়ট দুই পক্ষের সংজ্ঞা দিয়াছিলেন এইভাবে: রোমান্টিক সমালোচক স্বীয় অন্তরাত্মার দ্বারা চালিত হয়েন এবং ক্ল্যাসিকাল সমালোচক বাহিরের নিয়মের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। অন্য সমালোচকেরাও মোটামুটিভাবে এই বিভাগ মানিয়া লইয়াছেন।

ক্ল্যাসিকাল সমালোচনার বিচার পরে করা যাইবে। রোমান্টিক সমালোচনার অন্তরালে আছে এক মূলীভূত বিশ্বাস—কবির অপূর্ব্ব-বস্তুনির্ম্মাণক্ষমা প্রতিভা আছে। শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নির মত তাহা কাব্যের প্রতি অংশে—চরিত্রসৃষ্টিতে, কাহিনীসংঘটনায়, বাক্যগঠনে, শব্দসৃষ্টিতে—পরিব্যাপ্ত হয়। সমালোচকের অন্তরাত্মা—বা উপলব্ধির শক্তি—সেই প্রতিভার সঙ্গে মিলিত হইয়া রসের আস্বাদন করে। ইহা এক রকমের হৃদয়সংবাদ। এইরূপ বিচারে সহৃদয়ের বুদ্ধি মুকুরমাত্র নহে, ইহা সক্রিয়; ইহা বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিন্তু ইহা কবিপ্রতিভার অনুরূপ একটি শক্তি এবং সেইজন্যই শ্রেষ্ঠ সমালোচনাও সৃজন-ধর্মী। কাব্যের শব্দবিন্যাস ও নাটক ও উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের অন্তরালে এক রহস্য আছে যাহা অনেকাংশে অনির্ব্বচনীয়। বলা যাইতে পারে ইহা স্রষ্টার জীবনবেদ বা জীবনবোধ বা সত্যানুসন্ধান। সার্থক সমালোচনা এই রহস্যে অবগাহন করে ও ইহাকে উদ্ভাসিত করে; ইহা কবি ও সমালোচকের মিলিত নূতন সৃষ্টি। এই রোমান্টিক সমালোচনা নানাভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু নানা মূর্ত্তির মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র আছে—ইহার মধ্যে সমালোচকের নিজের ব্যক্তিত্ব স্বপ্রকাশ। এই শ্রেণীর সমালোচকেরা নিজেরাই তাঁহাদের মতবাদ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

ইংরেজ সমালোচক হ্যাজলিট বলিয়াছেন, 'আমি যাহা চিন্তা করি তাহা বলি; যাহা অনুভব করি, তাহা চিন্তা করি। যাহা দেখি তাহা হইতে কতকগুলি ধারণা না করিয়া পারি না এবং সেই সব ধারণা (খানিকটা আচমকাভাবে) প্রকাশ করিবার সাহস আমার আছে।' ফরাসী ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যরসিক আনাতোল ফ্রান্স বলিয়াছেন যে, সমালোচনা হইল পুস্তকরাজ্যে আত্মার অভিযানের বিবৃতি। তিনি আরও মন্তব্য করিয়াছেন, 'খোলাখুলিভাবে কথাটা দাঁড়ায় এই: সমালোচক পাঠকবর্গকে বলিবেন, "মহাশয়গণ, আমি শেক্সপীয়র বা রাসিনকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজের কথাই বলিব।"' ইঁহারা সবাই দাবি করেন সমালোচনায় কবির কাব্য নূতনরূপে প্রভাসিত হয়; অর্থাৎ সমালোচনাও সৃষ্টি।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ভাষা ধার করিয়া ও ঈষৎ বদলাইয়া বলিতে পারি যে এই জাতীয় অনুভবমূলক সমালোচনা স্বসংবিদানন্দোত্থ উল্লাস। অর্থাৎ কাব্য পড়িয়া পাঠকের স্বসংবিতে বা চৈতন্যে যে আনন্দ উত্থিত হয় তাহাই বাক্যে উল্লসিত হয়। সাধারণতঃ এই জাতীয় সমালোচনা অতিশয়োক্তিগর্ভ বিশেষণের রূপ নেয়। কিন্তু 'বিস্ময়কর', 'হৃদয়গ্রাহী, 'মর্মান্তিক', 'অপরূপ' প্রভৃতি বিশেষণ আলোচ্য কাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে না, মুখ্যতঃ পাঠকের বা সমালোচকের উপরে সেই কাব্য কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার পরিচয় দেয়। কোন এক নাটক পড়িয়া চার্লস ল্যাম্ব বলিয়াছিলেন, 'আমি যখনই ইহা পড়ি তখনই আমার কানে কাঁটা দিয়া উঠে এবং আমি অনুভব করি আমার গণ্ডদ্বয় আরক্তিম, উষ্ণ আভায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।' শেক্সপীয়রের নাটকে ওথেলো শ্বাসরোধ করিয়া স্ত্রী ডেসডিমোনাকে হত্যা করে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ডেসডিমোনা বলিয়া যায় যে, সে নিজেই এই অপকর্ম্ম করিয়াছে, অপর কেহ নয়। কবি সমালোচক সুইনবর্ণ বলিয়াছেন, এই মিথ্যাভাষণ পৃথিবীর সকল সত্যভাষণকে লজ্জা দিতে পারে ('the most heavenly falsehood that ever put truth to shame')। ভাবের উচ্ছ্বাসে কার্লাইল বলিয়াছিলেন, যদি ইংরেজকে বলা হয় সে ভারতসাম্রাজ্য ছাড়িবে না শেক্সপীয়রকে ছাড়িবে, তাহা হইলে সে নিঃসঙ্কোচে ভারতসাম্রাজ্য ছাড়িয়া শেক্সপীয়রকে ধরিয়া রাখিবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই সকল উক্তি পাঠকের আনন্দের আতিশয্য প্রকাশ করে, কাব্যবস্তুর রহস্যের সন্ধান করে না। কিন্তু এই কথা সব ক্ষেত্রে ঠিক হইবে না। সুইনবর্ণের প্রশংসা

ডেসডিমোনার চরিত্রের উপর আলোকসম্পাত করে এবং আধুনিক ইতিহাস কার্লাইলের অতিশয়োক্তির অপ্রত্যাশিত সমর্থন জোগাইয়াছে। ইংরেজ ভারতসাম্রাজ্য ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু শেক্সপীয়রের সাম্রাজ্য বিশ্বব্যাপী হইয়াছে। কার্লাইলেব উদ্ভট উক্তির মধ্যে শেক্সপীয়রের নাটকের সার্ব্বভৌম আবেদন ধ্বনিত হইয়াছে।

এই জাতীয় সমালোচনার খুব উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে। তাঁহার 'কাব্যের উপেক্ষিতা'-প্রবন্ধ অভিনব রচনা। ইহা রামায়ণ. শকুন্তলা, কাদম্বরী প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা, কিন্তু গ্রন্থগুলির সম্পর্কে বিশেষ কোন মন্তব্য করা বা তাহাদের গুণাগুণ বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বরং এই সকল প্রবন্ধের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া লেখকের কল্পনা এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে যেখানে উর্ম্মিলা, পত্রলেখা, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নবজীবন পাইয়াছে। কবি ইহাদের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা মূল গ্রন্থে নাই, কিন্তু তাহা মূল-বিরোধী নহে, বরং এই সব চিত্রের দ্বারা মূলগ্রন্থগুলি নূতন বিস্তার ও গভীরতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' ও 'স্বপ্ন' কবিতা লিরিক, সমালোচনা নহে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে রোমান্টিক সমালোচনার মূল সূত্রটি পাওয়া যায়। মেঘদূতের চিত্র, শব্দ, অলংকার কবির মনে যে ভাবের সঞ্চার করিয়াছে তাহাই কবিতা দুইটির বিষয়, কিন্তু মূলের সঙ্গে নূতন কবির নূতন ভাবের সংযোগ খুব নিবিড়। অনেক সময় মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের অনুবাদ করিতেছেন :

তস্মাদ্গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপংক্তিম্।
গৌরীবক্ত্রভ্রূকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্ম্মিহস্তা ॥

(কালিদাস)

কোথা কন্‌খল্,
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবন-চঞ্চল,
গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গী করি অবহেলা
ফেনপরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।

(রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু কবিতার শেষে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবটি প্রকট হইয়াছে :

কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস-সরসীতীরে বিরহশয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।

'স্বপ্ন' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাবলীর অন্যতম ; ইহার মধ্যেও কবির সমালোচনী মনোবৃত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কালিদাস যে ব্যক্তিগত বর্ষভোগ্য বিচ্ছেদের কথা বলিয়াছেন তাহা নূতন রূপে প্রতিভাত হইয়াছে :

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে—মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু সকরুণ আঁখি,
'হে বন্ধু আছ তো ভালো ?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার
দু'জনে ভাবিনু কত—মনে নাহি আর।

রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত'-সম্পর্কিত প্রবন্ধ পুরোপুরি সাহিত্যসমালোচনা। রোমাণ্টিক সমালোচনার ইহা একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও বিচারবুদ্ধি কালিদাসের কবিতাকে আশ্রয় করিয়া একটি নূতন ভাব প্রকাশ করিয়াছে যাহা সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি নহে, আবার ঠিক কালিদাসের অন্বয়মূলক, মূলানুগ ব্যাখ্যা করিলে—যাহা মল্লিনাথ করিয়াছেন—পাওয়া যাইবে না। বলা যাইতে পারে ইহা মেঘদূত কাব্যের ধ্বনিত অর্থ, কিন্তু এই ধ্বনি কোন একটি বিশেষ পদ, বাক্য বা শ্লোকের ধ্বনি নহে, সমগ্র কাব্যের ব্যঞ্জনা। ইহার মধ্যে কালিদাসের কবিতার রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং তাহার মূল্যায়ন করা হইয়াছে। তবু ইহা বিচারমাত্র নহে, ইহা একটি নূতন সৃষ্টি—চির পরিচয় মাঝে নব পরিচয়। যে কাব্য প্রতিদিন পড়িতেছি এইখানে তাহার সম্পর্কে নূতন আলোকের সন্ধান পাই। ইহা রোমাণ্টিক সমালোচনার

ধর্ম্ম। এই শ্রেণীর সমালোচকদের অগ্রণী হইলেন ইংরেজ কবি-দার্শনিক কোল্‌রিজ। কোল্‌রিজ পাশ্চাত্ত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসমালোচকদের অন্যতম —কেহ কেহ বলেন তিনি, অ্যারিষ্টটল ও লঙ্গাইনুস পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমালোচক। কোল্‌রিজের মধ্যে দার্শনিকের বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণনৈপুণ্য ও কবির কল্পনার আশ্চর্য্য সমন্বয় হইয়াছিল। কোল্‌রিজ হ্যামলেটের যে চিত্র আঁকিয়াছেন অনেকেই বলেন তাহা কোল্‌রিজেরই পরিমার্জ্জিত প্রতিরূপ। কিন্তু তাহার মধ্যে শেক্সপীয়রের নায়কও বিধৃত হইয়াছে, সেইজন্য কোন সমালোচক বা পাঠকই তাঁহার সমালোচনাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। যাঁহারা ইহাকে সংশোধন বা পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন তাঁহারাও ইহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।

॥ ৩ ॥

রোমাণ্টিক সমালোচনার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার আপত্তি যুগে যুগে উত্থাপিত হইয়াছে। কবির কল্পনাকে নিরঙ্কুশ মনে করা যাইতে পারে, আর সমালোচকও নিজেকে কবির সমানধর্ম্মী মনে করিয়া নিজের কল্পনার পক্ষবিস্তার করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলেও সমালোচনাকে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া লইতে হইবে। স্বীকার করিয়া লইলাম কবির জগৎ প্রাণময় নূতন সৃষ্টি। কিন্তু যে জড় পৃথিবীতে আমরা বাস করি তাহাই তো নিয়মের অধীন। সে নিয়ম তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নহে, অনেকাংশে বাহির হইতে প্রযুক্ত। পৃথিবী যে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে তাহা তাহার নিজের নিয়মেও আর বহিঃস্থিত সূর্য্যের আকর্ষণেও। সামাজিক জীবনে আমরা যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োগ করি তাহা এমন এক শক্তির দ্বারা যাহা আমাদের ক্ষণিক প্রবৃত্তির উর্দ্ধে। সাহিত্যবিচারে প্রত্যেক সমালোচক যদি নিজের উপলব্ধিকেই প্রাধান্য দেন তাহা হইলে কাহার কথা শুনিয়া সাহিত্যবিচার করিব এই প্রশ্ন উঠিবে এবং সেই ব্যক্তিগত উপলব্ধির অরণ্যে বিচার্য্য সাহিত্যগ্রন্থ হারাইয়া যাইবে। সাহিত্যে নিয়মের প্রাধান্য যাঁহারা মানেন তাঁহারা ক্লাসিকাল সমালোচক। রোমাণ্টিক সমালোচনার মত ক্লাসিকাল সমালোচনারও নানা প্রভেদ আছে, ইহা নানা মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে ও দিবে। তবুও সবাই এক বিষয়ে একমত : কবি নিয়ম মানিয়া চলিবেন এবং সমালোচক বিচার করিয়া দেখিবেন সেই নিয়ম কিভাবে পালিত হইয়াছে।

অ্যারিষ্টটল এই মতবাদের প্রবর্ত্তক। আজকাল পাশ্চাত্ত্য শিল্প ও সাহিত্য-বিচারে একটা শব্দ খুব বেশি ব্যবহৃত হয়—organic form। কথাটা নূতন নহে এবং পরিকল্পনাটা অ্যারিষ্টটলীয়। অ্যারিষ্টটল কাব্য ও নাটকের আঙ্গিকের বিচার করিয়াছেন, কেমন করিয়া বিভিন্ন অংশের সংযোজনের দ্বারা একটি সম্পূর্ণাবয়ব বস্তু গঠিত হয় তাহার নির্দেশ দিয়াছেন। অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন কাব্য বা নাটকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সম্পর্ক ঠিক জীবিত প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পর্কের মত অর্থাৎ প্রত্যেকটি তাহার নিজের কাজ করিতেছে, সবগুলি মিলিয়া একটি সম্পূর্ণ বস্তু রচনা করিতেছে, কোন কিছু যোগ বা বিয়োগ করিলে অথবা কোন অংশকে স্থানান্তরিত করিলে উহার সংহতি ও ঐক্য নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহাই আঙ্গিক বা organic form। কাব্য বা নাটক বিচার করিতে হইলে এই ঐক্য বা সংহতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেকটি অঙ্গের উপযোগিতা এবং বিভিন্ন অংশের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিতে হইবে। যেহেতু কাব্য শব্দ-বিরচিত সেইজন্য কাব্যবিচারে শব্দের প্রয়োগ, তাৎপর্য্য, পরস্পরের সম্পর্ক, একটি শব্দ কেমন করিয়া অন্য শব্দের পরিপোষণ করে এবং এইভাবে সমগ্র কাব্যকে সুসংবদ্ধ করে অথবা কোন একটি শব্দ বা অলংকার কেমন করিয়া সমগ্র কাব্যার্থকে নিয়ন্ত্রিত করে, কাহারও কাহারও মতে এই সকল প্রশ্নই সাহিত্যসমালোচনার বিষয়।

কাব্যকেই যদি কাব্যের নিয়ামক মনে করা হয় তাহা হইলে সাহিত্যের বিচার সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি কাব্যের একটি স্বতন্ত্র গঠন, স্বতন্ত্র রূপ বা স্বতন্ত্র সত্তা আছে ইহা মানিয়া লইতে পারি। কিন্তু তাহা ভাল কি মন্দ এই বিচার করিতে হইবে অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া। বিশ্লেষণের সঙ্গে তুলনা যোগ করিলেই সাহিত্য সমালোচনা সম্ভব হয়। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারদের কথায় বলিতে পারি, কেহ নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারে না। অর্থাৎ কোন কিছুই নিজের বিচারের মানদণ্ড হইতে পারে না। সেইজন্য কোন কোন সমালোচক প্রকরণমূলক সমালোচনা পছন্দ করেন। ইহারও সূত্রপাত করিয়াছেন অ্যারিষ্টটল। তিনি শিল্প সাহিত্যকে অনুকরণের প্রকারভেদ বলিয়া সংজ্ঞা দিয়াই অনুকরণের তিনটি সূত্র দিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় সূত্র এই যে, একই শিল্পে অনুকরণের ভঙ্গির দ্বারা অনুকরণ নিয়মিত হয়; যেমন, নাটকে পাত্রপাত্রীরা নিজেরাই তাহাদের কথা বলে, মহাকাব্যে কবি তাহাদের বর্ণনা দেন। এই সব সূত্র হইতে পরবর্ত্তী সমালোচকেরা কাব্যের নানা শ্রেণী-

বিভাগ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য নিয়মাবলী রচনা করিয়াছেন। আমাদের দেশের সাহিত্যশাস্ত্রের মূল কথাই শ্রেণীবিভাগ। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের মহাকাব্যবিষয়ক সুভাষিতাবলীর কথা সহজেই মনে আসিবে। কোন্ কাব্যে কতগুলি সর্গ বা অঙ্ক থাকিবে, নায়কনায়িকা কোন্ শ্রেণীর হইবে, ভাষা ও ছন্দ কিরূপ হইবে এই সকল বিষয়ে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশেও নাটক, মহাকাব্য প্রভৃতি সম্পর্কে ধরাবাঁধা আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং সেই আইন অধিকাংশ লেখকই মানিয়া চলেন। কথিত আছে, জনৈক পাঠক জনৈক সমালোচককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'অমুক ট্র্যাজেডিতে কিসে নায়কের মৃত্যু হইল?' সমালোচক উত্তর করিলেন 'Of the Fifth Act' (পঞ্চম অঙ্কের জন্য)! অর্থাৎ ট্র্যাজেডির শেষে নায়কের মৃত্যু ঘটাইতে হইবেই। কিন্তু রোমান্টিক সমালোচকেরা স্মরণ করাইয়া দেন যে, প্রত্যেক কাব্যই স্বতন্ত্র, অনন্য সৃষ্টি; যদি প্রথমেই তাহাকে কোন শ্রেণীতে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাহার অনন্যতা নষ্ট হইয়া যাইবে। ক্রোচে এই প্রকরণগত সমালোচনার বিরুদ্ধে কয়েকটি অকাট্য যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সাহিত্য ও শিল্প এতই বৈচিত্র্যময় যে ইহাদিগকে যদি কোন শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়, তবে সেই শ্রেণীকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞিত করা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে, তাহাই ট্র্যাজেডি বা কমেডি যাহা সংজ্ঞাকারকের কাছে সংজ্ঞারচনার সময় ট্র্যাজেডি বা কমেডি বলিয়া মনে হইয়াছে। কোন কাব্য বা কাব্যবর্ণিত চরিত্র কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি নহে, তাহার স্বাতন্ত্র্যই তাহার প্রাণ। ক্রোচে বলিয়াছেন, ডন কুইক্সোট কাহার প্রতিনিধিত্ব করিবে? তাহাকে খাপ খাওয়াইবার জন্য যে জাতি বা শ্রেণীই কল্পনা করা যাক্ না কেন, তাহার মধ্যে এমন সব চরিত্র পড়িয়া যাইবে যে, তাহারা মোটেই ডন্ কুইক্সোট নয়। আমাদের দেশে এক সময়ে খুব জোর তর্ক হইত, ভ্রমর ও সূর্য্যমুখীর মধ্যে কে ঠিক আদর্শ হিন্দু রমণী। ভ্রমর ও সূর্য্যমুখী উভয়েই সাধ্বী স্ত্রী, কিন্তু উভয়ের স্বাতন্ত্র্য এত তীক্ষ্ণ যে একজনকে প্রতিনিধি করিলে, অপর জন ঠিক সেই শ্রেণীর মধ্যে পড়িবে না। ক্ল্যাসিকাল সমালোচনা নিয়মানুবর্ত্তী, কিন্তু তাহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে প্রত্যেক কাব্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াই নিয়ম জারি করা সম্ভব। আবার স্বাতন্ত্র্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা এক বস্তু নয়। সংযমের মধ্য দিয়াই সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় এবং সমালোচনার অন্যতর কাজ সংযমের বন্ধনকে আবিষ্কার করা ও তাহার

সঙ্গে শিল্পকর্ম্মের সংযোগ প্রমাণ করা। রোমাণ্টিক ও ক্ল্যাসিকাল সমালোচনা উভয়ই সার্থক আবার উভয়ই একদেশদর্শী। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ— Freedom within and necessity without—ইহাদের সামঞ্জস্যই সমালোচনার উদ্দেশ্য।

॥ ৪ ॥

ক্ল্যাসিকাল সমালোচনা অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতি সমধিক দৃষ্টি দেয়; নীতির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ নাই। তবু ক্লাসিক সমালোচকেরা অনেকেই সাহিত্যে নীতিবাদী। আর নীতির সঙ্গে সাহিত্যের যে সম্পর্ক তাহা নিয়মের সঙ্গে সম্পর্কেরই অনুরূপ। বার্ণার্ড শ' প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা বলেন যে সাহিত্য চিরদিন নীতি শিক্ষা দিয়াছে; তিনি 'apostolic succession from Aeschylus to myself' দাবি করিয়াছেন। যুগে যুগে সাহিত্যিকরা সাহিত্যকে মতপ্রচারের কাজে লাগাইয়াছেন। কিন্তু আর এক শ্রেণীর সাহিত্যিক ও দার্শনিক বলেন সাহিত্যের সঙ্গে নীতির কোন সম্পর্ক নাই। রস অ-লৌকিক, আনন্দস্বরূপ। ক্রোচে মানবের ক্রিয়াজগৎকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সাহিত্য ও দর্শন মানসিক জগতের ব্যাপার আর নীতির সম্পর্ক ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। অস্কার ওয়াইল্‌ডের মতে আর্ট useless অর্থাৎ ইহার কোন উপযোগিতা নাই।

এই উভয় মতেই খানিকটা যাথার্থ্য আছে; আবার উভয় মতই ভ্রান্ত, কারণ যে কোন মতই গ্রহণ করি না কেন সাহিত্যের ঐক্য নষ্ট হইয়া যাইবে। শব্দার্থের সহিতত্ব হইতে 'সাহিত্য'-শব্দের সৃষ্টি। কাব্যের অর্থ চিন্তাজগৎকে বাদ দিতে পারে না, আর মানুষের চিন্তা বুদ্ধির ব্যাপার; সুতরাং তাহা নীতিনিরপেক্ষ হইতে পারে না। শুধু তাই নয়। আমাদের অনুভূতি যেমন ভালমন্দ-বিচারকে নিয়ন্ত্রিত করে আবার অনুভূতিও ভালমন্দ-বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং প্রকাশই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নহে, যাহা প্রকাশিত হইল তাহাও বিচার্য্য। কিন্তু আবার নীতিবোধকে যদি প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহা হইলে সাহিত্যের নিজস্ব মূল্য গৌণ হইয়া যায়; ইহা তিক্ত ঔষধের বড়ির শর্করাময় আবরণে পর্য্যবসিত হয়। সাহিত্যে নীতি থাকে,

কিন্তু ইহা নীতিকথার প্রকাশমাত্র নহে। সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ তাহার ঐক্য, বিভিন্ন অংশের নিবিড় সংসক্তি। ইংরেজ লেখক চেষ্টারটন এই সংহতিকে প্রকাশ করিয়াছেন এইভাবে : ...**the bad fable *has* a moral, and the good fable *is* a moral**। সার্থক কাহিনী এমনভাবে গঠিত হয় যে তাহার কোন অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না, প্রদীপের আলোক যেমন প্রদীপশিখার সঙ্গে অবিনাভাবে যুক্ত থাকে, কাব্যের নীতিও তেমনিভাবেই কাব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। নিকৃষ্ট গল্পের উপদেশ বহিরাবরণের মত ; তাহাকে অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা যায়। অ্যারিষ্টটল এই বলিয়া ইতিহাস ও কাব্যের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন যে, যাহা ঘটে ইতিহাস তাহার বর্ণনা দেয় আর কাব্য যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা রচনা করে। অ্যারিষ্টটলের অনিবার্য্যতাবাদ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ অবদান। সার্থক কাহিনীর ঘটনাবলীর মধ্যে কোথাও কিছু আল্‌গাভাবে থাকে না, কোনও কিছু বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না, কোথায় রাখাল ও নেকড়ে বাঘের গল্প শেষ হইল এবং কোথায় মিথ্যা-বাদিতার পরিণামবিষয়ক যুক্তি আরম্ভ হইল তাহা বিশ্লেষণ করা যায় না। উভয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।

চেষ্টারটন বলিয়াছেন, '**the bad fable *has* a moral**'। যে সমস্ত নিকৃষ্ট কাহিনী উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জন্যই লিখিত হয়, যাহারা শিল্প হিসাবে সার্থক নহে তাহাদের কথা বলিয়া গ্রন্থ বিস্তার করিয়া লাভ নাই। কিন্তু নীতিবোধ কখনও কখনও শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যেও যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তাহার বহিরঙ্গণে থাকে তাহারও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের ভূমিকায় ও পরিশিষ্টে ভারতে ইংরেজের অভ্যাগমকে অভিনন্দন জানান হইয়াছে। কিন্তু এই নীতিশিক্ষার সঙ্গে উপন্যাসের কোন সংযোগ নাই। ইহাকে সহজেই বাদ দেওয়া যায় এবং ইহাকে বাদ দিয়াই সবাই এই উপন্যাসকে বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠ কাব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসে প্রফুল্লর স্বামিলাভের কাহিনীর সঙ্গে ভবানী পাঠকের অভিনব ডাকাতির সংস্রব আছে, কিন্তু গীতোক্ত নিষ্কামধর্ম খুবই আল্‌গাভাবে এই কাহিনীর সঙ্গে গ্রথিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর সশস্ত্র বিদ্রোহের বর্ণনার সঙ্গে সুমিত্রার পথের দাবীর সমাজদর্শন জুড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু এই সংযোজন অবিচ্ছেদ্য আশ্লেষ নহে। নীতিশিক্ষা শুধু যে অবান্তরভাবেই কাহিনীতে অনুপ্রবেশ করে তাহা নহে, অনেক সময় প্রধান অংশকেও খর্ব

করিয়া দেয়। গীতার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম ও শ্রীকে ঠিকমত বাড়িতে দেন নাই; রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক-নৈতিক মতবাদের জন্য সন্দীপচরিত্রের পরিণতি খণ্ডিত হইয়াছে। নিখিলেশ ও চন্দ্রনাথ বাবুকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া স্বদেশীর চিত্র বিকৃত হইয়াছে এবং সন্দীপ নিজের পথে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

সাহিত্য কবির সমগ্র মনের সৃষ্টি এবং পাঠককে ইহার সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া সাহিত্যসমালোচকের কাজ। ইহাও একধরণের সহিতত্ব—শব্দার্থের সঙ্গে কবিমনের সংযোগ। কবির সামগ্রিক মন তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভার দ্বারাই উদ্বোধিত হয়, কিন্তু ইহা নিয়ম-বহির্ভূত বা নীতি-নিরপেক্ষ নয়। কাব্যের সৌন্দর্য্য শব্দার্থের তাৎপর্য্য ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই ইহা প্রকাশিত হয়, কিন্তু এই সৌন্দর্য্য বিচ্ছিন্ন শ্লোক ও বাক্যের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিধৃত হয় না। ইহা সমগ্র কাব্যের তাৎপর্য্য ও সৌন্দর্য্য এবং তাহাকে প্রাণ দিয়াছে কবির অবিঘ্নিত, অখণ্ড চৈতন্য।

॥ ৪ ॥

রোমান্টিক ও ক্ল্যাসিকাল সমালোচকেরা উভয়েই সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়াই মনে করেন, তাহার ক্রিয়াকলাপ মনোজগতেই সীমাবদ্ধ করেন। দুই চার জন উগ্রপন্থী ছাড়া যাঁহারা নীতিবাদী তাঁহারাও মনে করেন সাহিত্যের প্রধান কাজ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, নীতিশিক্ষা তাহার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র; কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে, নীতিবিরোধী সাহিত্য রসাস্বাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সেইজন্যই সাহিত্য প্রচলিত নীতিকে মানিয়া চলে। নীতির ইহার অধিক কোন মূল্য নাই।

আধুনিক কালে আর এক শ্রেণীর সাহিত্য সমালোচনা খুব প্রাধান্য পাইয়াছে যাহাকে এক কথায় বলা যাইতে পারে রিয়ালিষ্ট সমালোচনা। ইহার মধ্যে নানা সম্প্রদায় আছে, তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে এই সমালোচনা বিজ্ঞানভিত্তিক। এক শ্রেণীর সমালোচক কাব্যের—বিশেষতঃ প্রাচীন কাব্যের—পাঠ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন, কবি ঠিক কি লিখিয়াছিলেন, কোন্ কবিতা কাহার রচনা নানাপ্রকার তথ্যের সাহায্যে তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। কোন কাব্য বা কবি সম্পর্কে যদি কোন তথ্য প্রচলিত থাকে

ইঁহারা তাহারও সত্যতা যাচাই করেন, কোন কবির রচনার যদি পাঠান্তর থাকে তাহার তুলনা করিয়া কবি-প্রতিভার স্বরূপ নির্দ্ধারণে সাহায্য করেন। এই প্রশ্ন প্রাচীন কালেও যে না উঠিয়াছিল তাহা নয়। মল্লিনাথ কালিদাসের বলিয়া প্রচলিত সব শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই; তাঁহার মতে ঐ সকল শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। আবার কতকগুলি শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মনে হয় ইহাদের প্রক্ষিপ্ততা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন নাই। কি যুক্তির দ্বারা মল্লিনাথ চালিত হইয়াছিলেন তাহা আমরা জানিনা, বোধহয় কোন শ্লোকের কাব্যগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষই তাঁহার বিচারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। আধুনিক কালে ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক—এক কথায় নানা বৈজ্ঞানিক—পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-সমালোচকেরা কাব্যের পাঠ, রচনার কাল, কে তাহার রচয়িতা—ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন। বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস সমস্যা ও তাহার সমাধানের পদ্ধতি এই বৈজ্ঞানিক সমালোচনার নিদর্শন।

যে বৈজ্ঞানিক সমালোচনা পাঠনির্ণয় প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত থাকে তাহার পরিধি খুব সীমিত। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বা রিয়ালিষ্ট সম্প্রদায়েরা সাহিত্যকে ব্যাপক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে চাহেন। ইঁহাদের মতে সাহিত্য বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য নয়, বরং অন্য শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হইয়াই সে তাৎপর্য্যময় হয়। প্রথমেই বলা যাইতে পারে historical school বা ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের কথা। ইহার মধ্যেও নানা শ্রেণী উপশ্রেণী আছে। ইউরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক সম্প্রদায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ফরাসী সমালোচক টেন। তিনি বলেন সাহিত্য হইতেছে জাতি, পরিবেশ ও যুগের অভিব্যক্তি। আধুনিককালে এই মত খুব জোরালো অভিব্যক্তি পাইয়াছে মার্কস্‌বাদী সমালোচনায়। এই সম্প্রদায়ের বক্তব্য সাহিত্য অর্থনৈতিক পরিবেশ ও শ্রেণীসংগ্রামের বিবরণ এবং এই ভাবেই তাহার বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে হইবে। এই সকল সমালোচকদের মধ্যে অনেকে সাহিত্যকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে দেখেন এবং অনেকে মনে করেন যে, যেহেতু ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক সাহিত্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রতিচ্ছবি সুতরাং তাহার সাহায্যেই এই ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে জানা যাইতে পারে। মার্কসের তীক্ষ্ণ সাহিত্যবোধ ছিল, কিন্তু তিনিও যে ব্যাল্‌জাকের উপন্যাস খুব ভালবাসিতেন তাহা অনেকটা এই কারণে।

মার্কস্‌বাদ সম্প্রদায়গত ব্যাপার; সাহিত্যসমালোচনায় এই সম্প্রদায়ের চরমপন্থীরা যাহা বলেন তাহা সম্প্রদায়ের বাহিরের লোকেরা মানিবেন না। কিন্তু সাহিত্যে যে সামাজিক পরিবেশ প্রতিফলিত হয় এবং সেই পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই তাহার পূর্ণাঙ্গ বিচার সম্ভব এই কথা আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন এবং ইহাই ঐতিহাসিক তথা মার্কস্‌বাদী সমালোচনার প্রধান অবদান।

ইতিহাস হইতে নৃতত্ত্ব খুব বেশি দূরস্থিত নয়। নৃতত্ত্ব নানা জাতির কিংবদন্তী, লোকগাথা, উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের মনের আদিমতম ও সরলতম অভিব্যক্তির সন্ধান করিয়াছে। সাহিত্য কোন বিশেষ জাতির বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হউক বা না হউক, মানবের বাঁচিবার চেষ্টার ইতিহাস তাহার সংস্কৃতিতে, উৎসব-পার্ব্বণে, আচার-অনুষ্ঠানে প্রোথিত হইবেই এবং কাব্যে বা অন্য সাহিত্যিক প্রচেষ্টায়ও ইহার নিদর্শন পাওয়া যাইবেই। ফ্রেজারের **The Golden Bough** পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যরচনায় খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, জেসি ওয়েষ্টনের **From Ritual to Romance** গ্রন্থের প্রভাবে এলিয়ট **The Waste Land** কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ বলা হয় এই কবিতাই ইংরেজি কাব্যে আধুনিক যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। আধুনিক সমালোচনাও নৃবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে এবং এই সব আলোচনা হাল্‌কা সাহিত্যচর্চ্চাকে গভীরতা দান করিয়াছে। নৃতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছে আধুনিক মনোবিকলনশাস্ত্র। নৃতত্ত্ববিদ্‌ আচার-অনুষ্ঠান, লোকগাথা ও কিংবদন্তীর মধ্যে মানবের আদিরূপকে ধরিতে চাহিয়াছেন, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানী বাহিরে প্রকাশ্য ভাব-অনুভাবের অন্তরালে মানবমনের অর্দ্ধচেতন, অবচেতন অনুভূতির সন্ধান করিয়াছেন এবং য়ুঙ-পন্থীরা বলেন যে, ব্যক্তির অভিজ্ঞতার অন্তরালে পূর্ব্বপুরুষদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত কতকগুলি আদিরূপ রচিত হয় এবং কবিকল্পনার দ্বারা সেইগুলি উদ্বোধিত ও সঞ্চালিত হয়। মনে হয় ইঁহারা ভরতপ্রভৃতি কথিত স্থায়ী ভাবের অনুরূপ কতকগুলি আদিম অনুভূতি, প্রবৃত্তি বা চিত্রকল্পের সন্ধান করেন।

ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সমালোচনাপদ্ধতি সম্পর্কে শুধু একটি মন্তব্য করা প্রয়োজন। ইহা সত্য যে, এই সকল পদ্ধতির সাহায্যে সাহিত্যের জটিলতা, পূর্ণতা ও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু টি. এস. এলিয়টের

কথায় বলা যাইতে পারে, যাঁহারা সাহিত্যের ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক দিকের আলোচনা করেন তাঁহাদের বিচার ইতিহাস, বিজ্ঞান বা দর্শনের অন্তর্গত, সাহিত্যসমালোচনার নয়। সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞানাদি হইতে মালমশলা সংগ্রহ করিতে পারে, সেই সকল উপকরণ তাহার অর্থগ্রহণ ও মূল্যায়নে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের অর্থ ও মূল্য স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল : সেই বৈশিষ্ট্য অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা নিয়মিত হইবে না। ব্যালজাক ছিলেন রাজতন্ত্রী, রক্ষণশীল, মার্কস্ তাঁহার রচনায় বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতার চিত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সেখানে নিজের বিদ্রোহাত্মক দর্শন ও কর্ম্মসূচির সমর্থন খুঁজিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচকের কাছে ব্যালজাকের মূল্য ঔপন্যাসিকের মূল্য ; তিনি যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিকতা, তাহার মধ্যে বিদ্রোহ বা রক্ষণশীলতার সমর্থন—এই সকল প্রশ্ন অবান্তর নয়, কিন্তু মৌলিকও নয়। ইহারা সবাই রস-জগতের অন্তর্গত, যে জগতের প্রধান লক্ষণ স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা ও স্বয়ম্ভাবিতা।

॥ ৫ ॥

সাহিত্যসমালোচকের কারবার সাহিত্যের সাহিত্যত্ব লইয়া। প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে—এই প্রশ্ন অনেক সময় শোনা যায়—সমালোচনার সার্থকতা কি ? সাহিত্য কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিসঞ্জাত বস্তু এবং রস সামাজিকের নিজের উপলব্ধিতে আস্বাদ্যমান। একটা প্রচলিত কথা আছে—পরের মুখে ঝাল খাওয়া যায় না। সেইরূপ পরের রুচি দিয়া কেহ রস আস্বাদন করিতে পারে না। প্রত্যেক পাঠকই নিজের কাছে সমালোচক ; অপরের কাছে তাঁহার সমালোচনার মূল্য থাকিতে পারে না, কারণ অপর পাঠকও তাঁহার নিজস্ব উপায়ে রস আস্বাদন করিয়াছেন। আর যদি তাহা না করিয়া থাকেন তবে অপরের আস্বাদের বর্ণনা পড়িয়া পরীক্ষা পাশ করিতে পারিবেন, অথবা নিজেকে সামাজিক মনে করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে পারিবেন এই পর্য্যন্ত। তিনি প্রকৃতপক্ষে রস আস্বাদন করিতে পারিবেন না, কারণ রস-আস্বাদন তর্কের সাহায্যে সংক্রামণযোগ্য পদার্থ নয়। এই জাতীয় আপত্তির মধ্যে কিছু যুক্তি আছে, কিন্তু ইহা গ্রাহ্য নহে। রসাস্বাদন ব্যক্তিগত রুচির উপর

নির্ভর করে; তবু রসের আবেদন সার্ব্বজনীন এবং সামাজিকদের রুচিবৈচিত্র্যের মধ্যে কতকগুলি সামান্য লক্ষণও পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কোল্‌রিজের হ্যামলেট চরিত্রের বিশ্লেষণ অর্দ্ধ-আত্মজীবনী হইলেও তাহা হ্যাম্‌লেট চরিত্রকেও পরিস্ফুট করিতে সাহায্য করে। স্বসংবিদানন্দে বিশ্বাসী রসবাদী কবিত্বপূর্ণ শ্লোকের ধ্বনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ক্রোচেও শেক্সপীয়র, দান্তে ও গ্যেটের সমালোচনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। পাঠকে পাঠকে রুচিভেদ থাকিলেও সাহিত্যের মধ্যে যে রস আছে তাহার আবেদন রুচিবৈচিত্র্যের দ্বারা সীমিত হয় না এবং সেই রস-আস্বাদনে একে অপরকে সাহায্য করিতে পারে।

আর এক দিক্ হইতেও সমালোচনার সার্থকতা প্রমাণিত হইতে পারে। রসাস্বাদনশক্তি জন্মগত, কিন্তু ইহা সকলের মধ্যে সমান পরিমাণে থাকে না এবং যাঁহারা প্রতিভাবান্ তাঁহাদের শক্তিও অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বারা স্ফুরিত হয়। ইহার আর একটি কারণও আছে। রস শুধু আস্বাদস্বরূপ নহে; ইহা জ্ঞেয় বস্তুও বটে। অন্যান্য জ্ঞেয় পদার্থ যেমন শিক্ষার দ্বারা আহৃত হয় রসও তেম্‌নি। শ্রেষ্ঠ সমালোচনার সাহায্যেই কাব্যের সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হয়। চার্লস ল্যাম্ব এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারদের রচনার সংকলন করিয়াছিলেন এবং উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে স্বীয় মন্তব্য জুড়িয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল মন্তব্য পাঠ করিয়া অপর একজন সমালোচক বলিয়াছিলেন, ল্যাম্বের ওষ্ঠের সংস্পর্শে আসিয়া মধু সূক্ষ্মতর মাধুর্য্য লাভ করে অর্থাৎ ল্যাম্বের সাহায্য লইলে আমরাও এই সূক্ষ্মতর মাধুর্য্যের অংশ গ্রহণ করিতে পারি।

সাহিত্যের রহস্য সহজে চোখে পড়ে না, অনেক সময় তাহার আবেদন সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয় না, তাই ইহা সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। সমালোচকের প্রথম কাজ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। সাহিত্যের যে অর্থ গুহাহিত সমালোচক তাহাকে উদ্ঘাটিত করেন, যাহা ইঙ্গিতে কথিত হইয়াছে তাহাকে স্পষ্ট করেন, শব্দচয়ন ও শব্দবিন্যাসে যে উপযোগিতা ও মাধুর্য্য আছে তাহা বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার অপর কাজ ভালমন্দ বিচারে সাহায্য করা। সমালোচক ব্যাখ্যাতা ও বিশ্লেষক মাত্র নহেন, বিচারকও বটেন। কোন কোন সমালোচকের ঝোঁক বিচারের দিকে, আবার কেহ কেহ বিশ্লেষণনিষ্ঠ। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, ক্ল্যাসিকাল সমালোচনা বিচারমুখী এবং রোমান্টিক সমালোচনা বিশ্লেষণধর্ম্মী। কিন্তু এই দুই ধারার মধ্যে খুব চুলচেরা পার্থক্য করা যায় না। আমি যাহাকে ভাল মনে করি বিশ্লেষণ করিয়া তাহারই

স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে চাই এবং যাহাকে খারাপ মনে করি তাহার দোষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইতে চাই। আবার আমার বিশ্লেষণের ও ব্যাখ্যার মধ্য দিয়াই প্রমাণিত হয়, আমি কোন্ কাব্যকে ভাল মনে করি বা করি না। শেক্সপীয়রের নাটকের কোন্ অংশ স্বকীয়, কোন্ অংশ ধার করা বা প্রক্ষিপ্ত—ইহা লইয়া তর্কের অবধি নাই, কিন্তু বিজ্ঞানবাদী, যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচকের চরম মানদণ্ড—বিতর্কিত অংশ শেক্সপীয়রের অবিসংবাদিত রচনার মত ভাল লাগে কিনা। আবার নিছক নিন্দা প্রশংসারও খুব বেশি মূল্য নাই। বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্যে বিশ্লেষণই মুখ্য। টলস্টয় শেক্সপীয়রের নাটকের নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহার অভিমত রসোপলব্ধিকে সাহায্য করে নাই, যেমন করে নাই শেক্সপীয়র-ভক্তদের অনেক উচ্ছ্বসিত অতিশয়োক্তি। যে সমস্ত কাব্য যুগ যুগ ধরিয়া কীর্তিত হইয়াছে তাহাদের নূতন নূতন ব্যাখ্যারও ইহাই সার্থকতা। হ্যামলেট ভাল না লীয়র ভাল, 'কপালকুণ্ডলা' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ইহাদের কোন্‌টির মধ্যে বঙ্কিমের প্রতিভা সমধিক বিকশিত হইয়াছে—এই সকল আলোচনা খুব বেশি ফলপ্রসূ হয় না। বরং অত্যন্ত বিচারমুখী আলোচনায় উপলব্ধি ব্যাহতই হয়। ডক্টর জনসনের সাধারণ বুদ্ধি ছিল অনন্যসাধারণ, তিনি সাহিত্যের রসাস্বাদনও করিতে পারিতেন। কিন্তু কবিদের এমনভাবে সমালোচনা করিতেন, যেন তিনি স্কুলের ছাত্রদের খাতা পরীক্ষা করিয়া দোষ-গুণানুসারে মার্ক বিতরণ করিতেছেন। খানিকটা চমক লাগাইবার জন্য আমাদের দেশে কেহ কেহ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া বিচারকের মন্তব্য শোনান : বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র মায় কালিদাস পর্য্যন্ত এই বিচারপ্রহসন এড়াইতে পারেন নাই। ইহা সমালোচনার বিকৃতি।

॥ ৬ ॥

মল্লিনাথ বলিয়াছেন তিনি 'অনপেক্ষিত' কিছু লিখিবেন না অর্থাৎ মূল কাব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কথার অবতারণা করিবেন না। প্রাচীন আলংকারিকেরা কাব্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা আরও ব্যাপক অর্থে 'অনপেক্ষিত'; তাহা শাস্ত্র ইতিহাসাদি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন এবং দেশকাল অনালিঙ্গিত। আধুনিক কালে এক শ্রেণীর সমালোচক—তাঁহাদিগকে বলা হয় **the new critics**—কাব্যকে শুধু শব্দ ও অর্থের দ্বারা রচিত প্যাটার্ণ বা রূপকল্প

হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহেন। ইহা দেশকালাদি হইতে বিচ্ছিন্ন, শাস্ত্র-ইতিহাসাদির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, এমন কি কবি হইতেও বিযুক্ত। এইখানে প্রাচীন ভারতীয় ও আধুনিক কাব্যচর্চ্চার মিলন হইয়াছে। কবিতার যদি কোন অর্থ থাকে তাহাকে ইতিহাসাদি এমন কি বাচ্য অর্থ হইতে মুক্ত করিয়া শুধু প্রতীক হিসাবে বিচার করিতে হইবে। আই. এ. রিচার্ডস একবার একটা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কবির নামধাম, সময় প্রভৃতি গোপন করিয়া কতকগুলি কবিতার সমালোচনা আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি যে উত্তরগুলি পাইয়াছিলেন তৎসম্পর্কে এখানে কিছু বলিব না। শুধু পদ্ধতিটির আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে। এই পদ্ধতিতে নিছক কাব্যেরই আলোচনা হয় —কাব্যের সঙ্গে অপর কিছুর অপেক্ষা থাকে না।

কিন্তু কাব্য কি এইরূপ নিরালম্ব বস্তু? কাব্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা কি সম্ভব? আর যদি সেইভাবে দেখা হয় তাহা হইলে কাব্যের অর্থের মধ্যেও অনন্ততা আসিয়া যাইবে। যাঁহাদের নিউ ক্রিটিক্‌স (**new critics**) বলা হয় তাঁহাদের সমালোচনা অনেক সময়ই বুদ্ধির কারচুপি বা কল্পনার বিলাস বলিয়া মনে হয়। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, কাব্য কবির সৃষ্টি, কবিকে বাদ দিয়া কাব্যকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা যাইবে না। কবির সঙ্গে কাব্যের কোন সম্পর্ক আছে কিনা এবং থাকিলে সেই সম্পর্কের স্বরূপ কি—এইসকল প্রশ্ন স্বতঃই উত্থাপিত হইবে। এক শ্রেণীর সমালোচক মনে করেন কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই কাব্যের উদ্ভব এবং সেই অভিজ্ঞতাই তাহাকে প্রাণবন্ত করে। অনেকে আমার সঙ্গে এক মত না হইতে পারেন; তবু একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই কথাকে স্পষ্ট করিতে চাই। কালিদাস মেঘদূত কাব্যের পূর্ব্বমেঘে অবন্তীবিদিশা, ব্রহ্মাবর্ত্ত-কনখল প্রভৃতি যে সকল জনপদের বর্ণনা দিয়াছেন মনে হয় তাহাদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। কিন্তু উত্তরমেঘে তিনি যে অলকাপুরীর বর্ণনা দিয়াছেন তাহা নিছক কল্পনা। এই কারণে পূর্ব্বমেঘ উত্তরমেঘ অপেক্ষা সরস আর উত্তরমেঘ পূর্ব্বমেঘ অপেক্ষা কৃত্রিম। কিন্তু এই জীবনীভিত্তিক সমালোচনা লইয়া বাড়াবাড়ি হইতে পারে। শেক্সপীয়রের জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সামান্য। কোন কোন সমালোচক যেখানে অপ্রত্যাশিত কিছু পাইয়াছেন বা অনুভূতির তীব্রতা লক্ষ্য করিয়াছেন সেইখানে কবির সম্ভাব্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে তাহার উৎস খুঁজিয়াছেন। শেক্সপীয়রের

শ্রেষ্ঠ নাটক হ্যামলেটের কাহিনী ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে ব্যভিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, শেক্সপীয়রের ছেলের নাম ছিল হ্যামলেট, তাঁহার এক ভাইয়ের নাম রিচার্ড এবং তাঁহার প্রথম সার্থক ক্রূর চরিত্র (তৃতীয়) রিচার্ড। এই সকল সঙ্গতি হইতে কোন লেখক মনে করিয়াছেন শেক্সপীয়রের ভ্রাতা রিচার্ডের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ব্যভিচার করিয়াছিলেন এবং ইহাই শেক্সপীয়রের কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। এই সমালোচনা মৌলিক, কিন্তু উদ্ভট, আর ইহা সাহিত্য সমালোচনার পর্য্যায়ে পড়ে না।

অপর দিকে অনেক সমালোচক মনে করেন কবির জীবনের সঙ্গে কবির কাব্যের কোন সম্পর্ক নাই—'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'। 'কবি-জীবনী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও এই মতে সায় দিয়াছিলেন। যতদূর জানা যায় শেক্সপীয়রের জীবন সফলতার ইতিহাস, ব্যর্থতার নয়। তিনি পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া সম্পত্তি ও খেতাব অর্জ্জন করিয়া সম্পন্ন নাগরিক হইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া অবসরজীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের মধ্যে ট্র্যাজেডির স্থান কোথায়? শেক্সপীয়র চারশত বৎসর পূর্বে জন্মিয়াছিলেন; তাঁহার জীবন সম্পর্কে বহু গবেষণা করিয়াও আমরা খুব বেশি কিছু জানিতে পারি নাই। হাতের কাছেই একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি অতুলপ্রসাদ সেনের জীবনী বাহির হইয়াছে। ব্যবহারজীবের সাফল্য বাদ দিলে ইহা অতি করুণ, বেদনাময় ট্র্যাজিক কাহিনী। জীবনীকার তাঁহার গ্রন্থের উপযুক্ত শিরোনামা দিয়াছেন—'আমার এ আঁধারে'। অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতে তিমিরের স্পর্শ আছে, কণ্টকের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহার কাব্য শান্তসমাহিত আনন্দের কাব্য, ইহার মধ্যে কোথাও তিক্ততা নাই। জীবনীর নায়ক আর,

'প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখি
কেমনে বলো তাঁরে ডাকি?'

অথবা

'ওগো সাথি, মম সাথি, আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-তিলক-মাথে।'

প্রভৃতি গানের রচয়িতা যে একই ব্যক্তি ইহা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়।

কবির সঙ্গে তাঁহার কাব্যের যোগ কোথায়? কবির কাব্য কবিরই সৃষ্টি, এবং স্রষ্টাকে বাদ দিয়া সৃষ্টির বিচার সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কবি যে সকল

বিষয় লিখেন তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত, তবে ব্যক্তিগত জীবনে তাহা নাও ঘটিয়া থাকিতে পারে। যে কালিদাস পলায়মান মৃগের বিচিত্র গতিভঙ্গির বর্ণনা দিয়াছেন, তিনি নিজে শরভীত হইয়া কখনও পলায়ন করিয়াছিলেন এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু ভীত মৃগের পলায়ন তিনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এবং তাহার অপেক্ষাও বড় কথা—তিনি এই মৃগশিশুর মনে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। এই মানসিক অনুপ্রবেশের বলে মৃগের অভিজ্ঞতাকে তিনি আত্মস্থ করিয়া থাকিবেন। এই হিসাবেই মৃগের অভিজ্ঞতা কবির অভিজ্ঞতা। শেক্সপীয়রের মত কোন কোন কবি ট্র্যাজেডি ও কমেডি দুইই সমানভাবে লিখিয়াছেন। তাঁহাদের বাস্তব জীবনে কতটুকু ট্র্যাজেডির আর কতটুকু কমেডির উপাদান ছিল এই আলোচনা ফলপ্রসূ হইবে না। কিন্তু ইঁহারা যখন কোন কবিতা রচনা করেন—তাহা মহাকাব্যই হউক আর ছোট সনেটই হউক—সমস্ত মন দিয়া রচনা করেন। সুতরাং তদানীন্তন কালে কবির সমগ্র মনের স্বরূপকে বুঝিলেই কাব্যের সমালোচনা সম্ভব হইবে। কবির এই সমগ্র, একান্ত নিজস্ব মনোজগৎকে বাদ দিয়া প্রত্যেকটি শ্লোকের টীকা করিলে অথবা প্যাটার্ণ বা প্রতীকের জাল বুনিলে কাব্যের প্রকৃত অর্থগ্রহণ সম্ভব হইবে না। অপর পক্ষে, যদি ভাবময় জীবন ছাড়িয়া কাব্যের সঙ্গে কবিজীবনীর হুবহু সাদৃশ্য খুঁজিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে আমাদের গবেষণা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। কিন্তু তাহা কাব্যবিচারে অবান্তর।

ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক সমালোচনায়ও এই অপেক্ষিত অনপেক্ষার সূত্র মানিতে হইবে। কোন কবিতা বা গল্প কোন এক সময়ে কোন এক সামাজিক পরিবেশে লিখিত হয়; দেশকালের ছাপ তাহার মধ্যে থাকিবেই। এমন কি ঐতিহাসিক গল্প বা নাটকেও লেখকের সময়কার প্রভাব সহজেই লক্ষণীয় হয়। শেক্সপীয়র ও বার্ণার্ড শ' মধ্যযুগের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্রের ঐতিহাসিকতা বিতর্কের বিষয়, কিন্তু শেক্সপীয়রের চিত্রে যে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের এবং বার্ণার্ড শ'র চিত্রে যে বিংশ শতাব্দীর স্বাক্ষর আছে সেই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। থ্যাকারের এসমণ্ড অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের (একটা বিশেষ পরিস্থিতির) হুবহু প্রতিচ্ছবি; এমন কি ঔপন্যাসিক বর্ণিত যুগের ভাষার পর্য্যন্ত সার্থক অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই চিত্র থ্যাকারের যুগের অর্থাৎ ভিক্টোরীয় যুগেরও চিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে মোগল পাঠানের

সম্পর্কের ছবি আঁকিয়াছেন এবং তিনি দাবি করিয়াছেন যে 'রাজসিংহ' খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাহা হইলেও এই দুই উপন্যাসে যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস যতখানি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহার চেয়েও বেশি স্পষ্ট হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। তাই লেখকের দেশ ও কাল যে ঐতিহ্য রচনা করিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতেই লেখকের লেখার বিচার করিতে হইবে। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে তাঁহার রচনা ইহাদের অপেক্ষা রাখিলেও ইহার রস কবিপ্রতিভার রস—ইতিহাস বা জীবনচরিতের নয়। পরিবেশ বা ঐতিহ্যের চিত্র কবিমানসের উপলব্ধির সহায়ক মাত্র। মনোবিজ্ঞানীরা যেসকল আদিম সার্বজনীন প্রবৃত্তি বা আদিরূপের কথা বলেন তাহাদের সম্পর্কেও এই কথা খাটে। কবি এই সকল সার্ব্বভৌম বা স্থায়ী ভাবকে রসরূপ দান করেন, ইহা ভারতীয় রসতাত্ত্বিকরাও নিজেদের মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাদের অস্তিত্ব বা উপযোগিতা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কবি স্বীয় প্রতিভা বলে এই সকল স্থায়ী বস্তুকে নূতন ভাবে সঞ্জীবিত করেন। এই জন্যই সার্ব্বজনীন বিষয়বস্তুর মধ্যে কবিপ্রতিভা বৈচিত্র্য আনয়ন করে। এই মত সমর্থন করিয়া আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন :

রসভাবাদিসম্বন্ধ যদৌচিত্যানুসারিণী।
অন্বীয়তে বস্তুগতির্দেশকালাদিভেদিনী ॥

*　　　*　　　*

বাচস্পতিসহস্রাণাং সহস্রৈরপি যত্নতঃ।
নিবদ্ধা সা ক্ষয়ং নৈতি প্রকৃতির্জ্জগতামিব। (ধ্বন্যালোক ৪।৯-১০)

(দেশকালাদির ভেদে বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত বস্তুজগৎ যদি রসভাবাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া ঔচিত্যানুসারে অন্বিত হয়।৯.... জগতের প্রকৃতির মত তাহা সহস্র বাচস্পতির দ্বারা রচিত হইলেও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না।১০) সাহিত্যে সার্ব্বজনীন, সমাজতাত্ত্বিক, নৈতিক তত্ত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি থাকে সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রতিভার ছাপ।

কবির প্রতিভা ও সমালোচকের দক্ষতা—ইহাদের সাদৃশ্য ও বৈষম্য সম্পর্কে বহু আলোচনা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন ইহারা একই জাতীয় শক্তি এবং সমালোচকের সমালোচনাও সৃষ্টি, যেমন কবির সৃষ্টিও জীবনের সমালোচনা। ইহাদের মধ্যে আবার কাহারও মতে সমালোচনা নিকৃষ্ট

ধরণের কবিপ্রতিভা; যাঁহারা সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই তাঁহারাই সমালোচনা করেন। আর এক শ্রেণীর সমালোচক মনে করেন সমালোচনা বুদ্ধি-দীপ্ত বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও বিচার, ইহা কল্পনাপ্রসূত সৃষ্টি নহে। উভয় দিকেই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কবিপ্রতিভাহীন কোন লেখক রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত'-প্রবন্ধের মত প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন না; ড্রাইডেন, কোল্‌রিজ ও ম্যাথু আর্ণল্ড কবি হিসাবে বড় না সমালোচক হিসাবে বড় বলা কঠিন। অপর দিকে ইহাও দেখা যায় যে অধিকাংশ কবি সমালোচনায় নিপুণ নহেন; তাঁহাদের নিজেদের কাব্য-সম্পর্কেও তাঁহারা নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। অ্যারিষ্টটল হইতে এ. সি. ব্র্যাড্‌লি পর্যন্ত অধিকাংশ সমালোচকই নূতন সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত কবির সৃষ্টি এবং সমালোচকের বিচার-বিশ্লেষণের বৈলক্ষণ্যই প্রমাণ করে।

বিলক্ষণ হইলেও সমালোচকের দক্ষতা ও কবিপ্রতিভা নিঃসম্পর্কিত নয়। শ্রেষ্ঠ সমালোচক প্রতিভাবান্ কবি না হইতে পারেন, কিন্তু প্রতিভার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে। এই শক্তিরই অপর নাম সহৃদয়তা। ইহা সহানুভূতি হইতে গভীর ও সক্রিয়। এই সুহৃদয়তা না থাকিলে শুধু বুদ্ধির বলে অ্যারিষ্টটল কাব্যের **universality** বা সার্ব্বভৌমত্ববাদে পঁহুছাইতে পারিতেন না, আনন্দবর্দ্ধন ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধ্বনিবাদ আবিষ্কার করিতে পারিতেন না, কোল্‌রিজ **Imagination**-এর সংজ্ঞা দিতে পারিতেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে অক্সফোর্ড হইতে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (ডক্টর জে. সি. ঘোষ) ইংরেজিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনায় পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য, সূক্ষ্ম বিচারদক্ষতার অভাব নাই, কিন্তু ইহা বাংলা সাহিত্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারে নাই, কারণ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই, কোন বাঙ্গালী কবির সঙ্গে তিনি সহমর্ম্মিতা লাভ করিতে পারেন নাই। 'রামায়ণের সমালোচনা—কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত'—প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্রেণীর সমালোচনার উপর তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একটি চরম দৃষ্টান্ত কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই কশাঘাতের ব্যাপক দ্যোতনা আছে; শুধু বিচারমূলক সহানুভূতিহীন সমালোচনা কখনও আলোচিত সাহিত্যের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না।

কবি যে শক্তির বলে নূতন সৃষ্টি করেন তাহাকে আমরা বলিতে পারি কল্পনা বা **Imagination**, আর সমালোচক যে ক্ষমতার বলে তাহার গ্রহণযোগ্য

বিশ্লেষণ ও বিচার করেন তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে উপলব্ধি। এই উপলব্ধি বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ আলোচিত কাব্যকে আশ্রয় করিয়া ইহা ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু এই বস্তুনিষ্ঠতা বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতা হইতে বিভিন্ন, কারণ ইহার মধ্যে কবির সৃষ্টি পুনরুজ্জীবিত হইয়া প্রকাশ পায়, যেমন দেখা গিয়াছে ব্র্যাডলির শেক্সপীয়র সমালোচনায় অথবা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের শেক্সপীয়র ব্যাখ্যায়। সমালোচকের উপলব্ধিতে কবির সৃষ্টির প্রাণময় রূপ প্রতিভাত হয়, কিন্তু তবু সমালোচক বুদ্ধিজীবী ; তিনি বিশ্লেষণ করিয়া সমগ্র রূপটি উদ্ঘাটিত করেন। অপর দিকে কবির কল্পনা সংশ্লেষণধর্ম্মী, তাঁহার কাব্য অখণ্ড সমগ্রতা লইয়াই কল্পনায় প্রতিভাত হয় এবং তাঁহার প্রেরণা আসিবার পূর্ব্বে ও চলিয়া যাইবার পরে সেই অখণ্ডতা থাকে না। সেই জন্যই কবিরা নিজেদের কাব্যের উপযুক্ত ব্যাখ্যাতা বা সমালোচক হইতে পারেন না। ইহা কাব্যসৃষ্টি ও কাব্য-সমালোচনার মধ্যে অন্যতম প্রভেদ। সমালোচনা বিশ্লেষণধর্ম্মী বলিয়া সমালোচক কাব্যের বাচ্য বস্তুর যথার্থ বিচার ও ব্যাখ্যা করিবেন এবং কেমন করিয়া এই সকল বস্তু ব্যঞ্জিত অর্থে প্রবেশ করিয়াছে তাহা দেখাইবেন, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য হইবে সেই প্রাণময় রূপটিকে প্রকাশ করা যাহা বহু উপাদানের অপেক্ষা রাখিলেও নিজে অনপেক্ষমাণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই অপেক্ষিত অনপেক্ষা কবি ও সমালোচকের মধ্যে সংযোগের সেতুস্বরূপ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা সমালোচনা—প্রথম যুগ

॥ ১ ॥

বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা আধুনিক কালের সৃষ্টি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবিতার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সমালোচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। আধুনিক কালে খুব কম কবিই বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের সঙ্গে তুলিত হইতে পারেন; কিন্তু প্রাচীন কালে ইঁহাদের কাব্যের সাহিত্যিক বিচার ও বিশ্লেষণ হইত এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, হোরেস্ বা পোপের মত দুই একজন সমালোচক পদ্যে তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিলেও গদ্যই সমালোচনার উপযুক্ত বাহন। প্রাচীন আলংকারিকেরা পদ্যে সূত্র রচনা করিয়া বৃত্তি ও টীকা গদ্যাকারে লিখিতেন। কালিদাস কবি, কিন্তু টীকাকার মল্লিনাথ গদ্যলেখক। বাংলা সাহিত্যে গদ্য আধুনিক কালের সৃষ্টি; রামমোহন রায় ইহার জনক এবং বিদ্যাসাগর ইহাকে পরিণত রূপ দিয়া সাহিত্যের বাহন হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গদ্য সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সমালোচনাসাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না, কারণ বিশ্লেষণ ও বিচারই সমালোচনার প্রাণ এবং তাহা গদ্যেই নিবদ্ধ হইতে পারে। আর একটি কারণও আছে। প্রাচীন বাংলা কাব্যে কোথাও কোথাও বাস্তব বর্ণনা এবং চরিত্রসৃষ্টির পরিচয় থাকিলেও ধর্ম্মকথাই উহার প্রধান প্রতিপাদ্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে নরনারীর প্রেমের কথা লিখিয়াছেন; সেই প্রেম এত স্থূল যে তাহাকে ইন্দ্রিয়জ কামই বলা যাইতে পারে। কিন্তু তবু বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনী 'অন্নদামঙ্গল' ধর্ম্মকাব্যের অঙ্গ হিসাবেই পরিবেশিত হইয়াছে। এই কথা বিশেষ ভাবে বৈষ্ণব কাব্য সম্পর্কে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিকে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক কালের সাহিত্যিকের প্রশ্ন। সেই যুগের কোন রসিক পাঠক এই প্রশ্ন করিতেন না। সমসাময়িক রসিক বৈষ্ণব সমাজ পদাবলী সাহিত্যকে ধর্ম্মচর্চ্চার উপকরণ হিসাবেই দেখিয়াছে, সাহিত্য হিসাবে বিচার করে নাই। আমাদের দেশের বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় রসশাস্ত্র

সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং সেখানে অলংকারশাস্ত্রের ভাব ও পরিভাষাও গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কাব্যবিচার করেন নাই, ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধুসূদনের বন্ধু রাজনারায়ণ বসু রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। তাই 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে মধুসূদন তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন, 'When you sit down to read poetry leave aside all religious bias'; কাব্যকে তিনি কাব্য হিসাবেই বিচার করিতে বলিয়াছিলেন। এই উপদেশ অপর পক্ষ অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মে বিশ্বাসী সম্পর্কেই সমধিক প্রযোজ্য। মধুসূদনই প্রথমে religious bias পরিত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা যে সময়মত গড়িয়া উঠে নাই বা পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই তাহার আর একটি কারণ আছে এবং তাহার একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এই কারণ সাহিত্যশাস্ত্র-আলোচনার অধোগতি। ভারতবর্ষে যে সকল পণ্ডিতেরা রস-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অগ্রণী হইলেন আনন্দবর্দ্ধন ও তাঁহার টীকাকার অভিনবগুপ্ত। ইঁহাদের আলোচনার ভিত্তি হইল ভরতের বহু-বিতর্কিত সূত্র—বিভাব, অনুভাব ও সহচারী ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়। রসনিষ্পত্তির ব্যাখ্যা বা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে রসের কয়েকটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা রসের ভিত্তি হইলেও রস অ-লৌকিক। দ্বিতীয়তঃ, যদিও বলা যাইতে পারে যে, ভাবই রসে নীত হয়, তাহা হইলেও ইহা ব্যক্তিবিশেষের ভাব বা ইমোশন বা আইডিয়া নহে; ইহার আবেদন সার্ব্বজনীন। তারপর ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ভরতের সূত্রে ভাবের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। তৃতীয়তঃ, এই সূত্রে অলংকার অথবা ষ্টাইলের দোষগুণেরও কোন উল্লেখ নাই।

আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্তের বহুশত বৎসর পরে যখন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে উপনীত হই তখন দেখি সাহিত্যশাস্ত্রের রূপ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। রস রসনিষ্পত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইমোশন বা ভাবের প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যের লক্ষ্য হইয়াছে রস বা অলংকারের চুলচেরা বিশ্লেষণ; কখন হইতে জানিনা সাহিত্যতত্ত্বের নাম হইয়াছে অলংকারশাস্ত্র এবং আলংকারিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে অলংকার-গণনায় ও রচনার দোষগুণের ব্যাখ্যানে। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে

যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে সাহিত্যতত্ত্ববিচারের অবকাশ ছিল না, কিন্তু ইহা লক্ষণীয় যে, উক্ত বক্তৃতায় কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থদ্বয়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ধ্বন্যালোক উল্লিখিত হয় নাই। অভিনব-ভারতী বোধ হয় তখন আবিষ্কৃতই হয় নাই। বহুদিন পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত শিক্ষক সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'শিরোমণি মহাশয় কাব্য পড়াইতে কেবল ব্যাকরণ ও অলংকারের খুঁটিনাটি লইয়া থাকিতেন না। কাব্যরস ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে তাঁহার বেশ দৃষ্টি ছিল।' (হরপ্রসাদ-রচনাবলী – ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২) এই অর্দ্ধ অসতর্ক মন্তব্য হইতে বোঝা যায় যে, সে আমলে সাধারণতঃ সাহিত্যপাঠ ও কাব্যরসোপলব্ধির মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না।

আমাদের এই প্রদেশে মম্মট ভট্টের কাব্যপ্রকাশ এবং বিশেষ করিয়া বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ সাহিত্যপাঠের রুচির নিয়ামক ছিল এবং সাহিত্যালোচনাও নিয়ন্ত্রিত করিত। ইংরেজি শিক্ষার প্রারম্ভেই যে নবজাগরণ দেখা দিল তাহার প্রেরণায় মধুসূদন বিশ্বনাথের অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাংলা দেশে সাহিত্যচর্চ্চার যে অধোগতি হয় তাহার জন্য অংশতঃ বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ দায়ী। আনন্দবর্দ্ধন, ভট্টনায়ক, অভিনবগুপ্ত* রসের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন সেই ব্যাখ্যানুসারে রস উৎপন্নও হয় না, উপচিতও হয় না। ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, ইহা অভিব্যক্তও হয় না। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, রস অভিব্যক্ত হয় বটে, কিন্তু তাহা গৌণ, উপচরিত, বিশেষ অর্থে। আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি যে, কবি ভাবপ্রকাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং ভাবই রসে পরিণত হয়, যেমন চাউল পক্ক হইয়া অন্নে পরিণত হয়। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে রস একধরণের সাক্ষাৎকার। বাস্তবজীবনে আমাদের ভাব নানা অবান্তর বস্তুর আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; কবি স্বীয় প্রতিভা বলে বিভাব, অনুভাবাদির সাহায্যে তাহার আবরণ উন্মোচন করেন। সেই উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রতীতি হয় তাহার নাম রসাস্বাদ। এই অর্থেই বলা যাইতে পারে যে, ভাব অভিব্যক্ত হয় বা রসে পরিণত হয় দীপ জ্বালাইলে ঘট প্রভৃতি দেখা যায়; অনেকটা সেইভাবেই চৈতন্য রসের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। এই যে উদ্ভাসন বা অভিব্যক্তি তাহা বাস্তবজীবনের অভিব্যক্তি হইতে বিভিন্ন। আর এই যে পরিণতি ইহার সঙ্গে তণ্ডুলের অন্নে

* ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্তের রসব্যাখ্যায় পার্থক্য আছে; এখানে শুধু সামান্য লক্ষণের কথা বলা হইতেছে বলিয়া তাঁহাদের নাম এক সঙ্গে করা হইল।

পরিণতি বা দুগ্ধের দধিতে পরিণতির সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নাই। যাহা পাক করিয়া পাওয়া যায় তাহাই অন্ন ; তবু আমরা বলিয়া থাকি অন্ন পাক হইতেছে। শুধু এই ভাবেই বলা যাইতে পারে যে, রস আস্বাদিত হয়, প্রকৃত পক্ষে যাহা প্রতীত হয় তাহারই নাম রস। অন্ন পাক করার সঙ্গে রসপ্রতীতির ইহার অধিক সাদৃশ্য খুঁজিতে গেলে ভুল করা হইবে। বিশুদ্ধ ভাবের অবিঘ্নিত আস্বাদই রস। ইহা মূলতঃ ভাবের অভিব্যক্তিও নয়, রূপান্তরণও নয়।

কিন্তু এই ভুলই করিয়াছিলেন অভিনবগুপ্তের উত্তরসূরিরা—বিশেষ করিয়া 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ। তিনি প্রথমেই সূত্র নির্দ্দেশ করিলেন যে, বিভাবাদির দ্বারা রতি প্রভৃতি ভাব ব্যক্ত হয়। 'ব্যক্ত' হয়—অর্থাৎ দধ্যাদি ন্যায়েন রূপান্তরপরিণতো ব্যক্তীকৃত এব রসো ন তু দীপেন ঘট ইব পূর্ব্বসিদ্ধো ব্যজ্যতে ('দুধ যেমন দধি হয় সেই ন্যায়ে অন্যরূপে পরিণত হইয়া রস অভিব্যক্ত হয় ; দীপের দ্বারা ঘট যেমন প্রকাশিত হয় ইহার সেইরূপ প্রকাশ হয় না, কারণ ঘট তো পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়া আছে ; রস সেইভাবে সিদ্ধ হয় না)। এই ব্যাখ্যায় দুইটি মারাত্মক ভুল আসিয়া গেল। প্রথমতঃ, এই ব্যাখ্যায় ভাব সোজাসুজি রসরূপে প্রকাশিত হয়। (যেমন ক্রৌঞ্চের শোক ক্রন্দনের আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল ?) ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, কাব্য ভাবের প্রকাশ ; যত বেশি ভাবের উচ্ছ্বাস হইবে ততই ভাল কাব্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভাব রসের উপাদান ; তাই যেমন দুগ্ধ উপাদানের দ্বারা দধি প্রস্তুত হয় তণ্ডুল উপাদানের দ্বারা পক্ক অন্ন পাওয়া যায়, তেমনি ভাব রূপান্তরিত হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হয়। দীপের দ্বারা যেমন ঘট প্রভৃতি বস্তু প্রকাশিত হয় ইহা সেইরূপ নহে, কারণ ঘট তো পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনি প্রকাশিত হয়, রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশ পায় না। বিশ্বনাথ আরও বলিয়াছেন, রস স্বপ্রকাশ। কিন্তু দধির মধ্যে দুগ্ধ এবং পক্ক অন্নের মধ্যে তণ্ডুল স্বপ্রকাশ নহে। তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, রস বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য, অন্য কোন জ্ঞেয় বস্তুর স্পর্শ ইহাতে থাকে না। কিন্তু ইহা ব্রহ্মাস্বাদের লক্ষণ, রসাস্বাদের নহে। এইসব ভুলের ও বিভিন্ন বিষয়ের মিশ্রণের জন্য, সাহিত্যচর্চ্চা যাঁহারা করিয়াছেন—মায় রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত—তাঁহাদের ধারণা হয় ভাবের উচ্ছ্বসিত প্রকাশই রস এবং এই কারণেই কাব্যের বাক্য অলংকৃত হয়। এইভাবে সমালোচনাশাস্ত্র দুই দিক্ দিয়া ভুল পথ ধরে। রস অখণ্ড, অভগ্ন নারিকেলবৎ ; সুতরাং ইহার বিশ্লেষণ না করিয়া সমালোচকেরা শুধু 'চারুত্ব', 'সৌন্দর্য্য', 'চমৎকার' প্রভৃতি

শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের কাজ সমাপন করিয়াছেন। এই সকল শব্দ স্ববোধক, অর্থাৎ যাহা বুঝাইতে চায় তাহারই প্রতিশব্দ; পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ে ইহাদিগকে বলা যায়—question-begging epithets, যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহাকেই ইহারা স্বীকার করে এবং বিশেষণের প্রয়োগকেই ব্যাখ্যা বলিয়া ভুল করে। দ্বিতীয়তঃ, ইঁহারা মনে করিয়াছেন, ভাব তো আর নয়টি; তাহাদের প্রকাশই কাব্য। সুতরাং কাব্যের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে ভাষাপ্রয়োগ-নৈপুণ্যের উপর। তাই তাঁহারা শুধু 'উত্তম, উত্তম' অলংকারের প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন এবং গুণ, দোষ, রীতি প্রভৃতির বিচার করিয়াছেন। এইভাবে সাহিত্যশাস্ত্র অলংকারশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে এবং কাব্যবিচার নিষ্ফল হইয়াছে।

সমালোচনার দুর্গতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় 'রস'-শব্দের শিথিল প্রয়োগে। পাঠক কখনও নিজের রসে আপ্লুত হয়েন, কখনও কখনও কবির মধ্যে কোন বিশেষ রসের প্রাচুর্য্য দেখিয়া সেই কারণে তাঁহার প্রশংসা করেন। কেমন করিয়া বিভাবাদির সংযোগে রসনিষ্পত্তি হইল, লৌকিক অভিজ্ঞতা হইতে রসপ্রতীতিতে উপনীত হওয়া গেল অথবা বাচ্য অর্থ নিজেকে গৌণ করিয়া ব্যঙ্গ্য অর্থ আক্ষিপ্ত করিল তাহার কোন পরিচয় ইঁহারা দিতে চেষ্টা করেন নাই। তথাকথিত রসে বিভোর হইয়া অথবা অলংকার, দোষগুণ প্রভৃতির গণনা করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন।

॥ ২ ॥

জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। মনে হয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিজীবনী' বাংলা গদ্যে প্রথম সমালোচনাগ্রন্থ। শুধু কালানুক্রমিক বিচারে ইহা প্রাচীনতা দাবি করিতে পারে না, কারণ অন্ততঃ রঙ্গলালের 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' ইহার পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছিল। কিন্তু রঙ্গলালের প্রবন্ধ আধুনিক ভঙ্গিতে লিখিত এবং তাহার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী সমালোচকও। তিনি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত প্রভৃতি যে সকল কবিদের কথা লিখিয়াছেন তাঁহারা সবাই পাশ্চাত্ত্যপ্রভাবমুক্ত। তিনি নিজে ইঁহাদের সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যেও ইংরেজি সমালোচনা-

পদ্ধতির ছাপ কোথাও নাই; ইহা খাঁটি দেশী রসাস্বাদ। 'কবিজীবনী'কে সাহিত্যসমালোচনা হিসাবে বিচার করিতে গেলে একটি সন্দেহ প্রথমেই মনে জাগে—ইহা বিশুদ্ধ সমালোচনা কিনা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বহু পরিশ্রম করিয়া কবিওয়ালাদের জীবনী রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পদ সংগ্রহ করিয়াছেন; তিনি সাহিত্যবিচার করিতে বসেন নাই। কিন্তু তবু ইহাও মানিতে হইবে যে তিনি এই সকল কবিদের কাব্যের দ্বারা মোহিত হইয়াই এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন এবং তিনি এই সকল কাব্য পড়িয়া ও শুনিয়া যে আনন্দ পাইয়াছেন তাহাও ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইখানেই সমালোচনার অঙ্কুর।

'কবিজীবনী' পাঠ করিলে খাঁটি দেশী সমালোচনার দৈন্যই প্রকটিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র কবিতা ভালবাসিতেন, কবিগান তাঁহাকে উন্মত্ত করিত, তিনি নিজে কবি এবং তীক্ষ্ণধী লেখক। মনে করা যাইতে পারে তিনিই প্রকৃত সহৃদয় পদবাচ্য। কিন্তু দেখা যায় যে, কাব্যরস আস্বাদন করিয়া তিনি যে আনন্দ পাইয়াছেন তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ ব্যাপারে তিনি খুব সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই। কোন কোন জায়গায় তিনি ছন্দ, মিল প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা একটু ভাসা-ভাসা এবং সমালোচক নিজেও এই আলোচনাকে খুব গুরুত্ব দেন নাই। হরু ঠাকুরের গানে মিলের ও শব্দের কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে ইহা স্বীকার করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, কেবল ভাব অর্থ ও মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। (শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত 'কবিজীবনী', পৃঃ ১৪৯)

যেখানে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছন্দ, মিল প্রভৃতি ছাড়িয়া প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেইখানেও তাঁহার বিচার প্রায়শঃ নিছক উচ্ছ্বাস-উক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাঁহার সমালোচনা-পদ্ধতির স্বরূপ জানা যাইবে। 'ইঁহারা সখীসংবাদ ও বিরহগান যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট। অতিশয় সুখকর, ও সর্ব্ব বিষয়েই যশের যোগ্য।......অনেকেই তত্তৎ সংগীতসুধাশ্রবণে শ্রবণের ক্ষুধা নিবারণ করিতেন।' (পৃঃ ১৩৫) 'এই গীতে অত্যাশ্চর্য্য রচনা কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে।...অতি চমৎকার রচনা।' (পৃঃ ২৮২) 'যিনি শুনিয়াছেন তাঁহারি কর্ণে সুধা প্রবেশ করিয়াছে, ভাবে তাঁহার মন মোহিত হইয়াছে। তিনিই রসে গলিয়াছেন, ইঁহার তুল্য উৎকৃষ্ট বিরহ কেহ কখনও শুনেন নাই, যিনি

ইহার অন্তরা ও পাল্‌টা গান দিতে পারিবেন যাবজ্জীবন বিনা বেতনে তাঁহার নিকট বিক্রীত থাকিব।' (পৃঃ ২৩৪) এই জাতীয় স্ব-শব্দনিবেদিত অতিশয়োক্তি সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন; আজিকার দিনে শুধু যে পাঠক ঈশ্বরচন্দ্রের মত মোহিত হইয়া যাবজ্জীবন বিক্রীত হইতে চাহিবেন না তাই নয়। তিনি ইহাকে সমালোচনা বলিয়াই স্বীকার করিবেন না। আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। উপরি-উক্ত মন্তব্যে 'ভাব', 'রস' শব্দদ্বয়ের শিথিল প্রয়োগ লক্ষণীয়। অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যশাস্ত্রীরা রস আস্বাদন করিতেন, রসে গলিয়া যাইতেন না। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, লেখকের কাছে রস ভাবের প্রতিশব্দ মাত্র।

কোন কোন জায়গায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের মানদণ্ড প্রয়োগ করিয়া সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই সব স্থলেও প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির অভাবই প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার মত একটু বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত করিতে চাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যার প্রতি সুন্দরের এই উক্তিটির ব্যাখ্যা করিতেছেন :

আপন চিহ্নেতে কেন হইলা খণ্ডিতা।
লাভে হৈতে হৈলা কলহান্তরিতা ॥[১]
ভেবে দেখ নিত্য নিত্য বাসসজ্জা হও।
উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, এক দিন নও ।।[২]
কখনো না হইল, করিতে অভিসার।
স্বাধীন-ভর্তৃকা কেবা সমান তোমার ।।[৩]
প্রোষিত-ভর্তৃকা হোতে, বুঝি সাধ যায়।
নৈলে কেন বিনা দোষে খেদাও আমায় ॥[৪]

ইহার টীকা করিতে যাইয়া ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন, '...তুমি পণ্ডিতা হইয়া এবং তাহার [খণ্ডিতার] লক্ষণ জানিয়াও আপনার দন্ত চিহ্ন দর্শন করিয়া কেন খণ্ডিতা হইতেছ? তোমার এরূপ অনুচিত অবস্থা কেবল আমার দুরবস্থার কারণ শুধু দুর্ভাগ্য হেতু ঘটিয়াছে। ইতি ধ্বনিঃ। কেবল আমার দুরবস্থার কারণ তোমারো এরূপ হইবে এ কথা কহিতেছেন।' (পৃঃ ২৯) ভারতচন্দ্রের রচনার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য তাহা বাচ্যার্থেরই চারুত্ব। আমাকে দূর করিয়া দিলে তুমি প্রোষিত-ভর্তৃকা, কলহান্তরিতা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা নারীর যে দুঃখ তাহা ভোগ করিবে। ইহার মধ্যে ধ্বনি কোথায়? ধ্বনির প্রধান লক্ষণ

এই যে, বাচ্য অর্থ নিজেকে গৌণ করিয়া অপর প্রতীয়মান অর্থকে আক্ষিপ্ত করে। এইখানে সেইরূপ কোন অর্থ আক্ষিপ্ত হয় নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের অন্যান্য সমালোচনায়ও সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে অগভীর পরিচয় সূচিত হয়। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রশংসা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন, 'এই পুস্তকে তত্তৎ প্রসঙ্গানুসারে প্রায় নব রস বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শুদ্ধ শৃঙ্গাররসের প্রাবল্যরূপেই বর্ণিত হইয়াছে, এবং বীররসের কিঞ্চিৎ প্রাবল্যমাত্র। অপর করুণা, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত এই সপ্ত রসের স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বর্ণনা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রধানরূপে গণ্য হইতে পারে না।..... আপিচ নায়িকা বিশেষের অবস্থাবিশেষ, ও নায়ক প্রভেদ ও উদ্দীপন, আলম্বন, বিভাবন ও কোন কোন স্থানে ধ্বনি ও ব্যঙ্গ [ব্যঙ্গ্য ?] সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।' এখানে বিষয়বস্তুর বিবরণ আছে; শেষোক্ত বাক্যে যেটুকু সমালোচনা আছে তাহা সমালোচকের অলংকারশাস্ত্রে অপরিণত জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়।

কিন্তু একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, ঈশ্বর গুপ্ত কাব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন না। তিনি 'অন্নদামঙ্গল'-কাব্যের বিশ্লেষণ ও বিচারের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন এই ভাবে: '......নানা কারণে এই অন্নদামঙ্গল অনেক প্রকারে দোষ-শূন্য ও প্রকৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু পদ্যের দ্বারা ইঁহার পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম এবং যত্নের ব্যাপার যত প্রকাশ পাইয়াছে, দৈবশক্তির পরিচয় তত প্রকাশ পায় নাই, ফলতঃ যে পর্য্যন্ত ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও সাধারণ নহে।' এখানে অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত আয়াসলভ্য বৈদগ্ধ্য ও নৈসর্গিক, স্বতঃস্ফূর্ত্ত কবিপ্রতিভার মধ্যে ভেদরেখা অতি সুন্দরভাবে টানিয়াছেন এবং ভারতচন্দ্রের উপরে এই সূত্রের সূক্ষ্ম প্রয়োগ করিয়াছেন। পরে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধের আর একটি নিদর্শন দেওয়া যাইবে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ঈশ্বর গুপ্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন না, তাঁহার সময়ে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ট্র্যাডিশন ক্ষীয়মাণ এবং পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার যে ধারায় শীঘ্রই নব্য শিক্ষিত সমাজ অভিষিক্ত হইয়া যাইবে তাহারও তিনি সন্ধান পান নাই। তবু দেখা যায় স্বাভাবিক প্রতিভাবলে তিনি কৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত কাব্যের মধ্যে পার্থক্যের আভাস দিতে পারিয়াছেন।

॥ ৩ ॥

ঈশ্বর গুপ্ত সুকবি ও তীক্ষ্ণধী সাংবাদিক; তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন না। তিনি প্রাচীন পদ্ধতিতে কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার সঙ্গে তাঁহার গভীর পরিচয় ছিল না। তিনি একাধিক বার 'ব্যঙ্গ্য' অর্থকে 'ব্যঙ্গ' বলিয়াছেন। এই একটি অশুদ্ধিই এই ব্যঙ্গপ্রিয় কবি ও সাংবাদিকের অজ্ঞতার যথেষ্ট প্রমাণ। সুতরাং প্রাচীন সংস্কৃত বিচাররীতির নিদর্শন পাইতে হইলে সেই আমলের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের রচনা ও মন্তব্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রেমচাঁদ (চন্দ্র) তর্কবাগীশ ঈশ্বর গুপ্তের বন্ধু ছিলেন এবং 'সংবাদ-প্রভাকর'-পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁহার রচিত কোন সমালোচনা গ্রন্থ নাই; তিনি বন্ধুর পত্রিকায় সাহিত্যবিষয়ক কোন প্রবন্ধ লিখিয়া থাকিলেও এখন তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে তিনি শুধু নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন না; দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর তিনি অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের সহিত অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম প্রধান ছাত্র ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মনে হয় প্রেমচাঁদ শুধু সুপণ্ডিত ও কৃতী অধ্যাপকই ছিলেন না; তাঁহার খুব প্রখর ব্যক্তিত্বও ছিল। এই সব কারণে তিনি সমকালীন বিদগ্ধ সমাজের চিন্তা ও রুচি প্রভাবান্বিত করিতে পারিতেন। প্রাচীনপন্থী সাহিত্যচর্চ্চার তিনি একজন শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁহার রচিত কোন প্রবন্ধাদি আমাদের হাতে না আসিলেও বিক্ষিপ্ত মন্তব্য হইতে তাঁহার ও তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজের সাহিত্যিক মতামত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ'-গ্রন্থের সটীক প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণ অদ্যাবধি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই কাজে তিনি ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, না স্বীয় রুচির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিতে পারি না। তবু তিনি যে এই গ্রন্থে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিবার মত। আচার্য্য দণ্ডী রীতিবাদের অন্যতর প্রবর্ত্তক এবং 'কাব্যাদর্শ'-গ্রন্থে অলংকারসমূহের এত বিস্তৃত আলোচনা আছে যে তাঁহাকে অলংকারবাদীও বলা যাইতে পারে। প্রেমচাঁদ যে দণ্ডীর মতবাদের ব্যাখ্যাকে স্বীয় অধ্যাপক জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করিয়া খ্যাতি বা অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা অলংকারবাদ ও রীতি-

বাদের সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করে। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ মধুসূদনের রচনা পড়িয়া 'দুঃশ্রবত্ব', 'নিহতার্থত্ব', 'চ্যুতসংস্কারত্ব', 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' প্রভৃতি দোষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। 'শর্ম্মিষ্ঠা'র পাণ্ডুলিপি পড়িয়া প্রেমচাঁদ যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে এক দিক্ দিয়া তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন, 'বোধ হয়, ইহা কোন ইংরাজী শিক্ষিত নব্যবাবুর রচনা হইবে।'* শুধু 'শর্ম্মিষ্ঠা' কেন, শেক্সপীয়রের নাটকের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া তর্কবাগীশ মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'এই দৃশ্য কাব্যগুলি আমাদের অলংকার শাস্ত্রের নিয়মসঙ্গত নহে। রঙ্গমধ্যে বধ ও যুদ্ধাদির বর্ণনা শিষ্টাচার ও রুচির বিরুদ্ধ।' (রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বিরচিত জীবনচরিত) পাঠক শেক্সপীয়রের নাটক সম্পর্কে ভলটেয়ারের বিরুদ্ধ সমালোচনা স্মরণ করিবেন।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবনচরিতকার আর একটি মন্তব্যের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আরও বেশি তাৎপর্য্যপূর্ণ: ঈশ্বরচন্দ্রের এক বিষয়ে কয়েকটি পদ্য উল্লেখ করিয়া প্রেমচন্দ্র বলিলেন—'এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইলে ভাল হইত, ইহাতে কবিতাগুলির গূঢ় ভাব অব্যাহত থাকিত ও অলংকারসম্মত হইত। শেষের এই কয়েকটি পংক্তিতে এই ভাব একেবারে ঘাঁটা ছরকটা হইয়া গিয়াছে।'

ঈশ্বরচন্দ্র উত্তর করিলেন—'আপনি এখন অলংকারের অধ্যাপক, অলংকার পরিচ্ছদ আপনার দোকানের মাল। সাজান-গোছান আপনার পক্ষে সহজ, কিন্তু আমি কবিতা-কামিনীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা রাখিতে পছন্দ করি।'

কবিতাটি কি আমরা তাহা জানি না; সুতরাং তর্কবাগীশ যে দোষ ধরিয়াছিলেন তাহা এই ক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য বলিতে পারি না। তবে এই কথোপকথনে প্রাচীন পণ্ডিতী সমালোচনার সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় এবং ঈশ্বর গুপ্তের অশিক্ষিতপটুত্বও প্রমাণিত হয়।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনন্যসাধারণ পুরুষ। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা বা চরিত্রের বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কবি (সাধারণতঃ) ছন্দোবদ্ধ বাক্যে তাঁহার ভাব প্রকাশ করেন,

---

* যোগীন্দ্রনাথ বসু—'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত'। পৃঃ ২২৯।

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের সঙ্গে নিজের তুলনা করিয়া মধুসূদন মন্তব্য করিয়াছেন, I am afraid there is little congeniality between our friend and my poor-self'. খাঁটি রস-তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় হইলে তিনি এত সংস্কৃতবিরোধী হইতেন না।

কিন্তু সমালোচনার উপযুক্ত বাহন গদ্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্যতম কীর্ত্তি তিনি বাংলা গদ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তিনি ইহাকে সুশৃঙ্খল, সরল ও সুবিন্যস্ত না করিলে এই ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সমালোচনার মত সমালোচনা গড়িয়া উঠিতে পারিত না। ইহা ছাড়িয়া দিলেও, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন ; বিদ্যাসাগর উপাধিই এই পাণ্ডিত্যের অন্যতম স্বীকৃতি। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন এবং কালিদাস ভবভূতির রচনার কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে শেক্সপীয়রের একখানি নাটকেরও সারাংশ বাংলা গদ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের যে ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য এবং একচ্ছত্র প্রভাব ছিল হয়ত তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয় করিয়া বাংলা সমালোচনার ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেন ; অন্ততঃ প্রাচীন সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রকে বাংলা সাহিত্যে নূতন ধারায় প্রবাহিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সেই পথে যান নাই। তিনি সমালোচনাপ্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন মাত্র একখানা এবং তাহারও বিষয় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। কলিকাতার বীটন সোসাইটি নামক সমাজে তিনি এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন এবং অনতিকাল পরেই তাহা প্রকাশ করেন। ছোট একটি বক্তৃতায় সাধারণ পাঠকের জন্য সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের সারসংকলন যে প্রস্তাবের উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে গূঢ় তত্ত্ব বা বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রত্যাশা করা যায় না। তবু এই প্রবন্ধটি খুব তাৎপর্য্যময়। বিদ্যাসাগর কোথায় বাংলা সাহিত্যস্রষ্টা ও সাহিত্যসমালোচককে নূতন বিচার পদ্ধতির সন্ধান দিতে পারিয়াছেন এবং কোথায় তাহা পারেন নাই এই প্রবন্ধ হইতে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

ঈশ্বরচন্দ্র অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বলিয়াই মনে হয়। বাস্তবাভিমুখী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার জন্যই হউক অথবা স্বীয় বুদ্ধির বলেই হউক তিনি সাহিত্য বিচারের একটি নূতন সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে প্রবেশ করিয়াই তিনি রঘুবংশ সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'তাহার বর্ণনাসকল পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয় ; তাহাতে অত্যুক্তির সংস্রব মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলংকারে অলংকৃত। বস্তুতঃ, এবংবিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানুযায়িনী এবং একান্ত হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর দেখা যায় না।' রঘুবংশ সম্বন্ধে কোন টীকাকার বা আলংকারিক এইরূপ আলোচনা

করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই সুর ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে নূতন সুর। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে অত্যুক্তি বা অতিশয়োক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ভামহ তো বলিয়াছেন যে, অতিশয়োক্তি (বক্রোক্তি) সমস্ত অলংকার তথা কাব্যসৌন্দর্য্যের উৎস। পরবর্ত্তী আলংকারিকেরা কেহ কেহ স্বভাবোক্তিকে অলংকার বলিয়া মানিয়া লইলেও ইহা কোথাও প্রাধান্য পায় নাই। বিদ্যাসাগর কিন্তু স্বভাবানুযায়িতাকেই কাব্যসৌন্দর্য্যের ভিত্তি করিয়াছেন। রঘুবংশ-মহাকাব্যের আলোচনায় তিনি এই কথাটা প্রথম উত্থাপিত করেন, তারপর প্রধানতঃ এই মানদণ্ডের দ্বারাই তিনি অন্যান্য কাব্যের আলোচনা করিয়াছেন। অত্যুক্তির জন্য তিনি নৈষধচরিতকে হেয় মনে করিয়াছেন। অবশ্য নৈষধের অত্যুক্তি উহার পদলালিত্যের মতই বহুলপ্রচারিত। বিদ্যাসাগরের স্বকীয়তা বেশি করিয়া প্রকটিত হইয়াছে ঋতুসংহার-কাব্যের আলোচনায়। ঋতুসংহার সাধারণতঃ কালিদাসের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রচনা বলিয়া পরিগণিত হয় এবং কেহ কেহ ইহাকে কালিদাসের রচনা বলিয়াই মনে করেন না, কারণ ইহার মধ্যে ষড়ঋতুর বর্ণনা ছাড়া আর কিছু নাই। যাহা অপরের কাছে নিকৃষ্টতার নিদর্শন বিদ্যাসাগর তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান অলংকার ঋতুসংহার আদ্যোপান্ত তাহাতে অলংকৃত। কিন্তু রূপক, উৎপেক্ষা প্রভৃতি অলংকার এতদ্দেশীয় লোকের অধিক প্রিয়, স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব তাঁহাদের তাদৃশ মনোরম বোধ হয় না।' দেখা যাইতেছে বিদ্যাসাগর 'এতদ্দেশীয়' লোকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

তিনি অনেকটা সফলও হইয়াছিলেন। কাব্যেই যিনি স্বভাবানুকারিতার প্রশংসা করিয়াছেন তিনি যে গদ্য কাব্যে ইহা বেশী করিয়া দাবি করিবেন এইরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর কথাসরিৎসাগরকে নিকৃষ্ট উপাখ্যান বলিয়া বিচার করিয়াছেন, কারণ উহার গল্পগুলি 'কেবল অলৌকিক ও অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপুর্ণ। অলৌকিক ও অদ্ভুত বৃত্তান্ত ঘটিত উপাখ্যান সকল এক সময়ে সাতিশয় মনোহর ছিল; কিন্তু এক্ষণে আর তাহাদের তাদৃশ চমৎকার-জনকত্ব নাই।' এই হাওয়া বদলের পরিচয় অন্যত্রও পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের আলোচ্য প্রস্তাবের বছর পনের পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত রীতিতে পৌরাণিক আখ্যায়িকা লিখিতে বসিয়া একটু মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। গ্রন্থের আভাসে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, 'পৌরাণিক আখ্যায়িকায় আধ্যাত্মিক ও

বৈজ্ঞানিক তথ্যের যথেষ্ট বিস্তার থাকে ; অতিশয়োক্তি ও রূপকালংকারেরও আধিক্য হয়। এক্ষণে দেখিতে পাই অনেকেই অতিশয়োক্তি অলংকারের প্রতি বিরক্ত। কিন্তু ঐ অলংকারটি অদ্ভুত রসের সহচর। অদ্ভুত, অতি পবিত্র রস। বিস্ময়, মনুষ্যমাত্রের স্বভাব এবং অবস্থার উপযোগী।' লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে যে, তিনি অদ্ভুতকেও মনুষ্যের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং এই ক্ষেত্রে symbol বা রূপকের সাহায্যে সাহিত্যের সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে পূর্ব্বে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন এবং তৎপর বঙ্কিম যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার অন্তরালে অনুরূপ প্রেরণা ক্রিয়াশীল হইয়া থাকিবে। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্য দিয়া স্বভাবানুকারিতা ও স্বভাবাতিরেকের সমন্বয় সম্ভব হইতে পারে। যাহা এখন স্বভাবাতিরিক্ত তাহা অপরিচিত প্রাচীনকালের প্রতিচ্ছবি এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করা যাইতে পারে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্যবিচারের আরও কয়েকটি সূত্রের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই সব সূত্র রচনাশৈলী সম্পর্কে। তাঁহার মতে রচনার প্রধান গুণ সরলতা। এইজন্য তিনি কালিদাসকে প্রশংসা করিয়াছেন এবং দুরূহতার জন্য ভারবি, মাঘ ও বাণভট্টকে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি উত্তরচরিত-নাটকের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া 'সীতার বনবাস' রচনা করিয়াছিলেন ; উত্তরচরিতকে তিনি করুণরসের শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু সরলতার অভাবের জন্য ইহার নিন্দাও করিয়াছেন : 'রচনার দোষে স্থানের স্থানের অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট ; এর মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে যে তাহাতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। নাটকের কথোপকথনস্থানে সেরূপ দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দূষ্য।' বিদ্যাসাগর সরলতাকে প্রাধান্য দিলেও শুধু সরলতাকে কাব্যের পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতেন না ; প্রসাদগুণের সঙ্গে লালিত্য, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি গুণেরও সন্ধান করিতেন। এই কারণে তিনি বহু প্রচলিত পঞ্চতন্ত্র-গ্রন্থের নিন্দা করিয়াছেন ; এই গ্রন্থে 'সহজত্ব ব্যতীত আর কিছুই বিশেষ প্রশংসনীয় নাই।' তিনি আর একটি গুণের উপরেও বিশেষ জোর দিয়াছেন ; ইহা হইল সুঠাম গঠনকৌশল। কোথাও কিছু অসম্বন্ধ, অসংলগ্ন বা অপ্রাসঙ্গিক থাকিলে তিনি সেই গ্রন্থকে নিকৃষ্ট বলিয়া বিচার করিয়াছেন এবং শিশুপালবধ বা কাদম্বরী প্রভৃতি রচনায় যেখানে শুধু কোন

বিশেষ শব্দ বা অলংকারের প্রয়োগই কবির লক্ষ্য সেই সকল কাব্যেরও নিন্দা করিয়াছেন। এই সকল সূত্রের প্রয়োগে সাহসের পরিচয় আছে, কিন্তু ইহাদের পরিকল্পনায় কোন মৌলিকতা নাই, কারণ অন্যান্য সাহিত্যবিচারকেরাও কাব্যের বিভিন্ন অংশের সুসম্বদ্ধতা ও দৃঢ় ঐক্যের কথা বলিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অপর একটি উক্তি অধিক তাৎপর্য্যপূর্ণ। আলংকারিক কুন্তক বক্রোক্তির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া এক একটি পদের অপরূপ সার্থকতার কথা বলিয়াছেন; সেই পদটি সেই শ্লোকে না থাকিলে, অন্য কোন প্রতিশব্দ দিলে অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবেশিত হইত না। এই সূত্রটিই বিদ্যাসাগর অন্যভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কাব্যের পদবিন্যাস এমনভাবে করিতে হইবে যে কোন শব্দই 'পরিবর্ত্তসহ' না হয়। শব্দ ও অর্থের একাত্মতা এমন সুন্দর করিয়া আর কোন সমালোচক প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

বিদ্যাসাগর রচনার সরলতা, লালিত্য, ওজস্বিতা, মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করিয়াছেন এবং কর্কশতা, দুরূহতা প্রভৃতি দোষের নিন্দা করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সাহিত্যবিচারে তিনি গুণবাদিসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। অন্যান্য গুণবাদীদের মতই তিনি সাহিত্যের বহিরঙ্গেরই বিচার করিয়াছেন। যেখানে তিনি কাব্যের শরীর ছাড়িয়া কাব্যের আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে গিয়াছেন সেইখানেই এই জাতীয় আলোচনার অসম্পূর্ণতা প্রকট হইয়াছে। তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই 'নৈপুণ্য', 'মনোহারিত্ব', হৃদয়গ্রাহিতা' প্রভৃতি স্বশব্দ বা question-begging epithet দ্বারা কবিকৃতিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বুঝা যাইবে। মেঘদূত সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, 'ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।' এইরূপ সমালোচনায় অলৌকিক কবিত্বশক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি কবিত্বশক্তি ও রচনার নৈপুণ্যের মধ্যে পার্থক্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন: 'জয়দেব রচনা বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী হইত তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত।' ইহা হইতে বোঝা যায় যে কবিত্বশক্তিকে তিনি রচনার নৈপুণ্যমাত্র মনে করিতেন না। মেঘদূত সম্পর্কিত আলোচনায় এবং অন্যত্রও তিনি এই শক্তিকে সহৃদয়তা আখ্যা দিয়াছেন। এই সহৃদয়তা

লক্ষণটি বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। প্রাচীন আলংকারিকেরা কবিকে সহৃদয় বলিয়াছেন এবং রসবেত্তা পাঠক যাঁহাকে আমরা বলি ক্রিটিক (critic) তাঁহাকেও সহৃদয় আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু রসের স্রষ্টা ও রসের আস্বাদয়িতা —ইঁহারা কি সমানধর্ম্মা? অভিনব গুপ্ত সহৃদয় পাঠকের সংজ্ঞা দিয়াছেন এই ভাবে: কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশতঃ হৃদয়মুকুর অতিশয় স্বচ্ছ হওয়ায় যাঁহারা বর্ণনীয় বিভাবাদি বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিতে পারেন তাঁহারাই সহৃদয়। কিন্তু কবির ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া তিনি অভ্যাস বা অনুশীলনের কথা তোলেন নাই। বরং তিনি বলিয়াছেন, 'সরস্বতীর যে তত্ত্ব কোনপ্রকার উপাদানকারণের অপেক্ষা না করিয়াই অপূর্ব্ব বস্তুর সৃষ্টি ও বিস্তারসাধন করে, ...যাহা প্রথমে কবিপ্রতিভা ও পরে বাক্যরচনা—ইহাদের ক্রমিক প্রসারের দ্বারা রসময় হইয়া জগৎকে প্রকাশিত করে,...তাহাকে কবি-সহৃদয় আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।' রীতিবাদী দণ্ডীও কবিকৃতির জন্য তিনটি উপাদানের নির্দ্দেশ দিয়াছেন: প্রতিভা, শ্রুত, অভিযোগ বা অভ্যাস। এখানেও প্রতিভারই প্রাধান্য। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় অভিষিক্ত মধুসূদনের পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যের কোন সমালোচকই এই অপূর্ব্ব বস্তু নির্ম্মাণক্ষমা প্রতিভার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করেন নাই।

॥ ৪ ॥

উপরে যে কয়জন সমালোচকের কথা বলিলাম তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর লেখক এবং খাঁটি দেশী প্রথায় সাহিত্যবিচারে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অভ্যাগমের পূর্ব্বেই এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার ঢেউ আসিয়াছে। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জন্ম হয় ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে, ঈশ্বরগুপ্ত তদপেক্ষা বছর ছয়েকের ছোট। ইংরেজি শিক্ষার বহুল প্রচলনের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাহার কিছুদিন পরই রামমোহন রায় সংস্কৃতশিক্ষার বিরুদ্ধে বড়লাটের কাছে তাঁহার ঐতিহাসিক পত্র লিখেন। সুতরাং এই সময়েই ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি এদেশের সাহিত্যচর্চ্চাকে প্রভাবিত করে এবং অল্প কাল মধ্যেই দেশীয় আলোচনারীতি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। একেবারে লুপ্ত হয় নাই কারণ অনেকটা অজ্ঞাতসারেই আমাদের ঐতিহ্য আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে এবং এই ক্ষেত্রেও তাহার

ব্যতিক্রম হয় নাই। কিছুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি ও পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা পদ্ধতি পাশাপাশি বিরাজ করিতে থাকে।

এই সহ-অবস্থানের প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। ইনি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে একটি সাময়িক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। ইহার মধ্যে অন্যান্য রচনার সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হইত এবং নূতন গ্রন্থের সমালোচনা ইহার একটি বিশিষ্ট অংশ বলিয়া পরিবেশিত হইত। এই পত্রিকায়ই মধুসূদনের যুগান্তকারী এক্সপেরিমেণ্ট তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য প্রকাশিত হয় এবং পরে যখন মধুসূদন ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন তখন রাজেন্দ্রলাল ইহার দীর্ঘ সমালোচনা করেন। ইহা ছাড়া প্রধানতঃ বাংলাভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থের বিচার তিনি ও তাঁহার পত্রিকার লেখকরা করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছিলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ আলোচনা করিয়াছিলেন মেঘনাদবধ কাব্যের। রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধারার পরিচয় পাওয়া যায় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কোথাও শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ না থাকিলেও তাঁহার সমালোচনা একাধিক দিক দিয়া তাৎপর্য্যপূর্ণ। ভারতবর্ষীয় রীতিতে তিনি যখন সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তখন এই পদ্ধতির নিকৃষ্টতাই বিশেষভাবে প্রকট হয়। আমার মতে ইহার প্রধান কারণ বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ ও তাহার ভ্রান্ত অনুশাসন। ইহার অপপ্রভাব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যেখানে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, সেইখানেই তিনি বিশ্বনাথ নির্দ্ধারিত ভ্রান্ত পথে যাইয়া শুধু অভিব্যক্ত রসের নাম করিয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। বেণী-সংহার-নাটকের বক্তব্য বিষয় বীররস, এই বলিয়াই তিনি থামিয়া গিয়াছেন; উৎসাহ স্থায়িভাব কেমন করিয়া রসে নীত হইল তাহার বিশ্লেষণ করেন নাই। তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্যে প্রকৃত কবিত্ব লক্ষণ পাওয়া যায় কারণ ইহাতে 'সর্ব্বত্রই সুচারু-রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে।' বর্ণনায় রসের কথা বলিয়াই তিনি ভাষার দোষগুণ কথনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তিনি যে মিত্রাক্ষর ছন্দের বিরোধিতা করিয়াছেন তাহার কারণ ইহাতে 'ওজোগুণের হানি হয়।'

যেখানে রাজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্ত্য রীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন সেইখানে

তিনি সূক্ষ্মতর বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্যবিচারে বিদ্যাসাগরের ন্যায় তিনিও স্বভাবানুকারিতার পক্ষপাতী। মনে হয় এই বিষয়ে তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। বেণীসংহার নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'জীবন যাত্রায় সম্ভাবনীয় ঘটনার অনুকরণের নাম নাটক; তাহাতে যে পর্য্যন্ত প্রকৃতির সহিত সাদৃশ্য রক্ষা পায় তদনুসারে নাটকের সাফল্য হয়; সাদৃশ্যের হানি হইলেই রসের হানি হয়···।' এখানে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্যও লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগরের সূত্র সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের স্বভাবোক্তি অলংকার, রাজেন্দ্রলালের লক্ষ্য জীবনযাত্রায় সম্ভাবনীয় ঘটনার অনুকরণ; তাঁহার ভাষাই অ্যারিষ্টটেলীয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে **Thomas Twining** ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পোয়েটিক্স গ্রন্থের সটীক অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডে তাহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে। প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর পরোক্ষ ভাবেই হউক তিনি অ্যারিষ্টটলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে বেণীসংহার-নাটকের প্রশংসা এই যে 'তাহাতে মনুষ্যচরিত্র অবিকল বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পাঠমাত্রে ভীমের তেজ, কর্ণের অহঙ্কার, অশ্বত্থামার ক্রোধ ও দয়াপূর্ণ স্বভাব এবং দুর্য্যোধনের আত্মশ্লাঘায় মত্ততা, তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে প্রতীত হয়।' এখানে তিনি যে শুধু স্বভাবানুকারিতার কথা বলিতেছেন তাহাই নহে প্রত্যেক চরিত্রের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। রত্নাবলী-নাটকের বিচারে তিনি কাব্যালংকার ও নাট্যরসের পরিপূর্ণতার কথা বলিয়াছেন, আবার সাগরিকা, উদয়ন, বসন্তক প্রভৃতি ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর জোর দিয়াছেন। অন্যত্র (বিবিধার্থসংগ্রহ, ১৭৮১, পৃঃ ২৪) তিনি নাটক-রচনার একটি 'সাধারণ নিয়ম' উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'নাটকে গ্রন্থকারের বক্তব্য কথা কিছুমাত্র থাকে না····· সকল মুখ্য কথাই নটদিগের মুখ হইতে নির্গত হয়।' এখানে শুধু অ্যারিষ্টটলের পোয়েটিক্স নয়, শেক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে পরিচয়ের ছাপও সুস্পষ্ট।

সাহিত্য তথা সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই যে, তিনি অমিত্রাক্ষরছন্দের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সোমপ্রকাশ-সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল শুধু যে যুক্তির দ্বারাই এই নূতন অভিযানের প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইংরেজি, লাটিন ও গ্রীক

মহাকবিদের দৃষ্টান্তের দ্বারা নিজের মত সমর্থন করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি তিনি কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, কিরাতার্জ্জুনীয় প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পদের মধ্যস্থলে যতি নির্দ্দেশের সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতের উদারতা, মনের সাহস, রুচির সহৃদয়তা বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। রাজেন্দ্রলালের ও দ্বারকানাথের আলোচনা হইতে মনে হয়, তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে কাব্যসরস্বতী সমস্ত প্রকার শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় ভাষার একটু অদল-বদল করিয়া বলিতে পারি: তখন কাল প্রসন্ন, সুপবন বহিতেছিল, জাতীয় পতাকায় নাম লেখা হইল—শ্রীমধুসূদন।

॥ ৫ ॥

যে কেহ রেলগাড়ির বদ্ধ কামরা হইতে নামিয়া ষ্টেশন ও সহরের অভ্যন্তর অতিক্রম করিয়া সমুদ্র উপকূলে উপস্থিত হইয়াছেন তিনিই বিরাট জলস্ফীতি ও তরঙ্গলীলা দেখিয়া যেন নূতন জগতের পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। বিশ্বনাথ-অনুশাসিত, অলংকারশাস্ত্রপরিবেষ্টিত সমালোচনার ক্ষেত্র হইতে মধুসূদনের সাহিত্যবিষয়ক চিঠিপত্রের জগতে আসিলে পাঠকের অনুরূপ অনুভূতি হইবে। এ এক নূতন জগৎ—সীমাহীন, সততক্রিয়াশীল, অদ্ভুত প্রাণরসে সঞ্জীবিত; পিছনে যাহা ফেলিয়া আসিলাম তাহার সঙ্গে কোথাও ইহার সামঞ্জস্য নাই। দেশের লোকের কাছে তাঁহার রচনা (তাঁহার মতে) যথোচিত সমাদর পাইতেছে না মনে করিয়া মধুসূদন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি একটু আগে জন্মিয়াছিলেন—'**born an age too soon**'। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে রুচির পরিবর্ত্তন হওয়ার পর জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার কাব্য তাহার ন্যায্য সম্মান পাইত। কিন্তু এই খেদোক্তি অমূলক। শুধু ইংরেজি শিক্ষা নহে; বাংলা সাহিত্য তাঁহার মত একজন প্রতিভাবান্ কবিসহৃদয়ের অভ্যাগমের প্রতীক্ষায় ছিল যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে পুরাতন আইনকানুন জীর্ণপত্রের মত উড়িয়া যাইবে। তাঁহার পত্রাবলীর সঙ্গে তদীয় বন্ধু রাজনারায়ণ বসু ও অনুগামী কবি হেমচন্দ্রের রচনার তুলনা করিলে এই বিপুল পরিবর্ত্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সতীর্থ ছিলেন, তিনি ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং মধুসূদনের

তাঁহার মতের উপর আস্থা ছিল। হেমচন্দ্র নিজেই বৃত্রসংহার কাব্য, রচনাকালে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি বাল্যাবধি ইংরেজি ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহেন। ইঁহারা উভয়েই ইংরেজি-নবীশ, উভয়েই মাইকেলের কাব্যের সপ্রশংস সমালোচনা করিয়াছেন, অথচ ইঁহাদের কেহই প্রাচীন পদ্ধতির গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

বরং মধুসূদনের অপর সতীর্থ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনায় উন্মুক্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রঙ্গলালের সঙ্গে মধুসূদনের তুলনা করা সঙ্গত হইবে না। মধুসূদন যে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেন তাহার পূর্ব্বাভাস রঙ্গলালে পাওয়া যায়, সুতরাং তাঁহার কথা শেষ করিয়াই মধুসূদনের মতামতের বিচার করিব। তাঁহাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আর একটি কারণও আছে। বীটন সোসাইটিতে পঠিত তদীয় 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' বাংলা গদ্যে লিখিত প্রথম সমালোচনা প্রচেষ্টা। এই প্রবন্ধটি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে পঠিত হয় এবং মধুসূদনের সাহিত্য বিষয়ক পত্রাবলী লিখিত হয় ১৮৫৮-১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। ঠিক যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাংলা কাব্যকে খুব হেয় মনে করিতেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র দত্ত বীটন সোসাইটিতে বাংলা কবিতা বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে স্থানে স্থানে তিনি বাংলা কবিতার অপকৃষ্টতার কথা বলেন। এই বিষয়ে কৈলাসচন্দ্র বসু তাঁহাকে জোরাল সমর্থন জানান। বসু মহাশয় এমনও বলেন যে, পরাধীন জাতির মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির উদ্ভব সম্ভব নয়। রঙ্গলাল এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বাংলা কবিতার সপক্ষে লেখনী ধারণ করেন। কৈলাসচন্দ্র বসু বলিয়াছিলেন যে, পরাধীন জাতির দ্বারা শ্রেষ্ঠ কাব্য লিখিত হইতে পারে না; তাহার উত্তরে রঙ্গলাল দেশী ও বিলাতী অনেক নজির উপস্থাপিত করেন। লক্ষ্য করিতে হইবে উভয় পক্ষই মানিয়া লইয়াছেন যে, সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ থাকা স্বাভাবিক; শুধু রঙ্গলাল বলিতেছেন যে, পরাধীনতার মধ্যে কবিপ্রতিভা স্ফুরিত হইতে পারে, তবে সবরকম রস সেখানে সমাদৃত হইবে না। যে জাতি উন্নতিশীল তাহার কাব্যে রৌদ্ররস ও ভয়ানক রসের চর্চ্চা হওয়া স্বাভাবিক, পরাধীন জাতির কাব্যে আদিরস প্রভৃতির সমধিক অনুশীলন হইবে। রঙ্গলাল কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রকে এই বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন যে ইঁহাদের কাব্যে সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। এই মতটি পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও সমালোচনা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে

হয়। ইউরোপে এই মতবাদের উৎস কোমতের ধ্রুববাদ (Positivism)। কোমত তাঁহার মূল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ১৮৩০-৪২ খ্রীষ্টাব্দে; ১৮৫৩ ইহার সংক্ষেপিত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হইতে বোঝা যায় কোমত দর্শন বাংলা দেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ধ্রুববাদী টেন সাহিত্যসৃষ্টিতে সমকালীন পরিবেশের প্রাধান্য দেখাইয়া ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই গ্রন্থ আমাদের এখানে এম্‌-এ পরীক্ষায় অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে মার্কসবাদের প্রভাবে এই মত এক নূতন আকারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রঙ্গলাল যখন বীটন সোসাইটিতে প্রবন্ধ পাঠ করেন তখন তিনি কোমতদর্শনের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন এইরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। তবে অষ্টাদশ শতকেই ইংরেজি কবিতার প্রথম ঐতিহাসিক টমাস ওয়ার্টন বলিয়াছিলেন যে, প্রাচীন কাব্যে তখনকার কালের সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি থাকে এবং এই কারণে তাহা পঠনীয়। রঙ্গলালের প্রবন্ধে এই মতেরই প্রতিধ্বনি দেখা যায়। তাঁহার এই প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যালোচনায় বাস্তববাদী চিন্তা ও গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ।

আর একটি দিক্ হইতেও রঙ্গলালের এই প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। জনৈক শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক বলিয়াছেন যে, সমালোচনার প্রধান কাজ বিশ্লেষণ ও তুলনা। রঙ্গলালের প্রবন্ধে এই ক্ষমতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। আমরা সচরাচর কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতকে একই পর্য্যায়ে ফেলি। কিন্তু রঙ্গলাল ইহাদের তুলনা করিয়া কাশীরাম দাসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি শেক্সপীয়রের Venus and Adonis-এর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের তুলনা করিয়াছেন। শেক্সপীয়রের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের তুলনা!—শুনিলে প্রথমেই একটু খট্‌কা লাগিবে। কিন্তু রঙ্গলাল কোন একটি বিশেষ দিক্ হইতে দেখিয়া বিষয়টিকে সীমিত করিয়া এই তুলনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং বিশ্লেষণ ও উদ্ধৃতির সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই অসম তুলনায় কোথাও তাঁহার পরিমাণবোধ আচ্ছন্ন হয় নাই। রঙ্গলালের প্রবন্ধটি ছোট এবং ইহা লিখিত হইয়াছিল অন্যের উক্তির প্রতিবাদে, কিন্তু ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম সমালোচনশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং স্বদেশীয় কবিতার পক্ষ সমর্থনে লিখিত হইলেও ইহা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বিদেশী সাহিত্যের রীতিনীতির দ্বারা প্রভাবিত।

॥ ৬ ॥

বাংলাদেশের সাহিত্যচিন্তায় মধুসূদন এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেন। অন্য কোন দেশে কোন একজন কবি একা এইরূপ সাহিত্যিক বিপ্লবের সূচনা করিতে ও সার্থক পরিণতির পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মধুসূদন তাঁহার কবিকৃতির দ্বারাই এই বিপ্লব সমারোহ সহকারে উদ্‌যাপিত করিয়াছিলেন; তিনি একাই এই বিপ্লবের পুরোহিত ও যজমান। তিনি নূতন ধরণের কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছিলেন আবার চিঠিপত্রে এই নূতন আন্দোলনের মূল সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু এবং কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলির কাছে তিনি যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা বাংলা সমালোচনাসাহিত্যের অপূর্ব রত্ন। এই সকল চিঠির মধ্যে নূতন সাহিত্যচিন্তার মূল সূত্র নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই চিঠিগুলি এই দিক্ দিয়া কীট্‌সের চিঠির সঙ্গে তুলনীয়। এই সব চিঠির অন্যতর প্রধান কথা এই যে, মধুসূদন বিদ্রোহী কবি ও সাহিত্যিক—কাব্য ও নাটকে তিনি পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতন মানদণ্ড স্থাপন করিতে চাহেন। তিনি কৈশোরেই কবি বায়রণকে তাঁহার favourite বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। বায়রণ বিদ্রোহী ও রোমান্টিক। পরবর্ত্তীকালে মধুসূদন অন্যান্য অনেক ইংরেজ কবির নাম করিয়াছেন, কিন্তু বায়রণের কথা বলেন নাই। এমন কি ছাত্রাবস্থায় 'On poetry'* নামে যে প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও বায়রণের সমসাময়িক ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোল্‌রিজের উল্লেখ করিয়াছেন, বায়রণের নয়। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, তিনি বিদ্রোহী বায়রণকেই ভালবাসিয়াছিলেন; পরে যখন স্বীয় কবিপ্রতিভা উন্মেষিত হইল তখন বায়রণের আবেদন শিথিল হইয়া গিয়াছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই তিনি বিদ্রোহের জয়ডঙ্কা বাজাইলেন। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনার সময় তিনি গৌরদাস বসাককে লিখিলেন, '...It is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit' পরে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন, 'If I have to write other dramas, you may rest assured I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Visvanath of the Sahitya Darparn'. অপর এক পত্রে তিনি নিজেকে 'tremendous literary rebel' বলিয়া আখ্যাত

* সাহিত্যসংসদ-প্রকাশিত রচনাবলীতে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে।

করিয়াছেন এবং কৃষ্ণকুমারী নাটক লিখিবার সময় বলিয়াছেন, **'I shall come out like a tremendous literary comet and no mistake.'** একাধিক পত্রে তিনি পণ্ডিত সমাজকে **'barren rascals'** বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। প্রাচীনপন্থী বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্র—**'the man of Krishnagar**—সম্পর্কে তিনি উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন, 'My motto is "Fire away, my boys!" The Namby Pamby Wallahs—the imitators of Bharat Chandra—*our* Pope who has

"Made poetry a mere mechanical art,
And every warbler has his tune by heart!"

may frown or laugh at us, but I say—"Be hang to them!" '

শুধু প্রাচীন পন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াই যদি মধুসূদন ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহীর অধিক মূল্য পাইতেন না। কিন্তু তিনি সাহিত্যরচনার নূতন সূত্রও দিয়াছেন এবং সেই খানেই সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার মৌলিকতা। ছাত্রাবস্থায় তিনি কবিতা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ খুব কাঁচা, কিন্তু ইহার মধ্যেই মধুসূদনের সাহিত্যিক মত আভাসিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, **'Altho' there are striking differences between these writers [Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton],—yet they resemble each other in one point—an absence of *art* and dependence upon *nature* while their successors from Pope downwards are remarkable for qualities quite the reverse....'** ইহাই রোমাণ্টিক সাহিত্যের গোড়ার কথা; কবি স্বকীয় প্রেরণার বলে কবিতা লিখিবেন, বাহিরের কোন নিয়মের দ্বারা এই প্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে গেলে ইহা খর্ব্ব হইবে। কেশবচন্দ্রকে তিনি লিখিয়াছিলেন, **'a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be'.** মধুসূদন রোমাণ্টিক কবিতা ভালবাসিতেন, কোলরিজের একটি পংক্তি—**'[A sight] to dream of, not to tell***—তিনি একাধিকবার উদ্ধৃত করিয়াছেন।

* *Christable.*

কোল্‌রিজের কাব্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ Biographia Literaria প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে আর মধুসূদন সাহিত্যবিষয়ক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাহার চল্লিশ বৎসর পরে। কিন্তু মধুসূদন কোথাও কোল্‌রিজের সমালোচনার উল্লেখ করেন নাই; তবে যে সকল সমালোচকের কথা বলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে জার্মাণ দার্শনিক-সমালোচক শ্লিগেল আছেন। ইহা হইতে মনে হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমাণ্টিক সমালোচনার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। আর একটি ছোট্ট ইঙ্গিতও খুব তাৎপর্য্যময়। সতীর্থ রঙ্গলাল সম্পর্কে সকুণ্ঠ প্রশংসা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন, **he has poetic feelings—some fancy, perhaps imagination**; ইহা হইতে দেখা যায় তিনি আধুনিক, বোধ হয় কোল্‌রিজের, সমালোচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

মধুসূদন কোল্‌রিজ প্রভৃতির কাছে কতটা ঋণী ছিলেন, রোমাণ্টিক সমালোচকদের সঙ্গে তাঁহার বিস্তারিত পরিচয় ছিল কিনা, এই সকল প্রশ্নের আলোচনা সম্ভব নয়; কারণ চিঠিপত্রে তিনি তাঁহার মতবাদের অংশবিশেষ দিয়াছেন, পূর্ণাঙ্গ শিল্পদর্শন রচনা করেন নাই। এই সব আভাস-ইঙ্গিত ও খণ্ডিত বিবৃতি হইতে যতটা জানা যায়, তিনি অপরের নিকট হইতে সাহায্য পাইলেও নিজের ভাবেই নিজের মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে, কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি অলোকসামান্য শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, সেই শক্তি আপনার গতিবেগপ্রাবল্যে নূতন নূতন সৃষ্টি সম্পাদন করে। এই শক্তিকে কোল্‌রিজ প্রভৃতি বলিয়াছেন **Imagination**, মধুসূদন বলিয়াছেন **Inspiration**। ইহা উন্মাদনার মত কবির চিত্তকে পাইয়া বসে এবং ইহাই তাঁহার রচনা বা ষ্টাইলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কোল্‌রিজের Kubla Khan কবিতাকে কেহ কেহ এই শক্তির রূপক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; যুক্তির সাহায্যে এই শক্তির ব্যাখ্যা হয় না। মধুসূদন বলিয়াছেন,—**'I am "smit with the love of sacred song." There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend!'** এই শক্তিই ভাষা রচনা করে; তাহার জন্য কোন পূর্ব্ব প্রস্তুতি বা ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না: **'The thoughts and images bring out words with themselves.—words that I never thought that I knew'.** যে সব সমালোচকেরা ভাষাকে ভাব এবং কবির প্রতিভা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মুরুব্বিয়ানার মেজাজে সমালোচনা করেন তাঁহাদের সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, **'Some other Pundits**

·········say—"হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয় নি।"·········
These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song! They regret his want of popularity, while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory such as they can form no conception of. পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই শক্তিই আপন গতিবেগপ্রাবল্যে কবিকে দিয়া কাব্য সৃষ্টি করাইয়া লয়: 'I have fits of enthusiasm that come on me, occasionally, and then I go like the mountain torrent'. অন্য এক পত্রে: 'I never study to be grandiloquent······the words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration!' এই অর্থেই 'a man's style is the reflection of his mind' এবং এই জন্যই রামনারায়ণ তর্করত্নের সঙ্গে তাঁহার কোন মিল হইতে পারে না।

কবির এই যে নৈসর্গিক প্রতিভা ইহা কবিকে অনুভূতি, বুদ্ধি ও কল্পনার উচ্চগ্রামে উন্নীত করে এবং পাঠককেও সেইভাবে প্রভাবিত করে। মধুসূদন মিল্‌টনকে divine বা ঈশ্বরোপম কবি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি আপত্তি করিয়াছেন। মিল্‌টন বুদ্ধিকে যতটা উন্নত স্তরে লইয়া যাইতে পারিতেন অনুভূতিকে ততটা স্পর্শ করিতে পারিতেন না (He elevates the mind to a most astonishing height, but he never touches the heart)। মধুসূদন কবিপ্রতিভার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার প্রভাব সমসাময়িক পাঠক ও লেখকের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে একটু বিরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে, কারণ (বর্ত্তমান লেখকের মতে) তাঁহারা প্রাচীন নিয়মের বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু মধুসূদন কবিত্ব শক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছিলেন তদ্দ্বারা তাঁহারাও উদ্দীপিত হইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বলিয়াছিলেন, 'whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape' এবং রাজেন্দ্রলাল এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও কবির তেজস্বিতা (অর্থাৎ কল্পনার প্রাবল্য, যাহাকে মধুসূদন পর্ব্বতনিঃসৃত স্রোতস্বিনীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন) এবং উদ্ভাবকতার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

মধুসূদন বিদ্রোহী, রোমান্টিক সমালোচক, কিন্তু তিনি নিজেকে ক্লাসিসিষ্ট (**classicist**) বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া নাটকে। ক্লাসিক-শব্দটিকে তিনি একটু শিথিল, আলগাভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। কখনও কখনও তিনি যেন মনে করিয়াছেন যে, গ্রীক কিংবদন্তী হইতে কাহিনী বা কাহিনীর অংশ জুড়িয়া দিলে বা গ্রীক কবিদের উপমা বা চিত্রকল্প (**imagery**) অনুপ্রবিষ্ট করাইলে রচনা ক্লাসিকধর্ম্মী হইবে। কখনও কখনও তিনি ক্লাসিক শব্দটিকে ইউরোপীয় সমালোচনার পারিভাষিক শব্দ হিসাবেই একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাই বিশুদ্ধ প্রয়োগ। যে রচনায় গ্রীক কাব্যের গঠনকৌশল ও সংযম থাকে, যাহা গ্রীক সমালোচনাতত্ত্বের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে তাহাই ক্লাসিকাল। মধুসূদন বাহিরের নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন, তিনি '**Independence of mind and thought**'-এর পূজারি, কিন্তু তিনি অ্যারিষ্টটলকে সমীহ করিতেন। অ্যারিষ্টটল নাটকের গঠন সম্পর্কে তিনটি ঐক্যসূত্রের নির্দ্দেশ দিয়াছেন—**unity of action, unity of time, unity of place** অর্থাৎ নাটকের প্লটে একাধিক কাহিনী থাকিবে না, নাটকের ঘটনা এক দিনে সংঘটিত হইবে এবং সেই সকল ঘটনার স্থান পরিবর্ত্তন করা হইবে না। প্রথম ঐক্যসূত্র মানিয়া লইলে একই নাটকে ট্র্যাজেডি ও কমেডি থাকিতে পারিবে না, কারণ ট্র্যাজিক ঘটনা ও কমিক ঘটনা এক হইতে পারে না; আর এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় ঘটনার সমাবেশ করিলে রসের ঐক্যও নষ্ট হইয়া যাইবে, এই কথা পরবর্ত্তী অ্যারিষ্টটল-পন্থীরা বলিয়াছেন। 'কৃষ্ণকুমারী'-নাটক লিখিবার সময় মধুসূদন দাবি করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই **unity of place** বা স্থানিক ঐক্য মানিয়া লইবেন এবং যতদূর সম্ভব কালের ঐক্যও। ট্র্যাজেডি ও কমেডির সম্মিশ্রণ করিয়া প্লটের ঐক্য বিঘ্নিত করা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নির্দ্দেশ দিতে পারেন নাই। তিনি একবার বলিয়াছেন, '**The only piece of criticism I shall venture upon, is this ;—never *strive* to be comic in a tragedy ; but if an opportunity offers itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan. Perhaps, you will not find many scenes in his higher tragedies in which he is *studiously* comic.**' বলা বাহুল্য এই নীতি গ্রাহ্য নহে।

কোন শ্রেষ্ঠ কাব্যেই মুখ বদলাইবার জন্য কিছু দেওয়া হয় না; যাহা কাব্যে বা নাটকে প্রবেশ করিবে তাহা ইহার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়াই প্রবেশ করিবে। শেক্সপীয়রের কিং লীয়র নাটকের বিদূষক বা হ্যামলেট নাটকের পোলোনিয়াস মাত্র agreeable variety নয় এবং তাহারা যে সব দৃশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে সেই সকল দৃশ্য গৌণ এমন কথাও বলা যায় না। মধুসূদন নিজেই এই নীতির সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, কারণ তিনি কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলিকে অপর এক পত্রে লিখিয়াছেন 'The most beautiful plays in the world are combination of Tragedy and Comedy'.

মধুসূদন যে সাহিত্যতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটু স্ববিরোধিতা আছে। তিনি সাহিত্যরচনায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার জয়গান করিয়াছেন, কিন্তু শিল্পকর্ম্মের প্রধান গুণ সংযম; অবাধ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। স্বাধীনতা সুসংযত করিয়া কিভাবে গঠনসৌষ্ঠব লাভ করা যায় তাহা সাহিত্য-শাস্ত্রের একটি মৌলিক প্রশ্ন। মধুসূদন এই প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টিতে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়াও তিনি যে অ্যারিষ্টটলকে আশ্রয় করিয়াছেন, ইহার মধ্যেই নিয়মের রাজত্বের পরোক্ষ স্বীকৃতি রহিয়াছে। মধুসূদনের কাব্যের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যে গ্রীক শিল্পকর্ম্মের গঠনসুষমা পরিলক্ষিত হয়। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন, 'It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own ;.........I shall not borrow Greek stories, rather try to write, as a Greek would have done.' এইখানে জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, তিনি গ্রীক শিল্পের আঙ্গিক সৌষ্ঠবের কথা বলিয়াছিলেন। *New Essays in Criticism*—গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই গ্রীক পদ্ধতিকে গ্রীক ভাস্কর্য্যের পদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—'the genuine sculptural style which is most typical of classic art' (ভাস্কর্য্যের রীতিই ক্লাসিক শিল্পের সামান্য লক্ষণ)। গ্রীকভঙ্গিতে লেখা ভারতীয় কিংবদন্তীমূলক মেঘনাদবধ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, এ যেন প্যাগোডার ভূমিতে গ্রীক দেবদেবীর মূর্ত্তিশোভিত এক মহান মন্দির ('a stately Pantheon on the site of a Pagoda') ।*

* মেঘনাদ বধ সম্পর্কে মধুসূদন নিজেও লিখিয়াছিলেন, 'I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with it.'

আর এক দিক হইতেও মধুসূদনকে ক্লাসিক ধর্ম্মী বা গ্রীকপন্থী বলা যাইতে পারে। গ্রীক সভ্যতার একটি লক্ষণ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা। মধুসূদনও অন্য সব কিছুকেই এই বাহ্য বলিয়া শুধু সৌন্দর্য্যের মধ্যে মনোনিবেশ করিতে চাহিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে ধর্ম্মীয় সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া শুধু সুন্দরের প্রকাশ হিসাবে দেখিয়াছেন। মেঘনাদবধ রচনার প্রাক্কালে তিনি লিখিয়াছেন,'........ though as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors...A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it' (beautiful শব্দটি লক্ষণীয়)। পরে রাবণের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণ দেখাইতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন '........ the idea of Ravan elevates and kindles my imagination, he was a grand fellow.' ইহাকেও বিদ্রোহীর শিকল-ভাঙ্গা উক্তি বলিয়া মনে করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সৌন্দর্য্যপিপাসুর সৌন্দর্য্যস্তুতি। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই গ্রীক মনোভাবাপন্ন কবি কীট্‌স বলিয়াছিলেন :

'Beauty is truth, truth beauty,'—That is all
Ye know on earth, and all ye need to know.*

* মধুসূদনের পত্রাবলী যোগীন্দ্রনাথ বসুর জীবন-চরিত ও নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি'-গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থই সহজপ্রাপ্য এবং কাহারও পক্ষে উক্তিগুলি মিলাইয়া লওয়া কঠিন হইবে না। এই কারণে পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রভৃতির উল্লেখ করি নাই। উক্তিগুলির বঙ্গানুবাদ করিলে মধুসূদনের ভাষার তীক্ষ্ণতা ও তেজস্বিতা নষ্ট হইবে বলিয়া সেই চেষ্টাও করি নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্র

॥ ১ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হয় 'সাহিত্যসম্রাট'। এই সম্মানসূচক উপাধির তাৎপর্য্য আছে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ভাণ্ডার সম্রাটের ভাণ্ডারের মতই ঐশ্বর্য্যময় আর সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র সম্রাটের মতই সাহিত্যজগতে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিয়াছেন এবং যাঁহার যাহা প্রাপ্য তাঁহাকে তাহা দিয়াছেন। মধুসূদন প্রবল প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের জোরে নিজেই নিজের অনুরক্ত পাঠকবর্গ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এমন কি রক্ষণশীল পাণ্ডিত্যের চূড়ামণি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরূপতা জয় করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষাকৃত তরুণ কবি হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার ও নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তিনি নিরপেক্ষ সমালোচনার দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, এমন কি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁহাদের যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; তাঁহার প্রশংসা নিন্দায় আতিশয্য নাই। সর্ব্বোপরি তিনি দুষ্টের দমন করিয়াছেন। যেখানে যাহা কিছু মেকি দেখিয়াছেন, ভণ্ডামি, কুরুচি, অশিক্ষিতপটুত্বের আস্ফালনের পরিচয় পাইয়াছেন সেইখানেই তীব্র কশাঘাত করিয়া সাহিত্যের মান বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার পরে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের অভ্যাগম হইয়াছে, কিন্তু আর কেহ সাহিত্যসম্রাটের পদবী দাবি করিতে পারেন নাই।

॥ ২ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় দুইটি পরস্পরবিরোধী লক্ষণ দেখা যায়। তিনি শ্রেষ্ঠ সমালোচক, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌ নহেন। যাহাকে পারিভাষিক সংজ্ঞায় সহৃদয়তা বলে তাহা তাঁহার প্রচুর পরিমাণে ছিল। নৈসর্গিক প্রতিভার বলেই হউক অথবা পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলেই হউক তাঁহার মন মুকুরের স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছিল। সাহিত্যের খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য্য সেখানে

সহজেই প্রতিবিম্বিত হইত। সেই জন্য তিনি বিশ্লেষণে ও তুলনামূলক আলোচনায় নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের খণ্ড সৌন্দর্য্যের অন্তরালেও একটি অখণ্ড রূপ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায়ই বলা যাইতে পারে, 'এ স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের পর্য্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত করিতে হইলে, তাহার অনন্ত বিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে কাব্য নাটক সমালোচনাও সেইরূপ।' (বিবিধ প্রবন্ধ—'উত্তরচরিত') বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের অট্টালিকার প্রতিটি প্রকোষ্ঠ, প্রতিটি ইষ্টকখণ্ডের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন এবং তুলনা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে সেই সৌন্দর্য্যের মূল্যায়ন করিতে পারিতেন। কিন্তু সাহিত্যের অট্টালিকার নির্ম্মাণতত্ত্ব তাঁহার কাছে স্পষ্ট হয় নাই; অনেক সময় তিনি ইহার সমগ্র রূপটি ধরিতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিত সমালোচনা অনেকাংশে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সমালোচনাপ্রবন্ধ। ভবভূতির উত্তরচরিত এই দেশের শ্রেষ্ঠ নাটকের অন্যতম, ইহা যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্যের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। ভবভূতি নাটকের আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছেন রামায়ণের উত্তরকাণ্ড হইতে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, ভবভূতি বাল্মীকির আখ্যানের খানিকটা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, বাহ্যতঃ খুব বড় মনে না হইলেও এই পরিবর্ত্তনে কাহিনীর রূপ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। রামায়ণ বিয়োগান্ত কাব্য; এখানে রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সীতা বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছিলেন এবং সেখানে যমজ পুত্র প্রসব করিয়া বহু বৎসর কাটাইয়াছিলেন। সীতা স্বীয় সতীত্ব সম্পর্কে শপথ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন রামচন্দ্র এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে মহতী সভা আহ্বান করিলেন। সেইখানে উপস্থিত হইয়া সীতা বলিলেন, 'যদি আমি মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন।' সীতার এই অপ্রত্যাশিত আবেদন শুনিয়াই পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন; সীতা পাতালে প্রবেশ করিলেন। ভবভূতির নাটকের আখ্যান এইরূপ নহে। এখানে সীতা যমজ সন্তান প্রসব করিয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পরে দেবতারা তাঁহার সতীত্বের সাক্ষ্য দিলে প্রজারা

তাহা বিশ্বাস করিল, তাঁহার লোকাপবাদ দূরীভূত হইল এবং তিনি রামের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইলেন। ভবভূতি রামচন্দ্রের চরিত্রেও প্রভূত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বাল্মীকির রাম ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস, তিনি বংশের কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্যই সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন। ভবভূতির রামচন্দ্র বংশ-গৌরবের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সীতাগতপ্রাণ, তবু তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সীতার সখী ক্ষণিক ক্রোধের মাথায় যাহাই বলুন, তিনি যশের লোভে সীতাকে নির্ব্বাসিত করেন নাই। বাসন্তী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন আপনি এই কাজ করিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'লোকে বুঝে না বলিয়া।' 'কেন বুঝে না?' বাসন্তীর এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি শুধু বলিলেন, 'তাহারাই জানে।'

এই নাটকের মূল বিষয় দুইটি প্রবল শক্তির সংঘর্ষ। একদিকে রামসীতার অপার দাম্পত্য প্রেম, যাহা নির্ব্বাসন, বিচ্ছেদ কিছুতেই কোন পক্ষে ন্যূন হয় না, অপর দিকে জনাপবাদ—যাহা দৈবের মত কঠোর, দৈবের মত অনতিক্রম্য, দৈবের মত চরাচরব্যাপী। এই জনাপবাদের চিত্রণে ভবভূতি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা লক্ষণীয়। অপবাদের স্রষ্টা বা অপবাদে বিশ্বাসী কোন চরিত্র এই নাটকে নাই। কিন্তু প্রত্যেকে ইহার প্রভাবে আচ্ছন্ন। সীতা প্রথমে একবার ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত বলিয়াছিলেন, 'সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্মপালনে ক্রটি হইতেছে না।'* কিন্তু এই ব্যঙ্গোক্তি তাঁহার অগাধ প্রেমের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। সমস্ত নাটকখানি সীতার দ্বিধাহীন, অভিযোগহীন, পতিপ্রেমে উদ্ভাসিত। সীতা যদি সত্যই মনে করিতেন যশোলিপ্সার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই রাম তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রেম ধিক্কারের দ্বারা ক্ষুব্ধ হইত; অন্ততঃ তিনি বাল্মীকির সীতার মত পৃথিবীর ভিতরেই থাকিতেন, যশোলিপ্সু, ভীরু স্বামীর সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইতে অযোধ্যায় বা জনস্থানে আসিতেন না। এইখানেই বাল্মীকির কাব্য ও ভবভূতির নাটকে প্রধান প্রভেদ। ইহা আরও লক্ষ্য করিবার মত যে, এই নাটকে নানারূপ চরিত্রের ভিড় আছে—সংসারের সাধারণ মানুষ, ঋষি ও ঋষিপত্নী, বনদেবী, পৃথিবী, পুণ্যতোয়া নদী এবং সর্ব্বশেষে দেববৃন্দ। কেহই জোর করিয়া বলেন নাই যে, রামের লোকাপবাদ অগ্রাহ্য করা উচিত ছিল

* বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'এইরূপ বাক্য কেবল সেক্সপীয়রেই পাওয়া যায়।' এই ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন মন্তব্য তাঁহার অসামান্য রসবোধ বা সহৃদয়তার পরিচয় দেয়।

অথবা তাহা অগ্রাহ্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল। বাসন্তী রামের নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করিয়াই শান্ত হইয়াছেন, লব রামের বিরূপ সমালোচনা করিয়া অল্প ক্ষণের মধ্যেই বশীভূত হইয়াছেন, অন্যান্য ঋষিদের প্রশান্ত সমর্থনের ফলে জনকের ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলিয়া উঠিয়া স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। পরে দেবতারা মধ্যস্থ হইয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে যাহা নিয়তির মত অপ্রমেয় ও নিয়তির মত দুর্ব্বার তাহা শুধু দেবতারাই প্রতিরোধ করিতে পারেন; নর-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রও তাহার কাছে একেবারে অসহায়। আধুনিক কালে আমরা গণশক্তির কথা খুব শুনি, কিন্তু প্রাচীন বা আধুনিক কোন সাহিত্যিকই অপ্রমেয়, অপ্রতিরোধনীয় জনমতের এইরূপ চিত্র আঁকিতে পারেন নাই। জনমতের দুর্ব্বার শক্তি ও রামসীতার দুর্ব্বার প্রেম—ইহাদের সংঘর্ষই ভবভূতির নাটকের বিষয়; ইহাই এখানকার ট্র্যাজেডি এবং ইহার জন্যই নাটকটি মিলনান্ত হইলেও কমেডি নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতি অঙ্কের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যাখ্যায় অনেক তাৎপর্য্যময় মন্তব্য আছে। কিন্তু তিনি নাটকটিকে সমগ্র ভাবে দেখিতে পারেন নাই। সেই জন্য তাঁহার সুদীর্ঘ সমালোচনা খণ্ডিত মনে হয়; নাটকের মূল তাৎপর্য্য তাঁহার আলোচনায় বিধৃত হয় নাই। এই কারণেই তিনি নাটকের তৃতীয় অঙ্কের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিলেও তাহাকে নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়াছেন; তাঁহার মতে, নাটকের যাহা কার্য্য, রামসীতার পুনর্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। নাটকের যাহা 'কার্য্য' আর নাটকের যাহা সারবস্তু—ইহারা অনেক সময়ই এক হয় না। হ্যামলেট নাটকের 'কার্য্য' হ্যাম্লেট কর্ত্তৃক তাঁহার পিতৃব্যের হত্যা। কিন্তু এই নাটকের আসল বিষয় হইল হ্যামলেটের এই কাজ সম্পাদনের অসামর্থ্য। বঙ্কিমচন্দ্র রামের অশ্রুপাত ও মূর্চ্ছাপ্রবণতার নিন্দা করিয়াছেন এবং রামের এই অনায়কোচিত কোমলতার জন্য ভবভূতির কালের সামাজিক অবস্থাকে দায়ী করিয়াছেন। কোমতপন্থীদের অনুসরণ করিয়া এবং আধুনিক মার্কসপন্থী সমালোচনার পুরোধারূপে তিনি বলিয়াছেন, 'রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্য-পরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি—তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা, অলসাদির দ্বারা, তাঁহাদের চরিত্র কোমল প্রকৃতির হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাঁহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই।' ভবভূতির রামচন্দ্রের চিত্র কতখানি ভবভূতির কালের পরিবেশ

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, সেই সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাসের প্রশ্নের সম্যক্ বিচার সম্ভব নয়। ভবভূতির নাটকে দেখি যে, রাম মহামানব বলিয়া দেব, ঋষি, প্রকৃতি, মানব সকলের দ্বারা পূজিত, কিন্তু তবু তিনি সব সময় মূর্চ্ছা যাইতেছেন ও বিলাপ করিতেছেন। তাঁহার এই কাতরতা নাটকে বিশেষ ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ ইহা লোকাপবাদের অমোঘ শক্তিই সূচিত করিতেছে। তাঁহার কান্না নিয়তি বা অজেয় বহিঃশক্তির কাছে সমগ্র মনুষ্যজাতির অসহায়ত্বের রূপক। বঙ্কিমচন্দ্র নাটকের সামগ্রিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিযাই দুর্ম্মুখের সংবাদ শুনিয়া রাম যে বিলাপ করিযাছেন, তৎ-সম্পর্কে এইরূপ টিপ্পনী করিযাছেন, 'ইহা আর্য্যবীর্য্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত।'

॥ ৩ ॥

এই প্রসঙ্গে সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক একটা প্রশ্নের আলোচনা করিতে হইবে। সকল কবিই কোল্‌রিজের মত সমালোচক হইবেন অথবা সমালোচকেরা অ্যারিষ্টটল বা হেগেলের মত দার্শনিক হইবেন এইরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। তবু প্রত্যেক সমালোচকেরই সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে সূক্ষ্ম, যুক্তিগ্রাহ্য অথচ সহৃদযহৃদয়সংবেদ্য ধারণা থাকা উচিত। তাহা না হইলে তাঁহার সমালোচনা খণ্ডিত হইতে বাধ্য। মরিস মরগ্যান অফিসে চাকুরি করিতেন, তিনি তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তি নহেন, পেশাদার সমালোচকও ছিলেন না। সবাই মনে করে শেক্সপীয়রের ফলষ্টাফচরিত্র কাপুরুষতার চিত্র। মরগ্যানের অন্যরূপ মনে হইত; এই ধারণাকে প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি ফলষ্টাফের চরিত্র বর্ণনা দিলেন। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণা, একেবারে **impressionistic** সমালোচনা। কিন্তু দেখা গেল এই জাতীয় সমালোচনার অন্তরালে সুসংহত সাহিত্যতত্ত্ব নিহিত আছে। চার্লস ল্যাম্ব মক্ষিকার মত সাহিত্যের ফুলে ফুলে ঘুরিয়া রস আহরণ করিতেন, তিনি তত্ত্বকথার ধার ধারিতেন না, কিন্তু তাঁহার আস্বাদন রোমান্টিক আদর্শের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছে। সমালোচককে সূত্র বা বৃত্তির সাহায্যে তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইবে এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু বিশেষ সমালোচনার পশ্চাতেও সামগ্রিক,তত্ত্ব-নির্ভর সমর্থন থাকা দরকার।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা বুদ্ধিদীপ্ত, রসবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত, কিন্তু ইহা তত্ত্বের দিক্ দিয়া দুর্ব্বল। তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন, 'কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কিনা সন্দেহ।' (বিবিধ প্রবন্ধ—'গীতিকাব্য') ঈশ্বরগুপ্তের কবিত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন, 'পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল।' কিন্তু তিনি নিজে একাধিকবার এই চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই ভাবে সাহিত্যশাস্ত্র-বিষয়ক আলোচনার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার একাধিক প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে তাঁহার তেমন ব্যুৎপত্তি ছিল না। ইহা বিশ্বনাথের অপপ্রভাবের ফল হইতে পারে। প্রাচীন অলংকারিকেরা ভাব ও রসকে আট অথবা নয় ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের হৃদয়স্থিত ভাব অনেক; তাহাদিগকে আট বা নয় শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা কঠিন। সেইজন্য পরবর্ত্তী কালে অনেক কূট প্রশ্ন উঠিল—বাৎসল্য রতির অন্তর্গত হইবে কিনা, দয়াবীর বলিয়া এক শ্রেণীর বীর কল্পনা করা যায় কিনা ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল প্রশ্ন গৌণ। রসশাস্ত্রের মুখ্য প্রশ্ন হইল কেমন করিয়া লৌকিক ভাব অলৌকিক রসে নীত হয়, কেমন করিয়া কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি সহৃদয়সমাজে সাধারণীকৃত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই আসল প্রশ্নে উপনীত হইতে পারেন নাই বলিয়া রসতত্ত্বকে বিকৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি 'রসোদ্ভাবন' কথাটি প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন, 'এ দেশীয় আলংকারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য্য। ......নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্যচিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়ী ভাব, কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের কোথাও স্থান নাই; —না স্থায়ী, না ব্যভিচারী—কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকার স্বরূপ স্থায়ী ভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। ......সুতরাং এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি। আলংকারিকদিগকে প্রণাম করি।'

প্রাচীন আলংকারিকদের পরিভাষা গ্রহণ করিয়া এবং তাহার সঙ্গে ইংরেজি মত গ্রহণ করিয়া তিনি এইভাবে সাহিত্যের ব্যাখ্যা দিয়াছেন: 'মনুষ্যের কার্য্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্বারা সৌন্দর্য্যের সৃজন, কাব্যের উদ্দেশ্য। অস্মদ্দেশীয় আলংকারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে "স্থায়ীভাব" নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজি আলংকারিকেরা তাহাকে (Passions) বলেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম।' (বিবিধ প্রবন্ধ—'উত্তরচরিত') বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে 'রসোদ্ভাবন' বলিতেছেন তাহা একেবারেই আধুনিক নহে। প্রাচীন আলংকারিক ভট্টলোল্লট নবম-দশম শতকে অনুরূপ মতবাদের প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাকে উৎপত্তিবাদ বলিয়া অভিহিত করা হইত। সেই মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই যুক্তিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বলিতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই ইহাকে অসম্পূর্ণ মনে করিতেন; সেই জন্যই তিনি কাব্যসৃষ্টির অন্য ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। এই 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধেই তিনি বলিয়াছেন, কাব্যের প্রধান গুণ স্বভাবানুকারিতা। কিন্তু শুধু স্বভাবের নকল করিলেই কাব্য সুন্দর হইবে না। তাঁহার মতে টমসনের ঋতুবর্ণনা ও কালিদাসের ঋতুবর্ণনা উভয়ই আদ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, এবং স্বভাবানুকারী, কিন্তু ইহারা কোনটিই প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না —কেননা তদুভয় মধ্যে সৃষ্টিচাতুর্য্য নাই।' সৃষ্টিচাতুর্য্য বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র কি বুঝিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কারণ তাঁহার চিন্তার মধ্যেই খানিকটা অস্পষ্টতা ছিল। মনে হয় তিনি সৃষ্টিচাতুর্য্য বলিতে অভিনবত্ব বুঝিয়াছেন; যাহা স্বভাবে নাই তাহার সংযোজন করিতে হইবে। কবির কাব্য স্বভাবানুকারী হইবে, আবার স্বভাবাতিরেকীও হইবে। দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব শক্তির বিচার প্রসঙ্গেও তিনি বলিয়াছেন, প্রথম চাই Realism; তারপর চাই সৃষ্টিক্ষমতা যাহার দ্বারা idealize করিতে হইবে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন অনুত্থাপিত রহিয়া গেল, Realism ও Idealism এর মধ্যে সীমারেখা কেমন করিয়া টানিব এবং কেমন করিয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কাব্যের আদর্শলোকে উন্নীত হইবে? বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও এই সমস্যা সম্পর্কে কিছুটা সচেতন ছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, 'সৃষ্টিক্ষমতামাত্রই প্রশংসনীয় নহে। অনেক ইংরাজী আখ্যায়িকালেখকের রচনামধ্যে নূতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাপি ঐ সকলকে

অপকৃষ্ট গ্রন্থমধ্যে গণনা করিতে হয়। কেননা, সেই সকল সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা নহে। (বিবিধ প্রবন্ধ—'উত্তরচরিত')

এইভাবে এক বিচিত্র চক্রকের সৃষ্টি হইল। আমরা কাব্যসৌন্দর্য্যের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। ক্রমে বুঝিলাম যে, কাব্যকে স্বভাবের অনুকরণ করিতে হইবে, তারপর শুনিলাম স্বভাবানুকারী হইলেই সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইবে না। তাহার মধ্যে স্বভাবাতিরেকী সৃষ্টিকৌশল থাকা চাই। তারপর দেখিতেছি সৃষ্টিকৌশল থাকিলেই চলিবে না; তাহাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইতে হইবে। এইভাবে যেখানে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম সেইখানেই ফিরিয়া আসিলাম।

এই আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। স্বভাবানুকারিতায় যে সৌন্দর্য্য পাওয়া যায় তাহাতে 'চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্য্যের কি?' ইহাতে তেমন কোন লাভ হইতে পারে না, এবং ইহার দ্বারা যে চিত্তরঞ্জন হয় তাহা ক্ষণিক আমোদ মাত্র, উচ্চাঙ্গের আনন্দ নয়। এখানে একটি নূতন সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। শুধু চিত্তরঞ্জনই কাব্যের লক্ষ্য হইতে পারে না। 'যদি চিত্তরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেন্থামের তর্কে দোষ কি? কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়।' সুতরাং চিত্তরঞ্জনের অধিক কিছু প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই যুক্তি ভ্রান্ত। যাঁহারা কাব্যচর্চ্চার আনন্দের কথা বলেন তাঁহারা ইহাও বলেন যে, ইহা লৌকিক হর্ষ হইতে পৃথক বস্তু। 'তোমার পুত্র হইয়াছে।'—এই কথা শুনিলে যে পুলক সঞ্চারিত হয় আর কাব্যপাঠে যে আনন্দ হয় তাহা এক জাতীয় জিনিষ নহে। যাহাকে বঙ্কিমচন্দ্র **idealize** করা বলিয়াছেন, তিনি তাহার পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহার একটি কারণ প্রাচীন আলংকারিকদের রচনার সঙ্গে তাঁহার সম্যক পরিচয় ছিল না। তিনি দূর হইতেই তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যের আনন্দের অন্তরালে অন্য উপযোগিতার সন্ধান করিয়াছেন। বাংলার নব্য লেখকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন, 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।' লাতিন কবি-সমালোচক হোরেস্ এই মত ইউরোপে প্রবর্ত্তিত করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। যাহা হউক তিনি নব্য লেখকদিগকে

উপদেশ দেওয়ার সময় এই দুই উদ্দেশ্যকে পৃথক করিয়া দেখিলেও অন্যত্র ইহাদিগকে সংযুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন। ইহা পরিণত বিচারশক্তির ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু একটু পরেই দেখা যাইবে যে, এখানেও সেই চক্রেকেরই সৃষ্টি হইয়াছে; 'ধর্ম্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলিযাছেন, 'ঈশ্বরের সৃষ্টি অপেক্ষা কোন্ কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দব।···সাহিত্যের আলোচনায সুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমাব উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওযা উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে, কেননা, সাহিত্য সত্যমূলক।' 'ধর্ম্ম ও সাহিত্য'-প্রবন্ধটি 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হইযাছিল, এই পত্রিকার উদ্দেশ্যই ছিল ধর্ম্মপ্রচার। সুতরাং এই পত্রিকায ধর্ম্মের প্রাধান্য জোরালভাবে প্রকাশিত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। অপর একটি প্রেরণাও বঙ্কিমচন্দ্রকে এই পথে প্রধাবিত করিযাছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মপরাযণ হিন্দু, তবু নিরীশ্বর কোমত দর্শনও তাঁহার উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বেন্থাম প্রভৃতির হিতবাদ কোমতদর্শনের অন্তর্গত। কোমতপন্থীদের মতে মানুষের সকল কর্ম্ম, সকল চিন্তা—সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষিকর্ম্ম, শিল্পকর্ম্ম—একসূত্রে বাঁধা এবং সকল কর্ম্মেরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের হিতসাধন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, 'সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিযমের ফল।···কোমত বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।' (বিবিধ প্রবন্ধ—'বিদ্যাপতি ও জয়দেব') সাহিত্য যদি কেবল দেশের অবস্থার প্রতিকৃতি হয় তাহা হইলে তাহার মাধ্যমে সেই অবস্থার উন্নতি করার কথা সহজেই মনে আসিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সাহিত্যে নীতির প্রাধান্য দিয়াছেন তাহার ইহা অপেক্ষাও গভীর ব্যক্তিগত কারণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বড় স্রষ্টা ছিলেন; জগৎসিংহ হইতে সত্যানন্দ, আয়েষা হইতে দেবী চৌধুরাণী প্রফুল্ল—ইহারা সবাই আদর্শ নায়ক ও নায়িকা। এই জাতীয় শিল্পকর্ম্ম বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুরূপ সাহিত্যচিন্তায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। দার্শনিক চিন্তা ও স্বীয় সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণার সমন্বয় করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সোজাসুজিভাবে নীতিশিক্ষা দেওয়া কাব্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে হিতোপদেশ রঘুবংশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য হইত, শকুন্তলা কথামালা হইতে অপকৃষ্ট হইত। তাঁহার বক্তব্য আরও

একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিতে হইবে : 'কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিবাক্যের দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। ...কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তিনি এক সর্ব্বজনমনোহর পবিত্র চিত্র সৃজন করিলেন। সর্ব্বজনমনোহর, তাহাতে চোরেরও মন মুগ্ধ হইবে।...কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকর্ত্তা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন। কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎকার্য্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে তাহার সৃষ্টির দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য্য; অতএব সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।.. যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবের অতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়।' (বিবিধ প্রবন্ধ—'উত্তরচরিত')

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য্য ও নীতি, বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নিজের সৃষ্টি এই সমন্বয়ের সাক্ষ্য দেয়। তাহার মধ্যে অধিকাংশ জায়গায় স্বভাবানুকারিতা ও স্বভাবাতিরেক, নীতি ও সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টি ও সমালোচনা এক বস্তু নহে। সমালোচনার ক্ষেত্রে এই মতের বিরুদ্ধে একাধিক আপত্তি উত্থাপিত হইবে। প্রথমতঃ, সার্থক সাহিত্য স্বভাবানুকারিতা ও স্বভাবাতিরিক্ততা, বাস্তব ও আদর্শ দুইটি পৃথক বস্তুর সম্মিলন করে না; তাহারা বাগর্থ বা পার্ব্বতীপরমেশ্বরের মতই অভিন্নমূর্ত্তিতে দেখা দেয়। কোন্ শক্তির বলে কোন্ কাব্য একই সময়ে স্বভাবের প্রতিবিম্ব এবং আদর্শলোকের ছায়া বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহার সম্পর্কে কোন আভাস দিতে না পারিলে এই সমন্বয়ধর্ম্মী মতবাদ গৃহীত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 'সর্ব্বজনমনোহর' 'সুন্দর'—এই সকল শব্দ স্ব-বোধক, question-begging। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, কবি সর্ব্বজনমনোহর পবিত্র চিত্র সৃষ্টি করিবেন। পবিত্রতা ধর্ম্মশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্রের কথা; তথা হইতে পবিত্রতার সংজ্ঞা আমরা গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু সর্ব্বজনমনোহরত্ব সাহিত্যশাস্ত্রের সমস্যা; ইহা স্বীকার করিয়া লইলে চলিবে না, অপর শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিলে চলিবে না, সাহিত্যসমালোচককেই ইহার ব্যাখ্যা দিতে হইবে। বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পরই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তাঁহার অসামান্য সৃজনী প্রতিভা ও সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তাঁহার যথোপযুক্ত পাণ্ডিত্যও ছিল। কিন্তু সাহিত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে তিনি পারেন নাই; শেষ পর্য্যন্ত স্বশব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রশ্নটিকে এড়াইয়া গিয়াছেন।

॥ ৪ ॥

সাহিত্যের স্বরূপ বা সৌন্দর্য্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সমালোচনাক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব অপরিসীম। তাঁহার সৃষ্টির ঐশ্বর্য্য এত বিপুল, রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব এত দেদীপ্যমান যে সমালোচনায় তাঁহার দানকে আমরা যথোচিত মর্য্যাদা দিই না। কিন্তু এখানেও তাঁহার দান এত প্রচুর যে তাঁহাকে যে কোন শ্রেষ্ঠ সমালোচকের সমকক্ষ মনে করা যাইতে পারে। তিনি কোল্‌রিজের মত দার্শনিক ছিলেন না; কাজেই কবিপ্রতিভার সামগ্রিক রূপ তিনি ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার শক্তির প্রকাশ পাইয়াছে তুলনামূলক বিশ্লেষণে —একই শ্রেণীর ব্যক্তি বা বস্তুর প্রভেদ নির্ণয়ে। প্রথমেই তিনি সূক্ষ্মশিল্পের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা উদাহৃত হইতে পারে।

'সৌন্দর্য্য সৃজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী—বর্ণ, আকার, গতি, রব ও অর্থযুক্ত বাক্য।

যে সৌন্দর্য্যজননী বিদ্যার বর্ণমাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে।

যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতিসৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য্য।

যে সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, সে বিদ্যার নাম নৃত্য।

রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত।

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য।

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা। ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া "সূক্ষ্মশিল্প" নাম দেওয়া হইয়াছে।'

(বিবিধ প্রবন্ধ—'আর্য্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প')

ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট হয় নাই। মোটের উপর বলা যাইতে পারে শিল্পের এইরূপ পরিচ্ছিন্ন শ্রেণীবিভাগ খুব বেশি দেখা যায় না। তবুও ইহা খুব মৌলিক এমন কথা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র অ্যারিষ্টটল প্রদর্শিত রীতি অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি নাটক, মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের মধ্যে যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন সেইখানে তিনি অ্যারিষ্টটলকেও অতিক্রম করিয়াছেন। কথাটার একটু বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাহা হইলে শুধু যে বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিকতাই প্রমাণিত হইবে তাহা নহে; সাহিত্যালোচনার পথও সুগম হইবে। অ্যারিষ্টটল সূক্ষ্মশিল্পকে **mimesis** বা অনুকরণের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। এক শিল্প হইতে আর এক শিল্পে যে প্রভেদ হয় তাহার তিনটি কারণ: (১) সামগ্রীর পার্থক্য (২) অনুকৃত বিষয়বস্তুর পার্থক্য (৩) অনুকরণের ভঙ্গির পার্থক্য। মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি —উভয়ই কাব্য। উভয়ের অবলম্বিত 'সামগ্রী'—অর্থপূর্ণ শব্দ বা বাক্য। উভয়ই উচ্চাঙ্গের নরনারীর কার্য্যকলাপের চিত্র পরিবেশন করে; সুতরাং দ্বিতীয় কক্ষ্যায়ও কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য শুধু ভঙ্গিতে—মহাকাব্যে কবি কাহিনীর বর্ণনা করেন এবং নাটকে পাত্রপাত্রীগণ নিজেরাই নিজেদের কথা বলে। যেহেতু শিল্পকর্ম্ম জীবনের **mimesis** বা অনুকরণ, কাব্য যতটা অনুকরণধর্ম্মী হইবে ততই তাহা উৎকর্ষ লাভ করিবে। সেই হিসাবে ট্র্যাজেডি মহাকাব্য হইতে শ্রেষ্ঠ এবং যে মুহূর্ত্তে ট্র্যাজেডি ও কমেডির মত উন্নত ধরণের কাব্যপ্রকরণের উদ্ভব হইল, সেই মুহূর্ত্তে কবিরা মহাকাব্য বা বিদ্রূপাত্মক কাব্য ছাড়িয়া প্রতিভা ও অভিরুচি অনুসারে ট্র্যাজেডি ও কমেডি লিখিতে মনোনিবেশ করিলেন। এই প্রসঙ্গে অ্যারিষ্টটলের আর একটি বিতর্কসঙ্কুল মন্তব্যের অবতারণা করিতে হইবে। তিনি মনে করেন কাব্য প্রধানতঃ মানুষের কার্য্যের অনুকরণ, তাহার চরিত্র, চিন্তা বা ভাবের নহে। সুতরাং এখানে প্লটেরই প্রাধান্য, চরিত্রের স্থান গৌণ এবং চরিত্রের সেই অংশই তিনি বিচার করিয়াছেন যাহা তাহার কর্ম্মের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে জড়িত। বোধ হয় এই কারণেই তিনি গীতিকাব্যকে তাঁহার আলোচনা হইতে প্রায় বাদই দিয়াছেন। প্রশংসামূলক খণ্ড কবিতা হইতে মহাকাব্যের উদ্ভব এবং নাটকে গীত সন্নিবিষ্ট হয়, মহাকাব্যে হয় না—এইটুকু বলিয়াই তিনি থামিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই তিন প্রকরণের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা অ্যারিষ্টটলের

আলোচনা হইতে অনেক সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী। তিনি প্রথমেই গীতি-কবিতার সঙ্গে অন্য দুই প্রকরণের পার্থক্য সূচিত করিয়াছেন। কথোপকথনের সাহায্যে নাটক পরিবেশিত হয়, কিন্তু কথোপকথন তাহার প্রাণ নহে। ***Comus, Manfred, Faust*** 'নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রন্থিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে।' মানুষের হৃদয়ে নানা প্রকার ভাব থাকে। তাহার মধ্যে কতকগুলি কথোপকথন ও কার্য্যের দ্বারা ব্যক্ত হয় আর কতকগুলি এইভাবে ব্যক্তব্য নহে। যাহা কার্য্য ও কথোপকথনের দ্বারা ব্যক্তব্য তাহা নাটক ও মহাকাব্যের বিষয়, আর 'ভাবোচ্ছ্বাসের স্ফুটতামাত্র যাহার বিষয়' (অর্থাৎ যাহা কথা ও কার্য্যে ব্যক্তব্য নহে) তাহাই গীতিকাব্য। 'সত্য বটে যে, গীতিকাব্য লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।' (বিবিধ প্রবন্ধ—'গীতিকাব্য')।

নাটক ও মহাকাব্যের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে সীমারেখা টানিয়াছেন সেইখানে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সমধিক প্রকটিত হইয়াছে। নাটক ও মহাকাব্য উভয় প্রকরণেই উপাখ্যান থাকে, কিন্তু উভয় স্থানে উপাখ্যানের সমান মূল্য থাকে না। নাটকে উপাখ্যান বা প্লট মুখ্য নহে। কথোপকথনের সাহায্যে পরিবেশিত হয় বলিয়াই নাটকে বক্তা চরিত্রগণ প্রাধান্য পাইয়া থাকে। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্র অ্যারিষ্টটল অপেক্ষা অগ্রগামী হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, 'নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চরিত্র; রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যান কাব্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রকার। সে উদ্দেশ্য কার্য্যপরম্পরার সরস বিবৃতি। কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করিতে চাহেন, সে সকল কার্য্য করিবার সময় কে কি ভাবিল, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজন তাদৃশ বলবৎ নহে। কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবৎ। নাটককারের নিকট হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহি। সুতরাং তাঁহাকে চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়।' (বিবিধ প্রবন্ধ—'উত্তরচরিত') নাট্যকার হিসাবে শেক্সপীয়র সকলের চেয়ে বড়—কালিদাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রধান কারণ—অতি আধুনিক শেক্সপীয়র সমালোচকেরা আপত্তি করিবেন—তিনি হৃচ্চরিত্র সুস্পষ্ট করিতে পারিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনার মধ্যে তুলনার অবতারণা করিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত কিনা ইহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু তিনি এই তুলনার

সাহায্যে নাটক ও উপাখ্যানের পার্থক্য প্রকট করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মতে, শেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট ও কালিদাসের শকুন্তলা মূলতঃ কাব্য, নাটক নহে ; কিন্তু ওথেলো সর্ব্বাংশে নাটকোচিত লক্ষণসমৃদ্ধ। 'ওথেলো নাটক, শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেস্‌দিমোনা চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য।...শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না ; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র, দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত ; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।'* (বিবিধ প্রবন্ধ — 'শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা')

অ্যারিষ্টটলের সপক্ষে বলা যাইতে পারে যে তিনি চরিত্রপ্রধান আধুনিক, বিশেষ করিয়া শেক্সপীয়রীয়, নাটক দেখেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য পরবর্ত্তী সমালোচকদের সেই সুবিধা ছিল ও আছে। কিন্তু অ্যারিষ্টটল যে সকল নাটক ও মহাকাব্যের উপর ভিত্তি করিয়া পোয়েটিক্স গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সেই সকল গ্রন্থের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের মতের সমর্থন পাওয়া যাইবে। ঈস্কাইলাস বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাটকগুলি হোমারের মহাভোজের টুক্‌রা মাত্র। কিন্তু যে সকল নাটকে তিনি হোমারের মহাকাব্য হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের বিচার করিলেই বঙ্কিমচন্দ্রের মতের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাইবে। অ্যাগামেম্‌ননের স্ত্রীর হাতে মৃত্যু এবং পরে পুত্রকৃত সেই হত্যার প্রতিশোধের কাহিনী ঈস্কাইলাস গ্রহণ করিয়াছেন হোমারের মহাকাব্য হইতে। কিন্তু হোমার শুধু কাহিনীটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইস্কাইলাসের নাটকের গুণ এই যে, তিনি কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। যে বর্ণনভঙ্গিকে অ্যারিষ্টটল কাব্য বিভাগের মানদণ্ড করিয়াছেন তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র নাটক ও মহাকাব্যের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ভেদরেখা টানিয়াছেন। নাটকে পাত্রপাত্রীরা

* হৃদ্চরিত্রের উপর জোর দিলেও বঙ্কিমচন্দ্র নাটকে ক্রিয়া ও চরিত্রের গভীর সংযোগের কথা কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই: 'শেক্সপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না।' (বিবিধ প্রবন্ধ—'গীতি কবিতা')

নিজেরাই বক্তা, তাহারাই বর্ণিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, সুতরাং তাহাদের চরিত্র বিকশিত হইবার সুযোগ পায়; এই সুযোগ উপাখ্যাননির্ভর মহাকাব্যে বা অস্ফুটভাবভারাক্রান্ত গীতিকাব্যে নাই।

॥ ৫ ॥

সমালোচনা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম অবদান—বৈষ্ণব কবিতার নূতন মূল্যায়ন: বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের গ্রন্থকারেরা রসশাস্ত্রের পরিভাষা গ্রহণ করিয়া ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতেন। সাধারণ বৈষ্ণবেরা পদাবলী সাহিত্যকে ভক্তিরসের ব্যাখ্যান বলিয়া তখনও মনে করিতেন, এখনও মনে করেন। সেইজন্যই এখনও 'শ্রাদ্ধ বাসরে' লীলাকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধী তাঁহারা এই সাহিত্যকে পরস্ত্রীতে আসক্ত নাগর ও কুলত্যাগিনী ব্যভিচারিণী নায়িকার রতিলীলার অশ্লীল বর্ণনা বলিয়া তুচ্ছ মনে করেন। মধুসূদনই প্রথমে ধর্ম্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রাধাকে শুধু সাহিত্যের নায়িকা হিসাবে পরিকল্পনা করেন। তিনিও রাধার নূতন পরিকল্পনা করিয়াই থামিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আরও বেশী ব্যাপক এবং তাঁহার সমালোচনা সম্পূর্ণ তথ্যনিষ্ঠ। তাঁহার নিরপেক্ষতাও মধুসূদনের নিরপেক্ষতা হইতে বিভিন্ন। যে অপেক্ষিত অনপেক্ষাকে সমালোচনার প্রধান গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার সম্যক্ পরিচয় এই সমালোচনায় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যকে দেখিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে পরিচায়িত হইয়াছেন তাহার মধ্যে তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট স্তর দেখিতে পাইয়াছেন। সাহিত্যবিচারে টেনের সূত্রের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই সূত্র নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। এই সূত্রানুসারে কাব্যবৈচিত্র্যের কারণ তিনটি—জাতীয়তা (race), সাময়িকতা (the moment), এবং লেখকের স্বাতন্ত্র্য (the man)। 'কৃষ্ণচরিত্র'-প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে তিনি প্রথম ও তৃতীয়টি বাদ দিয়া শুধু সাময়িকতার কথাই বলিবেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই প্রবন্ধে—এবং অন্যত্র—তিনি তিনটি কারণেরই আলোচনা করিয়াছেন এবং যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ তাঁহার সমালোচনার প্রধান গুণ

এখানে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সাহিত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন—প্রথমে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ, তারপর শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ, তারপর বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদের শ্রীকৃষ্ণ, তিন স্তরেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলিয়া পূজিত—ইহার মধ্যে আর্য্যজাতির চিরন্তন বিশ্বাসের ছাপ রহিয়াছে। কিন্তু প্রাথমিক সত্য মানিয়া লইলেও তিনটি স্তরে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। প্রথম স্তরে শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতিবিশারদ, তিনি ভারতসংগঠনে ব্যস্ত। দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণও দার্শনিক আইডিয়ার প্রতীক। তিনি পরম পুরুষ; পরা প্রকৃতি রাধার সঙ্গে সংযোগ ও বিয়োগের দ্বারা তিনি মুক্তির সন্ধান দেন। তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ লীলাচঞ্চল নায়ক। সাহিত্যে এই স্তর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্ত্তনের সংযোগ আছে। এমন কি ভৌগোলিক পরিবেশও ইহার সঙ্গে অসম্পৃক্ত নহে।

তিন স্তরের সাহিত্যই কাব্যগুণসমৃদ্ধ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যবিচার করিয়াছেন শুধু তৃতীয় স্তরের বৈষ্ণবকাব্যের। এই বিচারে তাঁহার নীতি-বোধের পরিচয় মিলে, কিন্তু তাহা তাঁহার নিরপেক্ষ সাহিত্যবোধকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। বরং জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্যের তিনি যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার নীতিবোধ ও সাহিত্য-গত অন্তর্দৃষ্টির আশ্চর্য্য সমন্বয় হইয়াছে। জয়দেবের কাব্যের পদলালিত্য, শ্রুতিমাধুর্য্য ও আদিরসপ্রাধান্য সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত। জয়দেবের কবিতা অপূর্ব্ব মোহের সঞ্চার করে, তবু অনেকের মতে ইহা শ্রেষ্ঠ কাব্য নহে। কেহ কেহ মনে করেন ইন্দ্রিয়পরতাই ইহার অপকৃষ্টতার কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি আরও প্রসারিত, বিশ্লেষণ আরও গভীর। তিনি মনে করেন, ইন্দ্রিয়পরতা একটি লক্ষণ মাত্র; আসল কারণ খুঁজিতে হইলে আরও তলাইয়া দেখিতে হইবে। জয়দেব শুধু বহিঃপ্রকৃতির শোভায় আকৃষ্ট; তাই তাঁহার নায়ক শুধু বিলাসরসিক নায়ক, আর রাধিকা শুধু প্রণয়বিহ্বলা নায়িকা। জয়দেব রাধিকার চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতার চিত্র আঁকিতে পারেন নাই; তাহাকে বাহির হইতেই দেখিয়াছেন। এই কারণেই তিনি যে প্রণয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বাহ্য ইন্দ্রিয়জ প্রেমের চিত্র; তাহার মধ্যে প্রগাঢ়তার অভাব। বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি অতিশয়িত প্রীতি কবিতার

পদবন্ধনেও প্রতিফলিত হইয়াছে। জয়দেবের গান 'কোমলতাপূর্ণ', 'মুরজবীণা-সঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি'। পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথও এই মতেই সায় দিয়াছেন। কালিদাসের 'আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং' ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করিয়া তিনি জয়দেবের বহুবিশ্রুত পদলালিত্যের সীমিত আবেদনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন সমালোচক প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্য্যে প্রীতির সঙ্গে অপ্রগাঢ়তা ও ইন্দ্রিয়পরতার সংযোগ লক্ষ্য করেন নাই। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার মৌলিকতা।

বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের কবিতা জয়দেবের কবিতা হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ সেইখানে বাহ্য প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি থাকিলেও প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে অন্তঃপ্রকৃতিকে। 'বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত।' বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি কাব্যে উভয়কেই যথাযোগ্য স্থান দিতে হইবে। যদি বহিঃপ্রকৃতিকে একেবারে তুচ্ছ করা যায়, তাহা হইলেও কবিতার অঙ্গহানি হইবে। এই জাতীয় খণ্ডিত কবিপ্রতিভার উদাহরণ—পোপ ও জনসন। ('মানস-বিকাশ'-গ্রন্থের সমালোচনা) এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির কবি; নিসর্গশোভাকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কবিতা লিখিয়াছেন তিনি বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় কবি বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু তাঁহার অনেক কবিতা রসোত্তীর্ণ হয় নাই। অন্য কোন কবির কাব্যেই বোধ হয় উৎকৃষ্ট কাব্য ও নিকৃষ্ট কাব্যের এমন ব্যবধান দেখা যায় না। এই তারতম্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র একটি অভিনব ইঙ্গিত দিয়াছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির কবি; কিন্তু তিনি প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপর যথেষ্ট দৃষ্টি না দিয়া শুধু তাহার আধ্যাত্মিক আবেদনের উপর জোর দিয়াছেন। প্রকৃতির কবি প্রকৃতিকেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অনেক কাব্যও খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য সম্বন্ধে আর একটি যে উক্তি করিয়াছেন তাহা তাঁহার সমালোচনাশক্তির পরিচয় দেয়। কাব্য হইতে আমরা দুইটি জিনিষ চাই—প্রগাঢ়তা বা তীব্রতা এবং বিস্তৃতি বা জটিলতা। যেখানে এই দুইটি গুণের সমন্বয় হইয়াছে সেইখানে আমরা উত্তমোত্তম কাব্য পাই, কিন্তু যেখানে ইহার একটির আতিশয্যে অপরটি ম্লান হইয়া গিয়াছে সেইখানে কাব্য অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। আধুনিক কবিরা নানা বিষয় জানেন, কবিতায়

নানা বিষয়ের প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। ইহাতে বিষয়বস্তু বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রগাঢ়তা বা তীব্রতার হানি হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের উক্তি উদ্ধারযোগ্য : 'পূর্ব্ব-কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্ত্তী যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক বা নিকটস্থ তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অনুকরণীয় চিত্রসকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ।… তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুপ্রসারিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদের কবিতাও দূরসম্বন্ধপ্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়, মধুসূদন, হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, বা বিচিত্র কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে।' চণ্ডীদাস ও রবীন্দ্রনাথ, ডান্ ও এলিয়টের কবিতার তুলনা করিলেও অনুরূপ পার্থক্য অনুমিত হইবে।

॥ ৬ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়াছেন—উত্তরচরিত, দীনবন্ধু মিত্রের ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী ও সমালোচনা। শেষোক্ত দুইটি প্রবন্ধ অনেকাংশে সমগোত্রীয়। এই দুই প্রবন্ধে তিনি এমন দুইজন কবির কথা লিখিয়াছেন যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। এই দুই প্রবন্ধে তিনি কাব্য অপেক্ষা কবিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহার কারণ দেখাইতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন, 'কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে?……কবিতা, কবির কীর্ত্তি……যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে'। ('ঈশ্বর গুপ্ত') এই মতটি যুক্তিসহ কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথমতঃ, কবির মনের কোন্ অংশের ছায়া কাব্যদর্পণে আপতিত হয়? শেক্‌স্‌পীয়র শেষ বয়সে বিত্তশালী হইয়া অর্থব্যয় করিয়া আভিজাত্যের খেতাব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, জেন্টলম্যান হইয়াছিলেন। আবার শেষ বয়সের লেখা দি উইনটারস টেল নাটকে জেন্টলম্যান হওয়ার হীন আকাঙ্ক্ষা লইয়া ব্যঙ্গ

করিয়াছেন। এই দুইটি বিপরীত ব্যাপারের কোন্‌টিতে শেক্সপীয়রের প্রকৃত চরিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে? মনে করা যাইতে পারে যে, কবি শেক্সপীয়র মানুষ শেক্সপীয়রকে লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। এইখানে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নে আসিয়া পড়িলাম। স্বীকার করিলাম কাব্যে কবির বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়; কিন্তু কবি যে শক্তির বলে বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতাকে কাব্যে রূপান্তরিত করেন, কাব্যালোচনায় সেই শক্তির বিশ্লেষণই মুখ্য ব্যাপার। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর গুপ্ত মোচাকে মোচাই বলিতেন, কেলাকা ফুল বলিতেন না। কিন্তু যিনি মোচাকে কেলাকা ফুল বলেন, তিনিও কিন্তু মোচা ও ফুল, উভয়ের সঙ্গেই পরিচিত। আর যিনি মোচাকে মোচা বলিয়াই কাব্যময় রূপ দিতে পারেন, তিনিও এমন ভাবে বলেন যে মোচা যাবতীয় লৌকিক বস্তু হইতে পার্থক্য লাভ করে। জীবন ও কাব্যের সম্পর্কের সূত্র এই গভীরতর স্তরে নিহিত আছে এবং এইখানেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সূত্রটির সন্ধান যে একেবারে দিতে পারেন নাই তাহা নহে। তবে দেখা যায় যে অনেক সময়ই তাঁহার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা, উক্তি দ্বিধাগ্রস্ত। দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ববিচার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'এটুকু গেল তাঁহার **Realism,** তাহার উপর **Idealize** করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল।' কিন্তু কবি বাস্তবের উপর আদর্শবাদের প্রলেপ যোগ করিয়া দেন না। পার্ব্বতীপরমেশ্বরের মতই **Real** ও **Ideal** অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত হইয়া কবির মনে প্রতিভাত হয়—উভয় শ্রেণীর কবির মধ্যেই বাস্তবানুভূতি ও বাস্তবকে রূপান্তরিত করিবার শক্তি একই সঙ্গে বিরাজ করিবে, যদিও ইহা সত্য যে, কোন কবির বাস্তবের সঙ্গে নৈকট্য বেশি থাকে, আবার কাহারও মধ্যে বাস্তবাতিরিক্ত আদর্শের প্রাবল্য দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দীনবন্ধুর কবিত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া এই দুই প্রকারের রচনার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করিয়াছেন। দীনবন্ধু যে নিমচাঁদ, রাজীব মুখোপাধ্যায় এবং জলধর ও জগদম্বার চিত্র আঁকিয়াছেন সেইখানে তাঁহার সৃষ্টি বাস্তব অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অ-লৌকিক রসে সঞ্জীবিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহনের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বাস্তবের চিত্র নয়, নিছক কল্পনা; তাই সেই সকল সৃষ্টি রসোত্তীর্ণ হয় নাই।

স্বাধীন বুদ্ধি যখন বিশ্লেষণ করিতে করিতে সত্যানুসন্ধানে অগ্রসর হয় তখন যে সূত্র লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, অনেক সময় তাহা সংশোধন, পরিবর্ত্তন

এমন কি পরিবর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। ইহা বুদ্ধির অভিযানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায়ও এই পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্র সমগোত্রীয় লেখক, কবি হিসাবে দীনবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহার কারণ, (বঙ্কিমচন্দ্রের মতে) 'গুরু ঈশ্বরচন্দ্র অপেক্ষা দীনবন্ধুর অধিক সৃষ্টিক্ষমতা ছিল। 'উত্তরচরিত'-প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টিক্ষমতার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহার সম্যক্ পরিচয় দিতে পারেন নাই। সেখানে ইহাকে অভিনবত্বের প্রতিশব্দ হিসাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু দীনবন্ধুর কবিত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি এই শক্তির স্পষ্ট গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কবির সৃষ্টিক্ষমতা প্রকাশিত হয় জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টিতে। বার্ণার্ড শ' এই শক্তিটিকে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরসতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি নিজের কতকগুলি মত প্রকাশ করিবার জন্য নাটক লিখি এবং চরিত্রগুলি আমার কথাই বলিবে এই উদ্দেশ্য লইয়াই তাহাদের সৃষ্টি করি, কিন্তু নাটক একটু অগ্রসর হইলেই দেখি তাহারা তাহাদের কথা বলে, তাহাদের নিজেদের মত কাজ করে **and I have no more control over them than I have over my wife!** দীনবন্ধুর জলধর, জগদম্বা, নিমচাঁদ প্রভৃতি ইহার 'উজ্জ্বল উদাহরণ'।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সৃষ্টিক্ষমতার সূত্র খুঁজিয়াছেন দীনবন্ধুর অপরিসীম সহানুভূতিতে। দীনবন্ধু ভালমন্দ সকল প্রকার চরিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেন এবং এই সর্ব্বব্যাপিনী, স্বাভাবিকী সহানুভূতির জন্য জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। ইহার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ নাটক 'নীলদর্পণ'। 'কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি।.........নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য [সমাজসংস্কার] হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।' কিন্তু এই যুক্তি অসম্পূর্ণ; শুধু সহানুভূতি কাব্যরূপে প্রকাশ পায় না যেমন অন্য কোন অনুভূতিও শুধু স্বীয় শক্তিতে কাব্যরচনা করিতে পারে না। ভলটেয়ার বলিয়াছেন যে, মন্ত্রবলে ইঁদুর মারা যায়, কিন্তু সেই মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ সেঁকো বিষ ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। সহানুভূতির দ্বারা কাব্য রচনা করা যায় যদি সেই সঙ্গে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অর্থাৎ কাব্য রচনার ক্ষমতা থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই নূতন সূত্রের সন্ধান দিয়াছেন। কবির 'স্বাভাবিক' সহানুভূতি থাকে থাকুক, কিন্তু তাঁহার

স্বাধীনা অর্থাৎ স্বেচ্ছাসঞ্চারিণী কল্পনা থাকা প্রয়োজন, ইহার বলেই তিনি সকল প্রকার চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ভাঙ্গিয়া, পিষিয়া, মথিত করিয়া নূতন নূতন বস্তুর সৃষ্টি করিতে পারেন। কোল্‌রিজ ইহাকেই বলিয়াছেন Secondary Imagination। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় পথে এই কবিকল্পনার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। 'যাঁহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধীনা……, তাঁহারা এমন স্থলে কল্পনার বলে সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া, সহানুভূতিকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া, একটা নবীনমাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবন্ত করিতে পারিতেন। শেক্সপীয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত Caliban বা জীবন্ত Ariel সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী।'* সুতরাং সহানুভূতিযোগে কাব্য সৃষ্টি হয় না ; সহানুভূতি যাহার আজ্ঞাকারিণী সেই কল্পনাশক্তি চাই। দুঃখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র এখানেই থামিয়া গিয়াছেন। কবির কল্পনাশক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন নাই। তবে যে ভাবে তিনি চরিত্রসৃষ্টির প্রাধান্য দিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ ৭ ॥

যে বিশ্লেষণাত্মক বিচার বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহা তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মন্তব্যেও প্রকট হইয়াছে। তিনি প্রকৃত ও অতিপ্রকৃতবিষয়ক সাহিত্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা অসম্পূর্ণ। তিনি যে সকল দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন তাহা সুনির্ব্বাচিত নয়, কারণ তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, (মহাভারতের) শ্রীকৃষ্ণ এবং কুমারসম্ভবের মেনকা ও উমা 'মানবধর্ম্মাবলম্বী' ; তাঁহাদের মধ্যে অতিমানবীয় যে সকল গুণ আছে তাহা আনুষঙ্গিক উপলক্ষণ মাত্র। বোধ হয় ভারতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্যই তিনি মিল্টনের অন্যতর নায়ক সয়তানকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে, মিল্টনবর্ণিত দ্বন্দ্বে কোন পক্ষই 'মানব প্রকৃতিবিশিষ্ট' নহে ; তাঁহার এই যুক্তি কেহই স্বীকার করিবেনা, মিল্টনের

* এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণচন্দ্রের মতের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

সয়তানকে নায়ক বা প্রতিনায়ক যাহাই মনে করিনা কেন, তাহার মধ্যে মানবাত্মার অপরাজেয় অভীপ্সা, তাহার বিনিদ্র বিদ্রোহাকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হইয়াছে, ইহাই সাধারণ পাঠকের কাছে এই চরিত্রের বা এই গ্রন্থের প্রধান আবেদন। বঙ্কিমচন্দ্র যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তদপেক্ষাও যাহা গ্রহণ করেন নাই তাহার দ্বারাই তাঁহার আলোচনার অসম্পূর্ণতা বেশি করিয়া প্রমাণিত হয়। ইংরেজি সাহিত্যে অতিপ্রকৃতের সব চেয়ে বড় উদাহরণ হ্যামলেট, ম্যাকবেথ প্রভৃতি নাটকে প্রেতের প্রবেশ, ম্যাকবেথের তিন ডাইনীবুড়ি; ইহা অপেক্ষাও প্রকৃষ্ট উদাহরণ কোল্‌রিজের প্রাচীন নাবিকের গীতি ও ক্রিষ্টাবেল। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনায় ইহাদের উল্লেখ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। এই সমস্ত অপূর্ণতা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র অতিপ্রকৃত কাব্য সম্পর্কে যে সূত্রের নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা সকল দেশের সকল রকমের কাব্যের উপরে সমভাবে প্রযোজ্য; 'কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের·· ···নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।' ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিজের উপন্যাসে অতিপ্রকৃতের যে সংস্থান করিয়াছেন তাহা অনেক সময় এই নিয়মের অনুযায়ী হইলেও সব সময় হয় না এবং সেই জন্যই তাঁহার কোন কোন উপন্যাস দোষযুক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'রজনী' ও 'দেবীচৌধুরাণী'র কথা মনে আসিবে। রামানন্দ স্বামীর যোগবলও সম্পূর্ণ মানবিকতালক্ষণযুক্ত নয়।

১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে (চৈত্র সংখ্যায়) বঙ্কিমচন্দ্র 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-নামক একখানা প্রহসনের সমালোচনা করেন। প্রহসনটি অখ্যাত, হয়ত এখন লুপ্ত আর সমালোচনাও খুব সংক্ষিপ্ত। এত সংক্ষিপ্ত যে, বঙ্কিমচন্দ্র অন্য কোন নাটক বা প্রহসনের নাম পর্য্যন্ত করেন নাই। কিন্তু এখানেও তাঁহার পদ্ধতি বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনামূলক। তিনি এই ক্ষুদ্র, আপাততুচ্ছ সমালোচনায় সাহিত্যবিচারের দুইটি মূল সূত্রের সন্ধান দিয়াছেন এবং একটির নাতিদীর্ঘ বিশ্লেষণও দিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা খুব সূক্ষ্ম ও তাৎপর্য্যময়। আমরা খারাপ নাটক দেখিলেই বলি, ইহা নাটকই হয় নাই; ইহা farce বা প্রহসন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, প্রহসন প্রহসন, অপকৃষ্ট নাটক নহে। উৎকৃষ্ট প্রহসন আপনার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দুঃখের বিষয় তিনি এই সূত্রটি নির্দ্দেশ করিয়াই থামিয়া গিয়াছেন, ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন নাই। দ্বিতীয় সূত্রটি আরও মূল্যবান্ এবং স্থানাভাবের জন্য কোন বিশেষ নাটক বা প্রহসনের

উল্লেখ না করিলেও বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি সূক্ষ্ম সূত্রটিকে বোধগম্য করিয়াছেন। সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞানের একটা প্রধান বিচার্য্য বিষয়ঃ ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু কি। অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, যে কোন দোষ কমেডির বিষয়ীভূত হইতে পারে না; যে ভুল বা বিকৃতি অপরের পক্ষে ক্ষতিকর বা পীড়াদায়ক হয় না তাহাই ব্যঙ্গের কারণ ('· ·not as regards any and every sort of fault, but as regards one particular kind···The Ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others,···'—বাইওয়াটারের অনুবাদ)। বঙ্কিমচন্দ্র অ্যারিষ্টটল প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া নিস্ফল ক্রিয়াকে ব্যঙ্গের উপজীব্য করিয়াছেন, এবং তাঁহার বিশ্লেষণ আরও দূরপ্রসারী। তিনি বলিয়াছেন, 'যাহাতে দুঃখ করা উচিত, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। তদ্রূপ, ভ্রান্তিও ব্যঙ্গের যোগ্য নহে—উপদেশ তৎপ্রতি প্রযুজ্য। নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রতি অবস্থাবিশেষে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। ক্রিয়া যে নিষ্ফল হয়, তাহার সচরাচর কারণ এই যে উদ্দেশ্যের সহিত অনুষ্ঠানের সঙ্গতি থাকে না। যেখানে অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যে অসঙ্গত, সেইখানে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য।······Error ব্যঙ্গের যোগ্য নহে, Mistake ব্যঙ্গের যোগ্য।' অভিজ্ঞ পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, এখানে ব্যঙ্গসম্পর্কিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

আর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণের উদাহরণ দিয়া এই আলোচনা সমাপ্ত করিব। কালিদাসের উপমা জগদ্বিখ্যাত এবং তাহা তাঁহার বর্ণনাকে ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছে, ইহা সকলেই জানেন এবং কালিদাসের উপমার বিশ্লেষণও অনেকে করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাসের কাব্যের উপমাবাহুল্য ও ভবভূতির কাব্যের উপমাবিরলতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া শুধু যে ইহাদের রচনাশৈলীর উপর নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন তাহা নহে, কাব্যে বিভিন্ন বর্ণনাভঙ্গির পার্থক্যও প্রকট করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যের শোভা প্রাচুর্য্যের শোভা, এই বিষয়ে কীট্‌স্ ও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে তুলনীয়। 'কালিদাস, একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন, সুন্দর সামগ্রীগুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া সকল সূচিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলি সুন্দর সামগ্রী চাপাইয়া দেন।' (বিবিধ প্রবন্ধ—'উত্তরচরিত') এই রীতি মাধুর্য্যপূর্ণ বিষয়াদিতে বিশেষ উপযোগী। সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্য দিয়া সুন্দর আত্মপ্রকাশ করে। ভবভূতির রীতি

অন্য রকমের। 'ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না। যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটি চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘষেন না।' উৎকট, ভয়ঙ্কর, বীভৎস জিনিষের বর্ণনায় এই রীতি অধিকতর উপযোগী। কীট্‌সের La Belle Dame Sans Mercia সঙ্গে তাঁহার Endymion প্রভৃতি অন্যান্য কবিতার তুলনা করিলে রচনারীতির এই পার্থক্য সূচিত হইবে। ভবভূতি কালিদাস অপেক্ষা নিকৃষ্ট কবি, কিন্তু নাটকোচিত গুণ বিচারে তাঁহার উত্তর চরিত কালিদাসের নাটকের সঙ্গে তুলনীয়। এই তুলনা বিশেষ ভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ, কারণ ইঁহাদের কবিপ্রতিভা বিভিন্ন ধরণের। শুধু ষ্টাইল বা উপমাপ্রয়োগের বৈচিত্র্য অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দুই শ্রেণীর কবি-প্রতিভার পার্থক্য দেখাইয়াছেন। আধুনিক কালে রচনাশৈলী-আশ্রিত সমালোচনার প্রাবল্য দেখা যায়, কিন্তু এই জাতীয় অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান খুব কমই মিলে।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমোত্তর সমালোচনা—সূত্র (১)

॥ ১ ॥

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় এবং ইহা বাংলা সাহিত্যে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ঐ উপন্যাসে ৯৯৭ বঙ্গাব্দে নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ যে পথে অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত পক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম এই রাজপথের রেখাপাত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল প্রভাব শুধু উপন্যাসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয় নাই, তিনি বাঙ্গালীর সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্মবিষয়ক, সাহিত্যবিষয়ক চিন্তা উজ্জীবিত ও সঞ্জীবিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদয়পদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল। [তিনি] জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্ব্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিমদিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।' সাহিত্যসমালোচনার আকাশে ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার তুলনা করা উচিত হইবে কিনা জানিনা, কিন্তু সমালোচনার ধারা নির্দ্দেশ করিতে হইলে এই তুলনামূলক বিচার অপরিহার্য্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে সাহিত্যচর্চ্চা খুব বৃদ্ধি পায় এবং সাহিত্যবিষয়ক বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও বিশ্লেষণ ও সমালোচনার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে সমালোচনাবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়াছিলেন তাহাই নহে, তিনি সমালোচনার উপযুক্ত খোরাকও জোগাইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মধ্যে যে অংশ অপকৃষ্ট তাহাই তাঁহার সমকালবর্ত্তী শিষ্যবৃন্দের ও পরবর্ত্তী ভক্তবৃন্দের সমালোচনাকে প্রভাবিত করে। সাহিত্যকর্ম্মের শেষার্দ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর পুনরভ্যুত্থানের প্রধান প্রবক্তা হইয়াছিলেন। সীতারামের কাহিনী বলিতে যাইয়া অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই তিনি মন্তব্য করিলেন, 'হায়! এখন কিনা হিন্দুকে

ইণ্ডাষ্ট্রিয়ল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়। কুমারসম্ভব ছাড়িয়া স্থইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি।' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহের ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন, 'আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।'

এই সঙ্কীর্ণ, বিকৃত মনোভাব বঙ্কিমের সমালোচনাকে দূষিত করে নাই, কিন্তু ইহার প্রকোপে ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলী—অর্থাৎ তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা—সাহিত্যরসের আস্বাদ ও বিচার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ ইহা মানিতে হইবে যে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যের মূল তত্ত্বসম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তিনি আলংকারিকদের উপর তাহার বরাত দিয়াছিলেন। তখন সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র আমাদের দেশে নির্জীব হইয়া আসিয়াছে। রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনে করিতেন যেন রস বা ভাবের উদ্ভাবন বা পরিপোষণই কাব্যের উদ্দেশ্য; এই ভাবেই তাঁহারা সাহিত্য-দর্পণকারের 'বাক্যং রসাত্মকম্ কাব্যম্'—এই বিভ্রান্তিকর উক্তির ব্যাখ্যা করিতেন। রঙ্গলাল বলেন, 'এই স্বল্প বাক্যে কবিতাকলার গুণ ব্যাখ্যাত ও বৃহৎ গ্রন্থবিশেষের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে।' (পদ্মিনী-উপাখ্যান) বঙ্কিমচন্দ্রের মত পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ইঁহারা মনে করিতেন কাব্যের কাজ সুগভীর ভাবসমূহকে জাগরিত, পরিপুষ্ট করা। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতি গুণ ও রীতিবাদী পণ্ডিতেরা কাব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা বা বিচার করিতেন না; তাঁহারা রস ছাড়িয়া রচনাশৈলীর বিশ্লেষণ করিতেন, 'উত্তম-উত্তম' অলংকারের জন্য প্রশংসা করিতেন এবং 'চ্যুতসংস্কৃতি', 'নিহতার্থত্ব' প্রভৃতি দোষ দেখাইতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার গুণ এই যে, তিনি কাব্যের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যানে অসমর্থ হইলেও কাব্যের বিশ্লেষণ করিয়া সামান্য লক্ষণে পৌঁছিতে পারিতেন। তিনি সামান্য হইতে বিশেষে অবতরণ করিতেন না, বিশেষ হইতে সামান্যে আরোহণ করিতেন। তাঁহার মত প্রতিভা অপর লেখকের মধ্যে আশা করা যায় না। কিন্তু তিনি যে Neo-Hinduism-এর আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন তাহার ফলে বাঙ্গালী লেখকদের সাহিত্যালোচনা একদেশদর্শী হইয়া পড়িল। প্রথমতঃ, কাব্য বাগর্থসম্পৃক্ত যুগ্মক অথচ একক সৃষ্টি বলিয়া প্রতিভাত হইল না। বাক্ হইতে অর্থ প্রাধান্য পাইল এবং অর্থ বলিতেও লেখকরা বিষয়বস্তু বা হিন্দুর আদর্শের জয়গান বুঝিতে লাগিলেন।

যেখানে এই ধর্ম্মান্ধতা বা জাতিবৈর নাই সেইখানেও সাহিত্য সমালোচনা শুধু বিষয়বস্তুর বর্ণনা বা তাহার নিন্দা প্রশংসায় পর্য্যবসিত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্ত্তীদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত অনেকাংশে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দাবি করিতে পারিতেন। তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, বড় ঐতিহাসিক ছিলেন এবং ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় সুলেখক ছিলেন। তিনি জাতিবৈর বা Neo-Hinduism দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এমন মনে করা যায় না। কিন্তু সমালোচনার যে অধঃপাতের কথা বলিতেছি, অর্থাৎ সাহিত্যসৃষ্টিকে বিষয়নির্ব্বাচনের প্রতিরূপ মনে করা, তাহা তাঁহার মধ্যেও দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র উভয়েই ঈশ্বরগুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যে তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের তুলনায় কত ব্যবধান! রমেশচন্দ্র শুধু বলিয়াছেন, দীনবন্ধু মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যঙ্গের মধ্যে পার্থক্য আছে, ঈশ্বরচন্দ্র সবরকম সামাজিক প্রগতির বিরোধী ছিলেন এবং তাঁহার অতুলনীয় পদ্যে তিনি নূতন চালচলনের উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন। দীনবন্ধু কাহারও বিরোধী নহেন, তিনি এত সহৃদয়তাপূর্ণ যে কোন শ্রেণীকে আক্রমণ করেন নাই, শুধু পাপ ও বোকামির ব্যঙ্গ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কশাঘাত গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে, দীনবন্ধুর মৃদু বিদ্রূপ আঘাত করে না, শুধু পাপের স্বাভাবিক ও বীভৎস রূপ আঁকে।*

লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইহার মধ্যে সাহিত্যিক বিশ্লেষণের আভাস থাকিলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার বিবরণমাত্র। রমেশচন্দ্র শেষের দিকে হাস্য ও ব্যঙ্গের মধ্যে একটু পার্থক্য করিতে চেষ্টা করিলেও এই মন্তব্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষের তারতম্যের কথা নাই বলিলেও হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মত পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। তিনিও দীনবন্ধুর সহৃদয়তার উপর জোর দিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে ভিত্তি করিয়া তিনি সূক্ষ্ম সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সহানুভূতির সাহায্যে দীনবন্ধু ভালমন্দ

*'But there is a difference between Dina Bandhu's satires and Isvar Chandra's satires. Isvar Chandra is opposed to all social progress and he pours forth this withering scorn in his own matchless verse on new-fangled ways. Dina Bandhu is not opposed to any section, he is too good-natured and good-hearted to attack any particular community, he only ridicules folly and vice. The lash of Isvar Chandra's satire cuts deep, Dina Bandhu's milder and gentler admonitions inflict no wound, but hold up vice only in its natural and hideous colours. Isvar Chandra is the more powerful satirist, Dinu Bandhu is the pleasanter humourist.' (*Literature of Bengal*, Chapter XVII)

সকল প্রকার চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন এবং তাহাদিগের জীবন্ত রূপ দিতে পারিতেন। এই জীবন্ত রূপ অংশতঃ স্বভাবানুকারী, অংশত স্বভাবাতিরিক্ত। জীবন্ত রূপ দেওয়ার এই যে শক্তি ইহারই নাম সৃজনী প্রতিভা বা Creative Imagintion। এইখানেই দীনবন্ধু ঈশ্বরগুপ্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দীনবন্ধুর এই শক্তিও অভিজ্ঞতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। তিনি যাহা দেখেন নাই, যাহার সম্পর্কে তাঁহাব বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই, তন্মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে পারিতেন না। শেক্সপীয়রের মত তাঁহার কল্পনাশক্তি ছিল না। বঙ্কিমের আলোচনার লক্ষ্য সাহিত্যের বিচার, বিষয়বস্তুর বিভাগ নয় এবং বিশ্লেষণের সাহায্যে ইহা ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে এবং বিশেষ হইতে সামান্যে পঁহুছিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু রমেশচন্দ্রে সমালোচনার যে অধোগতি দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের শেষের দিকের সাহিত্যচর্চ্চাই বোধ হয় তাহার কারণ। তিনিই তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকে কবিকৃতি অপেক্ষা কাব্যের বিষয়গৌরবের দিকে চালিত করিয়াছিলেন।

সমালোচনায় এই অধোগতির পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়ও পাওয়া যায়। তাঁহার সুদীর্ঘ 'বৃত্রসংহার'-সমালোচনা ইহার নিদর্শন। তিনি এই মহাকাব্যের কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন, বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহা অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তিসম্পন্ন, কিন্তু এই কবিত্ব-শক্তির বিশ্লেষণ করেন নাই; তাঁহার মন্তব্যকে আপ্তবাক্যের মত গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি দুই এক জায়গায় মেঘনাদবধ-কাব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু মেঘনাদবধ হইতে কোন উদ্ধৃতি দেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার মত আপনা হইতেই খণ্ডিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের এই পক্ষপাতিত্বের একটা কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। মধুসূদনের কাব্য বিজাতীয় ভাবাপন্ন; তিনি 'Rama and his rabble-কে পছন্দ করেন না, রাবণ একজন 'grand fellow', যাহার দ্বারা তাঁহার কল্পনা উদ্বোধিত হয়। কিন্তু হেমচন্দ্র পুরাণবর্ণিত কাহিনীর যে রূপ দিয়াছেন তাহার মধ্যে চিরাচরিত ধর্ম্মের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ চরিত্র এবং শচীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'অনবনত ও অনবনমনীয়' মহিমা দেখিতে পাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, 'সুন্দর কার্য্যই সুনীতিসঙ্গত।··· হেমবাবু মনুষ্যজীবনের যে মূর্ত্তি লইয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা পরম সুন্দর। বাহুবলের শাস্তা ধর্ম্ম; ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাহুবল ধ্বংসপ্রাপ্ত

হয়। অত্যাচার ঈশ্বরের অসহ্য, পুণ্যের সঙ্গে লক্ষ্মীর নিত্য সম্বন্ধ। এ তত্ত্ব সৌন্দর্য্যে পরিপ্লুত,......হেমবাবু এই তত্ত্বকে এতদূর প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা অদৃষ্টও খণ্ডিত হইল; ত্রিভুবনজয়ী বৃত্রের আলয়ে রমণীর অপমান দেখিয়া, ত্রিদেব—তিন মূর্ত্তিতে পরমেশ্বর—অদৃষ্ট খণ্ডিত করিলেন—অকালে বৃত্রের নিধন হইল।' (বঙ্গদর্শন—চৈত্র, ১২৮৪)

॥ ২ ॥

বৃত্রসংহার-কাব্যের আলোচনায় উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নাই; শুধু পক্ষপাতিত্বের ছাপ সুপরিস্ফুট। হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতায় জ্বালাময়ী স্বদেশভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাও বঙ্কিমচন্দ্রের এই পক্ষপাতিত্বের কারণ হইতে পারে। 'সীতারাম' উপন্যাসে এবং অনেক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতা উগ্রমূর্ত্তি ধারণা করে; ইহাকে স্বাদেশিকতা না বলিয়া ইউরোপীয় বা ইংরেজি সভ্যতার প্রতি বিরূপতা বলা যাইতে পারে। ১২৮০ সালে প্রকাশিত 'জাতিবৈর' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'জাতিবৈর এখনও বহুকাল বঙ্গদেশে বিরাজ করুক।...জাতিবৈর স্বভাবসঙ্গত, এবং ইহার দূরীকরণ স্পৃহণীয় নহে।' এই আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং ইহা তাঁহার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে অল্পবিস্তর সংক্রমিত হইয়া পড়ে। ইঁহারা সাহিত্যে শিল্পকর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া তাহার নৈতিক বা ভাবগত আদর্শের প্রতি দৃষ্টি দেন; সাহিত্য ইঁহাদের কাছে নীতিশিক্ষার বাহন রূপে প্রতিভাত হয় এবং সেই নীতি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিরোধী ও স্বদেশীয় আদর্শের পরিপোষক হইলেই তাঁহাদের সমধিক মনঃপুত হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা এগার বছরের বড়; তিনি মধুসূদনের সমসাময়িক এবং মধুসূদনের সঙ্গে 'প্রণয়সূত্রে চিরগ্রথিত।' কিন্তু এই সতীর্থদের মধ্যে মনের মিল থাকিলেও মতের ও আদর্শের পার্থক্য ছিল খুব বেশি। মধুসূদন ইউরোপীয় আদর্শের মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন আর ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও ভূদেব ছিলেন সম্পূর্ণ স্বদেশী ভাবাপন্ন। খানিকটা ভূদেবের সংস্কারকে আঘাত দিবার জন্যই বোধ হয় মধুসূদন 'হেক্টর-বধ' গদ্যকাব্যের উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'মহাকাব্য রচয়িতাকুলের মধ্যে ইলিয়াস রচয়িতা কবি যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ, ইহা

সকলেই জানেন। আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চ-পাণ্ডবের জীবনচরিত মাত্র।' হেক্টর-বধ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার অনেক বৎসর বাদে ভূদেব মৃচ্ছকটিক-নাটক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেন 'এডুকেশন গেজেট পত্রিকা'য়। তখন 'প্রচার'-পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' প্রকাশিত হইতেছিল এবং হিন্দুধর্ম্ম ও জাতিবৈর বিষয়ক প্রবন্ধাদিও আলোড়নের সৃষ্টি করিতেছিল। ভূদেবের প্রবন্ধে এই আন্দোলন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহা নামে মাত্র নাটকের আলোচনা; নাটকের নাটকত্ব সম্বন্ধে খুব সামান্যই লিখিত হইয়াছে। প্রবন্ধের বক্তব্য আর্য্যদের মহিমাখ্যাপন; নায়ক চারুদত্ত সম্পর্কে ভূদেব বলিয়াছেন, 'এই আর্য্য—এই হিন্দু। পৃথিবীর অপর কোন নরকুলে আর এইরূপ বিশুদ্ধ আচরণ শিক্ষিত হয় নাই।' ইহার পর রজোগুণসম্পন্ন শর্বিলকের শৌর্য্যের সঙ্গে দয়াবীর, ক্ষমাবীর, সাত্ত্বিক চারুদত্তের শৌর্য্যের তুলনা করিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, 'আর্য্য হিন্দুর বীরতা এইরূপ। ধৃষ্টতায় উপেক্ষা, অপকর্ম্মে ঘৃণা, সত্যে নিষ্ঠা, শরণাগতের প্রতিপালন, নির্ভীকতা, যশোরক্ষায় যত্ন, ধর্ম্মপ্রভাবে বিশ্বাস এবং পরম অপরাধীর প্রতি ক্ষমা, এই সাত্ত্বিক বীরতা। এই বীরতার প্রকৃতি আর কোন জাতি এমন সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই।' (এডুকেশন গেজেট, ১২৯৪) এই জাতীয় প্রবন্ধ আর যাই হউক সাহিত্যসমালোচনা নয়।

Neo-Hinduism ও সাহিত্যে তাহার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা করিতে যাইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলিয়াছেন, 'Babu Bankimachandra Chatterji is its head of gold, Babus Chandranatha Bose and Akshaya-chandra Sarkar are the silver breast and arms, a Bengali journalist furnishes the brass and the rank and file of the great army of indolent slaves to routine form the feet of clay.' (*New Essays in Criticism*, p 88).

চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার শুধু প্রচারক নহেন, প্রবন্ধরচয়িতা ও সাহিত্যসমালোচকও, ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী ও অনুবর্ত্তী। ইঁহাদের বিষয়ে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিলেই তখনকার দিনের সাহিত্যিক আবহাওয়া বোঝা যাইবে। চন্দ্রনাথ বসু সুপণ্ডিত, সংযতবাক্; তাঁহার রচনায় অস্পষ্টতা বা বাহুল্য নাই। কিন্তু তাঁহার নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক মতে ও বিশ্বাসে সংযম নাই; তিনি সাহিত্যের যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা এত

একদেশদর্শী যে উহাকে সাহিত্যসমালোচনাই বলা যায় না। এই জাতীয় গোঁড়ামি তখনকার দিনের সাহিত্যচর্চ্চাকে বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। 'সুখের হাট ও সৌন্দর্য্যের মেলা' প্রবন্ধে* তিনি বলিয়াছেন, 'ইউরোপে মানবমনের আধ্যাত্মিকতা কিছু নিকৃষ্ট বলিয়া তথায় aesthetic বিদ্যার এত প্রাধান্য; ভারতে মানবের আধ্যাত্মিকতা বড়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া তথায় aesthetic বিদ্যা পরমার্থ বিদ্যায় একরকম লয় হইয়া গিয়াছে······aesthetic বিদ্যাকে পরমার্থ বিদ্যার সম্পূর্ণ অধীন না করিলে আমরা মানব প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারিব না··· ।' (ত্রিধারা—পৃঃ ৫৪) এই জাতীয় মত একাধিক কারণে বিভ্রান্তিকর। ভারতবর্ষে aesthetic বিদ্যা পরমার্থ বিদ্যায় লয় পাইয়াছিল অথবা ভারতে aesthetic বিদ্যা নাই বলিলেই চলে—এই দুইটি কথার কোনটিই সত্য নহে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথের রসগঙ্গাধর পর্য্যন্ত এক বিরাট্ রসশাস্ত্র বা aesthetic বিদ্যার সম্ভার আমাদের কাছে এখনও আছে। এই সব পণ্ডিতেরা কেহই রসশাস্ত্রকে পরমার্থ বিদ্যার মধ্যে লীন করেন নাই। কাব্যালোচনায় চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তি হয় এই কথা বলিয়াই তাঁহারা কাব্যের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যার মধ্যে পরমার্থ বিদ্যার নিকট সংস্রব নাই। যাঁহারা বলিয়াছেন যে, কাব্যের আস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদসহোদর, তাঁহারাও ব্রহ্মাস্বাদের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্যের উপরই বেশি জোর দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

চন্দ্রনাথ বসুর আর একটি মত আরও কৌতুককর। আমরা বলিয়া থাকি আমাদের দেশে জীবনচরিত লিখিত হইত না; আমাদের চরিতসাহিত্য নাই। তিনি এই মত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশেই প্রকৃত জীবনচরিত লিখিত হইত। পুরাণে ব্যক্তিবিশেষের কীর্ত্তিই ধর্মকাহিনীরূপে রক্ষিত ও বিবৃত হইত। 'মানুষের এইরূপ কীর্ত্তিকাহিনীই তাহার প্রকৃত জীবনচরিত বা ইতিহাস। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় প্রণালীতে জীবন-চরিত লিখিত না হইয়া প্রকৃত হিন্দু প্রণালীর জীবনচরিত লিখিত হয় ইহা

*সম্প্রতি এই প্রবন্ধটি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। (অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার, ১৮৮৭ শকাব্দ, পৃঃ ১০৫-১০৮) চন্দ্রনাথ বসু এই প্রবন্ধ নিজের গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর অক্ষয়চন্দ্র সরকার বহুদিন জীবিত ছিলেন; তিনি প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন কিনা জানিনা। এই প্রবন্ধটি ইঁহাদের দুইজনের যে কেহ লিখিয়া থাকুন বর্ত্তমান আলোচনায় তাহা সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। তবে ইহা চন্দ্রনাথ বসুর বলিয়াই মনে হয়।

নিতান্ত প্রার্থনীয়।' (ত্রিধারা পৃঃ ৮৬) পুর্ব্বে শাস্ত্রকারেরা পুরাণকে ইতিহাস বলিতেন, চন্দ্রনাথ বসু তাহাকে জীবনচরিত বলিতে চাহেন, বলুন। কিন্তু আধুনিক জীবনচরিতের সঙ্গে তুলনা করিয়া তিনি ধর্ম্মবোধ বা স্বাদেশিকতার যতটা পরিচয় দিয়াছেন সাহিত্যবোধের ততটা পরিচয় দেন নাই। পুরাণকে বলা হয় অতি-কথা, ইহার ইংরেজি প্রতিশব্দ myth। আধুনিক কালে যে জীবন-চরিত লিখিত হয় তাহা বস্তুনিষ্ঠ; ইহার মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারের মধ্য দিয়া সাধারণ বা অসাধারণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে। ইহাই এই জাতীয় সাহিত্যের আর্ট, বস্‌ওয়েলকৃত জনসনের জীবন-চরিত এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ রচনা। এই জাতীয় জীবন-চরিত সম্পর্কে চন্দ্রনাথ তাচ্ছিল্য করিয়া বলিয়াছেন, 'আর সেই সকল গ্রন্থে কত কথাই থাকে তাহার ঠিকানা নাই। খাইবার কথা, শুইবার কথা, বেড়াইবার কথা, ইত্যাদি সহস্র কথা থাকে। সে সকল কথা জানিয়া কাহারও লাভ নাই।' (ত্রিধারা, পৃঃ ৮৩) এই উক্তি হইতেই বোঝা যায় যে, লেখক আধুনিক কালের জীবন-চরিতের রস—তিনি চাহেন উপদেশ—গ্রহণ করিতে অসমর্থ। এই সকল গ্রন্থের সঙ্গে পুরাণের তুলনা সাহিত্যিক বাতুলতা। অনুরূপ বুদ্ধি-বিভ্রমের আর একটি নিদর্শন দেওয়া যাইতে পারে। নীতিবাদী সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন ড্রাইডেন, কনগ্রিভ প্রভৃতির জঘন্য গ্রন্থের প্রভাবে ইংলণ্ড যখন উৎসন্ন যাইতেছিল তখন জেরিমি কলিয়ার থিয়েটার বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া সমাজের স্বাস্থ্য-রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন! (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮৭)

সাহিত্যের দিক্ দিয়া চন্দ্রনাথ বসুর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা 'শকুন্তলা তত্ত্ব'। এই গ্রন্থে তিনি শকুন্তলার নাটকত্ব বিচার করিতে চাহিয়াছেন এবং ইহা তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তখন 'নবজীবন' প্রভৃতি পত্রিকায় হিন্দু আদর্শ সম্পর্কে যে সকল প্রচারমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাহাদিগকে বলিয়াছেন senseless maunderings বা অর্থহীন বাচালতা। কিন্তু তিনি শকুন্তলা-তত্ত্ব সম্পর্কে অনুকূল মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে, চন্দ্রনাথ প্রচলিত হিন্দু নাটকের গঠন ও চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে সুন্দর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আলোকসম্পাত করিয়াছেন ('our author lights up with a fine moral and spiritual significance the conventional structure and characters of the Hindu

drama')। কিন্তু সাহিত্যামোদীর কাছে এই আলোক খুব উৎকট বলিয়া ঠেকিবে। গ্রন্থকার শকুন্তলা-নাটকে সাতটি তত্ত্বকথা আবিষ্কার করিয়াছেন : (১) 'ব্যক্তিবিশেষের পরিণয় শুধু ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভের কারণ নয়। তাহা সমস্ত সমাজের শুভাশুভের কারণ।·····অভিজ্ঞান শকুন্তল জগতের একখানি প্রধান সমাজতত্ত্বজ্ঞাপক নাটক।' (২) 'বিবাহ সামাজিক সুখদুঃখের নিয়ন্তা; অতএব সমাজকে সাক্ষী করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া বিবাহ সম্পন্ন করিতে হয়।' (৩) 'দুষ্মন্ত সে প্রণালীতে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ না করিয়া মহাপাপ করিলেন এবং মহা অনিষ্ট ঘটাইলেন।' (৪) 'যে সকল মহাপুরুষ বিদ্যা, বুদ্ধি, উন্নত নীতি, উন্নত চিত্তসংযমশক্তি, বীরত্ব এবং উদারতার আদর্শস্বরূপ, তাঁহারাও রিপুর শাসনে হীনগৌরব।' (৫) 'জগতের প্রকৃতির বলে স্ত্রী-পুরুষের যোগসাধন হয় বলিয়া দুষ্মন্ত শুধু শকুন্তলাকে লইয়া বিপদগ্রস্ত নন। আরো অনেক রমণী লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত।···মনুষ্যমাত্রই বিপদগ্রস্ত।' (৬) 'ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিক শক্তিকে প্রয়োগ করিলে চলিবে না, সমাজকে সুসংস্কৃত এবং নীতিপ্রবণ করিয়া সমাজরূপ মহাশক্তিরও প্রয়োগ করিতে হইবে।' (৭) 'অভিজ্ঞান শকুন্তল কাব্যাকারে সাঙ্খ্যদর্শন। ইহাই অভিজ্ঞান শকুন্তলের অর্থতত্ত্বের চরম সীমা।' নাটকে এই সব তত্ত্ব আছে কিনা তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে। যে বহুবল্লভ নায়ক আশ্রমে আসিয়া গোপনে কুমারীর কৌমার্য্য হরণ করে অথবা যে কুমারী এত সহজেই আত্মসমর্পণ করে অ-হিন্দু পাঠক তাহার মধ্যে অপ্রিয় অর্থও বা হর করিতে পারেন। সাহিত্যের দিক্ দিয়া বক্তব্য এই যে, এই সব আলোচনা বা বিতর্কের মধ্য দিয়া শকুন্তলার কাব্যত্ব ও নাটকত্বের বিচার হইবে না। গ্রন্থকার যে সোল্লাসে এই আলোচনায় লিপ্ত হইয়াছেন তাহা শুধু তাঁহার সাহিত্যবিমুখ মনোভাবই প্রকটিত করে।

তত্ত্বব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনাথ বসু সাহিত্যবিচারও করিয়াছেন এবং দুই একটি অপ্রধান স্থলে রসবোধেরও পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মহাভারতের শকুন্তলা কাহিনী ও কালিদাসের কাহিনীর মধ্য তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া কালিদাসের মৌলিকতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত এবং অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা—এই সকল সমশ্রেণীভুক্ত গৌণচরিত্রের পার্থক্যবিশ্লেষণে। এইখানে ইংরেজি সাহিত্যসমালোচনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এইরূপ দুই একটি

ওয়েসিস্ ছাড়িয়া দিলে সবই মরুভূমি। চন্দ্রনাথ বসু শেক্সপীয়র হইতে কালিদাসের প্রাধান্য দেখাইতে বদ্ধপরিকর। তাঁহার দেওয়া একটি যুক্তি দেখাইলেই তাঁহার ভ্রান্ত বিচারবুদ্ধির সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। তিনি স্থির করিলেন যে, রোমিও ও জুলিয়েট শেক্সপীয়রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। ইহা প্রেমের নাটক, শকুন্তলাও প্রেমের নাটক। সুতরাং তিনি ইহাদের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখাইলেন যে, শকুন্তলা অপেক্ষা রোমিও ও জুলিয়েট নিকৃষ্ট। এই তুলনা দেখিয়া শেক্সপীয়রের কমিক চরিত্র ফ্লুয়েলেন-কৃত একটি তুলনার কথা মনে হয়। ম্যাসিডনে নদী আছে; মনমাউথে নদী আছে; ইহাদের সাদৃশ্য হইতে সে ম্যাসিডন-জন্মা সেকেন্দর ও মনমাউথ-জন্মা পঞ্চম হেন্‌রির সঙ্গে তুলনা ফাঁদিয়া বসিল। চন্দ্রনাথ বসুর তুলনা প্রবণতা এইখানেই থামে নাই। তিনি শকুন্তলার বিদায় দৃশ্যের কলা-কৌশলের সঙ্গে জুলিয়াস সীজার নাটকের এণ্টনীর বক্তৃতা-রচনা-কৌশলের তুলনা করিয়াছেন। ইহার উপর টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে আর যে-সকল মন্তব্য আছে তাহা উচ্ছ্বসিত অতিশয়োক্তিতে পরিপূর্ণ। কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করিলেই এই জাতীয় সাহিত্যালোচনার মূল্য বোঝা যাইবে: 'কি গম্ভীর, কি দুর্জ্জয় ধর্ম্মভাব! কি মনোহর ধর্ম্মানুরাগ!' (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১২) 'এমন নাটক কি আর হয়!' (পৃঃ ৩১) 'দুষ্মন্ত সমস্ত মনুষ্যজাতির ইতিহাসলক্ষিত নিয়তির কবিকল্পিত প্রতিমা। এতবড় চরিত্র জগতের আর কোন নাটকে আছে কিনা সন্দেহ।' (পৃঃ ৩৪) 'একটি সামান্য ঘটনা [শকুন্তলা গুরুজনের নাম করিয়া দুষ্মন্তের প্রণয়নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন] অবলম্বনে এতবড় ছবিও অন্য কোন কবি তুলিতে পারেন নাই। জগতের নাটককারদের মধ্যে কালিদাস অদ্বিতীয় শিল্পী। শিল্পপ্রতিভায় শেক্সপীয়রও তাঁহার সমকক্ষ নহেন।' (পৃঃ ৬০) 'এত গভীর এবং ব্যাপক নাটকত্ব অতি অল্প নাটকেই আছে। যে নাটকগুলিতে আছে, বোধ হয় তাহাদের সংখ্যা তিন চারিখানার বেশী হইবে না। অভিজ্ঞান শকুন্তল সেই তিন চারিখানার মধ্যে একখানা। গেটের "ফাউষ্ট" আর একখানা। শেক্সপীয়রের "রোমিও এবং জুলিয়েট"ও আর একখানা বটে। কিন্তু অভিজ্ঞান শকুন্তল এবং ফাউষ্ট অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট।' (পৃঃ ১৩২) গেটে শকুন্তলার খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন; বোধহয় সেই কারণেই চন্দ্রনাথ 'ফাউষ্ট' নাটকের প্রতি কিছু দাক্ষিণ্য দেখাইয়াছেন!

অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী ও শিষ্য। তিনি 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন; হিন্দু আদর্শ ও ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল তিনি তাহার পুরোভাগে ছিলেন; স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহার সহযোগিতা স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন। সাহিত্যে তিনি শীলতা ও শ্লীলতার পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য প্রথম দিকের রচনায়ই তিনি ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে কশাঘাত করিয়াছেন: 'কি বিচিত্র রুচি! এমন কদর্য্যস্বভাবান্বিত কবিও বঙ্গদেশে সমূহ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কেন? মালিনীর যে সকল গুণ থাকাতে চেঙ্গড়া-মহলে তাহার পসার ছিল, ভারত সেইসকল গুণেই স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন।' (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮০) অক্ষয়চন্দ্র নীতিবাগীশের দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই বিষয়ে তিনি অন্যান্য শুচিবায়ুগ্রস্ত সাহিত্যিকদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন সিংহ 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষার' জন্য বদ্ধপরিকর, নীতিধ্বজ ঔপন্যাসিক ও সমালোচক। সেই যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা'র সমালোচনা করিতে যাইয়া সেই শুচিসম্মত গ্রন্থের অংশবিশেষ সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছেন, 'সমাজে যাহা আছে—তাহার সমস্ত কি লিখিতে হইবে? না, নিশ্চয়ই না। শ্মশানের চিত্র দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু পুরীষের চিত্র হয় কি? হয় না।' (পুর্ণিমা, ১৩১৫) তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সাহিত্যে সমস্ত অসুন্দর বস্তুরই অবতারণা করা যায়, যদি কবিপ্রতিভা তাহাকে রূপান্তরিত করিতে পারে। শেলি কন্যার প্রতি পিতার রতির চিত্র আঁকিয়াছেন, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র একটি স্মরণীয় চিত্র পুরীষের উল্লেখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। নীতিবোধের দ্বারা সীমিত হইয়াছিলেন বলিয়াই অক্ষয়চন্দ্র শেক্সপীয়রের নাটকের মর্ম্মস্থলে পহুঁছিতে পারেন নাই। শেক্সপীয়রের হ্যাম্‌লেট ও ম্যাক্‌বেথ উভয়ই শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি; উভয়ের মধ্যে একই প্রতিভার স্বাক্ষর রহিয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। অক্ষয়চন্দ্র একই নীতিশিক্ষার সূত্র দিয়া এই দুই বিভিন্ন রসাশ্রিত নাটককে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া ফেলিয়াছেন। সেই কারণে তাঁহার সমালোচনা প্রতিপদেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 'ম্যাক্‌বেথ নাটকে শেক্সপীয়র বলেন, পাপ পাপীকে পোড়ায়। হ্যামলেট নাটকে বলেন, তাহা তো পোড়ায়ই—সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ বিস্তার করিয়া, পাপ ছড়াইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ পাপী ও নিষ্পাপকে দগ্ধ করে।' (রচনাসম্ভার,

পৃঃ ৭২৪) এই বলিয়া তিনি দুইখানি নাটককে একই নক্সায় ফেলিয়াছেন এবং এই সমীকরণের জন্য নাটক দুইখানির শিল্পবৈচিত্র্য ও অর্থবৈচিত্র্য ছায়াচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

পাণ্ডিত্যে অক্ষয়চন্দ্র চন্দ্রনাথ হইতে নিকৃষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয়; রচনায়ও তিনি খুব প্রগল্‌ভবাক্। কিন্তু সমালোচকের যাহা প্রধান গুণ—রসোপলব্ধি—সেই বিষয়ে তিনি চন্দ্রনাথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কখনও কখনও তিনি পরিণত পরিমাণ-বোধেরও পরিচয় দিয়াছেন। দুই এক জায়গায় তাঁহার সমালোচনা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং মার্জ্জিত। মনে হয় মধুসূদনের হিন্দুধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য এবং হেমচন্দ্রের স্বাদেশিকতার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই এবং হেমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অহেতুক পক্ষপাতিত্ব ছিল। তিনি অপূর্ব্ব কবিত্বের নিদর্শন হিসাবে হেমচন্দ্রের কাব্য হইতে বহু উদ্ধৃতি দিয়াছেন যাহার মধ্যে সাধারণ পাঠক উচ্চাঙ্গের কিছু পাইবে না এবং তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধ বর্ণনায় হেমচন্দ্র মধুসূদন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করিয়া অক্ষয়চন্দ্র বৃত্রসংহার-কাব্যের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কাব্যরূপের তত বিচার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার তারতম্যবোধ নষ্ট হয় নাই। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, হেমচন্দ্র জাতিবৈরিতার কবি, কিন্তু তাঁহার কাব্যের কৃতিত্ব কোথাও স্বধর্ম্মানুরাগ পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহার কাব্যের তুলনা করিয়া ও পাশাপাশি উদ্ধৃতি দিয়া অক্ষয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 'বীরকাব্যে হেমচন্দ্র সকল অনুকারীর ন্যায় ওস্তাদের নিম্নস্তরে। প্রসাদগুণে হেমচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের নিম্নে; একালবর্ত্তী "শিক্ষিত" মধুসূদনেরও নিম্নে।......তুলনা করুন; নিশ্চয়ই দেখিবেন ওস্তাদ মাইকেল ওস্তাদি বজায় রাখিয়াছেন।' (সাহিত্যসম্ভার, পৃঃ ৫৬১-৫৯০)

অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচনায় বেশ একটা আটপৌরে ভাব আছে—আটপৌরে জিনিসের মতই ইহা সাধারণ, সহজগ্রাহ্য ও নির্ভরযোগ্য। যখনই তিনি সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বা রসতত্ত্বের গূঢ়, সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবেশ করিয়াছেন তখনই তিনি বিপথগামী হইয়াছেন; উদ্দীপন ও রসের মধ্যে পার্থক্য করিয়া আবার নূতন উদ্দীপনরসের অবতারণা করিয়াছেন; সৌন্দর্য্য ও রস পৃথক্ না একাত্ম তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু যেখানে অমূর্ত্তভাব ছাড়িয়া তিনি কাব্য-সুন্দরীকে কোন নাটক বা নভেল বা কবিতার রূপে মূর্ত্তিমতী দেখিয়াছেন অমনি

তাঁহার ধীর, স্থির আটপৌরে বুদ্ধি ক্রিয়াশীল হইয়া উৎকৃষ্ট সমালোচনা উপহার দিয়াছে। তিনি নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; সেখানে প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তি নাই, কিন্তু আটপৌরে রসবোধের আলোক-বর্তিকায় নাটকের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র হৃচ্চরিত্রের সন্ধানকে ভিত্তি করিয়া নাটক ও মহাকাব্যের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছিলেন এবং উপাখ্যানের গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়া মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের মধ্যে ভেদরেখা টানিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র এত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বা বিচারের মধ্যে যান নাই। নাটকের মধ্যে যাহা সবচেয়ে স্পষ্ট, সবচেয়ে স্থূল তাহার উপরে দৃষ্টি দিয়া তিনি নাটকের সকলের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন। নাটকের কোন কাহিনী যখন পরিবেশিত হয় তখন উহার মধ্যে নানা শক্তি বা নানান ব্যক্তির ঘাত-প্রতিঘাতই প্রাধান্য পায়। অক্ষয়চন্দ্র খুব সহজভাবে এই কথাটি বলিয়াছেন, 'যে-সে গল্প লইয়া অঙ্ক-দৃশ্য-বিচ্ছেদ করিয়া—কথোপকথনের ভঙ্গিতে পুঁথি লিখিলে, নাটক হয় না। গল্পের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের উপকরণ থাকা ত চাই, গল্পটিতে পূর্ণত্বও থাকা চাই।' (সাহিত্যসম্ভার, পৃঃ ১৯২) এই সিদ্ধান্তে তিনি পঁহুছিয়াছেন নাটক দেখিয়া ও পড়িয়া; হেগেলের দর্শন পড়িয়া লিখিলে এত সরলভাবে লিখিতে পারিতেন না। এই রচনার প্রকাশকাল ১২৯৪ সাল, এ. সি. ব্রাডলির শেক্সপীয়র-আলোচনার বহু পূর্ব্বে। ইহার আরও আগে—১২৮৩ সালে—তিনি 'আধুনিক বাঙ্গালা নাটক' আলোচনা প্রসঙ্গে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং নাটকের আখ্যানের সঙ্গে প্রকাশভঙ্গির অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্ক নির্দ্দেশ করিয়াছেন: 'সংসার তাড়নায়......চরিত্রগত পরিবর্ত্তন ও পরিণাম যখন নাটকের উদ্দেশ্য, এবং মানসিক আবেগের বা অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের "ঘাত-প্রতিঘাত"ই যখন নাটকের জীবন, তখন কথোপকথন বা স্বগত বচনই নাটকের একমাত্র দেহ।' (সাহিত্যসম্ভার, পৃঃ ২৬৯)* এই প্রবন্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ ইউরোপীয় poetic justice মতবাদের খণ্ডন। সাহিত্য নীতিগর্ভ হইবে ইহা অক্ষয়চন্দ্রের দৃঢ় মত, কিন্তু তিনি হাল্কা নৈতিকতা চাহিতেন না। কোন কোন লেখক বলেন, সংসারে থাকিয়া সুবিচার পাই না; কবি জগতের এই অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া দিবেন, তাঁহার

*এই প্রবন্ধটি 'বান্ধব'-পত্রিকায় লেখকের নাম ছাড়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন উহা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের লেখা। অক্ষয়চন্দ্র ইহা নিজের রচনার তালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান আলোচনায় সেই নির্দ্দেশই গৃহীত হইল।

কাব্যে শিষ্টের পরিপোষণ ও দুষ্টের দমনের ছবি থাকিবে। অক্ষয়চন্দ্র দুই একটি শব্দের দ্বারা এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় ইহা মত নহে, 'আব্‌দার'। 'অনেকে আব্‌দার করেন যে, ভগবানের সৃষ্টিতে সুবিচার হউক-না-হউক, অন্ততঃ কাব্যে সুবিচার চাই। এসকল কাব্যপ্রিয় শিশুপ্রকৃতির সমালোচক মহর্ষি বাল্মীকিকে দেখিতে পাইলে এইরূপ সৎপরামর্শ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন, "মহর্ষে! আপনি আপনার মহাকাব্যের পরিণামে সীতাদেবীকে পাতালগতা করাইয়া সুবিচারকের কার্য্য করেন নাই। আহা! সেইদিন যদি রামচন্দ্র সীতা সতীকে বামে বসাইতেন, তাহা হইলে কি শোভাই না হইত।" (সাহিত্যসম্ভার, পৃঃ ·৭৪) বালসুলভ আব্দার বা poetic justice মতবাদের ইহা অপেক্ষা সুন্দর সমালোচনা আর কোথাও দেখি নাই।

অন্যত্রও এই ভারসাম্য, এই পরিমাণবোধ—যাহা আটপৌরে বুদ্ধির লক্ষণ—দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের মধ্যে যে গর্হিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় অক্ষয়চন্দ্র তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের রচনার গুণসম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন না। তিনি বাগাড়ম্বর ও 'ছল কথা'র বিরোধী ছিলেন ; সেইজন্য সর্বান্তঃকরণে ভারতচন্দ্রের রচনাশৈলী প্রশংসা করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের কাব্যে যে অদ্ভুত শিল্প-কৌশল আছে, বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই বলিলেও চলে। (সাহিত্যসম্ভার, পৃঃ ২২৪) ভারতচন্দ্রের ও ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় যে গুণ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা হইল প্রসাদগুণ ও ভাষার পারিপাট্য (পৃঃ ২৫৮, ৫৭৭)। কিন্তু যখনই গরীয়সী ভাষার রূপচ্ছটা ভাবের উপর আধিপত্য পাইয়াছে তখনই তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন।

সাহিত্যসৃষ্টিতে অক্ষয়চন্দ্রের প্রধান দাবি ছিল দুইটি—ভাবের ও চিত্রের স্পষ্টতা ও ভাষার প্রসন্ন স্বচ্ছতা। তিনি ইংরেজি কবিতার যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই আটপৌরে মনোভাবের পরিচয় পাই। তিনি শেলি অপেক্ষা বায়রণকে বেশি পছন্দ করিতেন, শেলির অন্তর্জগৎ কুজ্মটিকাময়, বায়রণে জীবন্ত জলন্ত প্রতিমা ; শেলি বায়রণের শেড, বায়রণের ছায়াভাগ, বায়রণের কালিমার অংশ। অনুরূপ কারণেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী, কারণ এখানে ভাষার জটিলতা, কূটকাটব্য আছে, কিন্তু মূর্ত্তির অস্পষ্টতা নাই, ভাবের অসম্পূর্ণতা নাই। (সাহিত্যসম্ভার, পৃঃ ২৬৪-২৬৭) এইখানে অক্ষয়চন্দ্রের স্বদেশানুরাগের সঙ্গে সাহিত্যিক রুচির সমন্বয় হইয়াছে। তিনি

বাংলাসাহিত্যের অনুরক্ত ছিলেন, কারণ তাহার আবেদন প্রত্যক্ষ স্পষ্ট, তাহার সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘনিষ্ঠ। কমলাকান্তের ভঙ্গিতে তিনি কবিকে পাচকের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দেশী ঢঙের রান্নাই সমধিক সুস্বাদু। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'আমরা চণ্ডী ফেলিয়া চসার পড়ি, ভারত ছাড়িয়া পোপ পড়ি। চরিতামৃত ছাড়িয়া সনেট পড়ি।' (সাহিত্যসম্ভার, পৃঃ ২২৫) তাঁহার এই মত জাতিবৈরপ্রসূত নয়, সহজ বুদ্ধির সহজ সমালোচনা। ইহা আটপৌরে কাপড়ের মতই, ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য নাই, কিন্তু ইহা মজবুত, সাধারণ সাহিত্যচর্চ্চার পরিপোষক; যিনি অসাধারণ, অলৌকিক, গুহাহিত রহস্যের সন্ধান করেন তিনিও এই স্পষ্ট আলোকের সাহায্য লইতে পারেন।

॥ ৩ ॥

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, অক্ষয়চন্দ্র 'বঙ্কিমযুগের শেষ বীর'। মনে হয় এই আখ্যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে সমধিক প্রযোজ্য। অক্ষয়চন্দ্র জন্মিয়াছিলেন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আর তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে, হরপ্রসাদের জন্ম হয় অক্ষয়চন্দ্রের সাত বৎসর পরে এবং তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র—ইঁহাদের উভয়ের সম্পাদনকালে তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গল্প লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর আটাশ বৎসর পরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তিনি জীবনে আমার Friend. Philosopher and Guide ছিলেন। তিনি এখন উপর হইতে দেখুন যে, তাঁহার এই শিষ্যটি এখনও তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত।' (হরপ্রসাদের রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২) 'বঙ্গদর্শন' পত্রে তাঁহার প্রথম রচনা বোধ হয় 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি'। এই তিন কবির মধ্যে একজন বঙ্কিমচন্দ্র এবং এই প্রবন্ধের মূল সূত্রও বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে পাওয়া—সাহিত্যের অন্যতর প্রধান উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা। এই প্রবন্ধে তিনি গুরুর শিক্ষাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি নীতিবিরোধী বায়রণের মধ্যেও নীতিশিক্ষার সন্ধান করিয়াছেন; তাঁহার মতে বায়রণের 'বিদ্বেষ শুদ্ধ বর্ত্তমান সমাজের উপর, কিন্তু উহার নীচে মনুষ্যের জন্য সহানুভূতি পরিপূর্ণ।' এইরূপ কথা বঙ্কিমচন্দ্রও বলেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবানুকারিতাকে সৌন্দর্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নীতিশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করেন নাই। হরপ্রসাদের

মতে স্বভাব-বর্ণনায়ও নীতিশিক্ষা আছে; কালিদাসের সুখময়, শান্তিময় বর্ণনা পড়িলে শান্তিময় ভাব জাগ্রত হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাব বর্ণনায় শুধু শান্তি নয় তাহার উপর যেন একটু কিছু আছে। আর বায়রণের স্বভাব বর্ণনায় মূল কথা: 'সমাজে অত্যাচার, প্রণয়ে অত্যাচার, মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিতে ভালবাসে। সবই কষ্ট—কেবল স্বভাবের আনন্দই পরমানন্দ।'

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আনুগত্য দেখাইলেও হরপ্রসাদ অনেকাংশে বঙ্কিমগোষ্ঠীর ভিতরকার লোক নহেন। বোধ হয় ললিতকুমারের কথাই ঠিক, অক্ষয়চন্দ্রই বঙ্কিমযুগের শেষ বীর। হরপ্রসাদ সংস্কৃত, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাসে তাঁহার সবচেয়ে স্মরণীয় দান তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাংলায় তিনি দুইখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন এবং বহু বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। সেই সকল প্রবন্ধের মধ্যে কতকগুলি বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে। কিন্তু সেই প্রবন্ধগুলিকে ঠিক সাহিত্য সমালোচনা বলা যায় না, কারণ তথ্য নির্ণয়ই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। অন্য কতকগুলি প্রবন্ধে বা ভাষণে তিনি সংক্ষেপে দুই চার কথা বলিয়াছেন—সাহিত্যের বিশ্লেষণ বা বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কেও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; এই প্রবন্ধগুলিকে ঠিক সাহিত্যসমালোচনা বলা যায় কি না সেই বিষয়েও দ্বিধা উপস্থিত হইতে পারে। সুশীলকুমার দে ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন, তাঁহারাও এই বিষয়ে সসঙ্কোচে তাঁহাদের মত বলিয়াছেন। সুশীলকুমার দের মত উদ্ধৃত করিলেই চলিবে, 'কালিদাস সম্বন্ধে তাঁহার বহুসংখ্যক প্রবন্ধে হরপ্রসাদ যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক সাহিত্য-সমালোচনা নয়। প্রাচীন কবির কাব্য ও নাটক পাঠ করিয়া তাঁহার রসিক চিত্ত যে আনন্দ পাইত, সেই আনন্দ তিনি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন।...' শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার বলিয়াছেন, 'এই প্রবন্ধগুলির নামকরণ এবং রচনার ভাষা ও ভঙ্গি হইতেই বুঝা যায় যে ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের আগ্রহ জাগাইয়া তোলা। শুধু তাহাই নয়, নামকরণ এবং রচনার ভাষা ও ভঙ্গির মধ্যে রহিয়াছে চমৎকার সাংবাদিকসুলভ মনোভাব।' (হরপ্রসাদ-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড—পৃঃ জ)

হরপ্রসাদের সাহিত্যসমালোচনার মধ্যে যে অভিনবত্বের ইঙ্গিত আছে এই শিষ্যদ্বয় তাহা ধরিতে পারেন নাই। সুশীলকুমার বলিয়াছেন যে, কালিদাস-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি সাহিত্যসমালোচনা নয়; ইহাদের মধ্য দিয়া রসিক পাঠক অন্য পাঠকের মনে সাহিত্যের আনন্দ সঞ্চারিত করিতে চাহেন। কিন্তু রসের এই সঞ্চারণই তো সাহিত্যসমালোচনারও উদ্দেশ্য। ইঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া হরপ্রসাদের সমালোচনার বা ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যাইতে পারে। হরপ্রসাদ নিজেই এই নূতনত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন, '‥ ‥ভাষা ছাড়িয়া, ব্যাকরণ ছাড়িয়া, অলংকার ছাড়িয়া শুদ্ধ সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা নূতন! সৌন্দর্য্য বুঝাইতে গিয়া ভূগোল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, স্বভাব, নরচরিত প্রভৃতির কথা তোলা নূতন!' একজন প্রথিতযশাঃ সংস্কৃত পণ্ডিত সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাখ্যা বা আলোচনাকে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলংকারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন ইহা খুব নূতন বই কি। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেঘদূতের অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু সেই শক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি ইহার দুরূহতার কথা বলিয়াছেন, এবং ইহার কতটুকু প্রক্ষিপ্ত তাহা বিচার করিবার সময় 'পৌনরুক্ত্য, দূরান্বয়, কষ্টকল্পনা, ন্যূনপদতা, অধিকপদতা, অস্ফুটার্থতা, ব্যর্থবিশেষণতা' প্রভৃতি দোষের নিদর্শন দিয়াই বিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

হরপ্রসাদের আলোচনার মৌলিকতা এই যে, তিনি কালিদাসের জগৎকে এক অভিনব সৌন্দর্য্যময় জগৎ মনে করিয়া সেইখানে সানন্দে প্রবেশ করিয়াছেন এবং পাঠককে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন। এই জগৎ অপরূপ সৌন্দর্যময়। ভূগোল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্বের কোন নিজস্ব মূল্য নাই; ইহারা শুধু এই জগতের সীমানা নির্দ্দেশকার্য্যে সাহায্য করে। হরপ্রসাদ প্রথমে ১২৮৯ সালে 'বঙ্গদর্শন'-পত্রে তাঁহার মেঘদূত-ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ইহার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব—অর্থাৎ সাহিত্য নীতিশিক্ষা দিবে এই মত – অল্প-স্বল্প দেখা যায়: 'যক্ষের নিজের উন্মাদাবস্থাতেও পরের প্রণয়সুখে তাঁহার সুখ এবং পরের দুঃখে তাহার গাঢ় দুঃখ প্রতিপদে প্রকাশ হইতেছে।' (১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮০) কিন্তু এই প্রবন্ধেই তিনি সাহিত্যসমালোচনার নূতন সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথম দৃষ্টিতে মেঘদূতকে বিরহী যক্ষের কাহিনী বলিয়াই মনে হইবে, 'কিন্তু যাঁহারা প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিবেন তাঁহারা দেখিবেন যে যদিও সম্মুখে মেঘ ও যক্ষ বই আর কিছুই নাই, কিন্তু তাহার পশ্চাতে, দূরে, যতই প্রণিধানপূর্ব্বক

দেখ, অতি পরিস্ফুটরূপে একটি নূতন জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।' (পৃঃ ৪৬৮) বিশ বৎসর পরে তিনি যখন পুনরায় মেঘদূত-ব্যাখ্যা লিখিলেন তখন এই ভাবটিই প্রস্ফুট হইয়া উঠিল, নীতিশিক্ষার কথা পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে; মেঘদূত তাঁহার কাছে এক নূতন ধরণের মহাকাব্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে যেখানে 'সব নূতন সৃষ্টি,—পৃথিবী, গাছ, পালা, বন, জঙ্গল, স্ত্রী, পুরুষ, সমাজ, সামাজিক, সব ছাড়িয়া নূতন সৃষ্টি। মেঘদূত এক অদ্ভুত নূতন সৃষ্টি......।'

(দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫০৮)

সমালোচনায় এই যে নূতন সূত্র, নূতন পদ্ধতি ইহাই পরিপূর্ণ প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি প্রবন্ধে। সেইখানে কবির নূতন সৃষ্টিকে ভিত্তি করিয়া সহৃদয় কবি-পাঠক এক নূতনতর সৃষ্টি উপস্থাপিত করিয়াছেন। এমন কথা বলিতেছি না যে, রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদের রচনা পড়িয়াছিলেন বা তাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কোথায় রবিপ্রভবা প্রতিভার অপরূপ সৃষ্টি আর কোথায় পুরাণ ইতিহাস সমর্থিত বাংলা গদ্যে মেঘদূতের সারসংকলন। এই পার্থক্যের কারণ হরপ্রসাদের কবিপ্রতিভা ছিল না। কিন্তু ইহাই তাঁহার সমালোচনাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। ইহার দ্বারা তিনি মেঘদূতের জগৎকে বাস্তবতা দিয়াছেন। আর একটি বিষয়েও তাঁহার রচনায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। তিনি এমন সব চরিত্র লইয়া লিখিয়াছেন যাহারা নাটকের পুরোভাগে স্থান পায় নাই, হয়ত অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে। তিনি মালবিকাগ্নিমিত্র-নাটকের সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া প্রবন্ধের বিষয়ীভূত করিয়াছেন নায়িকা মালবিকাকে নয়, পরাজিতা মহিষী ইরাবতীকে। তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন শকুন্তলার মা মেনকা সম্পর্কে, যাহাকে রঙ্গমঞ্চে দেখা যায় না অথচ যাহার প্রভাব নাটকে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই সব রচনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপেক্ষিতাদের পূর্ব্বছায়া দেখা যায়। সমালোচনার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের যুগের মধ্যে সংযোগসেতুস্বরূপ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমোত্তর সমালোচনা—সূত্র (২)

॥ ১ ॥

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমালোচনার আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা বঙ্কিমের যুগ ছাড়াইয়া আসিয়াছি। তাই পূর্ব্বপ্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে খুব উচ্চাঙ্গের সমালোচনা লিখিয়াছেন, কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব সুফলপ্রসূ হয় নাই। তাঁহার সমালোচনার মধ্যে যাহা সূক্ষ্ম, যাহা অন্তর্দৃষ্টি ও পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের অপেক্ষা রাখে তাহা তাঁহার অনুবর্ত্তীরা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার রচনায় নব্যহিন্দুত্বের বা জাতিবৈরের যে আদর্শ আছে তাহা ইঁহাদের সাহিত্য সমালোচনায় সংক্রমিত হইয়াছে, যদিও তাঁহার নিজের সমালোচনায় ইহার স্পর্শ খুব প্রকট হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্ত্তীদের সমালোচনাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ জাতিবৈরিতার দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন আমাদের দেশের সাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে বড়, কালিদাস শেক্সপীয়র হইতে বড়, গিরিশচন্দ্রের করিমচাচা শেক্সপীয়রের ফলষ্টাফের সমগোত্রীয় এবং এমন কথাও শুনিয়াছি যে গিরিশচন্দ্রের ম্যাক্‌বেথ-অনুবাদ মূল নাটক হইতে উৎকৃষ্ট। আর এক শ্রেণীর সমালোচকেরা অপেক্ষাকৃত সংযতবুদ্ধি; ইঁহারা শুধু দেশীয় আদর্শের উপরে জোর দিয়াছেন। ইঁহারা এদেশীয় সাহিত্যকে, বিশেষ করিয়া বঙ্কিমসাহিত্যকে, আদর্শের অভিব্যক্তি হিসাবে দেখিয়াছেন; পরের সাহিত্যকে ছোট করিয়া দেখাইতে চাহেন নাই। এই দুই শ্রেণীর সমালোচকদের মধ্যে দুইটি সামান্য লক্ষণ আছে: উভয় শ্রেণীই সাহিত্যের ভাব ও বিষয়বস্তুর উপরে জোর দেন; সাহিত্য যে সূক্ষ্মশিল্প, অর্থ যে শব্দাশ্রিত সেই কথা মনে করেন না। আর উভয় শ্রেণীই মনে করেন যে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা দেওয়া, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির স্থান তাহার নীচে। যে অনপেক্ষা সাহিত্যসমালোচনার প্রধান গুণ তাহা উভয়ের কাহারও নাই।

প্রথমে প্রথম শ্রেণীর কথাই ধরা যাক্। ইঁহাদের কেহ কেহ রচনা-প্রণালীকে উপজীব্য করিয়া সাহিত্যসমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যেমন সারদাচরণ মিত্র। 'বঙ্গদেশীয় মহাকাব্য' প্রবন্ধে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন

যে, বঙ্গীয় কবিগণ 'অনুকরণ প্রবৃত্তিকে আদৌ সংযত করিবার চেষ্টা করেন নাই; তাঁহারা বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভারবি, মাঘ ও শ্রীহর্ষের প্রদর্শিত পথের উপেক্ষা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।' সেই পথও যে অনুকরণের পথ তাহা মিত্র মহাশয় চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। ইহার পর তিনি মধুসূদনের ত্রুটি দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয় মহাকাব্যে কাহিনী আরম্ভ হয় মাঝখানে আর আমাদের দেশের কবি আরম্ভ করেন একেবারে আদিতে। মধুসূদন ইউরোপীয় পন্থায় মেঘনাদবধ আরম্ভ করিয়াছেন আখ্যায়িকার মাঝখানে বীরবাহুর মৃত্যুর পর। সারদাচরণ মিত্র এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন, 'মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ প্রথম হইলে কি ক্ষতি হইত?' এই অভিযোগ সাহিত্যবিচারের অভিযোগ নয়, জাতিবৈরের অভিযোগ। মধুসূদন চতুর্থ সর্গের বিষয়ে আরম্ভ করিলে সহজে প্রথম সর্গের বিষয়ে আসিতে পারিতেন না, হঠাৎ বীরবাহুর মৃত্যুজনিত নিদারুণ অবস্থা কাহিনীতে যে দোলা দিয়াছে তাহা সম্ভব হইত না। মধুসূদন মহাকাব্য চতুর্থ সর্গে আরম্ভ করিলেও ঠিক বাল্মীকিপ্রদর্শিত পথে যাইতেন না; তাঁহাকে আরম্ভ করিতে হইত আরও আগে। অর্থাৎ তাঁহাকে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কাব্য লিখিতে হইত। এই জাতীয় আলোচনাকে সাহিত্যসমালোচনা বা মধুসূদনের কবিকৃতির বিচার বলা যাইতে পারে না। ইহা জাতিবৈরিতার উদ্গীরণ মাত্র।

সারদাচরণ মিত্র লিখিয়াছিলেন ১৩১৭ সালে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। ইহা অপেক্ষা আরও বিচারমূঢ় দুইটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিব; সেই প্রবন্ধ দুইটি আরও আগে লিখিত, প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের কালেই। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১২৯৯ সালে—অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায়ই—একটি প্রবন্ধ লিখিছিলেন কালিদাস ও শেক্সপীয়রকে তুলনা করিয়া (সাহিত্য, ১২৯৯)। এই প্রবন্ধে গ্রন্থকার কথার ধূম্রজাল রচনা করিয়া চারিটি জগতের পরিকল্পনা করিয়াছেন: বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধ (অর্থাৎ বুদ্ধির) আর আধ্যাত্ম জগৎ। এই বিচিত্র ও বিস্তারিত শ্রেণীবিভাগের কি সার্থকতা তাহা বুঝা যায় না। লেখকের মূল বক্তব্য খুবই স্থূল—কালিদাস সুন্দরের কবি; মাঘ, ভারবি, বায়রণ, শেলি প্রভৃতি অনেক কবিই পর্ব্বত বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু কোন কাব্যবর্ণিত পর্ব্বতই কালিদাসের হিমালয়ের মত সুন্দর নহে। সুন্দর বলিতে লেখক কি বুঝেন তাহা স্পষ্ট নয়, বিশেষতঃ কাব্য ও শিল্পের সৌন্দর্য্য ও জীবনের বা স্বভাবের সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি ঠিকমত পার্থক্য করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, কালিদাস সর্ব্বত্র অর্থাৎ গ্রন্থকারের পরিকল্পিত চারিটি জগতেই সুন্দর বস্তুর বর্ণনা করিয়াছেন, শেক্সপীয়র অসুন্দর বস্তুর বর্ণনা করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই চলিবে: 'আমরা কালিদাসে উৎকট ঘৃণা, বিকট ক্রোধ, কাম, জঘন্য লোভ, নৃশংস ঈর্ষ্যা প্রভৃতির উল্লেখ পাইব না…। কালিদাসে ইয়াগোর খলতা, ওথেলোর সংশয়, ক্লডিয়াসের কামিতা, ম্যাকবেথের দুরাশা, রিগনের পিতৃদ্বেষ, রিচার্ডের স্বার্থসন্ধি, ফ্যালষ্টাফের পাশবতা, ক্রেসিডার ইন্দ্রিয়তা, পলোনিয়াসের আত্মম্ভরিতা, টাইমনের স্বজাতিদ্রোহিতা নাই।' স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও হীরেন্দ্রনাথের রচনার ব্যঞ্জনা এই যে, যেহেতু কালিদাস সুন্দরের কবি, সেইজন্য তাঁহার কাব্যও সর্ব্বাধিক সুন্দর। এই জাতীয় তর্কের গোড়ায়ই একটা গলদ আছে। তাহা দেখাইয়াই এই প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করা যাইতে পারে। বাস্তবজীবনের —বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ প্রভৃতি সব জগতের—সুন্দর আর সাহিত্যের সুন্দর এক বস্তু নয়। বাস্তব জগতের দেস্‌দিমোনার পতিভক্তি ও সরলতা সুন্দর এবং ইয়াগোর খলতা অসুন্দর, কিন্তু সাহিত্যে উভয়ই সুন্দর; ইয়াগো দেস্‌দিমোনা অপেক্ষা অনেক বেশি সুন্দর। শেক্সপীয়রের চারিটি চরিত্র শিল্প হিসাবে সব চেয়ে বেশি সুন্দর—হ্যামলেট, ইয়াগো, ফলষ্টাফ ও ক্লিওপেট্রা। ইহাদের মধ্যে এক হ্যামলেটই সুন্দরের চিত্র, তাহাও খুব সীমিত অর্থে। শেক্সপীয়রের ইহাই বিশেষ কৃতিত্ব যে তিনি সুন্দর ও অসুন্দর বস্তু লইয়া পরিপূর্ণ, অনন্তবিস্তৃত রসজগৎ রচনা করিয়াছেন।

সমালোচনা সাহিত্যে জাতিবৈরিতায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট অভিব্যক্তি হইয়াছে পূর্ণচন্দ্র বসুর 'সাহিত্যে খুন' প্রবন্ধে (সাহিত্য, ১৩০২)। বিজাতীয় আদর্শ ও বিজাতীয় সাহিত্য অপেক্ষা আমাদের অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ ও সাহিত্য শ্রেষ্ঠ—এই বিশ্বাসের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অনেক সাহিত্যিকই লেখনী ধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিবৈরবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যখন কোন বিকৃত মনোভাব চরমে পহুঁছায় তখনই তাহার ভয়াবহ ও হাস্যকর দিক্‌টি সমধিক পরিস্ফুট হয়। সেই জন্যই পূর্ণচন্দ্র বসুর রচনাটির উল্লেখ করিতেছি, ইহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে, সাহিত্যিক মূল্য কিছুই নাই। পূর্ণচন্দ্র বলিতেছেন, 'আমাদের দেশে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে যেরূপ উচ্চ আদর্শ পাওয়া যায়, তাহা হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়।…ইউরোপ সে আদর্শ কোথায় পাইবে?' ওথেলো কর্ত্তৃক

দেস্‌দিমোনার হত্যাসম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, 'একজন প্রতারিত বুদ্ধিহীন মূরের মত লোকের প্রতি কিছু এত সহানুভূতি জন্মিতে পারে না যে, নিতান্ত নিরপরাধা স্ত্রীর হত্যা তাহার [কোন সহৃদয় ব্যক্তির] সহ্য হইবে।' শেক্সপীয়র লেখকের প্রধান আসামী, কিন্তু গ্রীক্ ট্র্যাজেডির উপরও তাঁহার কোপানল বর্ষিত হইয়াছে। গ্রীক্ ট্র্যাজেডিতে হত্যা সংঘটিত হইত রঙ্গমঞ্চে নহে—যবনিকার অন্তরালে। 'Horace বলেন—রঙ্গভূমে প্রকাশ্যরূপে খুন করাতেই দোষ, খুন যদি প্রকাশ্য রঙ্গভূমে কৃত না হয়, তাহাতে দোষ নাই। একথা কোন কাজেরই নহে। খুনের নাম শুনিলেই লোকে শিহরিয়া উঠে।...গ্রীক্ ট্র্যাজেডি এই ঘোর হত্যাকাণ্ডে কলঙ্কিত ছিল বলিয়াই যে সে দোষ গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ইউরোপে নাট্যকারগণ তাহা গ্রহণ করিয়া কুরুচিরই পরিচয় দিয়াছেন; তাই বলিয়া আমরাও কি তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদের হিন্দু নামে ও আর্য্যগৌরবে জলাঞ্জলি দিব?' পূর্ণচন্দ্র বসুর মতে শেক্সপীয়রের প্রধান প্রধান নাটক এক বীভৎস ব্যাপার। তবে তিনি সিম্বেলিন প্রভৃতি মিলনান্ত **tragi-comedy**র প্রতি অপেক্ষাকৃত সদয়; তাঁহার মতে এই সব নাটকই প্রকৃত ট্র্যাজেডি! অধিক উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন, মন্তব্য তো বটেই।

দুই একটি সমালোচনায় এই জাতীয় বিকারগ্রস্ত সংস্কার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। খুব একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৫ সালে বৈশাখ সংখ্যায়। প্রবন্ধটির নাম 'কালিদাস ও শেক্সপীয়র'। টাইলের খুব সাদৃশ্য নাই, কিন্তু ইহার মধ্যে যে পরিণত বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় প্রত্যাশা করা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ এই যুগকে আশ্রয় করিয়া 'সমালোচনা-সংগ্রহ' বাহির করিয়াছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পালও প্রধানতঃ এই যুগের সমালোচনার সংকলন করিয়াছেন 'সমালোচনা সাহিত্য' গ্রন্থে। ইঁহারা কেহই এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটিকে স্থান দিতে পারেন নাই। অর্থনীতিশাস্ত্রে একটা কথা আছে যে **bad penny good penny**-কে বাজার হইতে তাড়াইয়া দেয়। সম্পাদকদের নির্ব্বাচননীতি কি এই তত্ত্বেরই নিদর্শন? না, জাতিবৈর এখনও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নাই? এই প্রবন্ধের লেখকও বলিয়াছেন যে, কালিদাস মনুষ্যহৃদয়ের সুন্দর অংশ দেখাইতে পারেন; কিন্তু শেক্সপীয়রের পক্ষে সৌন্দর্য্য বাছিয়া লইবার দরকার ছিল না, যেহেতু অসুন্দরকে

সুন্দর করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। চরিত্রের জটিলতা ও বিস্তৃতিতে শেক্সপীয়র অতুলনীয়, কিন্তু বর্ণনায়, বিশেষতঃ বাহ্য জগদ্বর্ণনায় কালিদাসের সমকক্ষ কেহ নাই। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, ভাষা ও ভাবের সংযমে, তীক্ষ্ণ পরিমাণ-বোধে এই প্রবন্ধটি অনন্য।

॥ ২ ॥

যাঁহারা স্বদেশানুরাগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের সমালোচনায় ও জাতিবৈর-প্রণোদিত সমালোচনায় অনেক পার্থক্য। স্বদেশানুরাগীরা যে ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে স্বদেশী সাহিত্যের তুলনা করেন নাই এমন নহে। তবে ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য তুলনা নহে, দেশীয় সাহিত্যের মধ্য হইতে দেশীয় ভাবের উদ্ভাবন। কোন কোন সাহিত্যিক তুলনার সম্ভাব্যতা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের ভক্তেরা গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে শেক্সপীয়রের তুলনাকে গিরিশভক্তির চরম অর্ঘ্য বলিয়া মনে করেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁহার মতে 'মানব-হৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্ন দেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে বিভিন্ন।......এক দেশের নাটক অপর দেশের নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচিত হইতে পারে না।' তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন, 'ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে।' (নাট্যমন্দির, ১৩১৭) ইহার মধ্যে স্বাজাত্যাভিমান আছে, কিন্তু পরজাতিবৈরিতা নাই।

এইসব সমালোচকেরা উগ্র স্বদেশপ্রেমিক, কিন্তু সমালোচনাকালে ইঁহারা নিজেরাও ইউরোপীয় সমালোচনার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বসু বিলাতী জীবনচরিত রচনাপদ্ধতির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া দেশীয় পুরাণবর্ণিত কাহিনীকে আদর্শ জীবনচরিত বলিয়া উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যখন জীবনচরিতের মূলসূত্র ব্যাখ্যা করিলেন (সাহিত্য, ১৩১৯) তখন তিনি বিলাতী জীবনচরিতের ভিত্তিতেই অগ্রসর হইয়াছেন এবং ইংরেজি জীবনচরিতকার সিড্‌নী লী'র 'Principles of Biography' বক্তৃতাকে বাঙ্গালী জীবনচরিতকারের অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' প্রভৃতির প্রশংসা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন, 'বিদেশের সামগ্রী কেমন করিয়া স্বদেশে আমদানি করিতে হয়,

তাহা এই হাসির গানেই বাঙ্গালীকে তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন।' (সাহিত্য,১৩২০) ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (পাক্ষিক সমালোচনা, ১২৯১) যে নূতন প্রণালীর সমালোচনা ও বৈজ্ঞানিক সমালোচনার কথা বলিয়াছেন তাহা একেবারেই বিলাতী আমদানি। পুরাতন সমালোচনার সমালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'যদি কল্পনাকে ব্যাকরণ-অলঙ্কারের বিধি-বিধানে, সমালোচনা-শাস্ত্রের বিবিধ বন্ধনে অষ্টপৃষ্ঠে ললাটে পিটে-পিটে মোড়া দিয়া বাঁধা যায়, তাহা হইলে তাঁহার কোমলাঙ্গী কবিতা-কন্যার কি বিষম অপমৃত্যু ঘটে, তাহা বারেক অনুমানই করুন।' এই উক্তির লক্ষ্য যে প্রাচীন (সংস্কৃতানুসারিণী) সমালোচনা তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

উপরে সাধারণভাবে যে সমালোচক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইল তাঁহাদের সম্পর্কে গোড়াতেই দুই একটি কথা বলা দরকার। প্রথমতঃ, ইঁহারা অনেকেই সুলেখক। শ্রীঅরবিন্দের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের প্রত্যেক রচনার মধ্যেই মনস্বিতার স্বাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত সুপণ্ডিত, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক যে কোন দেশে বিরল; বুদ্ধির স্থিরতায় ও সামঞ্জস্যবোধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইঁহাদের প্রায় সকলের সাহিত্য সমালোচনাই একদেশদর্শী। ইঁহারা সমালোচনা বলিতে আদর্শের উদ্ঘাটন এবং **passions** বা উদ্ভাবিত রসের পরিচয় বুঝিতেন। এই যুগে অনেকেই বঙ্কিমের সমালোচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী প্রবন্ধের এক অনুচ্ছেদে সেই সমালোচনার বিচার করা যাইবে। বর্তমান প্রসঙ্গে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইঁহারা সবাই বঙ্কিমচন্দ্রকে 'স্বদেশাত্মার বাণীমূর্তি' হিসাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমের এক স্মৃতিসভায় যাইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বন্দেমাতরম্ মহামন্ত্রের ঋষির কাছে কথা-সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র একেবারে হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 'সমালোচনা-সাহিত্য' প্রবন্ধ হইতে পুনরায় উদ্ধৃতি করিয়া এই যুগের সমালোচকদের আদর্শ বিবৃত করিতে পারি: 'ধর্মের আধ্যাত্মিক অংশের ন্যায় কাব্যেরও আধ্যাত্মিক অংশ আছে, এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ ও সার অংশ। সেই আধ্যাত্মিক অংশ আধ্যাত্মিকভাবেই অনুভবনীয়, অন্যভাবে নয়। নব প্রণালীর সমালোচনা এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিমূলক।' এই সমালোচনার একটি লক্ষণ এই যে, যেহেতু ইহা আধ্যাত্মিক অনুভূতিকেই প্রাধান্য দেয়

সেইজন্য কাব্যের কলা-কৌশলের বিচার ততটা করে না। বাক্, অর্থ, গুণ, অলংকার, চিত্রকল্প, চরিত্র ও কাহিনীর যে সমন্বয়ে কাব্য গড়িয়া উঠিয়া একটি সামগ্রিক রূপ লাভ করে ইঁহারা সেই কথা তত্ত্বগত ভাবে মানিয়া লইলেও কার্যতঃ মানিতেন না। ইঁহারা চরিত্রের আলোচনা করিতে গেলে চরিত্রকে ভাবের বহিঃপ্রকাশ হিসাবেই দেখিয়াছেন, যেখানে ষ্টাইলের আলোচনা করিয়াছেন তাহাও আধ্যাত্মিক অনুভূতির অঙ্গ হিসাবেই করিয়াছেন। এই সব লক্ষণগুলির নিদর্শন হিসাবে পূর্ণচন্দ্র বসুর 'রামপ্রসাদ' প্রবন্ধ উল্লিখিত হইতে পারে। পূর্ণচন্দ্র বড় লেখক ছিলেন না, কিন্তু তিনি প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক। তাঁহার রচনায় জাতিবৈর কি আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'রামপ্রসাদ' প্রবন্ধে (আর্য্যদর্শন, ১২৮২) তিনি রামপ্রসাদকে 'প্রকৃত ভক্তিপথের পথিক' হিসাবে দেখিয়াছেন এবং ধর্ম্মতত্ত্বের নানা গূঢ় ও সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনায় প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি রামপ্রসাদের বাগ্‌ভঙ্গির প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিশ্লেষণ করেন নাই এবং যে উপায়ে এই বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি ও এই বিশিষ্ট ভক্তিবাদ কাব্যময় রূপ পাইল তাহা দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই।

বঙ্কিমোত্তর যুগের সমালোচকদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল অনেক দিক্ হইতেই স্মরণীয়। তিনি বাগ্মী, রাষ্ট্রনেতা ও ধর্ম্মপ্রচারক, সাহিত্যিক হিসাবে অপেশাদার। কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য্য মননশীলতা ছিল এবং তাঁহার রাষ্ট্রচিন্তা ও ধর্ম্মচিন্তা তাঁহার সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার সাহিত্যচিন্তা বঙ্কিমের আদর্শের দ্বারা উদ্বোধিত ও সঞ্জীবিত। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ছিলেন—উভয়ের মধ্যে বয়সের ব্যবধান মাত্র তিন বৎসর। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনুরাগী পাঠক হইলেও তাঁহার সাহিত্যচিন্তা রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত ; কখনও কখনও রবীন্দ্রবিরোধী। বিপিনচন্দ্র সমালোচনা করিয়াছিলেন প্রধানতঃ বঙ্কিমসাহিত্যের ও বৈষ্ণবসাহিত্যের। তাহার বিচার যথাস্থানে করা যাইবে। তিনি সাহিত্যতত্ত্ববিষয়েও সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রথমে তাহার আলোচনা করা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হয় না। ইহাই বিপিনচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার উৎস। অবশ্য তিনি এই মূলতত্ত্বকে নিজের মত করিয়া গড়িয়াছেন এবং তিনি এই তত্ত্ব যেভাবে পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বকীয়তাই সমধিক পরিস্ফুট হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে বলিয়াছেন

স্বভাবানুকারিতা বিপিনচন্দ্র তাহাকে বলিয়াছেন বস্তুতন্ত্রতা। তাঁহার মতে সাহিত্য স্বভাবের অনুসরণ করিবে এবং তাহা সাহিত্যিকের নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিবে। ইহাই বস্তুতন্ত্রতা। যে সাহিত্যে এই বস্তুতন্ত্রতা নাই, তাহা মনোহারী হইতে পারে, কিন্তু তাহা সৎসাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়িবে না, তাহা মায়িক বা অলীক। মধুসূদনের নিম্নলিখিত পদ্যটি :

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ।

বিপিনচন্দ্রের ভাল লাগিয়াছে ; কিন্তু ইহা ভাল কাব্য নহে, কারণ মধুসূদনের 'এ বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই।' 'রাখাল বালকেরা গ্রামে মাঠের প্রান্তে গাছতলায় বাঁশী বাজাইয়া নাচে ; মধুসূদন ইহাই দেখিয়াছিলেন। তারা যে বাঁশী বাজাইয়া প্রণয়িজনকে আহ্বান করে না, একথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।' (নারায়ণ, ১৩২২)

কাব্য ও সাহিত্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু তাহা বাস্তবের হুবহু অনুকরণ করিলে বস্তুতন্ত্রতা বাস্তবের দাসত্বে পরিণত হইবে, কল্পনার স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যাইবে। কবির কল্পনা বস্তুর বাহিরের রূপের অন্তরালস্থিত স্বরূপকে চিনিতে পারে ; এই স্বরূপ প্রাকৃতজনে দেখিতে পায় না। ইহা 'প্রত্যেক বিশিষ্ট পদার্থের আদর্শ ছাঁচ, স্ফুট স্বরূপ।' বিপিনচন্দ্রের মতে, বেদান্ত ইহাকেই বলিয়াছেন নাম-ও-রূপ। (সাহিত্য ও সাধনা, পৃঃ ৯৮–১২২) বলা যাইতে পারে ইহাই প্লেটো কল্পিত eldos বা আইডিয়া। কবি-কল্পনা বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠে, আবার বস্তুকে ছাড়াইয়া যায়। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (নবজীবন, ১২৯৩) এই স্বরূপের নাম দিয়াছেন স্বভাবের সূক্ষ্ম শরীর। তাঁহার মতে, কবি সংসারের 'সব' হইতে রকমারি বাছিয়া, মাজিয়া, ঘসিয়া, আবৃতকে অনাবৃত করিয়া, অনাবৃতকে আবৃত করিয়া যাহা তুলিয়া ধরেন তাহাই স্বভাবানুকারী ও স্বভাবাতিরিক্ত। কিন্তু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় কবির এই সংগ্রহ করিবার, বাছিয়া নেওয়ার এবং নূতন রূপ দেওয়ার কোন মানদণ্ড দিতে পারেন নাই। সেই কারণেই তাঁহার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ এই সমস্যার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বিপিনচন্দ্র এইখানে অধিকতর সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মনে করেন বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে কবির অনুভূতিও প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। বাস্তবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতি—ইহাদের

সম্মিলনেই বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে। এই মাপকাঠিতেই শ্রেষ্ঠ ও অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট কবিতার মধ্যে—**poems of imagination** এবং **poems of fancy**'র মধ্যে—পার্থক্য করিতে হইবে। প্রশ্ন হইবে, অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতির যাথার্থ্য বিচার করিব কোন মানদণ্ডে? এখানেও বিপিনচন্দ্র সাহসের সহিত প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, এখানেও সহৃদয় ব্যক্তিদের বহুকালসঞ্চিত ও বহুদেশব্যাপী যে অভিজ্ঞতা—যাহাকে ট্র্যাডিশান (**tradition**) বলা যাইতে পারে—তাহার সঙ্গে মিলাইয়া আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই হিসাবেই কাব্যের অর্থ সহৃদয়-হৃদয়সংবেদ্য এবং শেষ পর্য্যন্ত এই সার্ব্বভৌম অনুভূতিই কাব্যবিচারের মানদণ্ড। বিপিনচন্দ্র এই কথাগুলি ঠিক এইভাবে বলেন নাই, কিন্তু ইহাই তাঁহার বক্তব্যের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিপিনচন্দ্র সাহিত্যের তাৎপর্য্য বা বস্তুতন্ত্রতা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার মননশীলতার পরিচয় দেয়। তিনি আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের মধ্যে সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রাচীন আলংকারিকদের পরিকল্পিত সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যতার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তবু তাঁহার দেওয়া সমাধান সম্পর্কে দুই একটি আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে। তিনি কবির নিকট হইতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দাবি করিয়াছেন, ইহা বস্তুতন্ত্রতার লক্ষণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা কি সম্ভব অথবা তাহা কি অপরিহার্য্য? তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা লইয়া আপত্তি তুলিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে এখন বাদ দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহার সাহিত্যের উৎকর্ষ সর্ব্বজনস্বীকৃত সেই শেক্সপীয়রের নাটকের কথাই ধরা যাক্। শেক্সপীয়র মানুষের জীবনের যত চিত্র আঁকিয়াছেন, রাজা বাদশা হইতে আরম্ভ করিয়া ভিখারী ফকির পর্য্যন্ত সকল স্তরের যত চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও শেক্সপীয়রের ছিল এমন প্রমাণ কেহ দিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, বাস্তবের স্বরূপে প্রবেশ করিতে হইলেই বাহিরে যাহাকে বাস্তব বলি তাহাকে অনেক সময় সংশোধিত, পরিমার্জ্জিত বা অবলেপিত করিতে হয়। হ্যাম্‌লেট বলিয়াছিলেন যে, তিনি ওফেলিয়াকে চল্লিশ হাজার ভাইয়ের অপেক্ষা বেশি ভালবাসিতেন। চল্লিশ হাজার ভাইয়ের অভিজ্ঞতা কাহারও থাকিতে পারে না। বাস্তব জীবনে ভ্রাতার স্নেহ ও প্রণয়ীর প্রেম—ইহাদের মধ্যে তুলনাও সম্ভব নয়। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,

মাটীর জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাষ।
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস।

মাটীর জনমের পূর্ব্বে চাষের অভিজ্ঞতা চণ্ডীদাসের ছিল না, যেমন মধুসূদন রাখালকে কোন প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে বাঁশি বাজাইতে দেখেন নাই। চণ্ডীদাস চাষ করিতে দেখিয়াছেন, আর মধুসূদন রাখালকে বাঁশি বাজাইতে দেখিয়াছেন। বাকিটুকু কবিদের সংযোজনী কল্পনা এবং তাহাই কবিত্বশক্তি। অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, কবি যাহা ঘটে তাহার অনুকরণ করেন না; যাহা ঘটিতে পারে বা ঘটা উচিত ছিল তাহারই অনুকরণ করেন।

স্বদেশী যুগের বাস্তবপন্থী সমালোচকেরা কবিকে দেশপ্রেমের প্রবক্তা হিসাবে বিচার করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে হিন্দু সভ্যতার স্বরূপের সঙ্গে হিন্দু নাটকের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ রহিয়াছে; প্রথমটি না বুঝিতে পারিলে দ্বিতীয়টি বুঝা সম্ভব নয়। বিপিনচন্দ্র পাল নবযুগের বাংলার সাহিত্যিকদের আলোচনার ভূমিকায় বাংলার বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছেন। এই গোষ্ঠির অন্যতম লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করিতে ব্যগ্র ছিলেন; তাঁহার মতে বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্তের সংস্কৃতি হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিলেও তাহার মধ্যে—যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে—এমন একটা বিশিষ্টতা দান করিয়াছে যে তাহা সম্পূর্ণ নূতনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিশিষ্টতা সিদ্ধাচার্য্যগণের গীত ও দোঁহাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। (বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা—রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১-১৩) ইঁহারা প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে, প্রত্যেক দেশ বা সমাজের একটা বিশিষ্ট আত্মা আছে; যাঁটি সাহিত্যে তাহা প্রতিফলিত হয়। বস্তুতান্ত্রিক সমালোচকদের এই মত একটা অর্দ্ধসত্য। সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার ও দেশের বা সমাজের যোগ আছে এবং সেই যোগ রক্ষা করিয়াই সাহিত্য গড়িয়া উঠে। কিন্তু সেই সংযোগ সাহিত্যের গৌণ অংশ; তাহা না থাকিলে সহৃদয়ের মন প্রতি পদে ধাক্কা খাইবে। অভিনবগুপ্তের ভাষায় বলিতে পারি যে, সেই যোগ না থাকিলে রসাস্বাদ বিঘ্নিত হইবে। সেইজন্য মধুসূদন রাম লক্ষ্মণকে ছোট প্রতিপন্ন করিলেও সীতার সতীত্বকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু বিপিনচন্দ্রও অন্য প্রসঙ্গে স্বীকার

করিয়াছেন, 'স্রষ্টার গুণাগুণ তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে।' (নবযুগের বাংলা ; পৃঃ ২৯৩) শেক্সপীয়র এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের আত্মাকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই যুগের অন্যান্য লেখকের মধ্যেও সেই যুগের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। বরং বলা যাইতে পারে যে, ঐ সময়ের বিভিন্ন দিক্ মার্লো ও বেন জনসনের নাটকে যতটা প্রত্যক্ষ হইয়াছে শেক্সপীয়রের নাটকে ততটা হয় নাই। শেক্সপীয়র যে অন্য সবাইকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা যুগধর্ম্মের বলে নয়, স্বকীয় সৃষ্টিধর্ম্মের বলে। বাস্তববাদী সাহিত্য সমালোচনায় এই সৃষ্টিধর্ম্ম যথাযোগ্য মর্য্যাদা পায় না।

॥ ৩ ॥

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন খুব কমই, কিন্তু তাঁহার সেই সব প্রবন্ধ এত উচ্চশ্রেণীর যে তাহাদের পৃথক্ ও বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং দুইটি প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিমসাহিত্যের আলোচনাও করিয়াছেন, আবার তিনি রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ্ ছিলেন। তাঁহার রচনা ইঁহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও স্বকীয়তায় ভাস্বর এবং অন্ততঃ সাহিত্যতত্ত্ববিচারে তাঁহার রচনা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্রথমে, রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় যাহা গৌণ, যাহা তথাকথিত যুগধর্ম্মের স্বাক্ষর বহন করে তাহার কথা বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। তিনি কখনও কখনও সাহিত্যকে এবং সাহিত্যকীর্ত্তিকে স্বদেশীর মাপকাঠিতে বিচার করিয়াছেন। এই স্বদেশভক্তি তাঁহার বঙ্কিমসমালোচনাকে অংশতঃ প্রভাবান্বিত করিয়াছে। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে এই সমালোচনার কথা বলা হইবে। প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের ফলেই রামেন্দ্রসুন্দর হিন্দুসভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও বাঙ্গালীর স্বকীয় সংস্কৃতির অন্বেষণ ও অর্হণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। অন্যান্য বাঙ্গালী লেখকদের সম্পর্কে তিনি যে দুই একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার মধ্যেও স্বদেশপ্রীতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। রজনীকান্ত গুপ্ত ছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্—বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ ইঁহাদের এবং আরও অনেকের—যৌথ কীর্ত্তি। রজনীকান্তের সাহিত্যচর্চ্চায় যে গুণ তাঁহাকে সব চেয়ে বেশি আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা 'স্বজাতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ'। তিনি

স্বীকার করিয়াছেন যে, উমেশচন্দ্র বটব্যালের গবেষণায় অতিরঞ্জনজাত বিকৃতি ও অসত্য আছে এবং ইহা বৈজ্ঞানিকের শ্রদ্ধার অনধিকারী, কিন্তু তিনি বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, আধুনিক কৃতবিদ্যদের মধ্যে যে দুই চারিজন সুধী পুরুষ আপনার জাতিকে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল তাঁহাদের অন্যতম। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যেও স্বদেশের শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখিয়াই তিনি তাঁহার প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর শিল্পসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সৌন্দর্য্যের রহস্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তবে তিনি ইহাও বলিয়াছেন, বিজ্ঞান সত্যের ও সাহিত্য সৌন্দর্য্যের সন্ধান করে, কিন্তু উভয়েরই লক্ষ্য সত্যম্ ও সুন্দরম্-এর পশ্চাতে শিবম্। (চরিত-কথা)

এখন রামেন্দ্রসুন্দরের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। এইখানেই তাঁহার মৌলিকতা ও প্রাধান্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, কাব্যসৃষ্টির দুইটি লক্ষ্য থাকিবে, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও নীতিশিক্ষা। তিনি নিজে স্রষ্টা ছিলেন; সুতরাং সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন, কিন্তু এই প্রাধান্য দিয়াই বলিয়াছেন, কবি উন্নততর নৈতিক আদর্শের মনোহর চিত্র আঁকিবেন। এইভাবে নীতিশিক্ষা আবার প্রাধান্য পাইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর এই সম্পর্কটি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মনে করা যাইতে পারে যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে যাহা সহায়ক তাহাই আমাদের কাছে সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইবে এবং এইরূপ মনে করিতে পারিলে সৌন্দর্য্যের নৈতিক ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ মনে করার প্রধান বাধা এই যে, আমরা জীবনধারণের উপযোগী সব জিনিষকে সুন্দর মনে করিতে পারি না আর যে জিনিষ যুগপৎ সুন্দর ও উপযোগী তাহার সৌন্দর্য্যও উপযোগিতার অতিরিক্ত বলিয়াই উপভোগ করি। 'সৌন্দর্য্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহার উপভোগে কেবল তৃপ্তিমাত্র, সুখমাত্র……।' (জিজ্ঞাসা, পৃঃ ৪৫) তাহার সঙ্গে উপকারিতার সংস্রব নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর এই মতের সূচনা করিয়াছেন 'সৌন্দর্য্যতত্ত্ব'-প্রবন্ধে। (সাধনা, ১৩০০) ইহার সাত বৎসর পরে লিখিত 'সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি' প্রবন্ধে তিনি এই মতকে আরও দ্বিধাহীন, জোরাল ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে তিনি বলিয়াছেন, মানুষের সৌন্দর্য্যবুদ্ধি আগন্তুক; ইহা আনুষঙ্গিক লাভ মাত্র। এই জন্যই দেখা যায়, যিনি সৌন্দর্য্যবুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, সাধারণতঃ

তাঁহার বিষয়বুদ্ধি প্রশংসনীয় হয় না। তাই বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য কেবল উপভোগের সামগ্রী; কোনরূপ লাভের, কোনরূপ হিতের সম্পর্ক আনিতে গেলে তাহার শুদ্ধতা থাকে না। এইভাবে তর্ক করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোন প্রাকৃতিক কারণে এই আনন্দের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা বোধ হয় অসম্ভব। সকলেই স্মরণ করিবেন যে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের গোড়ার কথা। রস ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত—ইহাই রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলিয়াছেন এবং মনে হইতে পারে যে, রামেন্দ্রসুন্দর কবির এই মতের সমর্থনেই বৈজ্ঞানিক—দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

কিন্তু এইরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। রামেন্দ্রসুন্দর এই অতিরিক্তত্ববাদের সংকীর্ণতাও প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্পর্কে যে নিয়ম খাটে, মানুষের মনোজগতে তাহা প্রযোজ্য নহে। রসের যে সংজ্ঞাই দিই না কেন তাহার অধিষ্ঠানভূমি মানুষের হৃদয় ও মন এবং সেইখানে সৌন্দর্য্যবুদ্ধি প্রয়োজন ও শুভাশুভের সঙ্গে নিবিড় সংযোগে আবদ্ধ। যদিও আদিম মানুষেরও সৌন্দর্য্যবোধ ছিল, তবু ইহাও মানিতে হইবে যে, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের উন্নততর সভ্যতার ও পরিণত ব্যক্তিত্বের লক্ষণ এবং তাহা বুদ্ধির সঙ্গে, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে অসম্পৃক্ত হইতে পারে না। ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, ময়ূরের পুচ্ছ বা কোকিলের গানের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ব্যবহারিক উপযোগিতার কোন সম্পর্ক নাই, তবু মানুষের অন্তর-জগতের সম্পর্কে সে কথা খাটে না। মানুষের সব চেয়ে তীব্র অনুভূতি দুঃখবোধ এবং রামেন্দ্রসুন্দরের মতে করুণ রসই শ্রেষ্ঠ রস। ইহার সমর্থনে বলা যায় যে, ট্র্যাজেডিই শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে সচরাচর আদৃত হইয়া থাকে। মানুষ শুধু যে দুঃখবোধের তীব্র অভিব্যক্তি দেয় তাহাই নয়, সে এমন সব বস্তুর মধ্যে আশ্রয় খোঁজে যাহারা দুঃখবোধের মধ্যে তাহার মনে আশ্বাস ও আশার সঞ্চার করিতে পারে। এই জন্যই সৌন্দর্য্য তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়; 'যাহাতে জীবন-সংগ্রামে আমাদের ভীতির ভাব কোনরূপে কমাইয়া দেয়, তাহারই প্রতি মন স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়, তাহাই দেখিতে ভাল লাগে; যেমন সুগঠিত বলিষ্ঠ নরদেহ; যেমন স্বাস্থ্যশোভাসম্পন্ন যুবতীর আরক্ত গণ্ডদেশ; যেমন দৃঢ়মূল ছায়াবিস্তারী মহীরুহ; যেমন দৃঢ়ভিত্তি সৌষ্ঠবসম্পন্ন অট্টালিকা।'

আর এক দিক্ হইতেও লৌকিক, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের

সম্পর্ক আছে। কোকিলের গান শুনিয়া কোকিলা কেন মুগ্ধ হয় জানি না; বিবর্ত্তন বা evolution তত্ত্বে বিশ্বাসী ইহার মধ্যে জিরাফের লম্বা গলার মত কোন জৈবিক সূত্র আবিষ্কার করিতে পারেন; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানুষের কাছে কোকিলের গান বা ময়ূর পুচ্ছের সৌন্দর্য্য অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে সে কথা খাটে না। এখানে দেখিতে পাই, মানুষ দুঃখভাবে পীড়িত বোধ করে বলিয়াই সেই সকল প্রবৃত্তিকে সুন্দর মনে করে যাহা মমত্ববোধকে জাগ্রত করে, একের সঙ্গে অপরের বন্ধন দৃঢ় করে যাহা প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির সম্মুখে আত্মাকে ম্রিয়মাণ হইতে নিষেধ করে। এই হিসাবে সৌন্দর্য্যবোধ জীবনরক্ষার সহিত সম্বন্ধ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ট্র্যাজেডি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রকরণ এবং করুণ রস শ্রেষ্ঠ রস। ট্র্যাজেডি মানবের দুঃখের কাহিনী, অলজ্ঘনীয় দৈবের নিপীড়নের কাহিনী, কিন্তু ইহা ট্র্যাজেডির নায়কের সঙ্গে মমত্ববোধও জাগায় এবং পরাভূত মানবের অপরাজেয় আশা আকাজ্ক্ষা-সংগ্রামশীলতার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। ম্যাক্‌বেথ ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—দুইখানি বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাজেডি. ইহাদের বিস্তারিত বিচার করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর দেখাইয়াছেন যে, উভয় গ্রন্থেই পরার্থপর প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় এবং এই ভাবে তিনি সৌন্দর্য্য ও জীবন রক্ষার সম্বন্ধ সুস্পষ্ট করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচনা আর এক দিক্ দিয়াও তাৎপর্য্যপূর্ণ। সাহিত্য-সমালোচনা সাধারণতঃ সাহিত্যের content ও form-কে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাদের বিশ্লেষণ করে এবং সেই জন্য ইহাদের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য খণ্ডিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর content বা বিষয়-বস্তুরই ব্যাখ্যা দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া উল্লেখিত দুই গ্রন্থের রূপাঙ্গিকও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই বিচারে তাঁহার অন্যতর সাহিত্যিক প্রবন্ধ—'মহাকাব্যের লক্ষণ'—আরও বেশি উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন মহাকাব্যে বিধৃত মহাজীবনের পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এই মর্ম্মকথার সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য—তাহার বিশালতা, তাহার স্বাভাবিকতা, তাহার অযত্নবিন্যস্ত সৌন্দর্য্য—উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বিশেষতঃ হিমালয়ের সঙ্গে তুলনার দ্বারা মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যের আঙ্গিক ও মর্ম্মগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ সমালোচনা কাব্যের এই পরিপূর্ণ রূপটিই ধরিতে চেষ্টা করে। রামেন্দ্রসুন্দর মহাকাব্যের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমালোচনার স্বাক্ষর রহিয়াছে।

॥ ৪ ॥

আর দুই জন বিশিষ্ট লেখকের আলোচনা করিয়া বঙ্কিমোত্তর যুগের সাধারণ বিবরণ শেষ করিব। ইঁহারা হইলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। পাঁচকড়ি বিপিনচন্দ্রের মতই 'নারায়ণ'-গোষ্ঠির লেখক, বিপিনচন্দ্রের মতই তিনি দেশের আত্মাকে জানিতে চাহেন এবং তাহাই সাহিত্য বিচারে তাঁহার মাপকাঠি। অনেক সময় তিনি সাহিত্যবিচার করিতেই চাহেন নাই; ইন্দ্রনাথ ও নবীনচন্দ্র সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, ইঁহাদের সাহিত্যের গুণাগুণ বিচারের সময় এখনও আসে নাই, ইঁহাদের মধ্যে স্বদেশাত্মার যে মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছে তিনি তাহারই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিপিনচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের মত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বদেশানুরাগের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছেন, জাতিবৈরের দ্বারা নহে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই পার্থক্য দেখান যাইতে পারে। চন্দ্রনাথ বসু পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে খাঁটি জীবনচরিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে ইংরেজি জীবনচরিতের নিন্দা করিয়াছেন। পাঁচকড়ির দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষাকৃত উদার। তাঁহার বিচারও সংযত। তিনি পুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন; ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি দান্তের কাব্যের সঙ্গে তিনি পুরাণের সাদৃশ্য দেখিয়াছেন। কিন্তু পুরাণের মধ্যে যেখানে জীবনচরিত বা ইতিহাসের বীজ আছে আর যেখানে তাহা নাই ইহাদের পার্থক্যের কথাও তিনি বলিয়াছেন: 'পুরাণের আখ্যায়িকার উপাখ্যান সকলের কতটুকু গ্রাহ্য এবং কতটুকু অবহেলার যোগ্য, তাহার বিধিও নির্দ্দিষ্ট ছিল। লীলা আখ্যান যাহা তাহার রস গ্রহণ করিতে হয়। ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে নাই।...... যাহা ইতিহাসের উপাখ্যান, তাহার ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, যেমন হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, নলোপাখ্যান ইত্যাদি।' (রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯) বিদেশ হইতে আমাদের সাহিত্যিকেরা যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তিনি সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন। বরং হেমচন্দ্রের কাব্য সম্পর্কে তিনি এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন, 'মধুসূদন যে ভাবে পরস্বকে নিজস্ব করিতে পারিয়াছিলেন, মধুসূদন যে দেশী মশলায় পরস্বকে ছানিয়া নিজস্ব করিতে পারিয়াছিলেন, সে মশলার ব্যবহার হেমচন্দ্র জানিতেন কি?' ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যে **Individualism** বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শিখিয়াছি, বিশেষ করিয়া কোমত দর্শন হইতে যে **Humanitarianism** বা মানবতা-ধর্ম্ম

অবলম্বন করিয়াছি, নবীনচন্দ্রকে তিনি তাহারই মহাকবি হিসাবে বরণ করিয়াছেন।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশানুরাগের আর একটি দিক্ উল্লেখ করা এইখানে প্রাসঙ্গিক হইবে। তিনি স্বদেশের আত্মা বলিতে সমগ্র দেশের আত্মাকে বুঝিয়াছেন, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত অভিজাতদের সংস্কৃতি বুঝেন নাই। এই বিষয়েও বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার ঐকমত্য ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পর্কে আলোচনার অবসরে বিপিনচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস বা কাশীরাম, ভারতচন্দ্র বা মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদ বা দাশরথি রায়, ইঁহারা বাঙ্গালী সাধনাতে যে স্থান পাইয়াছেন, আধুনিক যুগের কোন সাহিত্যিক সে স্থান কখনও পাইবেন বলিয়া মনে হয় না।…বর্ত্তমান সমাজের বিচ্ছিন্ন অবস্থা এর জন্য দায়ী।…কথাটা বলিতে ক্লেশ হয়, কিন্তু তথাপি ইহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়, যে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, —ইঁহাদের কেহ প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রাণরাজ্যে এখনও প্রতিষ্ঠিত হন নাই।' (সাহিত্য ও সাধনা, পৃঃ ৭৬-৭৯) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন একাধিক প্রসঙ্গে। হেমচন্দ্র সম্পর্কিত প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন 'আজ নীলকণ্ঠের গান হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে সুপ্রচলিত ; রবীন্দ্রনাথের গান হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে কেহ করিতে চাহে না। …স্রোতের শেহলার মতও এই যে ইংরেজী-গন্ধী সাহিত্য সমাজ-সাগরের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে, যাহার জন্য আমরা এতটা মাথা-কোটাকুটি করিতেছি—একটা তুফান উঠিলে, ঢেউয়ের মুখে উহা কোথায় তলাইয়া যাইবে।'

পূর্বে একাধিকবার বলা হইয়াছে। তবু পুনরুক্তির প্রয়োজন যে, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখক সাহিত্য সমালোচনার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহারা সাহিত্যের চেয়ে বড় কিছু খুঁজিতেন। এই প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুইটি গান' প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপরিজ্ঞাত পদকর্ত্তার—লোচনদাস বা গোবিন্দদাসের (?)—বিরহবিধুর পদ ঢালিয়া সাজিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থে পদাবলীর ভঙ্গিতে এক স্বদেশপ্রেমমূলক গান রচনা করিয়াছিলেন :

এস, এস বঁধু এস
আধ আঁচরে বস
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। ইত্যাদি

মূল পদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গানের তুলনা করিয়া লেখক মহাজনপদের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বঙ্কিমরচিত গানে 'ভাব-বিপর্য্যয় ও রসবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।' এই জাতীয় তুলনাই আপত্তিজনক। বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণব পদাবলী হইতে একটি পদ উদ্ধার করিয়া তাহাকে আধুনিক রূপ দিয়া দেশাত্মবোধক অপূর্ব্ব গদ্য কাব্যের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গ হইতে গানটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাই সমালোচনা-বিপর্য্যয়।

এই সকল সমালোচকেরা প্রকৃত সাহিত্যবিচার করিতে পারেন না। ইঁহারা ভাব ও ভাষাকে পৃথক করিয়া ভাষাকে প্রলেপের মত বিচার করেন। যখন ইঁহারা ভাব বা বিষয়বস্তুর কথা বলেন তখন ইঁহাদের আলোচনা অপরিণত দার্শনিক ব্যাখ্যার মত শোনায় আর যখন ভাষার কথা বলেন তখন শূন্যগর্ভ অলংকার বা রীতির বিবরণে পর্য্যবসিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক উৎকর্ষ বুঝাইতে গিয়া পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'তিনি স্ফুটোক্তির সাহায্যে বিরোধালংকারের অভিব্যঞ্জনা ঘটাইয়া এমন একটি অভিনব রসের অবতারণা করিতেন যে, শ্রবণমাত্রই পাঠকগণ ও শ্রোতৃমণ্ডলী অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া যাইত। ইহা ইংরেজি **climax** ও **antithesis** এই দুইয়ের সমবায়ে প্রায়ই ফুটান হইত; অনেক ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা-মালোপমার সম্মিলনে অপুর্ব রসের সঞ্চার করা হইত।' এই জাতীয় সাহিত্যালোচনা অলংকারের হিং টিং ছট ছাড়া আর কিছুই নয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী হিমালয়ের সঙ্গে বিস্তৃত তুলনার মাধ্যমে মহাকাব্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং তাঁহার আলোচনায় মহাকাব্যের ভাব ও রূপের সম্মিলিত সৌন্দর্য্য প্রতিভাসিত হইয়াছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও একটি উপমার সাহায্যে নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের গুণ ব্যাখ্যান করিতে চাহিয়াছেন: প্রৌঢ় শরতের শেফালী-বর্ষার ন্যায় তাঁহার ভাষা আপনি আসে আপনি ফুটে, আর আপন সৌরভে দশদিক্ আমোদিত করিয়া দেয়।' উপমাটি সুন্দর, কিন্তু ইহার সাহায্যে নবীনচন্দ্রের কাব্যসৌন্দর্য্য বুঝা যাইবে না।

পূর্ব্বে যাঁহাদের কথা আলোচনা করা হইয়াছে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহাদের অপেক্ষা একটু বিভিন্ন। তিনি সাহিত্যালোচনায় স্বদেশানুরাগদ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছেন; ইহা এই যুগের একটা লক্ষণ। কিন্তু তিনি রাজনীতিক নহেন, প্রচারক নহেন, দার্শনিক নহেন, পুরোপুরি সাহিত্যিক। খুব অল্প

বয়সে তিনি 'সাহিত্য'-পত্রের সম্পাদকরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন এবং দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত এই কাজ সম্পন্ন করেন। এক সময়ে 'সাহিত্য' সাহিত্যজগতে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং সম্পাদক সুরেশচন্দ্রও বেশ একটা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার নাম শুধু সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের কাছেই পরিচিত। এই বিস্মৃতির জন্য দায়ী সুরেশচন্দ্র নিজেই। তিনি দীর্ঘ, বিস্তৃত সমালোচনা লিখিয়াছেন খুব কম। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর তিনি মাসিক সাহিত্যের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করিতেন। তৎকালে এই সমালোচনার বিশেষ মর্যাদা ছিল। কিন্তু এই ক্ষণজীবী সাহিত্যের সমালোচনাও স্থায়ী স্বীকৃতি দাবি করিতে পারে না।

সুরেশচন্দ্র কয়েকটি নাতিদীর্ঘ সমালোচনাপ্রবন্ধ লিখিয়াছেন—বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অক্ষয়কুমার বড়াল সম্পর্কে এবং কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূত সম্পর্কে। এই সব সমালোচনার মূলসূত্র দুইটি—স্বদেশানুরাগ ও নীতিবোধ। তিনি এই দুই সূত্রের দ্বারা চালিত হইয়াছেন বলিয়াই কাব্যের গভীরতর বিশ্লেষণে ও বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। এই কারণে তাঁহার সমালোচনা ভাসা-ভাসা বলিয়া মনে হয়; সাহিত্যিকের সাহিত্যসমালোচনায় সাহিত্যিকতা কম। যাঁহারা সুরেশচন্দ্রের খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই সকল সমালোচনা পড়িবেন তাঁহারা তৃপ্তি পাইবেন না; বিশেষতঃ এই যুগের সমালোচনার যাহা প্রধান দুর্লক্ষণ—উচ্ছ্বাসপ্রবণতা—তাহার আধিক্যে পীড়িত বোধ করিবেন। তিনি মধুসূদনের কবিকৃতির বিশ্লেষণ ও বিচার করেন নাই; মধুসূদনের সমবেদনা, সহানুভূতি ও সর্ব্বোপরি তাঁহার স্বদেশপ্রীতি তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত অতিশয়োক্তিতে প্রণোদিত করিয়াছে: 'মাইকেলের বঙ্গভূমির প্রতি সম্ভাষণ দেশ-তন্ত্রের প্রথম গান—দেশভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাস—স্বদেশী কবির প্রথম ঝঙ্কার। মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গ বাঙ্গালীর জীবনবেদ হউক।' অক্ষয়কুমার বড়ালের 'প্রদীপ'-কাব্যের যে 'প্রস্তুতি' সুরেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও এই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে: 'অক্ষয়কুমার প্রেমের কবি, কিন্তু বাঙ্গালীর সৌভাগ্যক্রমে তিনি লালসার শিখা—আলেয়ার আলোয় মুগ্ধ হন নাই।...লালসার অঙ্কুর উদ্গত হইবা মাত্র কবি স্বয়ং তাহা পদদলিত করেন।' অক্ষয়কুমার দুঃখবাদেরও কবি কিন্তু এই দুঃখবাদ প্রতীচ্যের দুঃখবাদের মত 'আত্মনাশের প্রবর্ত্তক নয়।' ইহা হিন্দুর দুঃখবাদ

যাহা 'সুখের নন্দনকানন' এবং 'আত্মজ্ঞানের তপোবনের' সন্ধান দেয়। ফল কথা অক্ষয়কুমার বৃহত্তর মানবিকতার কবি।

নীতিবাদী সমালোচক কালিদাসের মেঘদূতকে লইয়া মুস্কিলে পড়িয়াছেন। মেঘদূত কাব্যের সৌন্দর্য্য অবিসংবাদিত কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য বহ্নিমান্ লালসার শিখায় দেদীপ্যমান। কাজেই সুরেশচন্দ্র নিজের ও অপরের আনন্দবোধের জন্য নানা কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃতি দিলেই তাঁহার এই মুস্কিল ও মুস্কিল আসানের চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইবে : 'যক্ষের আকাঙ্ক্ষা প্রণয়িনীর শারীরিক সৌন্দর্য্য লইয়া; যক্ষের অলকা-বর্ণনা একজন বিলাসীর কাল্পনিক স্বপ্নভূমির কাহিনীমাত্র।·· যাঁহারা মানুষের প্রেম হইতে শারীরিক সৌন্দর্য্য-লালসা একেবারে বাদ দিয়া একটা অতি উচ্চরকমের মানসগত (ideal) ভালবাসা নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের সহিত, এক্ষেত্রে কালিদাসের খুব অল্প সহানুভূতি।···কবি আমাদিগকে···সৌন্দর্য্যের মূলে আনিয়া ফেলেন। কবির সাহায্যে আমাদিগের এই জগতের সুখের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।' এই ভাবে তিনি নীতিনিরপেক্ষ কাব্যের নীতিমূলক প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজেই এই যুক্তিকে যথেষ্ট মনে না করিয়া যক্ষকে ছাড়িয়া যক্ষপত্নীকে আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'যক্ষকে কামী বলা যায়, কিন্তু যক্ষপত্নীর প্রতি লালসার আরোপ করা যায় না। তাহার প্রশান্ত ভাব ও নীরবতা, বাস্তবিকই বড় প্রশংসনীয়।' (সাহিত্য, ১২৯৮)

উপরে সুরেশচন্দ্রের সমালোচনার যে পরিচয় দেওয়া হইল তাহা হইতে তাঁহার শক্তির পরিমাপ করা যাইবে না। তিনি 'ত্বরিত-ভঙ্গুর' মাসিক সাহিত্যের যে সমালোচনা করিতেন তাহার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর সমালোচনাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপে অ্যারিষ্টটল হইতে ডক্টর জনসন পর্য্যন্ত যে ক্লাসিক সমালোচনাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে বাংলা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাহাই প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছেন। মনে হয় এই ক্লাসিক ভঙ্গি তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ বা স্বোপার্জ্জিত; তিনি ইউরোপ হইতে ইহা গ্রহণ করেন নাই। ক্লাসিক সমালোচনারীতির বৈশিষ্ট্য কয়েকটি উদ্ধৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে। অন্যান্য ক্লাসিক সমালোচকদের মতই সুরেশচন্দ্র অতিভাষণের বিরোধী ছিলেন। ১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসের 'প্রদীপ'-পত্রিকায়

প্রকাশিত জলধর সেনের 'হিমালয়বক্ষে' প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, 'খরবাহিনী নদনদীর দ্রুতস্রোতে ক্ষুদ্র উপল যেমন ভাসিয়া যায়, "সেন্টি-মেণ্ট্যালিটি"র প্রবল প্রবাহে ভ্রমণবৃত্তান্তের অতি সংক্ষিপ্ত উপাদানটুকু তেমনই কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। সহৃদয় লেখকের যে ভাবুকতা ও সুচিন্তা রত্নকণার ন্যায় "হিমালয়ে"র সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে, ক্রমাগত তাহারই পুনরাবৃত্তি "রাংতা"র ন্যায় "খেলো" হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি ফেনাইবার গুণে অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাবুকতা রবার নয় যে, টানিলেই বাড়িতে থাকিবে।'

ক্লাসিক সমালোচনার অন্যতম প্রধান লক্ষণ বুদ্ধির দীপ্তি। ইহা আকাশ-বিহারী কল্পনার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারে না; তাহাই ইহার দুর্বলতা। কিন্তু স্পষ্ট, প্রসাদগুণবিশিষ্ট রচনার উপরে জোর দেয় বলিয়া ইহা আতিশয্যকে সংযত রাখে। অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকরা শেক্সপীয়রের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতেন, কিন্তু তাঁহার সুদূরপ্রসারী কল্পনার সঙ্গে ইঁহাদের বুদ্ধি পক্ষবিস্তার করিতে পারিত না। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির রবীন্দ্রসমালোচনা খানিকটা এই ধরণের; মনে হয় ড্রাইডেন কিংবা পোপ বা তাঁহাদের অনুবর্ত্তী কেহ শেক্সপীয়রের সমালোচনা করিতেছেন। গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে অধিক উল্লেখ করিতে পারিব না। একটি উদ্ধৃতি হইতেই এই শ্রেণীর সমালোচনার বৈশিষ্ট্য বোঝা যাইবে। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "প্রবাসী" কবিতাটি কষ্টকল্পনার কলঙ্কে অত্যন্ত মলিন। কৃত্রিম ভূষণের ভারে কবি আপনার "মানসী"কে নিতান্ত পীড়িত করিয়াছেন। স্বচ্ছন্দলীলা ও সুষমার অভাবে কবিতাটি ব্যর্থ হইয়াছে।' (সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮) এই সমালোচনা সমালোচকের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়, কিন্তু এই জাতীয় সমালোচনা নিরর্থক নয়।

ক্ল্যাসিকাল সমালোচনায় প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য অঙ্গসৌষ্ঠব, পূর্ব্বাপরসামঞ্জস্য, পরিমিতিবোধ। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন, 'আমরা রবীন্দ্রবাবুর "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন" পড়িতে আরম্ভ করিলে যেমন আমোদ পাইয়াছি, উপসংহারে তেমনই নিরাশ হইয়াছি। এই গল্পটির আরম্ভভাগ অতি মনোরম; বেশ স্বাভাবিক। ইহার প্রাঞ্জল ভাষা, সরল প্রণালী ও সহজ অলংকারে গল্পটিকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। আদুরে খোকার খামখেয়ালি মেজাজ কেমন স্বাভাবিক! কিন্তু যখন রাইচরণ

নিজের বুড়ো খোকাটিকে, মুন্সেফবাবুর সেই আদুরে খোকা বলিয়া আনিয়া দিতেছে তখন আমাদের কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। মুন্সেফবাবু যেন গল্পটি সমাপ্ত করিবার জন্যই, সন্দেহ সংশয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, পরের ছেলেটিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এইজন্য গল্পটি কেমন অঙ্গহীন ও কষ্টকল্পিত বলিয়া বোধ হয়।' (সাহিত্য, ১২৯৮)

রবীন্দ্রভক্তের কাছে এই সব সমালোচনা মুখরোচক হইবে না, কিন্তু ইহার মধ্যে যে খানিকটা যাথার্থ্য আছে, অন্ততঃ ইহার পরিপ্রেক্ষিতে যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, তথা যে কোন সাহিত্য. ভাল করিয়া বুঝা যায় তাহা নিরপেক্ষ সাহিত্যরসিকমাত্রই স্বীকার করিবেন। আমাদের মন্তব্য সুরেশচন্দ্রের প্রতি মরণোত্তর উপদেশের মত শোনাইবে। তবু মনে হয় তিনি যদি তাঁহার স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনার ব্যাপকতর ও বিস্তৃততর সমালোচনা করিতেন তাহা হইলে তিনি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন ও স্থায়ী সম্পদ্ রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে অন্যরূপ। যেখানে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন সেইখানে স্বদেশানুরাগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্বকীয় শক্তির প্রকাশ হয় নাই। আর যেখানে সেই শক্তির প্রকাশ হইয়াছে সেইখানে বিষয়বস্তুর ক্ষণিকতার জন্য অথবা আলোচনার সংক্ষিপ্ততার জন্য তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে যোগ্য জায়গা করিয়া লইতে পারেন নাই। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্তৃক লিখিত সমালোচনা অপচিত শক্তির নিদর্শন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমোত্তর সমালোচনা—প্রয়োগ

॥ ১ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে সমালোচনায় যে রীতি ও পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা বলা প্রয়োজন যে, সমালোচনায় এই রীতি সম্পূর্ণ বঙ্কিমী রীতি নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাহিত্যসৃষ্টির দুইটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও নীতিশিক্ষা। তিনি যে সকল কবির আলোচনা করিয়াছেন বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি তাঁহাদের কাব্যের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকেরা জোর দিয়াছেন নীতিশিক্ষার উপর। তিনি জাতিবৈরিতার সমর্থন করিয়াছেন, আধুনিক স্বদেশানুরাগের তিনি প্রধান প্রবক্তা এবং বন্দেমাতরম্ মহামন্ত্রের ঋষি। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যসমালোচনা সাধারণতঃ স্বদেশানুরাগের দ্বারা প্রভাবিত বা জাতিবৈরিতার দ্বারা বিকৃত হয় নাই। তাঁহার অনুবর্ত্তীদের সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার সমালোচনা বিশ্লেষণাত্মক; তাঁহার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে এক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছাড়া আর কেহ বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। ইঁহারা যখন বিশ্লেষণ করিয়াছেন বলিয়া নিজেরা মনে করিয়াছেন, তখনও প্রকৃতপক্ষে আদর্শের ব্যাখ্যান করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা যাঁহারা প্রভাবিত হইয়াছেন তাঁহাদের সমালোচনার বৈশিষ্ট্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে: (১) সাহিত্যের ইতিহাস রচনা, (২) বৈষ্ণব কবিতার আলোচনা, (৩) বঙ্কিম-সাহিত্যের বিচার ও ব্যাখ্যা। প্রথমটির সম্পর্কে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। বর্ত্তমান গ্রন্থ সমালোচনার ইতিহাস নহে এবং সাহিত্যের ইতিহাস ইহার বিষয়ও নহে। কিন্তু যেখানে সাহিত্যের ইতিহাস শুধু ক্রমবিবর্ত্তনের কথা বলে না, শুধু চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে না, পরন্তু বিশিষ্ট ভঙ্গিতে সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও বিচার করে সেইখানে সমালোচনার ভঙ্গি ও পদ্ধতি বর্ত্তমান গ্রন্থের আওতায় আসিয়া যায়। সেই জন্যই দুইখানা ইতিহাস গ্রন্থের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না: (১) রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা

সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৪) এবং (২) দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬)।

বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'সাহেবরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।' তিনি বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসের কিছু কিছু মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং বোধ হয় তাঁহারই প্রভাবে এই দিকে বাঙ্গালী লেখকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে তাঁহারই জীবিতকালে তিন জন লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাঙ্গালা সাহিত্য' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ১২৮৭ সালে তাহা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। ইহা সংক্ষিপ্ত বিবরণ; ইহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।* তারপর রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' রচনা করেন। তন্মধ্যে আদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বৃহৎ গ্রন্থ; তাহা আধুনিক কালের প্রান্তদেশে আসিয়া থামিয়া যায়। দীনেশচন্দ্র বহুদিন পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দুই বৎসর পর ইহা প্রকাশ করেন এবং প্রচুর অভিনন্দন লাভ করেন। রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থকে ঠিক ইতিহাস বলা যায় না; তিনিও ইহাকে ইতিহাস না বলিয়া 'প্রস্তাব' আখ্যা দিয়াছেন। ইতিহাসের ভিত্তি হইতেছে ক্রমপরিণতি, পূর্ব্বসূরি হইতে উত্তরসূরিতে, প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককালে বিবর্ত্তন। ক্রোচে ও তাঁহার অনুবর্ত্তীরা সাহিত্যের ইতিহাস বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে সাহিত্যের উদ্ভব হয় তৎকালিক তৎস্থানিক অনুভূতিতে; ইহার মধ্যে কোন ক্রমিকতা বা বিবর্ত্তন থাকিতে পারে না। রামগতি ন্যায়রত্ন যে কোন দার্শনিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহা নহে। তবে তিনি বাংলা সাহিত্যকে আদি, মধ্য, ইদানীন্তন—এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া গ্রন্থকারদের জীবনচরিত লিখিয়াছেন ও সাহিত্যবিচার করিয়াছেন; মাঝে মাঝে, পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের সঙ্গে পরবর্ত্তী লেখকের—যেমন মুকুন্দরামের সঙ্গে

* পরে পুরাণো পুঁথির সাহায্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করেন। তাঁহার এই গবেষণা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় যুগান্তর আনয়ন করে। কিন্তু ইহা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্গত, সাহিত্য সমালোচনার নয়।

ভারতচন্দ্রের তুলনা করিলেও তিনি এই তিন কালের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতার সূত্র আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার প্রস্তাব মূলতঃ বিচ্ছিন্ন, কালানুক্রমিক সমালোচনার সমষ্টি।

রামগতি ন্যায়রত্নের সমালোচনা খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইংরেজ মনীষী ডক্টর জনসনের মত তাঁহার তীক্ষ্ণ কাণ্ডজ্ঞান বা **common sense** ছিল। ডক্টর জনসন ইংলণ্ডে ক্ল্যাসিকাল রীতির অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন, কিন্তু অ্যারিষ্টটল-নির্দ্দিষ্ট স্থান ও কালের যে ঐক্য—**unities of time and place**—ক্ল্যাসিকাল সমালোচনার স্তম্ভস্বরূপ তাহা জনসনের সহজ বুদ্ধির আঘাতে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন; তাঁহাকে সেকেলে পণ্ডিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি বাংলা রচনায় সংস্কৃত অলংকারের আমদানির বিরোধিতা করিয়াছেন; এই প্রসঙ্গে তিনি যে উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাও তাঁহার সহজ কাণ্ডজ্ঞানসম্ভূত মানদণ্ডের পরিচয় দেয়: 'কামিনীগণের অলংকার পরিবার সাধ পাঠকদিগের অবিদিত নাই।......ভাগ্যবন্ত গৃহের অনেক গৃহিণী অলংকার ভরে চলিতে পারে না—ভাল দেখায় না, তবু অলংকারে সাজিয়া "আহ্লাদে পুতুল" হইয়া বসিয়া থাকিবেন! বুড়া আয়ীর ['মাতামহী সংস্কৃতভাষার'] গায়ের সমস্ত অলংকার বাঙ্গালার গাএ সাজিবে না—জবরজঙ্গী হইবে—ইহা বাঙ্গালী বোঝে না, তাহা নহে। তবু যে, সে অলঙ্কারের ঝুড়ি মাথায় করিতে চাহে, সে তাহার জাতির গুণে!'

রামগতি দেখিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত অলংকারের অত্যধিক সাজসজ্জা বাংলায় মানাইবে না। কিন্তু তবু তিনি মনে করিতেন যে, সাহিত্য শিল্পকর্ম্ম; তাই তিনি প্রকাশের পারিপাট্য, গঠনের সুষমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। সাহিত্য সমালোচনায় তিনি দুইটি আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন—রচনার বৈচিত্র্য ও ঔচিত্য। তিনি বঙ্কিমযুগের লেখক, কিন্তু স্বভাবানুকারিতার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং নীতিশিক্ষাকে শিরোধার্য্য করিলেও স্বভাবাতিরিক্তত্ব বলিতে তিনি কোন অত্যুচ্চ আদর্শের কথা ভাবেন নাই, তিনি রচনার সুসঙ্গতি ও চাতুর্য্যই বুঝিয়াছেন। যে সহৃদয়তার বলে পাঠক কবির কাব্যের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহার গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, রামগতি ন্যায়রত্নের তাহা ছিল না, কিন্তু যে বিচারবুদ্ধির দ্বারা রচনার কারুকার্য্য ও ঔচিত্য নির্দ্ধারিত হয়, তাহা তাঁহার প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি চণ্ডীদাসের

স্বাভাবিক 'কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য' লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে চণ্ডীদাসের 'রচনা সাদাসিদা সামান্য ভাব লইয়াই অধিক' এবং 'নিতান্ত আদিরসসম্পৃক্ত হওয়ায় নব্যকবির প্রীতিপ্রদ হয় না।' তিনি একটু কুণ্ঠার সহিত স্বীকার করিয়াছেন যে, চণ্ডীদাসকে প্রধান কবি বলিয়া অবশ্য গণ্য করিতে হইবে। বিদ্যাপতির সম্পর্কে তাঁহার সেইরূপ কোন দ্বিধা নাই; তাহার কারণ 'বিদ্যাপতির গীতাবলীতে যেরূপ ভাবগাম্ভীর্য্য ও রচনাপারিপাট্য আছে, চণ্ডীদাসের গীতে সেরূপ পাওয়া যায় না।' অধিকাংশ পাঠক এই পার্থক্য স্বীকার করিলেও স্বাভাবিক প্রতিভার জন্যই চণ্ডীদাসের কাব্যের শ্রেষ্ঠতা দাবি করিবেন। ন্যায়রত্ন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের স্বভাববর্ণনের নিপুণতার ও নানাজাতীয় লোকের চরিত্রের বিভিন্নতা চিত্রিত করিবার কৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন এবং ভারতচন্দ্র যে তাঁহার নিকট ঋণী তাহাও বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন ভারতচন্দ্রের শিল্পচাতুর্য্যের; কোন কোন স্থলে—তাঁহার মতে—এই শিল্পচাতুর্য্য কালিদাসের শিল্পচাতুর্য্য অপেক্ষাও মনোহর। ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম প্রভৃতি হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা 'অস্থি' মাত্র; তাহার উপর মাংসযোজনা করিয়াছেন তিনি নিজেই। কেহ কেহ ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় মোহিত হইয়া বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আদিরূপ খুঁজিতে বর্দ্ধমান গিয়াছেন। ন্যায়রত্ন নিজেও সেই অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ব্যর্থতার কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। সাহিত্যের ছবি মানসপটে অঙ্কিত হয়, বাস্তবের সঙ্গে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য সেখানে অবান্তর; সেই প্রশ্ন তুলিলে 'মানবচিত্রখানি' 'মলিন' হইয়া যাইবে।

রামগতি ন্যায়রত্ন সাহিত্যবিচারে ঔচিত্যবাদী; নীতিবোধ ঔচিত্যেরই অঙ্গ। তাঁহার অপর লক্ষ্য গঠনের সুসঙ্গতি এবং ভাষার পারিপাট্য। এই জন্য অনেক সময় তিনি কল্পনার রহস্য ও ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। অতি জাগ্রত নীতিবোধের জন্য তিনি 'সধবার একাদশী' ও তাহার নায়ক নিমচাঁদকে বুঝিতে পারেন নাই বা এই নাটকের যথাযথ মূল্যায়ন করিতে পারেন নাই। 'জামাইবারিক'-নাটকের উদ্দাম প্রহসন তাঁহার কাছে 'অত্যুক্তিদোষে দূষিত' বলিয়া মনে হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা বেশি করিয়া প্রকট হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায়। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নবীনা প্রতিভাকে স্বাগত জানাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহজ, সরল কাণ্ডজ্ঞান বা **common sense** ইহার সঙ্গে তাল রাখিয়া পক্ষবিস্তার করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের

প্রতিভার সবচেয়ে রহস্যময়ী সৃষ্টি—কপালকুণ্ডলা ও মনোরমা। এই দুই নায়িকা সম্পর্কে রামগতি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা একটু কৌতুককর। তাঁহার মতে, 'অদৃষ্টদোষে সংসারসুখে বঞ্চিতার বর্ণন করিবার অভিলাষেই বোধ হয়, কবি কপালকুণ্ডলার সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন।' ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তাহার পর, নীতিবাদী সমালোচক আরও বলিয়াছেন, 'গ্রন্থের নায়ক-নায়িকার গুণ এরূপ হওয়া উচিত যে অন্যের স্পৃহণীয় হইতে পারে,…কিন্তু তাঁহার (কপালকুণ্ডলার) উদাসীনপ্রকৃতিকতা কি কোন সংসারীর বাঞ্ছনীয় হইতে পারে?' মনোরমা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, 'মনোরমাকে গ্রন্থকার একটি অদ্ভুত পদার্থ করিয়া তুলিয়াছেন।…এক স্ত্রীকে বহুরূপার ন্যায় একক্ষণে "সরলা বালিকা ভাবের" ও পরক্ষণেই "গম্ভীর প্রকৃতি প্রৌঢ়যুবতী ভাবের" প্রাপ্তি হওয়া কতদূর স্বাভাবিক, তাহা আমরা বলিতে পারি না।'

ইহা সত্য যে, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের সীমিত মাপকাঠিতে প্রতিভার অসাধারণত্বের বিচার সম্ভব হয় না। কিন্তু তবু এই মাপকাঠির প্রয়োজন আছে, কারণ বুদ্ধির দ্বারা, পরিমাণবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে কল্পনা উদ্দাম, উদ্ভট হইয়া যাইবে। ন্যায়রত্নের কয়েকটি সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। দীনবন্ধু বহু গল্প জানিতেন এবং তাহা বলিতে ভালবাসিতেন এবং এই জন্যই তাঁহার অনেক নাটক অবান্তর কাহিনীর জন্য সুষম ঐক্য লাভ করিতে পারে নাই। ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন, '…কোন কোন স্থলে বোধ হয় সেই গল্পগুলি প্রবেশ করিবার জন্যই সেই সেই প্রকরণের অবতারণা করিয়াছেন।' 'মৃণালিনী'র গিরিজায়া সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, 'ভিখারিণী গিরিজায়া যেন একটি আহ্লাদে পুতুল; বাচালতা একটু কম হইলে গিরিজায়া আরও মনোহারিণী হইত।' বঙ্কিমচন্দ্র মতিবিবিকে খুব রূপবতী বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, 'কিন্তু বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা উহার সে প্রকার রূপ দেখিতে পাইলাম না।' এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের অতিরিক্ত কারুকার্য্য উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন কুশলী গদ্য লেখক ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্ম। তিনি কোন রচনা লিখিলেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মহিমার কথা না বলিয়া পারিতেন না। এই সম্পর্কে ন্যায়রত্নের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য: 'ঈশ্বর ভাল পদার্থ বটে, তাঁহাকে মনে করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্যও বটে, কিন্তু তালটি পড়িলেই—পাতাটি নড়িলেই—পাখীটি উড়িলেই—অর্থাৎ সকল কার্য্যেই যদি লোককে ঈশ্বরের উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের বোধে সে উপদেশ সফল হয় না।'

রামগতি ন্যায়রত্ন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবকে নিজের কাল পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন তাহা করেন নাই ; তিনি আধুনিক কালের দ্বারদেশে আসিয়াই তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা তথ্যপূর্ণ, বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। আর ইহা সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবেই লিখিত এবং ইহার মধ্যে এক যুগ হইতে আর এক যুগে ক্রমবিবর্তনের ধারা সূচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যে সকল তথ্য সংকলিত হইয়াছে তাহা কতটা প্রামাণ্য, যে সকল পুঁথি আলোচিত হইয়াছে তাহারা গ্রহণযোগ্য কিনা, এমন কি সাহিত্যের ইতিহাসের যে রেখাচিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা যুক্তিসহ কিনা এই সকল প্রশ্ন বর্তমান আলোচনায় অবান্তর হইবে। সাহিত্যালোচনার যে পদ্ধতি বা রীতি এই গ্রন্থে অবলম্বিত হইয়াছে তাহাই আমাদের পক্ষে একমাত্র প্রাসঙ্গিক বস্তু।

দীনেশচন্দ্র সেন বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার কাব্যের ও সাহিত্যের গভীর সংযোগ দেখাইয়াছেন। এই গ্রন্থ লিখিবার সময় বাংলার ইতিহাস যতটুকু জানা ছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, তাহার অপসরণ, মুসলমান অধিকারের প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক তাৎপর্য্যময় ইঙ্গিত দিয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘটনা কেমন করিয়া সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার বর্ণনা যতই চিত্তাকর্ষক হউক মৌলিকতার পরিচায়ক নহে। দীনেশচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি আরও গভীর। বাংলা সাহিত্যে বাংলার জীবন কেমন করিয়া বিবৃত রহিয়াছে তাহা অপূর্ব্ব কৌশলের সঙ্গে তিনি আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। প্রধানতঃ কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের উপর ভিত্তি করিয়া কেহ কেহ প্রাচীন বাংলার সামাজিক অবস্থার চিত্র আঁকিয়াছেন। কিন্তু সেই সব চিত্র খুব ভাসা-ভাসা ; কাব্যগ্রন্থের সুবিন্যস্ত গদ্যসারসংকলনের অধিক মূল্য পাইতে পারে না। কিন্তু দীনেশচন্দ্র কাব্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন এবং কবির অঙ্কিত চরিত্র, কবির বর্ণিত দৃশ্য তাঁহার আলোচনায় সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ গ্রাম বাংলার যে জীবন বিলীন হইয়া গিয়াছে অথবা যাহার অপরিবর্ত্তনীয় শোভা এখনও তাহাকে আকর্ষণীয় করিয়া রাখিয়াছে তাহা তিনি অপরিসীম সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সহিত পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, স্বভাবানুকারিতা কাব্য-সৌন্দর্য্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। বাংলার কোন সাহিত্যিকই স্বভাবানুকারিতাকে এত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেন নাই অথবা এত বিস্তারিতভাবে এই সূত্রের প্রয়োগ করেন নাই। গ্রাম বাংলার

জীবনের প্রতি আকর্ষণ ছিল বলিয়া এবং তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার অনন্যসাধারণ শক্তি ছিল বলিয়াই দীনেশচন্দ্র মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার এমন সমুজ্জ্বল বর্ণনা দিতে পারিয়াছেন। আজকাল লোকগীতি, লোক সঙ্গীতের প্রতি শিক্ষিত সমাজের খুব ঝোঁক দেখা যায়। দীনেশচন্দ্র এই জাগরণের পূর্ব্বসূরি এবং সাহিত্যের স্বভাবানুকারিতাই তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

যে সহানুভূতি ও স্বভাবানুকারিতার কথা উপরে বলা হইল তাহার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। শুধু স্বভাবানুকারিতা কাব্যের তথা সমালোচনার বিষয় হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সামাজিক নিজের অনুভূতি বা উপলব্ধির রসে কাব্যকে সঞ্জীবিত করিয়া তাহা অপরের কাছে উপস্থাপিত করেন। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সাহিত্য শুধু ব্যক্তিগত ভাবের প্রকাশ নয়; তাহার একটা বস্তুনিষ্ঠ রূপ আছে। সামাজিক যদি নিজের দ্বারাই চালিত হয়েন, তাহা হইলে অনুভূতি প্রাবল্যে এই বস্তু-নিষ্ঠতা চাপা পড়িয়া যাইতে পারে। ইংরেজ কবি-সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, কাব্যের আলোচনায় **personal estimate** অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাল লাগা-না-লাগাকে দূরে রাখিতে হইবে। আমাদের প্রাচীন আলংকারিকেরা এই প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন কাব্য সহৃদয়ের মানসপটে প্রতিবিম্বিত হয়, রস সেইখানেই আস্বাদিত হয়। কিন্তু বহিঃস্থিত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগেই রসের নিষ্পত্তি হয় এবং এই সূত্রে ভাব উল্লিখিতই হয় নাই। সুতরাং সাহিত্য সমালোচনায় সমালোচকের ব্যক্তিগত অনুভূতিই ভিত্তি কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা তাহাকে সংযত করিতে না পারিলে ব্যাখ্যা ও বিচারের বদলে আমরা কোন একজন বিশেষ লোকের অনুভূতিকেই পাইব।

দীনেশচন্দ্রের রচনায় এই অনুভূতি-ভিত্তিক সমালোচনার দোষগুণ উভয়ই পাওয়া যায়। তিনি ভারতচন্দ্রের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই, এবং যেখানে তাঁহার সহানুভূতি জাগ্রত হইয়াছে—যেমন মহুয়া, মলুয়া প্রভৃতিতে —সেইখানে তাঁহার আলোচনা ও বিচার উচ্ছ্বাস ও অতিশয়োক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে। তিনি সাহিত্যে সরলতার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু নিজের আলোচনা অনেক সময় অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট হইয়াছে। চণ্ডীদাসের আলোচনার অবতারণা করিতে যাইয়া দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন, 'চণ্ডীদাসের কবিতা আমার

আশৈশব সুখ, দুঃখ ও বহু অশ্রুর উৎসস্বরূপ ; হৃদয়ের প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসে তাঁহার কবিতার আলোচনা সম্ভবপর হইবে কিনা বুঝিতে পারি না।·········আমি বহু বৎসর যাবৎ চণ্ডীদাসের গান গায়ত্রীমন্ত্রের ন্যায় প্রায় একরূপ জপ করিয়া আসিয়াছি। এই মহাকবি আমার যতটা অন্তরঙ্গ, আমার দারা-পুত্র স্বগণের কেহ তদপেক্ষা অন্তরঙ্গ নহেন ; তিনি আমাকে যতটা আনন্দ দিয়াছেন, পৃথিবীতে আর কেহ তদধিক আনন্দ দেন নাই।' যাঁহার অনুভূতি এত তীব্র, উপলব্ধি এত নিবিড় তিনি নিজের অনুভূতিকেই সাহিত্যের মধ্যে প্রতিবিম্বিত দেখিবেন এবং তাহারই পুনরাবৃত্তি করিবেন। তাঁহার নিকট হইতে বস্তুনিষ্ঠ বিচার ও বিশ্লেষণ প্রত্যাশা করা যায় না। তবু এই নিবিড় অনুভূতির সাহায্যেই তিনি কাব্যসৌন্দর্য্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া অংশতঃ তাহা অপরের কাছে উদ্ঘাটিত করিতে পারিয়াছেন। সাহিত্য-সমালোচনায় ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব। তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া—কোন মতবাদের প্ররোচনায় নহে—বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার ছবি তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং নিজের রসোপলব্ধিও অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।*

॥ ২ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনা তাঁহার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনার মতই অতুলনীয়। লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে যে, তিনি জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা কবিতা হিসাবেই বিচার করিয়াছেন ; এই সকল প্রবন্ধে ধর্ম্মমতের অনুপ্রবেশ হয় নাই। সাহিত্য-সমালোচনার ধারা নির্ণয় ব্যাপারে এই ধর্ম্মনিরপেক্ষতাই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী ও অনুবর্ত্তীরা কেহই তাঁহার মত প্রতিভাবান্ ছিলেন না, কিন্তু প্রায় সবাই এই ধর্ম্মনিরপেক্ষ, অনাধ্যাত্মিক **secular** দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ১২৮০ সালের 'বঙ্গদর্শন'-পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ স্মরণীয়। লেখক বলিতেছেন, 'বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের রচনায়, অপ্রাকৃত বর্ণনাদোষ তাদৃশ দেখা যায় না।······তাঁহাদিগের গুণ এই যে তাঁহারা সাধারণ মানবহৃদয় চিত্রিত করিয়াছেন। মনুষ্যহৃদয়ের সঙ্গে মনুষ্যহৃদয়ের

* উদ্ধৃতিগুলি 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (তৃতীয় সংস্করণ) ও 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (অষ্টম সংস্করণ) হইতে গৃহীত।

যে সম্বন্ধ তাহারই অভিব্যক্তি কবিতার বিষয়—যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের নামে বিরক্ত, তাঁহারা উক্ত নামের স্থলে ক ও খ আদেশ করিয়া পাঠ করুন কোন ক্ষতি হইবে না।' ইহার দুই বৎসর পর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাপতি সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য পরিবেশন করেন ; তিনিই বোধ হয় প্রথমে যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করেন যে বিদ্যাপতি মিথিলার সন্তান। ইহার পর জ্ঞানদাস প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকজন পদকর্ত্তার পরিচয়ও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সকল বিবরণে সাহিত্যিক বিচার বিশেষ নাই, কিন্তু লেখকদের ধর্ম্মমোহমুক্ত, পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয় ; ইঁহারা নির্ভেজাল সমালোচনার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, সেই জন্যই স্মরণীয়।

এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান—অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ। ১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেন, 'অক্ষয়বাবু ও সারদাবাবু উৎকৃষ্ট গীতসকল বাছিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ....[অক্ষয়চন্দ্র] কাব্যের সুপরীক্ষক। তাঁহার রুচি সুমার্জ্জিত, এবং তিনি বিদ্যাপতির কাব্যের মর্ম্মজ্ঞ।' লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সংগ্রাহক বা সমালোচক, কেহই অধ্যাত্মবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েন নাই। উভয়তঃ একমাত্র নিয়ামক বিদ্যাপতির বা অপর কবির কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব। এই বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্র যে পরিমাণবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার জীবনীপাঠে মনে হয় তিনি বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও তিনি করিয়াছেন। কেমন করিয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণবের কাছে 'বৃন্দাবন-বিলাসিনী, কুলকলঙ্কিনী, বৃষভানু-নন্দিনী "সাধকশ্রেষ্ঠ" হইলেন তাহা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং কেমন করিয়া জয়দেবে বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মের চরম বিকাশ হইয়াছিল তাহাও সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন।' (সাহিত্যসম্ভার—পৃঃ ১২০-২৭, ১৩৩-৪৯) কিন্তু জয়দেবের কাব্য সম্পর্কে তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে অধ্যাত্মবাদের নামগন্ধও নাই। তাঁহার এই দ্বিতীয় 'জয়দেব' প্রবন্ধ জয়দেবের কাব্যের সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয় এবং উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ ; তবু ইহা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে, তিনি বাংলা গীতিকাব্যের আদিগুরু জয়দেবের কাব্যের পরিচয় দিতে যাইয়া এই কাব্যের পাঁচটি উপকরণের কথা বলিয়াছেন এবং তাহার একটিমাত্র 'ভক্তিভরে ভগবানের ভজন'। এই প্রবন্ধ যে সম্পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যালোচনা হইতে পারে নাই তাহার একটি কারণ তিনি জয়দেবের সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে

বাংলার গীতিকাব্য ও সঙ্গীতের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রমাণ করিতে ব্যস্ত ; নিছক সাহিত্যালোচনা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য গীতিকাব্য সম্পর্কে তাঁহার সিদ্ধান্ত সকলেই স্বীকার করিবেন—'বাঙ্গালার কি কীৰ্ত্তন, কি পাঁচালি, কি যাত্রা, কি কবি অল্পবিস্তরে কোন না কোন বিষয়ে জয়দেব গোস্বামীর কাছে সকলেই ঋণী। এখনও বঙ্গের গীতি-সাহিত্য সেই মহাজনের দ্বারস্থ, তাঁহার নিকট পদানত।' সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, অক্ষয়চন্দ্র গভীর বিশ্বাসপরায়ণ 'সনাতনী' হইলেও সৌন্দর্যবোধকেই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'সৌন্দর্য্যবোধ, মানুষের মনুষ্যত্ব, জগতের সৌন্দর্য) প্রতিভাসিত করে বলিয়া ধর্ম্ম মনুষ্যত্বের প্রধান সহায় এবং অবলম্বন।'

বঙ্কিমোত্তর যুগে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা দুই পথে অগ্রসর হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী মুখে মুখে গীত হইত এবং একই বিষয়ে বহু পদকর্ত্তা এক ধরণের বিভিন্ন পদ রচনা করিতেন। এই সব কারণে আধুনিক কালে পাওয়া কোন পদই অবিকৃত আছে কিনা সন্দেহ হয়। বহু পাঠান্তর দেখা যায় ; বহু অশুদ্ধির অনুপ্রবেশ হইয়াছে ; অনেক পদের ভণিতা নাই এবং ভণিতা থাকিলেও কোন্ পদ কাহার রচনা ইহা অনেক সময় নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। বহু পুঁথি মিলাইয়া, ভাষার পরীক্ষা করিয়া বৈষ্ণব কবিদের রচনার বিশুদ্ধ মূল পাঠ নির্ণয় করিতে উৎসাহী ও অধ্যবসায়ী সম্পাদকগণ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইলেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সতীশচন্দ্র রায়। ইঁহারা যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন পরবর্ত্তী সম্পাদকেরা নিষ্ঠার সহিত সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া সম্পাদনার কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন।

সম্পাদন করিতে করিতে সম্পাদকদের মনে হইয়াছে যে, এক নামে যে সকল পদ চলিয়া আসিয়াছে তাহার সবই এক কবির রচিত নাও হইতে পারে। সুতরাং কবিদের সম্পর্কে প্রচুরতর তথ্য পাওয়া গেলে তাঁহাদের কাব্যনির্ণয়ের ও কাব্যবিচারের কাজ সহজ হইতে পারে। এই কাজেও এই যুগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বিদ্যাপতিসম্পর্কিত গবেষণার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গ্রীয়ারসন প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতেরাও এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৈষ্ণব কবিতার কবি বিদ্যাপতি আদৌ বৈষ্ণব ছিলেন না:

"বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি পঞ্চোপাসক ছিলেন, বিষ্ণুর উপাসনায় তাঁহার কিছুই আপত্তি ছিল না। তিনি শিব-গঙ্গার জন্য যেমন গান লিখিয়াছেন, কৃষ্ণের জন্যও তেমনি লিখিয়াছেন। বিশেষ বৈষ্ণব ভাব তাঁহাতে নাই বলিলেও হয়। তিনি সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গবেষণা এতই ধর্ম্মপ্রভাবমুক্ত যে তিনি বিদ্যাপতিকে আদি রসের কবি বলিয়াই আখ্যাত করিয়াছেন। 'অনেক সময় কৃষ্ণ-রাধা উপলক্ষ্য মাত্র, আদিরসই প্রধান লক্ষ্য।' (হরপ্রসাদ-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৬) চণ্ডীদাস সম্পর্কেও তিনি এমন একটি তথ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যাহা চণ্ডীদাসের কাব্যালোচনায় বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে। তিনি মনে করেন যে, দুইজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের কাব্যের অস্তিত্ব সহজে গ্রহণযোগ্য হয়। 'প্রথম চণ্ডীদাস জয়দেবের মত বৈষ্ণব হইয়া গিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছেন; আর একজন বৈষ্ণব হয়েন নাই; কখনও তিনি খাঁটি সহজিয়া গান গাহিতেন, কখনও বা রাধাকৃষ্ণকে লইয়া সহজিয়ার গান গাহিতেন'। (হরপ্রসাদ-রচনাবলী ১ম খণ্ড—পৃঃ ২৯৩) এই পথ ধরিয়া আধুনিক কালে আরও চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। চণ্ডীদাস-বিভাজনে হরপ্রসাদ পথিকৃৎ কিনা বলিতে পারি না। তবে তাঁহার আলোচনা খুব মূল্যবান্।

এই সকল গবেষণা ঠিক সাহিত্যসমালোচনার পর্য্যায়ে পড়ে না, কিন্তু সাহিত্য সমালোচনায় ইহারা অপ্রাসঙ্গিক নহে। বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সমালোচনার মূল সূত্র হিসাবে অপেক্ষিত অনপেক্ষার কথা বলা হইয়াছে। সাহিত্য কবিমানসের সৃষ্টি, তাহার সঙ্গে কবির জীবন, তাঁহার পরিবেশ, তাঁহার রাজনৈতিক ও নৈতিক মতের সম্বন্ধ গৌণ। এই সব বিষয় হইতে বিমুক্ত হইয়া কাব্যকে কাব্য বলিয়া আস্বাদন করিতে হইবে। প্রাচীন আলংকারিকদের ভাষায় বলা যাইতে পারে, কাব্য অদ্ভুত পুষ্প, ইহার গন্ধ অ-লৌকিক। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লৌকিক অভিজ্ঞতা, পরিবেশ এবং মত ও বিশ্বাস হইতেই এই অ-লৌকিক সৌন্দর্য্য আক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং লৌকিককে ছাড়িয়া দিলে অ-লৌকিক অলীকে পরিণত হইবে। আর একটি দিক হইতেও বিষয়টি বিবেচনা করা যাইতে পারে। সাহিত্যে নানান ভাবের, নানা চিত্রের সমবেশ হয়। ইহাদের বৈচিত্র্য, বিরোধ ও সমন্বয়ের দ্বারাই ইহার গুণাগুণ নির্দ্ধারিত হয়। দুইটি বিচ্ছিন্ন ভাবের বিরোধ ও সামঞ্জস্য

হইতেই রূপক অলংকারের উদ্ভব হয়, কোন কোন পাশ্চাত্ত্য আলংকারিক তো মনে করেন রূপকের বিরোধ ও সম্মিলনই কাব্যের প্রাণ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে যে সকল তথ্য নির্দ্ধারিত হইতেছে তাহার দ্বারা ইঁহাদের কাব্যের স্বরূপও উদ্ভাসিত হইয়াছে। যদি কোন পঞ্চোপাসক কবি বৈষ্ণব কাব্য রচনা করেন তাহা হইলে কেমন করিয়া পঞ্চোপাসনার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সমন্বয় হইল সেই বৈচিত্র্য ও ঐক্যের পথেই বিদ্যাপতির কাব্যের রস আস্বাদন করিতে হইবে। চণ্ডীদাসের কাব্যে অপরূপ তীব্রতা ও সরলতা যুগে যুগে পাঠক ও শ্রোতাকে মুগ্ধ করিয়াছে, এই একঘনতা ও সরলতার অন্তরালে হয়ত বাশুলি-উপাসনা, সহজিয়া প্রেম ও বৈষ্ণব ভক্তির বৈচিত্র্য রহিয়াছে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির তথ্যানুসন্ধান সাহিত্য সমালোচনার অন্তর্গত না হইলেও সাহিত্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও বিচারের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে।

যাঁহারা বৈষ্ণব কবিতার রস আস্বাদন করিতে অর্থাৎ সমালোচনা করিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদিগকে একাধিক শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ ধর্ম্মীয় ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়া সাহিত্যিক তাৎপর্য্যকে গৌণ করিয়াছেন অথবা ধর্ম্মীয় ব্যাখ্যার অন্তর্গত করিয়াছেন। পদকল্পতরু-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় ছিলেন বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যের 'অদ্বিতীয় পণ্ডিত'; তিনি অপরিসীম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত এই চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন, 'পদাবলী-পাঠক সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা প্রধানতঃ কাব্য-রচনার জন্য পদাবলীর রচনা করেন নাই; সেগুলি তাঁহাদের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ব্রজ-লীলা-ধ্যানের আনুষঙ্গিক ফল ও উহার সহায় মাত্র। এ অবস্থায় পদাবলী রচনা করিতে যাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ ও শ্রীরাধা যে সেই ভগবানের পরা-শক্তি বা পরা প্রকৃতি—এই মূলীভূত তত্ত্বটি তাঁহারা কদাপি বিস্মৃত হন নাই। পদাবলীর পাঠকও এই তত্ত্বটি বিস্মৃত হইবেন না।' (পদকল্পতরু—পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৬৪) যদি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির গবেষণা অনুসরণ করিয়া মনে করা যায় যে, বিদ্যাপতি ও (অন্ততঃ একজন) চণ্ডীদাস বৈষ্ণবই ছিলেন না, তাহা হইলে সতীশচন্দ্র রায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সাহিত্যিক, সাংবাদিক; সতীশচন্দ্র রায়ের তুলনায় তিনি এই বিষয়ে আগন্তুক। তিনিও ভক্তকে কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি অন্যরূপ। তিনি মনে করেন পরম

সত্যের দুইটি দিক্ আছে—নাম (Concept) ও রূপ (Percept)। অন্তরঙ্গ ভাবের দ্যোতনাকে নাম বলা যায়, যাহা ছায়া ও প্রতিচ্ছায়া হিসাবে ভিতরে ও বাহিরে ফুটিয়া উঠে, তাহাই রূপ। নাম বড়, রূপ ছোট, বিভোরতায়—বিহ্বলতায়—বিমূঢ়তায়—রূপসাগরে ডুবিয়া অতলতলে ডুবিয়া যাওয়ায় রূপের পরিতৃপ্তি।' (পাঁচকড়ি-রচনাবলী, ২য় খণ্ড—পৃঃ ৪-৮) বলা বাহুল্য, কাব্যের কারবার রূপজগৎ লইয়া, ভক্তি নামজগতের। 'দুইটি গান' (১ম ভাগ, পৃঃ ২৫২—৫৭) প্রবন্ধটির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে কবির কাব্য অপেক্ষা মহাজনের পদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া লেখক বলিয়াছেন, 'মহাজন শাস্ত্রোক্ত সাধনক্রমকে কাব্যের আবরণে ফুটাইয়া, রোচক করিয়া তুলেন। কবি কেবল খোস খেয়ালের বশে মন-ভুলান কথা বলেন।' এই জাতীয় মন্তব্যের উপর দীর্ঘ টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। কাব্য যদি কাব্যই হয়, তাহা হইলে তাহা আবরণ মাত্র বলিয়া গণ্য হয় না, আস্বাদকালে তাহা শুধু প্রাধান্য অর্জ্জন করে না, মনোজগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। সর্ব্বোপরি, তাহা 'খোস খেয়ালের' সৃষ্টি নয়।

দীনেশচন্দ্র সেনের রসাস্বাদন নীতিগত বা অন্য কোন সমস্যার দ্বারা বাধিত হয় নাই। তিনি মনে করেন বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা, বিশেষ করিয়া চণ্ডীদাস, মানুষী প্রেমকে স্বর্গীয় প্রেমে রূপান্তরিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রীভূত এক স্বর্গীয় উপাদান আছে; ইহা মানবীয় প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে সহসা সুর চড়াইয়া এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী রচনা করিয়াছে এবং তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে। এই যে স্বর্গীয় প্রেম—ইহার কাব্যগত উপাদান কি, কেমন করিয়া ইহা মানবীয় প্রেমগীতির ভিত্তি হইতে উদ্ভূত হইয়া স্বর্গীয় প্রেমের রাজ্যে পক্ষবিস্তার করিল তাহা তিনি বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া দেখান নাই। আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ বলিয়াছেন, '...চণ্ডীদাসের মত কোমলস্বরে বীণা বাজাইবার লোকও বঙ্গভাষায় আর দ্বিতীয় আবিষ্কৃত হন নাই।...চণ্ডীদাসের কবিতা যেন স্বভাবের কোমল উৎস হইতে স্বতঃই বিনিঃসৃত হইতেছে।' (সাহিত্য, ১৩১৬) কোমল ভাবের প্রকাশ অন্য অনেক কাব্যেও পাওয়া যায় এবং কাব্য স্বভাবানুকারী হইলেও স্বভাবানুকারিতাই কাব্য নহে। কবির শিল্পই কাব্যকে কাব্যত্ব দান করে; সেইজন্য যে স্বাভাবিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশকে লেখক কাব্যের প্রধান গুণ বলিয়া দাবি করিতেছেন তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা দরকার।

মোটকথা, এই জাতীয় আবেগময় উক্তিকে বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা বিচার বলা যায় না।

যাহাকে আমরা সাহিত্য-সমালোচনা বলি তাহার আভাস বিপিনচন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায়। 'আভাস' শব্দ নিন্দার্থে বা ব্যাজস্তুতি বুঝাইতে ব্যবহার করিতেছি না। বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণব কবিতার সাহিত্যিক আলোচনা বা ব্যাখ্যা করিতে চাহেন নাই। তিনিও চাহিয়াছেন বৈষ্ণব কবিতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে ; পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই যুগের লেখকরা মর্ম্ম কথার উদঘাটনকেই সাহিত্য-সমালোচনা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তবু বলিতে হইবে, বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণব কবিতার রহস্যের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাহার বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। এই জন্য এই তত্ত্বব্যাখ্যানে বৈষ্ণব কবিতার মূলসূত্র পাওয়া যাইতে পারে। এই সূত্র যে সকলে গ্রহণ করিবেন তাহা বলিতেছি না ; তবে এই সূত্রের সাহায্যে পদাবলী সাহিত্যের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি সহজ হইতে পারে। বিপিনচন্দ্রের সূত্রের একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বে যে সকল ভক্তদের বা ব্যাখ্যাতাদের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা বৈষ্ণব কবিতার কোমলতা, সরলতা ও কেন্দ্রীভূত, একঘন রসময়তার দ্বারা আপ্লুত হইয়াছেন। বিপিনচন্দ্র এই সকল গুণের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, কিন্তু ইহার অন্তরালে তিনি দেখিয়াছেন জটিলতা, বৈচিত্র্য, দুইটি বিরোধী ভাবের স্বাতন্ত্র্য ও সম্মিলন। তাহারই নাম লীলা। লীলাবাদ অনুসারে, ভগবান অবতাররূপে জন্ম গ্রহণ করেন প্রধানতঃ নিজের তৃপ্তির জন্য। নিজের তৃপ্তির জন্য তিনি যাহা সৃষ্টি করেন তাহা নিজের স্বরূপ হইতে পৃথক্ আবার তাহা সেই স্বরূপ হইতেই উদ্ভূত। জ্ঞানলীলা ও আনন্দলীলা এই দ্বৈততা ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই বিধৃত ; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও বৃন্দাবনে বিভিন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই ইঁহারা অমূর্ত্ত ভাব বা মানসবস্তু অর্থাৎ কোন রকমের **abstraction** নহেন ; ইঁহারা ব্যক্তি। বিপিনচন্দ্রের মতে বৈষ্ণব কবিতার প্রধান গুণ ইহার মানুষী ভাব। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলী পড়িতে বসিয়া সকলের আগে শ্রীকৃষ্ণ যে দেবতা সেই কথা ভুলিতে হইবে। সতীশচন্দ্র রায়ের যে মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার সঙ্গে এই মতের পার্থক্য স্মরণীয়। যদি বিপিনচন্দ্রের কথা মানা যায় তাহা হইলে ইহাও মানিতে হইবে যে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা যাহা বৈষ্ণবকাব্যে অপরূপ অভিব্যক্তি পাইয়াছে

তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানবোচিত প্রেম ; শুধু তাই নয়, এই প্রেম ইন্দ্রিয়জ প্রেমের চরম অভিব্যক্তি, কারণ ইহা কুল, মান, লজ্জা কিছুই স্বীকার করে না ; ইহা সকল নীতিকে, সকল নিয়মকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়। ইহা সকল নিয়ম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উপরের কিছু চায় ; এইভাবে ইন্দ্রিয়জ প্রেম ইন্দ্রিয়াতীতের উপলব্ধিতে বিলীন হইয়া যায়। এই অভীপ্সাই মানবীয় প্রেমকে অতীন্দ্রিয়ের ভূমিতে টানিয়া লয়। ইহাকে যদি ঈশ্বরভক্তি বলা হয় কাব্যরসিক আপত্তি করিবেন না, না বলিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু এই দুই অনুভবের টানা-পোড়েন, বিরোধ ও সম্মিলনই বৈষ্ণব-কবিতার বিশিষ্ট আবেদন। (সাহিত্য ও সাধনা, পৃঃ ১৩৭-৭৪)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৈষ্ণব-কাব্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' জাতীয় উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসমালোচনামূলক কোন প্রবন্ধ বঙ্কিমোত্তর যুগে লিখিত হয় নাই। তবে বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণব কবিতার যে মূলসূত্রের সন্ধান দিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

॥ ৩ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভাদীপ্ত সাহিত্যসমালোচনা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার অপেক্ষাও বড় সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সাহিত্য তাঁহার সহযোগী ও অনুবর্ত্তীদের সাহিত্যসমালোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হইবে ইহা স্বভাবতঃই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এই সমালোচনা বিচার করার পূর্ব্বে উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি আখ্যানভিত্তিক সাহিত্যপ্রকরণ সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা দরকার।

এই জাতীয় সাহিত্যে তিনটি প্রধান উপাদান থাকে—প্লট বা আখ্যানবস্তু, চরিত্র এবং ভাবনা বা thought। এই তিনটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে ; ইহাদের একটিকে অপর দুইটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে, নাটকে অথবা মহাকাব্যে—আধুনিক উপন্যাসের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না—কাহিনী হইবে সম্ভবী ও অবশ্যম্ভাবী। এই সম্ভাব্যতা ও অবশ্যম্ভাব্যতা পরস্পরসম্পৃক্ত। কাব্যের কাহিনীর মধ্যে আজগুবি ও অনুচিত বস্তু থাকিতে পারে এবং থাকেও ; কিন্তু সাহিত্যিক যে পরিবেশ রচনা করেন, যেরূপ চরিত্রের পরিকল্পনা করেন তাহার জন্যই ঐ সকল উপাখ্যান সম্ভাব্য ও

উচিত বলিয়া মনে হয়। গোঁফ-দাড়ি বিশিষ্ট মেয়েলোক থাকিতে পারে কিনা, আদর্শ বঙ্গগৃহিণীর পক্ষে স্বামিগৃহ পরিত্যাগ করা উচিত কিনা, ম্যাক্‌বেথ ও 'বিষবৃক্ষে'র চরিত্র-প্লট-ভাবনার কাঠামোর মধ্যেই তাহার বিচার হইবে। সাহিত্যে অঙ্কিত চরিত্রগুলির সম্পর্কে এই নিয়ম বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কেহ কেহ মনে করেন সাহিত্যের চরিত্র জীবন্ত; সুতরাং আমরা কোন জীবিত মানুষকে যে ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করি এইখানেও সেইভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে। যেহেতু সাহিত্যের চরিত্র খুব মনোহর, সেইজন্য এই জাতীয় বিচার ও বিশ্লেষণ খুব মুখরোচকও বটে। অপর এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, সাহিত্য সাহিত্যিকের সৃষ্টি; যত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হউক, তাহা কৃত্রিম। সুতরাং জীবন্ত মানুষকে যেভাবে বিচার করা হয় সাহিত্যের চরিত্রের সেইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও বিচার সম্ভব নয়; আমাদের সেইরূপ বিচার করিবার অধিকারও নাই। হ্যাম্‌লেটের বাবার মৃত্যুর সময় হ্যাম্‌লেট কোথায় ছিলেন, সিংহাসন লাভ বিষয়ে ম্যাক্‌বেথ-দম্পতীর মধ্যে পূর্ব্বে কিরূপ আলাপ-আলোচনা হইত সে কথা আমাদের পক্ষে অবান্তর, কারণ এই সব ব্যাপার নাটকে নাই। এই উভয় দলের কথাই অংশতঃ সত্য। নাটকের বা উপন্যাসের চরিত্র জীবন্ত চরিত্র; জীবিত মানুষের মতই তাহাদের বিশ্লেষণ ও বিচার সম্ভব। কিন্তু এই কথাও মানিতে হইবে যে, প্লট ও ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াই সে জীবন্ত হয়। যদি আমরা সেই চরিত্রের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করি অথবা এক উপন্যাস বা নাটকের চরিত্রের সঙ্গে অন্য উপন্যাস-নাটকের চরিত্রের তুলনা করি, তাহা হইলে সম্পূর্ণ কাঠামোর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই করিতে হইবে।

এই মূলসূত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বঙ্কিম-সমালোচনার কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রধান চেলা' বলিয়াছেন, অর্থাৎ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের দুই একটি মন্তব্য লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমের ভাষা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। গুরুর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চেলা একটি উক্তি করিয়াছেন যাহার সঙ্গে বঙ্কিমের শত্রুমিত্র কেহই একমত হইবেন না। অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছেন, 'প্রতিভা দুই ভাবে বুঝা যায়, (১) "নবনবোন্মেষশালিনীবুদ্ধিঃ প্রতিভা উচ্যতে।" **Inventive genius** (২) আর এক কার্লাইলের মতে,—"**Indefatigable exertion in pursuit**

of an object." আমি যতদূর জানি, তাহাতে বুঝি,—এই দ্বিতীয় প্রকার প্রতিভাতেই বঙ্কিমবাবু আমাদের মধ্যে মহিমান্বিত হইয়াছেন।' (সাহিত্য-সম্ভার, পৃঃ ১৪৮) অক্ষয়চন্দ্র বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার উপরই জোর দিতেছিলেন ; কাজেই নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি যে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল ইহা ধরিয়াই বক্তব্যকে সুদৃঢ় করার জন্য এইরূপ ভাবে কথা বলিয়াছিলেন। যদি তিনি মনে করিয়া থাকেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনী প্রতিভা কম ছিল, শুধু 'অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রম' দ্বারাই তিনি মহিমান্বিত হইয়াছিলেন তাহা হইলে সেই মত কেহ গ্রহণ করিবে না। ভরসা করি তিনি সেইরূপ মনে করেন নাই।

সমসাময়িক কালে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধী লোক যে ছিল না তাহা নহে। কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে সেই বিরুদ্ধতা তিনি সহজেই জয় করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি যে শুধু জনপ্রিয় হয়েন তাহাই নহে, তাঁহার চার পাশে এক দল অনুরাগী লেখকসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। এই সব লেখকরা নানা পত্রপত্রিকায় এবং কেহ কেহ গ্রন্থাকারে তাঁহার উপন্যাসের আলোচনা করেন। ইহারা শক্তিশালী লেখক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের রচনা সাহিত্যিক বিচার ও বিশ্লেষণ নয় ; সুতরাং সাহিত্য-সমালোচনার পর্য্যায়ে পড়ে না। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, ইহারা উপন্যাস সাহিত্যকে নীতিশিক্ষার বাহন বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে হিন্দু আদর্শের প্রচারের মাধ্যম বলিয়া তাহার বর্ণনা দিয়াছেন।* কেহ কেহ বলেন, প্রথম যুগের উপন্যাসে ('দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতিতে) বঙ্কিমচন্দ্র নিছক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, দ্বিতীয় যুগের ('কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি) উপন্যাসগুলি বাস্তব চিত্র, তৃতীয় যুগের ('দেবীচৌধুরাণী' প্রভৃতি) উপন্যাসগুলি উদ্দেশ্যমূলক। এই সব বিভাগ একেবারে অযৌক্তিক এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, বাস্তবচিত্র ও উদ্দেশ্যপ্রাণতা অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি অন্ততঃ এই শিক্ষা দেয় যে, সৌন্দর্য্য একটি স্পৃহণীয় সম্পদ বা value, বাস্তব চিত্রও অ-লৌকিক রসের আস্বাদ দেয় বলিয়াই সাহিত্যপদবাচ্য হয়। আর উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি না থাকিলে তাহা উপন্যাসের পর্য্যায়ে পড়ে না।

* জনৈক উৎসাহী সামাজিক বলিয়াছেন যে 'কপালকুণ্ডলা'র অন্যতম সার্থকতা মারণ, উচাটন প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের সত্যতা প্রমাণ করা।' (বীরেশ্বর পাঁড়ে—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২)

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমযুগের সমালোচকেরা কেহই ঠিক সমালোচক ছিলেন না। তাঁহারা নিজেদের মত অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িতেন এবং সেই মতানুসারে কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে ঢালিয়া সাজিয়া লইতেন। ইহাকে সমালোচনা বলা যাইতে পারে না; জনৈক ইংরেজ সমালোচক এই জাতীয় রচনা সম্পর্কে বলিয়াছেন, ইহা substitution (এক কাহিনী বা চরিত্রের জায়গায় আর এক কাহিনী বা চরিত্র বদল করা), interpretation বা ব্যাখ্যা-বিচার নয়। বঙ্কিমের অনুবর্ত্তীরা উপন্যাসগুলিকে হিন্দুর আদর্শের বা অন্য কোন আদর্শের আলোকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল তাঁহাদের সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ছিল না বলিয়া চরিত্রগুলি জীবন্ত রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহাদের অপেক্ষাকৃত সীমিত বুদ্ধি ও ততোধিক সীমিত কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছিল এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

প্রথমে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও চন্দ্রনাথ বসুর কথাই বলা যাইতে পারে। 'কপালকুণ্ডলা' সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছেন, 'এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতাশূন্য অথচ রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ওতপ্রোত কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই।' 'বিষবৃক্ষ' সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, সূর্য্যমুখীর দায়িত্বের কথা লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে এই গ্রন্থের নাম রাখিয়াছিলেন 'উভয়ের দোষ'। বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসে অদৃষ্টবাদের অনুপ্রবেশ হইয়াছে, নীতিশিক্ষা বা দোষগুণের বিচার ইহাদের অন্যতম উপাদান আর নায়ক-নায়িকার হিন্দুভাব একটা উপলক্ষণ—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এই সব উপকরণ কেমন করিয়া রসরূপ প্রাপ্ত হইল সাহিত্যের তাহাই বিচার্য্য বিষয় এবং সেই বিচার এখানে নাই। চন্দ্রনাথ বসুর রচনায় এই সংকীর্ণতা আরও বেশি প্রকট। বঙ্কিমোত্তর যুগে সাহিত্যালোচনা যে কেন্দ্রচ্যুত হইয়া গেল, ইহার জন্য তাঁহার দায়িত্বই বেশি। নভেল বা কথাশিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন (বঙ্গদর্শন, ১২৮৭)। ইহাদের একটিও সাহিত্যরসিক পাঠক গ্রহণ করিবেন না, কারণ সর্ব্বত্রই তিনি নীতিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রোমান্স জাতীয় কথাসাহিত্যে অধিক উপকার হয় না; ইহাতে কেবল কল্পনা-শক্তির সম্যক্ পরিচালনা হয়। দৃষ্টান্ত 'দুর্গেশনন্দিনী'। কল্পনা-শক্তির পরিচালনা তাঁহার নিকট বিশেষ মূল্য বহন করিত বলিয়া মনে হয় না। অতঃপর তিনি বলেন যে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত কিন্তু সমাজ-

বিরোধী প্রেম প্রশমিত করা উচিত ; ইংলণ্ডের প্রভাবেই আমরা এই জাতীয় প্রেমকে মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছি। ইহার ফলেই শৈবলিনী, কুন্দনন্দিনী প্রভৃতির চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। এই জাতীয় দৃষ্টান্তের অধিক অনুকরণ হইলে, তাহাতে আমাদের এই লাভ হইবে যে, আমরা স্বদেশের সতীত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইব এবং ইহাতে দেশের অমঙ্গল সাধিত হইবে। চন্দ্রনাথ বসু সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরের চরিত্রের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু ঐ বিবরণ সাহিত্যিক বিশ্লেষণ নয়। হিন্দু রমণীর আদর্শ ইহাদের মধ্যে কতটা প্রতিফলিত হইয়াছে ইহাই তাঁহার বিচার্য্য বিষয়। তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, 'তবে কি ভ্রমর হিন্দু পত্নী নয় ?' তিনি বিস্তারিত আলোচনা করিয়া ভ্রমরের পক্ষেই রায় দিয়াছেন। (ত্রিধারা—'দুইটি হিন্দু পত্নী') পরে হারাণচন্দ্র রক্ষিত আরও বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভ্রমর হিন্দু রমণীর আদর্শ নহে। ('বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম')

বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যবহিত পরে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলির বিস্তারিত আলোচনার ঝোঁক দেখা যায়। পথ দেখান বোধ হয় 'কাব্যসুন্দরী' প্রণেতা পূর্ণচন্দ্র বসু ; কারণ তিনি দাবি করিয়াছেন তাঁহার প্রবন্ধগুলিই বঙ্গসাহিত্যে প্রথম সমালোচনা। তাঁহার পর গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রধানতঃ চরিত্রকে ভিত্তি করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে গ্রন্থ লিখেন। অন্য অনেক সমালোচক অনেক প্রবন্ধও লিখেন। এই সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাভঙ্গি একই ধরণের। সবাই চরিত্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেদের মত ও অনুভূতি অনুসারে বিচার করিয়াছেন—চরিত্রগুলির জীবন যে উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যেই তাহা কেহই অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই ; তাহাদিগকে গ্রন্থের বাহিরে আনিয়া তাহাদের কি করা উচিত ছিল এবং কেমন করিয়া তাহারা নৈতিক আদর্শের পোষকতা বা বিরোধিতা করিতেছে—ইহাই এই সকল সমালোচকেরা বর্ণনা করিয়াছেন এবং উচ্ছ্বসিত অতিশয়োক্তির দ্বারা নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। দুই একটি নমুনা দেওয়া যাইতে পারে : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন, 'সূর্য্যমুখীর প্রেম অনন্ত ও অসীম, কুন্দের প্রেম অতলস্পর্শ।' (আর্য্যদর্শন, ১২৮৪) চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ফষ্টরকে ক্ষমা করিবার জন্য প্রতাপকে উপদেশ দিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের মহানুভবতা সম্পর্কে গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছেন, 'দেখিলে উদারতা! দেখিলে ক্ষমাগুণ! আর্য্যদিগের কবির কল্পনাতেই এইরূপ চিত্র

সৃষ্ট হইতে পারে।' সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর অপেক্ষাকৃত সংযতবাক্। কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন যে, 'যদি কোন দেশে সূর্য্যমুখী দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল এদেশেই। সূর্য্যমুখীর ছায়াও অন্য কোন দেশের লেখকের চিত্রে দেখা যায় না।' তবে তিনি বন্ধনীর মধ্যে যোগ করিয়াছেন, 'অবশ্য শেক্সপীয়র ছাড়া'! (সাহিত্য, ১২৯৮)

সমালোচনার একটি মূল নীতি বর্ত্তমান প্রবন্ধেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। উপন্যাসে বা নাটকে কাহিনী (প্লট), চরিত্র ও ভাবনা (আইডিয়া)—এই তিনটি অঙ্গ পৃথক হইলেও, ইহারা একের সঙ্গে অপরে মিশিয়া গিয়া অদ্ভুত যৌথ সংস্থা রচনা করে। চরিত্র ও প্লটের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক হেন্‌রি জেম্‌সের প্রখ্যাত উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে : **What is character but determination of incident? What is incident but the illustration of character?** (ঘটনার সীমা ও স্বরূপ নির্দ্ধারণ ছাড়া চরিত্র-চিত্রণ আর কি? চরিত্রের চিত্রণ ছাড়া কাহিনী আর কি?) সমালোচকেরা যাহাকে উপন্যাসের তত্ত্ব বা আইডিয়া বা উদ্দেশ্য বলেন তাহাও এই প্লট-চরিত্রের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়, ইহারাও একে অপরের পরিপোষক ও নিয়ামক। এই সত্যটি লক্ষ্য করেন নাই বলিয়া পূর্ণচন্দ্র বসু, গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতি লেখকগণ এত বিভ্রান্তিকর চরিত্র সমালোচনা বা আদর্শ ব্যাখ্যান করিয়াছেন। একটি উদ্ভট দৃষ্টান্ত দিলে এই জাতীয় সমালোচনা কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে তাহা বুঝা যাইবে। পূর্ণচন্দ্র বসু 'চন্দ্রশেখর' ও 'রজনী'র তুলনামূলক সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'রমণীহৃদয়েও যে প্রতাপের পৌরুষ বল ও সংযম অবস্থান করিতে পারে লবঙ্গলতা তাহাই প্রদর্শন করিলেন।...যে সুধীরতা শৈবলিনীতে নাই লবঙ্গলতায় তাহা আছে।...আবার প্রতাপ, তোমার ইন্দ্রিয়সংযম প্রশংনীয় বটে, কিন্তু তুমি কি অমরনাথের নিকট দাঁড়াইতে পার?...সেই [শৈবলিনীর] অনুরাগ অহোরাত্র পোষিত করিয়া তুমি কি করিয়া আবার রূপসীকে ভালবাসিতে পারিতে?...অমরনাথের ন্যায় বিবাহে উদাসীন থাকিলে তোমার প্রণয় কি অধিকতর পবিত্র হইত না?'

এই যুগের সমালোচকদের দৃষ্টি নৈতিক আদর্শের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে সাহিত্য কাহাকে বলে ইঁহারা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ইঁহাদের সমালোচনা এখনকার যুগে কৌতুক ও কৌতূহলের উদ্দীপন করিবে,

কাব্যরস আস্বাদন করিতে সাহায্য করিবে না। কিন্তু তবু ইঁহাদের আদর্শের মেঘালয় হইতে মাঝে মাঝে সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যুচ্চমকের মত ঝলসিয়া ওঠে। পাতা গুণিলে দেখা যায় যে, 'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম ছোট উপন্যাস। তবু পড়িবার সময় সে কথা আমাদের মনে হয় না, বরং ইহার ব্যাপ্তি ও প্রগাঢ়তার জন্য ইহাকে আয়তনেও দীর্ঘ বলিয়াও মনে হয়। বহু পূর্ব্বেই পূর্ণচন্দ্র বসুর দৃষ্টি এই দিকে গিয়াছিল এবং তিনি ইহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও দিয়াছিলেন। তিনি মনে করেন কতকগুলি বিরাট 'বৈপরীত্যভাব'-সম্পন্ন চরিত্রকে পাশাপাশি রাখার জন্যই আমাদের মনে এইরূপ ধারণা হয় এবং ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীসজ্জা ও কাহিনীবিন্যাসের কৌশলের পরিচয় দেয়। এখানে পূর্ণচন্দ্র কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে নিকট সংযোগ স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্কিমসাহিত্যে কপালকুণ্ডলা ও মনোরমা সব চেয়ে রহস্যময় চরিত্র। মনোরমা একাধারে সরলা বলিকা ও গাম্ভীর্য্যময়ী প্রবীণা। বঙ্কিমচন্দ্র একটি একক, সমগ্র চরিত্র আঁকিয়া তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভার সমালোচকের ও পাঠকের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মনোরমার জীবনযাত্রার অকথিত কাহিনীর পুনরুদ্ধার করিয়া তাহার নিঃসঙ্গ চিন্তাশীলতার মধ্যে এই দ্বৈতভাবের সন্ধান খুঁজিয়াছেন। তিনি যে মনোরমার জীবনযাত্রার চিত্র দিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের রচনা, অথচ তাহা বস্তুনিষ্ঠ, কারণ ঔপন্যাসিক যে সকল ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত হয়ত গ্রহণযোগ্য হইবে না, কিন্তু এই আলোচনা সাহিত্যিক চরিত্রবিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। পূর্ণচন্দ্র বসু এই রহস্যের সমাধান করিতে চাহিয়াছেন বিশ্লেষণের পথে নয়, কবিকল্পনাসন্নিভ সহৃদয়তার দ্বারা। এই সহৃদয়তা শ্লাঘনীয়। তাঁহার মতে, কপালকুণ্ডলার সরলতা নৈসর্গিক, কিন্তু মনোরমার রহস্য নিসর্গশোভার প্রতিবিম্ব। 'কোন স্বচ্ছ সরোবরে নির্ম্মল জলরাশিতে যখন প্রকৃতির সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয় তখন সেই প্রতিবিম্বিত চিত্রে প্রকৃতিসুন্দরী অধিকতর রমণীয় বেশে প্রতীত হইতে থাকেন। এইরূপ প্রতিবিম্বিত সৌন্দর্য্যে মনোরমা চিত্রিত। কপালকুণ্ডলা যেন মানসসরোবরে সুবর্ণকমলিনী, মনোরমা সেই সুবর্ণকমলিনীর প্রতিবিম্বিত চিত্র।' গ্রন্থান্তরে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, পুরুষের হৃদয়ে রমণীর যে রহস্যময়ী মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র মনোরমায় তাহারই চিত্র আঁকিয়াছেন।*

* মৎপ্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র'

হারাণচন্দ্র রক্ষিতের দৃষ্টিও আদর্শবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন, কিন্তু খাঁটি সমালোচনার স্ফুলিঙ্গ তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম' গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। নিজে আদর্শবাদী হইলেও অতিরিক্ত আদর্শানুগামিতা সৃষ্টিকে কিরূপ ভারাক্রান্ত করে সেই বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, 'শৈবলিনীর দেহ কলুষিত হইয়াছিল কিনা,—ফষ্টর কর্ত্তৃক তাহার নারীধর্ম নষ্ট হইয়াছিল কিনা—ইহা প্রতিপন্ন করিতে গ্রন্থকার বহু অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন,—স্বপ্ন, যোগবল, মীরকাশিমের এজলাস্, দেহতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে।' বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ নারীচরিত্র আঁকিতেন এই ধারণা লইয়া এই যুগের সাহিত্যিকেরা তাঁহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু হারাণচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, রোহিণী, হীরা প্রভৃতি পাপীয়সীর চিত্রেও বঙ্কিমের প্রতিভা সমভাবে বিকশিত হইয়াছে, তিনি ঠিকই মন্তব্য করিয়াছেন, মানব-জীবনের কঠিন সমস্যার বিশ্লেষণই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসের আখ্যায়িকার উপর তিনি বেশি জোর দেন নাই। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি বহু উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে 'সামান্য দুই একটি মাত্র ঘটনা লইয়া সামান্য দুই একটি রেখাপাতে' অনন্যসুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন তৎপ্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। হারাণচন্দ্রের মতে, কাব্যাংশে 'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে তিনি অনেক নূতন উপাদান যোগ করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যাংশে এক সোপান নামিয়া গিয়াছেন। এইসব আলোচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 'কপালকুণ্ডলার কাব্যাদর্শ,—বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর প্রভৃতির লিপিচাতুর্য্য ও চরিত্রচিত্র,—এবং আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, ও সীতারামের মহালক্ষ্য যদি একত্র সন্নিবিষ্ট হইত তাহা হইলে বলিতে কি, বঙ্কিমের উপন্যাস—আজ সত্য সত্যই "জগতের উপন্যাস"-মধ্যে পরিগণিত হইত······।' এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য এবং ইহা নূতনতর সমালোচনার আভাস দেয়।

এই অনুচ্ছেদে যাঁহাদের আলোচনা করিতেছি তাঁহাদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উল্লেখ করায় অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, হরপ্রসাদ ছিলেন তথ্যানুসন্ধানী প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক, তিনি সাহিত্যসমালোচক ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, যদিও তিনি বঙ্কিমগোষ্ঠির অন্যতম, তবু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধীয় তাঁহার যে প্রবন্ধটিকে

সাহিত্যসমালোচনা বলা যায় তাহা লিখিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর আটাশ বৎসর পরে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যখন পরবর্ত্তী যুগের লেখকগণ আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ, এই প্রবন্ধে—বা বক্তৃতায়—তিনি বিস্তারিত কোন আলোচনা করেন নাই, শুধু ইঙ্গিত দিয়াছেন। কিন্তু এই ইঙ্গিতগুলি তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং সেইজন্যই উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে দুই চার কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে আদর্শবাদের নাম গন্ধ নাই। তিনি উপন্যাসগুলির সাহিত্যিক দিকই দেখিয়াছেন। হরপ্রসাদের মত গ্রহণ করি আর নাই করি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার মত। তিনি বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র বড় বড় জিনিসগুলি দেখিতেন এবং তাহাই বাছিয়া লইতেন; বঙ্কিমের উপন্যাসে গরীব-দুঃখীর স্থান কম। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসের মধ্যেই বিষয়গত সাদৃশ্য আছে, তবু ইহারই মধ্যে এত বৈচিত্র্য আছে যে কখনও ইহা একঘেয়ে হয় নাই। দুইটি গল্পকে এক করিয়া দেওয়ার চেষ্টা—হরপ্রসাদের মতে—বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র দুইখানি উপন্যাসে করিয়াছেন—'বিষবৃক্ষ' ও 'চন্দ্রশেখর'। প্রথমটিতে দুইটি গল্প তিনি সাফল্যের সহিত একত্র করিয়াছেন, কিন্তু অপরটিতে 'সিদ্ধিলাভ হয় নাই, দুইটি গল্প বেশ তফাৎ হইয়াছে।'

(রচনাবলী—২য় খণ্ড)

হরপ্রসাদ ছিলেন সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তিনি যেন একটু ক্ষোভের সহিত বঙ্কিম-চর্চ্চার পরিণতির কথা বলিয়াছেন; 'এতদিন তিনি কবি ছিলেন, লেখক ছিলেন, উপন্যাস-লেখক ছিলেন, ইতিহাস-লেখক ছিলেন, এখন লোকে দেখিল, তিনি ঋষি ছিলেন, saint ছিলেন, সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।' দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্ত্তনই এই যুগের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমালোচনার প্রধান লক্ষণ। এই পর্য্যায়ের লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী শ্রীঅরবিন্দ। তিনি অবশ্য বাংলায় কোন সমালোচনা লিখেন নাই। কিন্তু তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি জোর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার তথা ভারতের জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা হিসাবে উপস্থাপিত করেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিকে অপেক্ষাকৃত লঘু করিয়া দেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসরই শ্রীঅরবিন্দ বরোদা হইতে বোম্বাইয়ের 'ইন্দু-প্রকাশ'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেন (Bankim Chandra Chatterjee, Pondichery, 1895)। স্বদেশী তখনও প্রায় এক যুগ দূরে। এই প্রবন্ধগুলিতে

সাহিত্য সমালোচনা আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে অন্যান্য লেখকদের বিশেষ করিয়া স্কটের তুলনা আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আভাসিত হইয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ভাবীযুগের পথপ্রদর্শক, যে যুগ বিদেশীর কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করিবে না, যে যুগ সংস্কার লইয়া সন্তুষ্ট হইবে না—বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও মালাবারী প্রভৃতি সংস্কারকের উপর বিরূপ ছিলেন,—স্বাধীন মননশীলতা ও স্বাধীন অধ্যাত্ম অনুভূতি—**free soul and free intellect**—সৃষ্টি করিবে। স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দ বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে নূতন যে প্রবন্ধ লিখেন তাহার নামই দেন—**Rishi Bankimchandra, *Bande Mataram*,** 1901)। এই প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করেন যে, ভবিষ্যতের সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমের প্রথম যুগের রচনার শিল্প-কৌশলের অজস্র সুখ্যাতি করিবে এবং 'আনন্দমঠ', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি সম্পর্কে সংযতভাবে কথা বলিবে, কিন্তু শেষের দিকের গ্রন্থগুলির রচয়িতা হিসাবেই তিনি আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইবেন (**The earlier Bankim was only a poet and stylist—the later Bankim was a seer and nation-builder.**)। তিনি এই নবজাগ্রত রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে ধর্ম্মের স্থানও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; তাঁহার মতে বঙ্কিমের দেশপ্রেমই প্রকৃত ধর্ম্ম। এই নূতন ধর্ম্মের ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'দেবীচৌধুরাণী'তে; 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-গ্রন্থদ্বয়ে কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মূলকথা। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই সুরেই একটি প্রবন্ধ লিখিলেন 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' (নারায়ণ, ১৩২২); ইহার বিষয় 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'। এখানে তিনি এই তিনটি উপন্যাসের শিল্পগত ত্রুটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবের অনুপ্রবেশের কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সব কথা অবান্তর; আসল কথা হইল 'এই তিনখানি উপন্যাস বাঙ্গালীর দেশাত্ম-বোধের ত্রিপদ বেদী।'

এই জাতীয় ব্যাখ্যা ও প্রচার যতই মূল্যবান হউক, সাহিত্যালোচনার অঙ্গ নয়। রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখেন স্বদেশী-যুগের আলোড়নের মধ্যে—১৩২২ সালে। সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধও এই নূতন আন্দোলনের প্রভাবমুক্ত নহে। তিনি বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, 'তিনি সাহিত্য উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে

আপন ঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন'। রামেন্দ্রসুন্দর ধর্ম্ম ও রাজনীতির কথা ছাড়িয়া দিয়া চারখানি উপন্যাসের মাধ্যমে বঙ্কিমসাহিত্যের মর্ম্মকথা উদ্ঘাটন করিয়াছেন—এই চারখানি উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। তাঁহার মতে, 'মনুষ্যের হৃদয় (এক) জীবনব্যাপী মহাহবের কুরুক্ষেত্র; ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের মহাযুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চারিখানি উপন্যাসে এই গোড়ার কথাটার আলোচনা করিয়াছেন।' 'আলোচনা' কথাটা এখানে অপপ্রযুক্ত হইয়াছে; ইহার মধ্যে এই যুগের ছাপ স্পষ্ট। সাহিত্য সৃষ্টি, 'আলোচনা' নয়। যদি উল্লিখিত তত্ত্বটি মানিয়া লই, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, চারখানি উপন্যাসের প্রত্যেকটিই আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র এবং সেই স্বাতন্ত্র্যই ব্যাখ্যা করা দরকার। ক্রোচের একটি যুক্তি অবলম্বন করিয়া বলিতে পারি যে, রামেন্দ্রসুন্দর যে ফরমূলা (formula) দিয়াছেন তাহার সঙ্গে খাপ খায় এমন অনেক উপন্যাসের নাম করা যায় বা কল্পনা করা যাইবে যাহাদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসগুলির কোন সাহিত্যগত সাদৃশ্য নাই।*

এই স্বদেশী যুগের লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সব চেয়ে বেশি লিখিয়াছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি সাহিত্যে 'বস্তুতন্ত্রতা'য় বিশ্বাসী; তাই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে জানিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা, বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন, বঙ্কিমচন্দ্রের বংশ ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন। আধুনিক যুগের সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান বিচার করিবার জন্য তিনি তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে সমগ্র বিষয়টি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন—(১) বঙ্কিম-সাহিত্য, (২) বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মব্যাখ্যা, (৩) বঙ্কিম-সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি। ইহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় জাগরণে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহারও বিচার করিয়াছেন। এক হিসাবে এই বিস্তারিত ও বিভক্ত আলোচনার মূল্য আছে—এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরচনাকে আগন্তুক বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখার চেষ্টা হইয়াছে। বিপিনচন্দ্রের মতে, 'বঙ্কিমচন্দ্র জাতিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের দিকে বাঙ্গালীর চিত্তকে বিশেষ ভাবে প্রেরিত করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই কথাটাই সর্ব্বত্র

* রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'সাহিত্য-কথা' প্রবন্ধে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা খুব উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবিচার। এই প্রবন্ধ একবার উল্লিখিত হইয়াছে; চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

ফুটিয়া উঠিয়াছে।' (নবযুগের বাংলা) রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, আধুনিক যুগে পরজাতিবিদ্বেষ জাগিয়া উঠিলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন; তিনি পরজাতিবিদ্বেষ প্রচার করেন নাই; তাঁহার লক্ষ্য ছিল সমন্বয়সাধন। তিনি মুসলমানদের বিরোধী ছিলেন না; তাঁহার সাহিত্যে মুসলমানরাষ্ট্র স্বাধীনতার পরিপন্থী শক্তির প্রতীকমাত্র। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই বাঙ্গালী ইংরেজকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাব ধারণা আসে ইংরেজি সাহিত্য ও ইউরোপের ইতিহাস হইতে এবং দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল ইংরেজের শাসনদণ্ড তাহা বন্ধ করিয়া শান্তিস্থাপন করিয়াছিল। ইহা সত্য যে 'চন্দ্রশেখর' এবং 'আনন্দমঠ' সেকালের পাঠকের মনে ইংরেজ বিদ্বেষের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বয়ের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির মূলে ছিল ঈশ্বর-ভক্তি এবং এই আদর্শের উপরে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি বিশ্বজনীন মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্যের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যারও মূলসূত্র সমন্বয়সাধন। বলা যাইতে পারে, এই ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তা ও ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রথম সূত্র ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে সমন্বয়। কোন কোন উপন্যাসে এই ভাবটি প্রাধান্য পাইয়াছে, আবার কোথাও কোথাও ইহা প্রচ্ছন্ন কিন্তু সততক্রিয়াশীল রহিয়াছে। ধর্ম্মব্যাখ্যার দ্বিতীয় সূত্র কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ সকল কর্ম্মকে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট করা। কর্ম্ম বলিতে তিনি আচার-উপাসনা বুঝেন নাই; ব্যবহারিক জীবনের কর্ম্মই বুঝিয়াছেন। এই ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর ঈশ্বরোপাসনা ও নিরীশ্বর যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণ-চরিত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ মানবতার আদর্শ হিসাবে চিত্রিত হইয়াছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিপিনচন্দ্র বঙ্কিমসাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন। প্রচলিত রীতি অনুসরণ করিয়া তিনি উপন্যাসগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—রোমান্স ('দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি), বাঙ্গালী জীবনের বাস্তব চিত্র ('বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি), নিষ্কাম কর্ম্ম ও বিশ্বজনীন মানবতার চিত্র ('আনন্দমঠ' প্রভৃতি)। তিন শ্রেণীর উপন্যাসের আলোচনায়ই তিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তুর কথাই বলিয়াছেন; ইহাদের রসময়তার উল্লেখ আছে, কিন্তু বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

বা বিচার নাই। সুতরাং যথেষ্ট মননশীলতার পরিচয় বহন করিলেও এই আলোচনাকে সাহিত্যসমালোচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পূর্ব্বে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি। তাহার দ্বারাই কথাটা স্পষ্ট হইবে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের আলোচনায় অনেকখানি প্রাধান্য পাইয়াছে মহাপুরুষ ও সত্যানন্দের কথোপকথন। কিন্তু মহাপুরুষকে উপন্যাসের অভ্যন্তরে দেখা যায় না। তিনি গ্রন্থারম্ভে সত্যানন্দকে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং গ্রন্থশেষে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতেছেন। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা কি উপন্যাসে জায়গা পাইয়াছে, না জায়গা জুড়িয়াছে? চেষ্টারটন বলিয়াছেন, **the bad fable *has* a moral, and the good fable *is* a moral**; মহাপুরুষ-সত্যানন্দ সংবাদের যে নীতিকথা তাহা কোন্ শ্রেণীতে পড়ে? সাহিত্যিক বিচারে এই প্রশ্নই একমাত্র প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, কিন্তু বিপিনচন্দ্র ইহাকে এড়াইয়া গিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বত্র।

এই পর্য্যায়ের মাত্র একজন সমালোচক—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—খাঁটি সাহিত্যালোচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ললিতকুমার ছিলেন সুপণ্ডিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক এবং বঙ্কিমসাহিত্যের অনুরক্ত, অধ্যবসায়ী পাঠক। তাঁহার নিকট হইতে খুব উচ্চ শ্রেণীর সমালোচনা প্রত্যাশা করা গিয়াছিল, কিন্তু সেই প্রত্যাশার পুরণ হয় নাই। তিনি কতকগুলি প্রবন্ধে বঙ্কিমসাহিত্যের পারিবারিক চিত্রগুলি তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে নরনারীর সম্বন্ধের রহস্য ও জটিলতার কোন আভাস পাওয়া যায় না; প্রবন্ধগুলি ক্যাটালগ বলিয়া মনে হয়। তিনি গভীরতর রহস্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 'কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব'-গ্রন্থে। কিন্তু এইখানেও ক্যাটালগের পরিধি বাড়িয়াছে মাত্র। এবার তিনি বিশ্বসাহিত্য হইতে কপালকুণ্ডলার অনুরূপ চরিত্রের বর্ণনা দিয়া তুলনামূলক সমালোচনার ইঙ্গিত দিয়াছেন। কিন্তু এই তুলনা একেবারেই ভাসা-ভাসা; ইহার মধ্য দিয়া কপালকুণ্ডলা ও অন্যান্য নায়িকাদের চরিত্রের বা কাহিনীর তাৎপর্য্য ফুটিয়া উঠে নাই। একটি অনুচ্ছেদে নিমিত্ত (Omens) ও সঙ্কেত (Symbol) সম্পর্কে বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাও শুধু বিবরণমাত্র। সমালোচক যে কোন্ রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে চাহেন বুঝা যায় না; বোধ হয় প্রাসঙ্গিক বাক্য ও বর্ণনার উদ্ধৃতি দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি কেন এই সব বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ করিতেছেন তাহা স্পষ্ট হয় নাই। ললিতকুমারের 'ফোয়ারা'-গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে

অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিয়াছেন, 'অনেক সময় তাঁহার রচনার কেন্দ্র ঠিক থাকে না।' (সাহিত্যসম্ভার—পৃঃ ২৯১) 'কপালকুণ্ডলা'-সমালোচনার কেন্দ্র খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। গ্রন্থের শেষের দিকে ললিতকুমার কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের 'বিশ্লেষণ' দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহা বিশ্লেষণ নহে, বিবরণ। প্রকৃতপক্ষে ললিতকুমারের সমালোচনার প্রধান দোষই বিশ্লেষণবিমুখীনতা। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, বিশ্লেষণ করিয়া সাহিত্যের আস্বাদ পাওয়া যায় না; জলযান ও অম্লজানের আস্বাদ একত্র করিলে জলের আস্বাদ পাওয়া যায় না। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে অভিনব গুপ্ত এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যের আস্বাদ পানকরস বা সুমিষ্ট পানীয় রসের আস্বাদের মত। যিনি প্রকৃত রসিক তিনি পানীয়কে সমগ্রভাবে আস্বাদ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুড়মরিচাদি উপাদানেরও আস্বাদ করেন। ললিতকুমারের বঙ্কিম-সমালোচনায় এই আস্বাদন-নিপুণতার পরিচয় নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ (১)—সাহিত্যতত্ত্ব

॥ ১ ॥

বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান নানা দিক্ হইতে স্মরণীয়—শুধু উৎকর্ষে নয়, অজস্রতায় ও বহুমুখীনতায়ও। তিনি শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই, সাহিত্য সমালোচনাও করিয়াছেন এবং—সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—তিনি সাহিত্যতত্ত্বও প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় চেষ্টা খুব কমই হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছাড়া বাংলা সাহিত্যে এই পথে আর কোন শ্রেষ্ঠ রথী অগ্রসর হয়েন নাই। রামেন্দ্রসুন্দরের দান খুব উচ্চাঙ্গের হইলেও স্বল্পপরিসর এবং প্রশ্নের সমাধানের ইঙ্গিত দিলেও প্রশ্নের উত্থাপনের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। অতুলচন্দ্র গুপ্ত একটি সম্পূর্ণাঙ্গ থিওরি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার বিচার যথাস্থানে করা হইবে। এই সম্পূর্ণ বিস্তারিত থিওরিতে যথেষ্ট মৌলিকতা থাকিলেও ইহা অপরের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্ব উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা যে শুধু বহুধা বিস্তারিত তাহাই নহে, ইহা সম্পূর্ণ স্বকীয়।

সাহিত্যতত্ত্ববিচারে এই স্বকীয়তা অবিমিশ্র সৌভাগ্য নহে। স্বীয় প্রতিভার প্রবর্ত্তনায় কবি তাঁহার মত গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক লেখকদের মতের সঙ্গে মিলাইয়া যাচাই করিয়া দেখেন নাই বলিয়া ইহার স্বরূপ বুঝিতে বেগ পাইতে হয়, ইহা সুবিহিত, সুবিন্যস্ত, সুনির্দ্দিষ্ট আকার গ্রহণ করে নাই। তিনি এই বিষয়ে বাংলায় তিন খানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন—'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' ও 'সাহিত্যের স্বরূপ'। বাস্তবিকপক্ষে ইহারা একখানা বড় গ্রন্থের সামিল, এবং তাহার আয়তন 'গোরা' উপন্যাসের সমান। ইহার মধ্যে দেশী বা বিদেশী আলংকারিকদের উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। তিনি আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্রের কথা দুই একবার বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সেইসব জায়গায় তাঁহার এই শাস্ত্রের সঙ্গে অপরিচয়ই পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশের আলংকারিকেরা কাব্যের সৌন্দর্য্যকে অনির্ব্বচনীয়

বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ আলংকারিক আনন্দবর্দ্ধন যে এই অনির্ব্বচনীয়তাবাদকে লইয়া পরিহাস করিয়াছেন তাহা কবি জানিতেন না। তিনি বারংবার বলিয়াছেন, রসাত্মক বাক্য কাব্য; কাব্য ও সাহিত্যের ইহাই চরম সংজ্ঞা, ইহার উপরে আর কথা নাই। কিন্তু প্রাচীন আলংকারিকেরা রসের যে ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহার কোন নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া যায় না। এক জায়গায় তো তিনি বলিয়াই ফেলিয়াছেন, 'এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।'* অথচ ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের প্রধান কৃতিত্বই হইল রসকে অলংকার হইতে মুক্ত করিয়া দেখা এবং অলংকারের অঙ্গত্ব প্রতিপাদন করা। ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কম। তিনি ঐক্যের উপর খুব জোর দিয়াছেন, কিন্তু অ্যারিষ্টটলের পথে নহে; তিনি রোমান্টিক কবিদের মধ্যে কীট্সের **Truth is beauty, beauty truth** সূত্রের একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোল্‌রিজের সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধের কথা কোথাও বলেন নাই। ইউরোপীয় বহু মনীষীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কথা আমরা পড়িয়াছি, কিন্তু ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কোন সংবাদ দেখি নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নন্দনতত্ত্ব একটা ডিসিপ্লিন বা দার্শনিক চর্য্যা। ইহাদের আইন-কানুনের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় তাঁহার রচনা অনেক সময়ই এলোমেলো এবং পরস্পরবিরোধী উক্তিতে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবার ইহাও দেখা যায় যে তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে অপরের সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন; যেখানে অপরের সঙ্গে একমত হইতে পারিয়াছেন আর যেখানে একমত হইতে পারেন নাই—উভয়ত্র তাঁহার স্বকীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-তত্ত্বের আর একটি ত্রুটির কথা এইখানে কবুল করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষাকৃত গুরুতর। অপর সকল সমালোচকদের যুক্তিতর্কের বিস্তারিত আলোচনা না করিলেও অথবা তাঁহাদের নাম না করিলেও মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে তিনি ছিলেন ভাববাদী বা আদর্শবাদী (**idealist**) এবং বস্তুতন্ত্র বা রিয়ালিজমের বিরোধী। কিন্তু তিনি বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যশাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা বা বিবরণ দিয়াছেন তাহা খুব বিকৃত।

* 'সাহিত্যের পথে (পৃঃ ৩২৭)। **বর্ত্তমান গ্রন্থে সমস্ত উদ্ধৃতিগুলিই রবীন্দ্ররচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ হইতে গৃহীত হইয়াছে।**

এই বিকৃতির জন্য বিরোধী পক্ষের মতের যথাযথ বিচার হয় নাই তাঁহার নিজের মতও সুস্পষ্ট হয় নাই। এই বিষয়ে তাঁহার রচনার সঙ্গে আদর্শবাদ-বিরোধী দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের রচনার তুলনা করা যাইতে পারে। আদর্শ-বাদকে খণ্ডন করিবার জন্য রাসেল অনেক সময়ই উহাকে হেয়, বিকৃত মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সবাই জানেন, হেগেলের দর্শন **thesis** বা প্রতিজ্ঞা এবং **anti-thesis** বা বিরোধী প্রতিজ্ঞার সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কথাটা বুঝাইবার জন্য রাসেল বলিয়াছেন: **'"Reality is the uncle." This is the thesis. But the existence of an uncle implies that of a nephew. Since nothing really exists except the Absolute, and we are now committed to the existence of a nephew, we must conclude: "The Absolute is a nephew." This is the anti-thesis.' (*History of Western Philosophy*)** এই খুড়ো-ভাইপো-আশ্রিত ব্যাখ্যার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যবিচার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বিদ্যাপতির একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন:

যব গোধূলিসময় বেলি
ধনি মন্দিরবাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব-পসারি গেলি।

তিনি ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বস্তুতান্ত্রিক তথ্যনিষ্ঠ সমালোচনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন, 'কবি হয়ত বলতে পারতেন, সে সময়ে বালিকার ক্ষিদে পেয়েছিল, এবং মনে মনে মিষ্টান্নের কথা চিন্তা করেছিল।' (সাহিত্যের পথে, পৃঃ ৩১৬) অন্যত্র (পৃঃ ৩৩০) রামায়ণ-সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, কোন বৈজ্ঞানিক সমালোচক হয়ত বলিতে পারেন, অশোকবনে সীতার দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া হওয়া উচিত ছিল। বস্তুতান্ত্রিক সমালোচকেরা কখনও কখনও উদ্ভট কথা না বলেন তাহা নয়, কিন্তু কোন উৎকট বস্তুবাদীই বিদ্যাপতির কবিতা বা রামায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক আরোপিত উক্তি করিবেন বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতান্ত্রিকতাখণ্ডনের পক্ষে এই জাতীয় পন্থা প্রশস্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের আর একটি বিভ্রান্তিকর লক্ষণ উপমার আতিশয্য। তিনি সাধারণতঃ উপমার উপর উপমা জড়ো করিয়া যান,

কিন্তু যুক্তিকে দীপ্তি দান করিলেও, উপমা উপমা, যুক্তি নয় এবং অনেক সময় তাহা যুক্তিকে দীপ্যমান না করিয়া ঝাপ্‌সা করিয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথের যুক্তির মধ্যে কখনও কখনও যে স্ববিরোধিতা পাওয়া যায় তাহারও অন্যতম কারণ উপমা-প্রবণতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতও বোধহয় উপমার দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাই কবি অগমতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, 'উপমার জ্বালায় তুমি বোধ হয় অস্থির হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমার এ প্রাচীন রোগটিও তোমার জানা আছে।' (সাহিত্য, পৃঃ ৮৪৯)* উপমার সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিলে একাধিক বিপদের সম্ভাবনা। প্রথমতঃ, উপমা যুক্তি নয়: তাহা বিশ্বাসের দিকে প্রবণতা দিতে পারে, বিশ্বাস জন্মায় না। দ্বিতীয়তঃ, উপমাকে উপমা দিয়া খণ্ডন করিলে মূল তর্কটি অমীমাংসিত থাকিয়া যায় এবং বিভ্রান্তি বাড়িয়া যায়। 'সাহিত্যধর্ম্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, সাহিত্যের সঙ্গে প্রয়োজনের সম্পর্ক নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, 'সজনে ফুলের সৌন্দর্য্যের অভাব নেই। তবু, ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য এই খর্ব্বতায় সজ্‌নে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারালো।' এইভাবে আরও বহু ফুলফল প্রভৃতির উল্লেখ করিলেন। উত্তরে শরৎচন্দ্র বলিলেন যে, কদলীর সঙ্গে রমণীদেহের অংশবিশেষের তুলনা প্রাচীন কাব্যে সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু পক্ক রম্ভার প্রতি কোন কবিরই বিতৃষ্ণার কথা শোনা যায় নাই!

॥ ২ ॥

এই সকল অসুবিধার কথা মনে রাখিয়াই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের একটি সুসম্বদ্ধ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রথমে প্রয়োজনের জগতের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের ও শিল্পের সম্পর্ক অনুধাবন করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, জগতের সঙ্গে আমাদের তিন রকমের যোগ— প্রয়োজনের যোগ, বুদ্ধির যোগ ও আনন্দের যোগ। ইংরেজিতে বলা

* শেষ বয়সেও তিনি এক পত্রলেখককে লিখিয়াছিলেন, 'সত্য-আলোচনা সভায় আমার উক্তি অলংকারের ঝংকারে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ কথাটা বেশি জানা হয়ে গেছে, সেজন্য আমি লজ্জিত ও নিরুত্তর। অতএব, সমালোচনা সভায় আমার আসন থাক্‌তেই পারে না।' (সাহিত্যের স্বরূপ—পৃঃ ৫৩১) এই স্বীকৃতিতে একটু ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন আছে, কিন্তু তবু ইহা স্মরণীয়।

যায়—**I am, I know, I express**—আমি আছি, আমি জানি, আমি প্রকাশ করি। উপনিষদ্‌ও ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ করিয়াছেন—সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি বস্তুর জগৎ যেখানে আমরা জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত আছি, বিজ্ঞানে দর্শনে আমরা এই জগৎকে জানি, উভয়ত্র আমাদের চেষ্টা বস্তুর জগতের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা। ইহাদের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিয়াছেন যে, যদিও স্বীকার করি যে ময়ূরীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্যই যৌন বা প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করে, তবু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, মানুষের তাহাতে কি আসে যায়? মানুষের চোখে ময়ূরপুচ্ছ সুন্দর লাগে কেন? ইহা হইতে মনে হয়, 'যেখানে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই সুন্দর এবং যেখানে বিনা কারণে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা সেই জন্যই অতি সুন্দর।' (জিজ্ঞাসা—সৌন্দর্য্যতত্ত্ব) রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'সংসারে আমাদের ক্ষুধিত প্রবৃত্তি যেখানে পাত পাড়িয়া বসে তাহার কাছাকাছি প্রায়ই একটা সৌন্দর্য্যের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। ফল যে কেবল আমাদের পেট ভরায় তাহা নহে, স্বাদে গন্ধে দৃশ্যে সুন্দর।··· কেবল পেট ভরাইবার দিক হইতে নয়, সৌন্দর্য্যভোগের দিক হইতেও সে আমাদিগকে আনন্দ দিতেছে। এটা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাভ।' (সাহিত্য—পৃঃ ৫৫০) ভোগের জগৎ, প্রয়োজনের জগৎ হইতে মানুষের হৃদয় মুক্তি চায়। এই মুক্তির আস্বাদই প্রকৃত আনন্দ; সেই আনন্দই সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। 'সৌন্দর্য্য প্রয়োজনের বাড়া। এইজন্য তাহাকে আমরা ঐশ্বর্য্য বলিয়া মানি। এইজন্য তাহা আমাদিগকে নিছক স্বার্থসাধনের দারিদ্র্য হইতে প্রেমের মধ্যে মুক্তি দেয়।'

প্রকৃতি যে সৌন্দর্য্য রচনা করিয়াছে মানুষের সৃষ্ট সৌন্দর্য্যও—অর্থাৎ শিল্প ও সাহিত্যের সৌন্দর্য্যও—তেমনি প্রয়োজনাতিরিক্ত আনন্দানুভূতি হইতে উদ্ভূত হয়। প্রয়োজনের জগতের সঙ্গে তাহার যে সম্পর্ক থাকে তাহা নিতান্তই গৌণ, সেই সম্পর্ক সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উপলক্ষ্যমাত্র। প্রয়োজনের জগৎ বস্তুর জগৎ; বস্তুর উপর বস্তু চাপাইয়া তাহার ওজন দিয়া সাহিত্যের বা শিল্পের মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে না। বস্তুর দর এবেলা ওবেলা উঠানামা করিতেছে; সাহিত্য ও শিল্পের আবেদন চিরন্তন। এই চিরন্তনতার প্রশ্ন না তুলিলেও বস্তু বা প্রয়োজন, যাহাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন তথ্য, তাহা কখনই

শিল্পসৃষ্টির উপাদান হইতে পারে না; ইহা আধার মাত্র। যে অর্ঘ্যপাত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া কীটস Ode-on a Grecian Urn কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'মন্দিরে অর্ঘ্য নিয়ে যাবার সুযোগমাত্র ঘটাবার জন্যে এই পাত্রের সৃষ্টি নয়। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনকে রূপ দেওয়া এর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রয়োজনসাধন এর দ্বারা নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের মধ্যেই এ নিঃশেষ হয়নি। তার থেকে এ অনেক স্বতন্ত্র, অনেক বড়ো।' (সাহিত্যের পথে) এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিধাতাও একজন বড় শিল্পী। মেনকার কবরীবন্ধনে যে পারিজাত ফুল দেখা যায় তাহা বস্তুজগৎ বা প্রয়োজনের জগৎ হইতে মুক্তির নিদর্শন। 'বিধাতার রুদ্ধ আনন্দ ঐ পারিজাতের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে—সেই অরূপ আনন্দ রূপের মধ্যে প্রকাশ লাভ করে সম্পূর্ণ হয়েছে।' সকল শিল্পীর পক্ষেই এই কথা খাটে। বস্তুজগৎ শিল্পকর্ম্মের আধার বটে, কিন্তু তাহা হইতে মুক্ত হইয়াই শিল্প শিল্পত্ব লাভ করে।

বস্তুজগৎকে আমরা অধিকার করি আমাদের কর্ম্মের দ্বারা এবং জ্ঞানের দ্বারা। শিল্পের জগৎ ইহাদের উভয়েরই ঊর্দ্ধে। আমাদের মধ্যে যে বাঁচিবার প্রবৃত্তি যাহা কর্ম্মের প্রেরণা জাগায় আর আমাদের জানিবার প্রবৃত্তি (I am, I know)—ইহারা পরস্পর সম্বদ্ধও বটে আবার বিচ্ছিন্নও বটে। জ্ঞানের দ্বারা আমরা বস্তুজগৎকে অধিকার করিতে চাই, জীবনসংগ্রামে সে আমাদের সহায়, আবার বস্তুর বোঝা হইতে জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তিও পাওয়া যায়। জ্ঞান যখন উচ্চশিখরে উঠে তখন 'সে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজননিরপেক্ষ, সেখানে জ্ঞানের মুক্তি।' (সাহিত্যের পথে, পৃঃ ৩৫৪) কিন্তু বস্তুজগৎ বা জ্ঞানের জগৎ কোন জায়গায়ই মনের সম্পূর্ণ মুক্তি সম্ভব নয়। 'বাস্তবকে আমরা বিশ্বাস করি কেন? কারণ সে প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু অনেক স্থলেই মানুষের সম্বন্ধে যাহা আমরা বাস্তব বলি তাহার বেশির ভাগই আমাদের অপ্রত্যক্ষ।' (সাহিত্য—পৃঃ ৭৬৩) বুদ্ধিনিষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারা যে অধিকার জন্মে তাহাও অসম্পূর্ণ; বুদ্ধির সঙ্গে সত্যের যোগ 'যেন ব্যাধের সঙ্গে শিকারের যোগ। সত্যকে বুদ্ধি যেন প্রতিপক্ষের মত নিজের রচিত কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জেরা করিয়া করিয়া তাহার পেটের কথা টুক্‌রা টুক্‌রা ছিনিয়া বাহির করে।' (সাহিত্য, পৃঃ ৭৬২) এই জন্যই বুদ্ধির বা জ্ঞানের কাছে জগৎ সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না। তাহার ভাষা 'হৃদয়ের মধ্যে অব্যবহিত আবেগে প্রবেশ করতে পারে না।' (সাহিত্যের পথে, পৃঃ

৩৫৪) কিন্তু জগতের সঙ্গে যেখানে আমাদের আনন্দের যোগ বা শুধু প্রকাশ করিবার ইচ্ছার যোগ সেখানে আমাদের বুদ্ধির শক্তিকেও অনুভব করি না, কর্মের শক্তিকেও অনুভব করি না ; সেখানে শুদ্ধ আপনাকেই অনুভব করি, মাঝখানে কোন আড়াল বা হিসাব থাকে না।' (সাহিত্য, পৃঃ ৭৬২) ইহাই সম্পূর্ণ সত্য, সাহিত্যের কাছে ইহাই বাস্তব। 'ইংরেজিতে যাকে বলে real, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিত ভাবে স্বীকার করতে বাধ্য।' (সাহিত্যের পথে, পৃঃ ২৯২) 'সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি—জ্ঞানে নয়, স্বীকৃতিতে। তাকেই বলি বাস্তব।' (সাহিত্যের স্বরূপ, পৃঃ ৫০৯) মানুষের অন্যতম প্রবল প্রবৃত্তি যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষার বিচার করিলেই সাহিত্যে বাস্তবতা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের অপ্রাধান্য প্রমাণিত হইবে। ইংলণ্ডে রেস্টো-রেশন যুগের নাটকে ইহার যে মূর্তি পাওয়া যায় তাহা দৈহিক লালসার মূর্তি ; আধুনিক কালে প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল। রবীন্দ্রনাথের মতে ইহার কোনটিই চিরদিনের মত সাহিত্যের রাজটিকা পায় নাই। যখন প্রেমের মিলন অন্তরবাহিরকে নিবিড় চৈতন্যে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে অর্থাৎ যখন তাহাকে প্রকৃতির আদিম প্রয়োজন হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলা যায় তখনই তাহা সাহিত্যের মূল্য পাইতে পারে। (সাহিত্যের পথে—'সাহিত্যধর্ম')

যে প্রশ্নের সদুত্তর রবীন্দ্রনাথ দিতে পারেন নাই তাহা এই : সাহিত্যের আনন্দাংশ, প্রেমের অংশকে এইভাবে বিশ্লিষ্ট করিতে পারি কিনা আর যদি বিশ্লিষ্টই করি তাহা হইলে চৈতন্যের নিবিড়তা বা বিস্তৃতি ক্ষুণ্ণ হয় কিনা। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে সমগ্রতার কথা বহুবার বলিয়াছেন, কিন্তু এই সমগ্রতা কি পরিশোধিত—বস্তু ও চিন্তার সংশ্লেষমুক্ত—অনুভূতিতে পাওয়া যায় ? তিনি বলিয়াছেন, ফল ভোজনের সামগ্রী ; ইহার বর্ণ, ও রূপের সুষমা ভোজনাতিরিক্ত বস্তু এবং তাহাই সুন্দর। এই জাতীয় বিশ্লেষণ বা বিভাজন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু সাহিত্য ও শিল্প মানুষের সৃষ্টি ; শিল্পিমানসের সমগ্রতাই কাব্য ও শিল্পকে সমগ্রতা দান করে। বস্তুগত ও ভাবগত কবিতার পার্থক্য করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'ভাল করিয়া দেখিলে পৃথিবীর দ্রব্যে নাকি নানা প্রকার অসম্পূর্ণতা দেখা যায়।··ইহা যদি সত্য হয় তবে দূরেই থাকি না কেন, কল্পনায় পূর্ণতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি না কেন—রক্ত মাংসের অত কাছে ঘেঁষিবার আবশ্যক কি ?' (সমালোচনা, পৃঃ ৬১৬-৭) বলা বাহুল্য,

পূর্ণতার এই যে প্রতিমা কবি কল্পনা করিয়াছেন তাহা দূরত্বের জন্যই অস্পষ্ট হইতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, মানুষের প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা মিলনের আকাঙ্ক্ষা; 'তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়। নদীর সঙ্গে নদী।' (সাহিত্যের পথে—পৃঃ ২৯২) দূরত্বের ব্যবধান থাকিলে এই একাত্মতা সম্ভব হয় না। রক্ত মাংসের কাছে যাইয়াই আমরা তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি এবং যাহা কদর্য্য তাহা তাহার কদর্য্যতা রক্ষা করিয়াই শিল্প ও সাহিত্যে আপনার জায়গা পায়। কবিকে বাহিরের ঘটনার মধ্যে নাও পাওয়া যাইতে পারে। টেনিসনের পুত্র পিতার বাহিরের আচার ব্যবহার বা বাহিরের ঘটনাবলীর উপর বেশি জোর দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার লিখিত জীবনী ঠিক কবির জীবনী হয় নাই ইহা মানিয়া লইতে পারি। কিন্তু কবির যে প্রতিভা কাব্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতা, তাঁহার মত ও বিশ্বাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে সম্পৃক্ত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, 'যিনি যাই বলুন শেক্সপীয়রের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত্ত ভাবশরীরী শেক্সপীয়রকে পাওয়া যায় যেখান থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিরাগ অনুরাগ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মত চতুর্দ্দিকে বিচিত্র শিখায় বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে……।' (সাহিত্য, পৃঃ ৮৪২) অমূর্ত্ত ভাবশরীরকে যত অমূর্ত্ত করিয়াই দেখা যাক্ না কেন, এই স্বীকৃতির পর এমন কথা বলা সম্ভব হইবে না যে কাব্যের তাৎপর্য্য বস্তু ও জ্ঞান-নিরপেক্ষ।

বস্তুজগতের সঙ্গে ও জ্ঞানের জগতের সঙ্গে আনন্দময় রসলোকের নৈকট্য ও দূরত্বের সম্পর্ক লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার মত সুনির্দ্দিষ্টভাবে প্রকাশ পায় নাই এবং অনেক সময় এই অস্পষ্টতার অন্তরালে স্ববিরোধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কখনও কখনও মনে হয় রসচেতনা বস্তু-জগতের কুশ্রীতাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের জগৎকে পরিহার করিয়া নূতন আনন্দলোকের সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে তিনি একাধিকবার পেটুকতাকে সাহিত্যের পক্ষে অনুপযোগী বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ওখানে মানুষের প্রবৃত্তি আহারের মধ্যে তৃপ্তি লাভ করিয়া নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাই পেটুকতার চিত্র দেখা যায় শুধু বিদূষক প্রভৃতি গৌণ চিত্রে। কিন্তু শেক্সপীয়র যে সকল অমর চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ফলষ্টাফ যে তাহাদের মধ্যে বিশেষ স্থান পায় তাহা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে সাহিত্যের চিত্রভাণ্ডার হইতে কন্দর্পকে বাদ দিলে লোকসান নাই, লোকসান

আছে ফলষ্টাফকে বাদ দিলে। (সাহিত্যের স্বরূপ, পৃঃ ৫০৯) কিন্তু ফলষ্টাফ শুধু যে অসুন্দর তাই নয়; তাহার চরিত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ভোগ-লোলুপতা। সে পেটুক নহে, মদ্যপ ; অনির্ব্বাণ মদ্যপিপাসা তাহার আহারের রুচিকেও আচ্ছন্ন করিয়াছে। কবি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রাউনিঙের কবিতায় অনেক গদ্যময় বিষয় মিশিয়া গিয়াছে। (সাহিত্যের স্বরূপ, পৃঃ ৫২৮) এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ গদ্যকাব্যের সার্থকতা প্রমাণ করিতে যাইয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, গদ্যকাব্যে সংবাদের সঙ্গে সঙ্গীতের সংমিশ্রণ হয় এবং এই সংমিশ্রণ যুক্তিযুক্ত, কারণ তুচ্ছ অর্থাৎ প্রাত্যহিক ব্যাপারের মধ্যেও একটা স্বচ্ছতা আছে যাহার মধ্য দিয়া অতুচ্ছ ধরা পড়ে। ইহা মানিয়া লইলে রবীন্দ্র-নাথের মূল বক্তব্যের অনেকখানি সংশোধন করা দরকার হইয়া পড়ে। আধুনিক কবিতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোন কবির লেখায় যদি পাই তা হলে বলব এখবরটা দেবার মতো বটে, কিন্তু তার পরেই যদি বর্ণনায় ডেন্টিস্‌ট্ এল, সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তা হলে বল্‌তে হবে নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে, কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মত খবর নয়।' যদি এই নীতি মানা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে হোমার, দান্তে, শেক্সপীয়র ও ডান নরনারী সম্পর্কে এমন অনেক খবর দিয়াছেন যাহা সবাইকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিবার মত নয়।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্যে চিন্তা বা আইডিয়ার স্থান লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। ইংরেজ কবি-সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ড বলিয়াছেন যে, কাব্য জীবনের সমালোচনা বা criticism of life, কিন্তু এই সমালোচনা কাব্যের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথ চিন্তা বা আইডিয়াকে গৌণ করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক।.........সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই।' (সাহিত্য, ৮২৮) তিনি রঘুবংশকে কাব্যাংশে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন, কারণ তাহা উদ্দেশ্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত : 'রাজধর্ম্মে কিসে গৌরব, কিসে তার পতন এইটের তিনি দৃষ্টান্ত দিতে চেয়েছেন। এইজন্য সমগ্রভাবে দেখতে গেলে রঘুবংশ আপন ভারবাহুল্যে অভিভূত, মেঘদূতের মতো তাতে রূপের সম্পূর্ণতা নেই।' (সাহিত্যের স্বরূপ—পৃঃ ৫১৬) তিনি নিজে যে মেঘদূতের মধ্যে একটা উদ্দেশ্যমূলক সূত্র বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার জন্যও কৈফিয়ৎ

দিয়াছেন। আধুনিক উপন্যাস সম্বন্ধে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে সেখানে মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। নিজের 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বিরুদ্ধেও এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে তাহা কবুল করিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এই দুই উপন্যাসে রাষ্ট্রতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় জায়গা পাইয়াছে না জায়গা জুড়িয়াছে।

জায়গা পাওয়া ও জায়গা জোড়ার পার্থক্য তিনি অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'যদি কোন দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সত্যকে সাহিত্যের অন্তর্গত করতে চাই তবে তাকে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা আমাদের সন্দেহ-বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত করে আমাদের মানসিক প্রাণপদার্থের মধ্যে নিহিত করে দিতে হবে ;·········সত্য যখন মানবজীবনের সঙ্গে মিশে যায় তখনই সাহিত্যে ব্যক্ত হতে পারে।' (সাহিত্য, পৃঃ ৮৪৪) সাহিত্যের প্রাণপদার্থ সজীব চরিত্র ; সুতরাং 'অর্থনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি চরিত্রের অনুগত হয়ে বিনীতভাবে যদি না আসে, তবে তার বুদ্ধিগত মূল্য যতই থাক্, তাকে নিন্দিত করে দূর করতে হবে।' (সাহিত্যের স্বরূপ, পৃঃ ৫১৬) এই কারণে তিনি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা কর্ণকে বেশি মূল্য দেন, লক্ষ্মণের তুলনায় রাম তাঁহার কাছে নিষ্প্রভ। রাম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রসৃষ্টিতে আদর্শের জন্য ওকালতি আছে ; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে লক্ষ্মণ, হনুমান ও কর্ণ দোষে গুণে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সজীব চরিত্র এবং তাঁহার মতে অসুন্দর বস্তুও কাব্যসৌন্দর্য্যের বিশিষ্ট উপাদান হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ বিতর্কমূলক, উদ্দেশ্যনিষ্ঠ সাহিত্য সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অর্দ্ধসত্য এবং একটু বিভ্রান্তিকর। ইহা সত্য যে, সাহিত্য প্রাণচঞ্চল জগৎ রচনা করে, কিন্তু প্রাণপদার্থ শুধু হৃদয়ে নিহিত থাকে না, বুদ্ধিও তাহার রস জোগায় এবং বস্তুজগতের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। আত্মা দেহ অপেক্ষা বড়, কিন্তু শরৎচন্দ্রের কমল প্রশ্ন করিয়াছে, দেহ যদি না থাকে ? সাহিত্য যে সকল সজীব চরিত্র সৃষ্টি করে এবং চরিত্রগুলি যে সকল তত্ত্বকথা বলে তাহা যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইবে-ইহা মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তত্ত্বকথার যে স্বকীয় মূল্য নাই এবং সব সময়ই তাহা যে চরিত্রের অনুগত হইয়া বিনীতভাবে প্রবেশ করিবে তাহা ঠিক নহে। কাব্যে নানাপ্রকার উপাদান থাকে। সফোক্লিসের রাজা ঈদিপাস নাটকে চরিত্র ও তত্ত্বকথা প্লটের অনিবার্য্য গতির কাছে নতিস্বীকার করিয়াছে, শেক্সপীয়রের নাটকে চরিত্র প্রাধান্য

পাইয়াছে, ইবসেন ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদের নাটকে আইডিয়া বা তত্ত্বই প্রাণবন্ত হইয়াছে। ইবসেনের নোরা বা আলভিং-মাতা জীবন্ত চরিত্র, কিন্তু তাহাদের প্রাণরস যোগাইয়াছে নাটকের তত্ত্ব; ইহারা যদি লেডি ম্যাক্‌বেথের মত প্রাধান্য পাইত তাহা হইলে নাটক কেন্দ্রচ্যুত হইত। মনে হয় শেক্সপীয়রের চরিত্রের মত প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র ইব্‌সেন কল্পনা করিয়াছেন মাত্র একটি—হেড্ডা গ্যাবলার। এই নাটকটির মধ্যে ইব্‌সেনের শক্তির পরিচয় যথেষ্ট আছে, কিন্তু ইহা উৎকৃষ্ট নাটক হইলেও ইব্‌সেনের পরিণত বয়সের শ্রেষ্ঠ নাটকের পর্য্যায়ে পড়ে কিনা সন্দেহ; তাহার কারণ হেড্ডার চরিত্রের গতিবেগপ্রাবল্যে তত্ত্বকথা যথাযোগ্য প্রাধান্য পায় নাই। এই সব যুক্তির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের উত্তর: 'ইব্‌সেনের নাটকগুলি তো একদিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনই কি তার রং ফিকে হয়ে আসে নি, (সাহিত্যের স্বরূপ, পৃঃ ৫১৭) ইব্‌সেনের নাটক আজও অম্লান দীপ্তিতে ভাস্বর; তাঁহার প্রভাব বিশ্বসাহিত্যে পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য যুক্তি নয়, আত্মপ্রবঞ্চনা।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়ের মধ্যে ভেদরেখা টানিয়া সাহিত্যের যে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। তাঁহার নিজের দেওয়া একটি দৃষ্টান্তই তাঁহার থিওরির অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করিবে। তিনি বলিয়াছেন 'কত লোক পাগলের মতো কেবল দেশ-বিদেশের ছাপ-মারা ডাকের টিকিট সংগ্রহ করিতেছে; সেজন্য সন্ধানের এবং খরচের অন্ত নাই।' (সাহিত্য, পৃঃ ৭৪৯) কিন্তু এই চেষ্টা অপ্রয়োজনীয় হইলেও সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে না। সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নিবিড় অনুভূতি হইতে এবং ইহা স্বাভাবিক যে যাহা আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই আমরা নিবিড়ভাবে অনুভব করি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ; এই সমগ্র মানবতা ইন্দ্রিয় মন আত্মা লইয়া গঠিত; সাহিত্যে যে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায় তাহা বস্তু ও জ্ঞানের অসংখ্য বন্ধন মাঝেই লাভ করা যায়। প্রয়োজনকে রূপান্তরিত করিয়া কবি কাব্য সৃষ্টি করেন, 'প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম' করিয়া নয়।

॥ ৩ ॥

এই প্রসঙ্গে কাব্য ও সাহিত্যের উপকারিতার প্রশ্ন উঠিয়া পড়ে। প্লেটোর মতে কাব্য ও শিল্প উপকারী তো নয়ই বরং ইহারা প্রভূত অপকার করে, কারণ ইহারা নকলের নকল করে আর আমাদের দুর্ব্বল প্রবৃত্তিগুলিকে সঞ্জীবিত করে। যে অর্থে অন্য পাঁচটা প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের উপকার করে সেই অর্থে কাব্য ও শিল্প অবশ্যই কোন উপকার করে না। মিস্ত্রী যে পালঙ্ক বানাইয়া দেয় তাহার উপরে আমরা শুইতে পারি, চিত্রকর পালঙ্কের যে ছবি আঁকে সেখানে শোওয়া সম্ভব নয়। কাব্য ও সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম্ম সম্পর্কে এই সহজ সত্যটি সব সময় মনে রাখিতে হইবে। কাব্যের যদি কোন উপকারিতা থাকে, খুব সূক্ষ্মভাবেই তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। শিল্প ও সাহিত্য কোন জাগতিক লাভ আনয়ন করে কি না, তাহা রাষ্ট্রনীতি বা সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কোন জ্ঞান দান করে কি না তাহা বিবেচ্য নয়, তাহারা নীতিশিক্ষার বাহন হিসাবেও পরিগণিত হইতে পারে না। এই সব শাস্ত্রে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা সাহিত্যের মাধ্যমে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়, সাহিত্যের মধ্যে সেই জ্ঞান জীবন্ত হইয়া উঠে। এই জন্যই কবি সবচেয়ে বড় শিক্ষাগুরু।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে জীবনের অনুকরণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার যুক্তি খুব সংক্ষিপ্ত: মন প্রকৃতির আরসি নয়। আর যদি সাহিত্য জীবনের নকল হইত তাহা হইলে তাহা একপ্রকারের খেলা বলিয়া গণ্য হইত। শিশু পুতুল লইয়া জীবনযাত্রার নকল করে; ইহাকে পুতুল খেলা বলা যাইতে পারে। ছেলেমেয়েরা নিজেদিগকে দুই দলে ভাগ করিয়া এক পক্ষ আর এক পক্ষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; ইহা লড়াইয়ের নকল। তাই ইহাকে খেলা বলিতে পারা যায়। এই ভাবে সাহিত্য বিচার করিতে রবীন্দ্রনাথ কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন: 'বেঁচে থাক্‌বার জন্যে আমাদের যে মূলধন আছে তারই একটা উদ্বৃত্ত অংশকে নিয়ে সাহিত্যে আমরা জীবন-ব্যবসায়েরই নকল করে থাকি, এ কথা বল্‌তে তো মন সায় দেয় না।' (সাহিত্যের পথে, পৃঃ ৩১২) সেইজন্য তিনি সাহিত্যকর্ম্মকে বলিয়াছেন লীলা; ইহা অপর বস্তুর নকল নহে, পরন্তু *সৃষ্টির স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল*। অথচ ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই; এখানে দুঃখজনক ঘটনাও আনন্দ দান করে, কারণ দুঃখজনক, ভয়ঙ্কর ব্যাপারে আমরা ব্যথিত হই না বরং নিজেকে বেশি করিয়া উপলব্ধি করি। 'রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে; লীলা যদি না হত বুক যেত

ফেটে।' কল্পনায় আপনার [এই] অবিমিশ্র উপলব্ধিকে কবি লীলা বলিয়াছেন। এইভাবে তিনি সাহিত্যকে জ্ঞানের বা নীতিশিক্ষার বা উপকারিতার জগৎ হইতে বিশ্লিষ্ট করিতে চাহিয়াছেন।

সাহিত্যের এই সংজ্ঞায় অনেকে আপত্তি করিবেন। সাহিত্য যদি লীলা-মাত্র হয় তাহা হইলে ইহার দ্বারা জগতের কি উপকার সাধিত হইবে? রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও এই জাতীয় মনোভাবকে কৌতুকহাস্যের দ্বারা উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন উপকারিতার পরিমাণের উপর সাহিত্যের সত্যতা ও সৌন্দর্য্যের পরিমাণ নির্ভর করে না। সারবান্ সাহিত্য রচিত হইতেছে না বলিয়া অনেকে দুঃখ করেন, কিন্তু সারবান্ সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটিলেও, অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি। অনেকে কাব্যে অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি দার্শনিক বা অভিব্যক্তিবাদ (**theory of evloution**) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন। লুক্রেশিয়ুস ও দান্তে তো বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক কবি হিসাবে বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তত্ত্ব তুমি দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে পারো, কিন্তু কাব্যরসই কবিতার বিশেষত্ব। (সাহিত্য—'কাব্য' ও 'সাহিত্যের সামগ্রী') তাঁহার 'সব শেষের কথা' এই, 'আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এ প্রশ্নের কোন অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোন হিতসাধন হয় কিনা।' (সাহিত্যের পথে, পৃঃ ৩১১)

উপরের আলোচনা হইতে মনে হইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ **art for art's sake** বা কলাকৈবল্যবাদের সমর্থক। কিন্তু সেইরূপ সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত হইবে না। সুইনবর্ণ প্রভৃতির **Gospel of Beauty** বা সৌন্দর্য্যের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি কঠোর মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন, 'সৌন্দর্য্যের টান মানুষের মনকে যদি সংসার হইতে এমনি করিয়া ছিনিয়া লয়, মানুষের বাসনাকে তাহার চারিদিকের সহিত যদি কোনোমতেই খাপ খাইতে না দেয়, যাহা প্রচলিত তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রচার করে, যাহা হিতকর তাহাকে গ্রাম্য বলিয়া পরিহাস করিতে থাকে, তবে সৌন্দর্য্যে ধিক্ থাক্।' (সাহিত্য, পৃঃ ১৭৫) রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব-আলোচনার অসুবিধা এই যে, তিনি এক হাতে যাহা বর্জ্জন করেন আর এক হাতে তাহা গ্রহণ করেন। তিনি প্রয়োজনীয়তাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কিন্তু কল্যাণ রূপে বা মঙ্গলের নামে তাহাকে আবাহন

করিয়াছেন। তিনি সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের মধ্যে যে মিল আছে তাহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য প্রয়োজনের বাড়া; ইহা স্বার্থসাধনের দারিদ্র্য হইতে প্রেমের মধ্যে মুক্তি দেয়। মঙ্গলের মধ্যেও আমরা অতিরিক্তত্বের ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাই। ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায় কোন বীরপুরুষের আত্মত্যাগে; তিনি সংকীর্ণ স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া মহৎ আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। এই খানেই কল্যাণ ও সৌন্দর্য্যের সাদৃশ্য ও সম্মিলন। কিন্তু কবি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, জগতের উপকারের জন্য, অর্থাৎ বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই বীরপুরুষ নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে এই আত্মত্যাগ আত্মহত্যা বলিয়া গণ্য হইত। বীরপুরুষের জগতের জন্য আত্মবিসর্জ্জনকে অপ্রয়োজনীয়ের পর্য্যায়ে ফেলিলে শুধু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহার বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্যজগতে সৌন্দর্য্য একটা বিমিশ্র পদার্থ। তিনি বলিয়াছেন, 'গর্ভিণী রমণীর যে কান্তি সেটাতে চোখের উৎসব তেমন নাই। নারীত্বের চরম সার্থকতা লাভ যখন আসন্ন হইয়া আসে তখন তাহারই প্রতীক্ষা নারীমূর্ত্তিকে গৌরবে ভরিয়া তোলে।' (সাহিত্য—পৃঃ ৭৫৬-৭) এই যে গৌরব ইহার সঙ্গে বংশরক্ষা জড়িত আছে, ইহার ভিত্তি যৌনমিলন বা লালসা এবং ইহার পরিণতি মনুষ্য সমাজের সবচেয়ে কল্যাণময় বস্তু মাতৃস্নেহে।* সৎ ও চিৎকে বাদ দিয়া শুধু আনন্দকে গ্রহণ করিলে আমরা সৌন্দর্য্যের খণ্ডিত পরিচয় পাইব। সূক্ষ্মকে পাইতে হইলে স্থূলবস্তুকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, 'কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূল খাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন। সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে উল্লাস না করে আধিভৌতিকতার অভাব বলে বিমর্ষ হওয়া উচিত।'[১] (সাহিত্যের স্বরূপ, পৃঃ ৫২১) তিনি নিজে বস্তু জগৎ হইতে মুক্ত সাহিত্য সরস্বতীর যে মূর্ত্তি খাড়া করিয়াছেন তাহাও ছায়ামূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়।

*এই প্রসঙ্গেই মেঘদূত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'বিরহীর বার্তাপ্রেরণকে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলব্যাপারের সঙ্গে পদে পদে গাঁথিয়া গাঁথিয়া তবে কবির সৌন্দর্য্যরসপিপাসু চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছে;' যতই কবিত্বপূর্ণ নাম দিই না কেন, মেঘের প্রধান কাজ পৃথিবীকে শস্যশালিনী করা এবং ইহা প্রয়োজনের জগতের অন্তর্ভুক্ত।

॥ ৪ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের যে আলোচনা করা হইল তাহা খণ্ডনমূলক। তাঁহার এই বিষয়ের রচনায় যে অস্পষ্টতা ও স্ববিরোধিতা আছে তাহার কথাই এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে এই সমস্ত ত্রুটি ও অপূর্ণতার অন্তরালে কোন সুসম্বদ্ধ মৌলিক মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। এই কথা প্রথমে মানিতে হইবে, শুধু যে রবীন্দ্রনাথই উল্টোপাল্টা উক্তি করিয়াছেন তাহাই নহে, সাহিত্যের সৃষ্টিই বিরোধাভাসে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের আলোচনার দোষ এই যে অন্য সব শ্রেষ্ঠ লেখকরা—যেমন অভিনব গুপ্ত, কোল্‌রিজ বা ক্রোচে—এই বিরোধাভাস সম্পর্কে সচেতন এবং তাঁহারা ইহার সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে এই বিষয়ে সন্দেহই উত্থিত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহার স্বরূপ বুঝিতে কষ্ট হয়।

প্রথমে এই বিরোধাভাসগুলির কথাই ধরা যাক। সাহিত্যের একটা লক্ষণ দূরত্ব। যে জিনিস আমাকে ব্যক্তিগত জীবনে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহা লইয়া কাব্য রচনা করা যায় না; একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেই তাহার কাব্যরূপ ধরা পড়ে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছিলেন যে, কবিতা হইতেছে **emotions recollected in tranquillity** অর্থাৎ কোন অনুভূতিরই প্রথম অভ্যাগমে কবিতা রচনা সম্ভব হয় না; তাহা যখন স্মৃতিতে সঞ্চিত হইয়া প্রশান্ত মননের বিষয় হয় অর্থাৎ একটু দূরে সরিয়া যায় তখনই তাহা কাব্যের অন্তর্গত হইতে পারে। এডোয়ার্ড বুলো মনোবিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, সাহিত্য ও শিল্পের মূলে রহিয়াছে মানসিক দূরত্ব (**psychic distance**)। ইহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অপ্রয়োজনীয়তাবাদের সাদৃশ্য আছে; বুলোও মনে করেন যখন ব্যবহারিক জগতের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং আমরা কোন দুর্ব্বিপাককে দর্শকের ঔদাসীন্যের সঙ্গে লক্ষ্য করি তখনই ঈস্থেটিক বা শিল্পিসুলভ মনোভাবের উদয় হয় (**'when our practical interest snaps like a wire from over-tension and we watch the consummation of some impending catastrophe with the marvelling unconcern of a mere spectator'**—***Aesthetics*****, p. 94**)। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, 'দুঃশাসনের হাতে কৌরবসভায় দ্রৌপদীর যে অসম্মান ঘটেছিল

তদনুরূপ ঘটনা যদি পাড়ায় ঘটে তা হলে তাকে আমরা মানবভাগ্যের বিরাট শোকাবহ লীলার অঙ্গরূপে বড়ো করে দেখতে পারি নে।...মহাভারতের খাণ্ডবদাহ বাস্তবতার একান্ত নৈকট্য থেকে বহু দূরে গেছে— সেই দূরত্ববশতঃ সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে তেমনি করেই সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পারে যেমন করে সে দেখে পর্ব্বতকে সরোবরকে।' (সাহিত্যের পথে, পৃঃ ৩৭০)

কিন্তু সাহিত্যের জন্ম হয় তীব্র অনুভূতিতে এবং তাহা আমাদের হৃদয়কে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। কেবলমাত্র দর্শকের ঔদাসীন্যের সঙ্গে কোন জিনিস বর্ণনা করিলে তাহা সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে না; তাহা হইলে সাহিত্যসৃষ্টি ও ইতিহাসের বিবরণের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন যে, কাব্যরচনাকালে কবি যখন তাঁহার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা রোমন্থন করেন তখন স্মৃতিতে আগেকার অনুভূতির অনুরূপ অনুভূতি জাগ্রত হয় অর্থাৎ যাহা দূরে সরিয়া গিয়াছিল তাহা আবার নিকটে আসে। এডোয়ার্ড বুলোও এই জাতীয় মত পোষণ করেন। তিনি বলেন সাহিত্যে ও শিল্পে দূরত্ব একেবারে অপসৃত হয় না, কিন্তু যথাসম্ভব হ্রাস প্রাপ্ত হয় (*'utmost decrease of Distance without its disappearance'*, Aesthetics, *p. 100*) রবীন্দ্রনাথও এই কথা বহুবার বলিয়াছেন, সাহিত্যের অর্থ সহিতত্ব বা মিলন। 'সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ সম্মিলন।' সাহিত্যের পথে—পৃঃ ৩৬৬) এই মিলন মানুষে মানুষে মিলন, কালে কালে মিলন; তদপেক্ষাও বেশি বিষয়ের সঙ্গে কবিহৃদয়ের তন্ময়তা। এই প্রসঙ্গে কোল্‌-রিজের মতও তুলনীয়। কোল্‌রিজের বিশ্বস্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে নিয়ত উপলব্ধি করিতেছেন, এই যে অনন্ত অস্মিতা (the infinite I AM) ইহাই ইমাজিনেশনের মধ্যে পুনরাবৃত্ত হইতেছে।

কবির সৃষ্টিতে শুধু যে দূরত্ব ও নৈকট্যেরই সমাবেশ দেখা যায় তাহা নহে, আরও বিরোধাভাস আছে। বৈজ্ঞানিক তাঁহার বিষয়বস্তুকে খুব নিকটে আনিয়া দেখেন; তাঁহার যন্ত্রপাতি—দূরবীক্ষণই হউক আর অণুবীক্ষণই হউক—এই নৈকট্যসম্পাদনের উপায় মাত্র! অথচ বৈজ্ঞানিক আবার সব জিনিসই উদাসীন ভাবে দূর হইতে দেখেন; তাঁহার কোন বস্তুর প্রতি কোন আকর্ষণ নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বিজ্ঞান 'ব্যক্তিস্বভাববর্জিত।' কিন্তু সাহিত্যের কারবার ব্যক্তিকে লইয়া—'স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যাহা ব্যক্ত হয়েছে তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র।' (সাহিত্যের পথে—পৃঃ ৩৩৬) বৈজ্ঞানিক যখন

নক্ষত্রকে যখন জ্যোতিষ্ক বলেন, তখন তিনি তাহাকে নক্ষত্র বলিয়াই জানেন, কিন্তু কবি যখন নক্ষত্রকে সুন্দর বলেন, তখন নক্ষত্রলোকের মধ্যে তাঁহার আপনার হৃদয়কে অনুভব করেন। (সাহিত্য—পৃঃ ৮৫৬)। যে সব প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ আপনাদের রুচি অনুসারে জগৎকে দেখিতে চাহিতেন, তাঁহারা বলিতেন যে গ্রহনক্ষত্রাদির গতি নিশ্চয়ই বৃত্তাকার, কারণ বৃত্ত সবচেয়ে মনোরম রেখাচিত্র! এডোয়ার্ড বুলোও বলেন যে, সাহিত্য ব্যক্তিগত (**personal**) সম্পর্কের বর্ণনা দেয়; এই জন্যই তিনি বস্তুনিষ্ঠতা (**objectivity**) বা নির্লিপ্ততা (**detachment**) বা এই জাতীয় অন্য কথা ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু সাহিত্য যদি ব্যক্তির নিজের কথাই বলিত তাহা হইলে ব্যক্তিত্বের অপরাপর প্রকাশ হইতে তাহার কোন মৌলিক পার্থক্য থাকিত না। বুলো বলিয়াছেন, ইহা এক বিশেষ রকমের ব্যক্তিত্ব; এখানে ব্যবহারিক জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা বা ভোগাসক্তি নাই। সুতরাং বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য অনেকটা কমিয়া গেল, সাহিত্যিক আসক্তও বটেন আবার নিরাসক্তও বটেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।' (সাহিত্যের পথে, পৃঃ ৩৪৮)

বাস্তব লইয়াও গোলযোগের অবধি নাই। কবি তাঁহার ইমাজিনেশন বা কল্পনার বলে এক নূতন জগৎ রচনা করেন; রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বলিয়াছেন দ্বিতীয় সংসার। ইহা কাল্পনিক, অ-বাস্তব। কিন্তু যাহা অ-বাস্তব তাহাই কি মিথ্যা? যদি তাহাই হইত তাহা হইলে কাব্যের এই বিপুল ও তীব্র আবেদন থাকিত না, পাঠকসমাজ তাহাকে হৃদয়ের সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করিত না। সমালোচকচূড়ামণি অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, সাহিত্য জীবনের অনুকরণ কিন্তু সাহিত্যের সংসার ঠিক বাস্তব নয়; ইহা সম্ভাব্য ও ও অবশ্যম্ভাব্য। এই অবশ্যম্ভাবিতা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। অবশ্যম্ভাবিতার জন্যই সাহিত্য ইতিহাস বা জীবনের অনুকরণ অপেক্ষা ব্যাপক এবং অধিকতর দার্শনিক তত্ত্বসমৃদ্ধ অর্থাৎ সত্যতর। দেবর্ষি নারদের মুখ দিয়া রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন:

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি।
ঘটে যা সব তা সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি,
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'[১]

রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতার বিরোধী, তাঁহার মতে বাস্তব জগতের মানদণ্ডের দ্বারা সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। কিন্তু আবার তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, যাহা আমরা হৃদা মনীষা মনসা উপলব্ধি করি তাহা শুধু সুন্দর নয়, সত্যও এবং তাহাই বাস্তব। বাস্তব ও অ-বাস্তব, সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব অমীমাংসিতই থাকিয়া গেল।

এই সব বিরোধাভাসের সবচেয়ে সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের রচনায়। ইঁহাদের মতে রসের ভিত্তি রহিয়াছে মানুষের মনের স্থায়ী ভাব বা সংস্কারে ; সেই হিসাবে সাহিত্য বাস্তব, কারণ লৌকিক জগতের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতেই তাহার গোড়াপত্তন। কিন্তু ইহা শাস্ত্র ইতিহাসাদির মত প্রমাণব্যাপার নহে ; ইহা আস্বাদস্বরূপ। ইহা লৌকিক অনুভূতি হইতে বিলক্ষণও বটে ; তোমার পুত্র হইয়াছে এই কথা শুনিলে মানুষের মনে যে আনন্দ হয়, কাব্য রচনা বা পাঠ করিয়া ঠিক সেই রকমের আনন্দ হয় না। রসের আনন্দ অ-লৌকিক আনন্দ। লৌকিক জীবনে আমরা কতকগুলি ব্যাপারে একেবারে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ি, সেখানে আমাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ; আবার যে সকল ব্যাপারে আমাদের স্বার্থ জড়িত থাকে না সেখানে আমরা হই উদাসীন। কিন্তু কাব্যে আমরা একই সময়ে অভিনিবিষ্ট ও উদাসীন থাকি। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেম আমাদের নিজেদের প্রেম ; আমরা ইহার রসে আপ্লুত হইয়া পড়ি। আবার ইহা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার ব্যাপার, আমাদের সঙ্গে ইহার কোন সাক্ষাৎ সংস্রব নাই। দুষ্মন্ত যখন কণ্ব মুনির তপোবনে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া এক মৃগশিশু প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইল। কালিদাস তন্ন তন্ন করিয়া এই ভীত মৃগশিশুর অঙ্গসঞ্চালনের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি যদি ভয় অনুভব না করিতেন তাহা হইলে ঐরূপ বর্ণনা দিতে পারিতেন না ; অপরপক্ষে তিনি যদি বাস্তবিকই ভীত হইতেন তাহা হইলে কবিতা না লিখিয়া নিজেই পলায়নপর হইতেন। তিনি ভয়াচ্ছন্ন ও ভয়বিমুক্ত বলিয়াই এইরূপ বর্ণনা দিতে পারিয়াছেন। এই যে অ-লৌকিক অর্থাৎ লিপ্ত ও নির্লিপ্ত অনুভূতি ইহাই রস এবং লৌকিক নয় বলিয়াই ইহা দেশকাল-অনালিঙ্গিত।

এই অ-লৌকিক অনুভূতি আস্বাদিত হয় কবি-সহৃদয়ের হৃদয়ে, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বাহিরের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা প্রভৃতি বিভাবের উপরে, তাহারাই রসাস্বাদের কারণ ; তাহাদের সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব ও অনুভাবের সঙ্গে

তাহাদের যে সংযোগ বা মিলন তাহার দ্বারাই রসের নিষ্পত্তি হয়। লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে যে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা মূলতঃ বাস্তব জগতের লোক, তাহাদের হাব-ভাব এবং অভিজ্ঞতাও বাস্তব জগতের, কিন্তু কবির ভাব তাহাদের মারফতেই অ-লৌকিক রস-জগতে নীত হয়। এই রূপান্তরণের প্রধান বাহন কবির ভাষা। আমরা শব্দের এক রকম অর্থের সঙ্গে পরিচিত আছি। ইহা ব্যবহারিক জীবনে বা শাস্ত্র ইতিহাসাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কবি আর একটি অর্থ আবিষ্কার করেন, তাহার নাম প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঞ্জনা। ইহার দ্বারাই লৌকিক, বাস্তব অভিজ্ঞতা পরমার্থিক জগতে উত্তীর্ণ হয়।

॥ ৫ ॥

অভিনবগুপ্ত বলেন রস আস্বাদিত হয়, প্রতীত হয়। বিগলিত, পরিব্যাপ্ত ও বিকশিত চিত্তবৃত্তিতে যে প্রতীতি জন্মে তাহাই রস; তবু আমরা যেমন বলি ভাত পাক করা হইতেছে, সেই ভাবে বলা যাইতে পারে যে রস প্রতীত হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভট্টনায়ক বলিয়াছিলেন যে রস প্রতীতও হয় না, অভিব্যক্তও হয় না। অভিনব বলিয়াছেন যে, রস অবশ্যই প্রতীত হয়; এই প্রতীতি বিশুদ্ধ ভাব বা চিত্তবৃত্তির স্বরূপের সাক্ষাৎকার, এই গৌণ অর্থেই রস অভিব্যক্ত হয়।* রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সহজ, প্রাথমিক অর্থেই বলিয়াছেন যে, সাহিত্যসৃষ্টি প্রধানতঃ প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। ইহার তাৎপর্য্য ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশের তাৎপর্য্য ও ঐশ্বর্য্য। এইখানেই অভিনবগুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পার্থক্য এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বব্যাখ্যায় মৌলিকতাও এইখানেই। সাহিত্যে ও শিল্পে মানবের ভাব প্রকাশিত হয় এই কথা বহু সাহিত্যশাস্ত্রী বলিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি একটু নূতন ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন; এখন সেই নূতনত্বের অনুধাবন করিতে হইবে।

আপত্তি হইবে যে, অভিনবও তো বলিয়াছেন রস স্বীয় অর্থাৎ কবি-সামাজিকের চিত্তবৃত্তিতেই আস্বাদিত হয়। বাল্মীকির 'মা নিষাদ' শ্লোকটির সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, 'পরিপূর্ণ কুম্ভ হইতে যেমন জল উছলিয়া পড়ে, তেমনি চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক নিঃষ্যন্দিতার জন্য বিলাপবাক্য ক্ষরিত হয়।' উপমাটি

*আনন্দবর্দ্ধনও বলিয়াছেন, ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থ শোক শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। (ধ্বন্যালোক, ১।৫) শোক অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এমন কথা বলেন নাই।

খুব সুসঙ্গত নয়, কারণ রসাস্বাদ ব্যক্তিগত ভাবের অতিশয়িত প্রকাশ নহে; তাই অভিনব স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, 'মনে রাখিতে হইবে ইহা মুনির শোক নহে।' (লোচন ১।৭) কেমন করিয়া ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তি নৈর্ব্যক্তিক শোকে পরিণত হয় তাহা বুঝাইবার জন্য এইসব আলংকারিকেরা বিভাবাদি ও শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। রসাস্বাদ, রসপ্রতীতি বা রসাভিব্যক্তি— ইহার উপায় হইল বিভাবাদি ও প্রতীয়মান অর্থ। ইহাদিগকে ইংরেজি পরিভাষায় **vehicle** বা বাহনও বলা যাইতে পারে, তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা প্রকাশিত হইতেছে এবং যাহা প্রকাশ করিতেছে তাহারা অভিন্ন। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা প্রকাশিত বা প্রতীত হইল তাহা বিশুদ্ধ, সর্ব্বসাধারণের আস্বাদ্য ভাব, ব্যক্তিগত অনুভূতি নহে।

রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়াছেন রসস্রষ্টার বা রসবেত্তার ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রাবল্যের উপর। কবি কোন কোন ভাব তীব্রভাবে অনুভব করেন এবং সেই তীব্র অনুভূতি একটা বিশেষ রূপে—অলংকৃত বাক্যে—অভিব্যক্ত হইয়া পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অনুভূতি কবির চিত্তকে এমন প্রবলভাবে নাড়া দেয় যে ব্যবহারিক জীবনের বা বিজ্ঞানের বা দর্শনের ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এই যে তীব্র আলোড়ন ইহা এক প্রকারের জ্ঞান এবং এইজন্যই ট্র্যাজেডি আমাদের আনন্দ দান করে এবং এইজন্যই কাব্যের অলংকৃত বাক্যও স্বাভাবিকতা লাভ করে। 'ট্র্যাজেডিতে আছে বেগবান্ অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি।......তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।' (সাহিত্যের পথে—পৃঃ ৩৫৮) অন্য প্রসঙ্গেও তিনি ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রাবল্য ও তাহার অবিলম্বিত, ঐশ্বর্য্যবান্ প্রকাশের উপর জোর দিয়াছেন: 'সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করা যাক্ যাতে লোকে অবিলম্বে জানতে পারে যে সেটা আমারই বিশেষ মন থেকে বিশেষ ভাবে দেখা দিচ্ছে।' (সাহিত্য—পৃঃ ৮৩৯)

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে রসোদ্ভাবন বা ইউরোপীয় লেখকরা যাহাকে **expression of emotions** বলেন রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাহা বলেন নাই। ব্যবহারিক জীবনে ভাবের অবিলম্বিত, অব্যবহিত প্রকাশ দেখা যায়; সহচরী-নিধনজাত শোক ক্রৌঞ্চের কণ্ঠ হইতে খুব স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও তীব্রভাবে প্রকাশিত হইল, কিন্তু ইহা শ্লোকত্ব পাইল না, কারণ ইহা ব্যক্তিগত শোকের বেড়া অতিক্রম

করিতে পারে নাই। এইখানেই কাব্যের চরম antinomy বা বিরোধাভাস। কবি নিজের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন অথবা অপরের অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করিয়া রূপ দিতে পারেন, কিন্তু তাহা এমনভাবে অভিব্যক্ত করিতে হইবে যে তাহার মধ্যে সামাজিক পাঠকও স্বীয় অনুভূতি ও ভাবনার প্রতিরূপ দেখিতে পাইবেন। এই নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিকতাই সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'অনেকের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য্য, সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানা প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে।' কবি আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, 'যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই।' (সাহিত্যের পথে) তিনি আন্দাজ করিয়াছেন যে, পাখীর গানের লক্ষ্য পক্ষিসমাজ। রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি আলংকারিক বা ক্রিটিক নহেন; তাই যে সকল উপায়ে—'নানা প্রকারে'—কবি ভাব প্রকাশ করেন তাহার তিনি বিবরণ বা ব্যাখ্যা দেন নাই। তিনি মনে করেন মানুষ যখন নিজের অনুভূতিকে স্বীয় সুখ-দুঃখের গণ্ডি হইতে উর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারে তখনই তীব্রতা ও ব্যাপ্তির সমন্বয়ে ভাব শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হয়। অভিনব-গুপ্ত ইহাকে বলিয়াছেন, হৃদয়সংবাদ বা হৃদয়ের সম্মিলন; তিনি জোর দিয়াছেন উপায়ের—ব্যঞ্জনার—বৈচিত্র্যের উপর; রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে অনুভূতির বৈশিষ্ট্যের উপর।

'সহিত শব্দ হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটা মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে।' (সাহিত্য—পৃঃ ৭৯৩) এই অন্তরঙ্গ মিলনের জন্যই কবি নিজের অন্তরের মানবপ্রকৃতি সমাজের মধ্যেও দেখিতে পান; এমন কি যে বিশ্বপ্রকৃতি বৈজ্ঞানিকের কাছে জড় বলিয়া মনে হয় তাহাও মানবতার রসে সঞ্জীবিত হয়:

হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহেনি কথা
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা,
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে,
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি।

এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে,
সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে।

(কল্পনা—'প্রকাশ')

এই প্রকাশই কবিত্ব। কবি যাহা প্রকাশ করেন তাহা তাঁহার 'নিজত্ব' নয়, এই সামগ্রিক 'মানবত্ব'। এই বৃহত্তর, অন্তরতর ভূমিকায় কবি যখন তাঁহার ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে প্রকাশ করেন তখন তাঁহার ভাষা স্বভাবতঃই অলংকার, আভাস ও ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ হয়। এই ভাষা একই সময়ে স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃত্রিম হইয়া পড়ে। এই অর্থেই—কোন সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের নজিরের বলে নহে—অলংকৃত বাক্যই রসাত্মক বাক্য।

আর একটি কারণেও কবির ভাষায় অলংকারের সমারোহ থাকে। 'আমরা বাস্তবে যাহা দেখি-শুনি তাহা ইন্দ্রিয়গোচর, প্রত্যক্ষ। কিন্তু বাস্তবেরও সবটা আমরা দেখিতে পারি না বা ধরিতে পরি না, সবটাই যে প্রত্যক্ষ এমন কথা বলিতে পারি না। অন্তরের অনুভূতিতে এই অপ্রত্যক্ষতা আরও বাড়িয়া যায়। আমাদের অন্তর যে-সকল ভাবে স্পন্দিত হয় তাহারা আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয় না, অন্তরেও অনেকখানি অস্পষ্ট থাকে। অবশ্য বলিতে পারি যে, যখন কোন অনুভূতি আমাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তখন তাহাকে অব্যবহিতভাবেই অনুভব করি, তখন তাহার ও আমাদের মধ্যে কোন আবরণ থাকে না। কিন্তু যখন সেই অনুভূতি বিস্তারিত হইয়া অপরের অনুভূতির প্রতিনিধিত্বের দাবি করে তখন তাহার সুনির্দ্দিষ্ট স্পষ্টতা চলিয়া যায়; সেই অনুভূতিকে বলা যাইতে পারে অপ্রত্যক্ষ, অ-রূপ। এই অ-রূপকে অপরূপ করাই সাহিত্যের কাজ এবং ইহার জন্য অলংকার অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কবি নিজের ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু অপরের মধ্যেও তিনি সেই ভাব উদ্রিক্ত করিতে চাহেন। তাঁহাকে হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে হয়। সেই জন্য পুরুষের মত তাঁহাকে শুধু যথাযথ হইলে চলিবে না, মেয়েদের মত সুন্দরও হইতে হইবে। মেয়েদের মতই 'সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, রূপকের, ছন্দের, আভাসের, ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন-বিজ্ঞানের মতো নিরলংকার হইলে তাহার চলে না।'* (সাহিত্য—পৃঃ ৭৩০)

* অলংকার ও নিরাভরণতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোন স্থির নির্দ্দেশ দিতে পারেন নাই। তুলনামূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন;

দর্শন-বিজ্ঞান জীবনের বা বস্তুর কোন একটি দিক্‌কে জানাইতে চায়, সাহিত্য প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের সমগ্র রূপটি প্রকাশ করিতে চায়। 'কাষ্ঠ বস্তু—গাছ নয়, তার রস টানিবার ও প্রাণ ধরিবার শক্তিও গাছ নয়, বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া যে-একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ—তাহা একই কালে বস্তুময় শক্তিময় সৌন্দর্য্যময়।' (সাহিত্যের পথে—পৃঃ ৩০৩) এই সামগ্রিক সত্য কেমন করিয়া কাব্যের অলংকৃত ভাষায় বা আভাসে-ইঙ্গিতে বিধৃত হয় রবীন্দ্রনাথ তাহার কোন সূত্র দিতে পারেন নাই বা দেওয়া প্রযোজন বোধ কবেন নাই। এইখানে আনন্দবর্দ্ধন-অভিনব-গুপ্তের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রাচীন আলংকারিকেরা রসের অ-লৌকিকত্ব উপস্থাপিত করিয়া ধ্বনিবাদেব মাধ্যমে সেই অ-লৌকিকত্বলাভের প্রক্রিয়া বিস্তারিত ভাবে দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ দেখাইযাছেন যে এই অ-লৌকিকত্ব বা অনির্ব্বচনীয়ত্ব ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার। সাহিত্য যে সত্য প্রকাশ করে তাহা শ্রেণীগত সামান্য লক্ষণ নয। ব্যক্তিগত অনুভূতিই প্রসারিত হইয়া বিশ্বমানবের অনুভূতির সঙ্গে মিলিত হইযাছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, মানব-জীবনের সুখদুঃখে আমরা 'বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিরন্তন যোগ অনুভব করি হৃদয়ে।' ইহাই বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হইয়াছে আমাব আপন হৃদয়ের ও আর সকলের হৃদয়ের অনুভূতি। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সতীলক্ষ্মী বলিতে হিন্দুর মনে যে ভাবটি জাগিয়া ওঠে সে আমরা সকলেই জানি। 'কালিদাস কুমারসম্ভবের গল্পটাকে মাঝখানে ধরিতেই সতী-নারীর সম্পর্কে যে-সকল ভাব হাওয়ায় উডিযা বেডাইতেছিল তাহারা কেমন এক হইয়া শক্ত হইয়া ধরা দিল।' (সাহিত্য, পৃঃ ৭৮৫) এইভাবে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি হিন্দুসমাজের—পরে বিশ্বমানবের—অনুভূতির সঙ্গে একত্র হইয়া গেল। ইহাই সাহিত্য। ইহার মধ্যে উপকরণ ও উপায় অপেক্ষা উপলব্ধিরই প্রাধান্য।

বড বড় কবি যে জগৎ সৃষ্টি করেন তাহা দ্বিতীয় সংসার, আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন যে, কবি প্রজাপতি ব্রহ্মার মতই স্রষ্টা। ব্রহ্মা কোন্ প্রেরণার বলে প্রজা সৃষ্টি করেন আমরা জানি না। কবি জগৎকে দেখেন, কিন্তু নিজের

ইহার অন্যতম কারণ চণ্ডীদাসের কাব্য সহজ, সরল, প্রগাঢ়। বিদ্যাপতির কাব্য কৃত্রিম অলংকারে পরিপূর্ণ। কিন্তু যখনই ভাল কবিতার নিদর্শন দিতে হইয়াছে তখনই তিনি বিদ্যাপতির পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষা অলংকারবহুল।

উদারতার দ্বারা সকল জিনিসকে এমন ভাবে প্রতিবিম্বিত করেন, যে তাহার কতখানি নিজের কতখানি বাহিরের, কতখানি বিশ্বের, কতখানি প্রতিবিম্বের নির্দ্দিষ্টরূপে প্রভেদ করিয়া দেখান কঠিন হয়।* শ্রেষ্ঠ সমালোচককে বলা হইয়াছে সহৃদয়; রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে বলা যাইতে পারে যে, তিনিও অংশতঃ স্রষ্টা। তাঁহার মনের মুকুরে সাহিত্য যে প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করে তাহা আসলের ঠিক নকল নহে। বরং সেইখানে সাহিত্য নবজীবন লাভ করে। তাহা মূলের সঙ্গে অনপেক্ষিত নয়, অথচ তাহা নূতন সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা এই জাতীয় সমালোচনার আভাস দেয়। এই আভাস পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে তাঁহারই মেঘদূত ও অন্যান্য কাব্যের সমালোচনায়। এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিলে দেখা যায়, যদিও রসবিচারের সময় তিনি বস্তু ও চিন্তাকে ভার বলিয়া মনে করিয়াছেন, প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কাব্য-উপন্যাসের আলোচনায় তিনি ইহাদিকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রোচের সমালোচনার মত, তাঁহার নিজের সমালোচনাই তাঁহার থিওরির অপূর্ণতার প্রমাণ দেয়।

* 'সাহিত্যে প্রাণ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নবম পরিচ্ছেদ

সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ (২)—প্রয়োগ

॥ ১ ॥

'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়।···তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়।' (সাহিত্য—পৃঃ ৭৪২) ভাবের সঞ্চার করা, উদ্রেক করা সাহিত্যের কাজ। রবীন্দ্রনাথের মতে সমালোচনারও প্রধান কাজ ইহাই। এই কথা তিনিই যে একা বলিয়াছেন তাহা নহে, ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রীরাও কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সমালোচনা হওয়া উচিত creative, সৃজনধর্ম্মী। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা পৃথিবীর creative সমালোচনায় অনন্য। সেই সমালোচনার বিবরণ দেওয়ার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহার একটু পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ফরাসী মনীষী জুবেয়ার স্ফুলিঙ্গের মত অনেক তাৎপর্য্যপূর্ণ চিন্তাকণা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি নির্ব্বাচন করিয়া 'জুবেয়ার' প্রবন্ধে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে সমালোচনা সম্পর্কে একটি মন্তব্য এই: 'পূর্ব্বে যাহা সুখ দেয় নাই তাহাকে সুখকর করিয়া তোলা একপ্রকার নূতন সৃজন।' রবীন্দ্রনাথ নিজের টীকা যোগ করিয়া বলিয়াছেন, 'এই সৃজনশক্তি সমালোচকের।' সুতরাং তাঁহার মতে সমালোচনাও সাহিত্যের মত সৃজন। যাহা পাঠক পূর্ব্বে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, পারিলেও অস্পষ্টভাবে করিয়াছে তাহার রস উদ্‌ঘাটিত করা সমালোচকের কাজ।

এই দিক্ হইতে বিচার করিলে সমালোচক বিশ্লেষক বা বিচারক নহেন, পূজারী। দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন, 'পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা। এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।' সাহিত্য ভাবের আস্বাদন; সমালোচনা সেই ভাব অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। কবি যেমন নিজের ভাবকে আস্বাদন করেন, বিশ্বকে আপনার অনুভূতির রসে সঞ্জীবিত

করেন, সমালোচকও তেমনি নিজের আস্বাদিত রসকে অপরের মধ্যে উদ্রিক্ত করেন। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের মতে, 'আত্মসৃজনপদ্ধতিই সাহিত্যের পদ্ধতি।' (সাহিত্য—পৃঃ ৮৫১) তাই মনে করা যায় যে, সমালোচনাও একরকমের আত্মসৃজন; পূজারী বিগ্রহকে আপনার ভাবরসেই সঞ্জীবিত করেন। তাই সাহিত্যবিচারের প্রধান মাপকাঠি নিজের ভাল লাগা মন্দ লাগা: 'সাহিত্যে ভালো-লাগা মন্দ-লাগা হল শেষ কথা। বিজ্ঞানে সত্য-মিথ্যারই শেষ বিচার। এই কারণে বিচারকের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপরে বৈজ্ঞানিকের চরম আপিল আছে প্রমাণে। কিন্তু ভালোমন্দ-লাগাটা রুচি নিয়ে, এর উপরে আর কোনো আপিল অযোগ্যতম লোকও অস্বীকার করতে পারে।' (সাহিত্যের পথে—পৃঃ ৩৩৭) 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় সাহিত্যপাঠের সপক্ষে এক যুক্তিও দিয়াছেন। প্রকৃতি সম্বন্ধে, মানবজীবন সম্বন্ধে কবি নিজের আনন্দবিষাদ, বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তাঁহার নিজের সেই মনোভাব কেবল মাত্র আবেগের দ্বারা অপরের মনে সঞ্চারিত করেন। সেই যুক্তিতে বলা যাইতে পারে যে, সমালোচক কাব্যপাঠের ব্যক্তিগত আনন্দ অপরের মনে উদ্রিক্ত করিতে চাহেন; এই আনন্দসঞ্চারপ্রচেষ্টা 'যুক্তিতর্ক ও শ্রেণীনির্ণয়ের' অতীত।

কিন্তু শুধু খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করিয়া যেমন সাহিত্য রচনা হয় না তেমনি শুধু ভালো-লাগা মন্দ-লাগার উপর ভিত্তি করিয়া সাহিত্যসমালোচনাও হয় না। বড় কবির কল্পনা (imagination) আর ছোট কবির কাল্পনিকতা (fancy) এক বস্তু নয়; বড় কবি যাহা সৃষ্টি করেন তাহাকে আমরা সত্য বলিয়া অনুভব করি আর ছোট কবি যে কাল্পনিকতার জাল বিস্তার করেন তাহাকে আমরা আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন মনে করি। যে কবি রোমাঞ্চকর মুহূর্ত্তময় (life of sensations) জীবনকে চিন্তাসমৃদ্ধ (life of thought) জীবন হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন তিনিও বলিয়াছেন সত্যই সুন্দর, সৌন্দর্য্যই সত্য। সাহিত্য যদি সার্ব্বভৌম সত্যের রূপ দেয় তাহা হইলে সমালোচনাকেও সর্ব্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড স্থাপন করিতে হইবে, ভালো-লাগা ও মন্দ-লাগাকে ভালো ও মন্দ'র নিকষে যাচাই করিতে হইবে অর্থাৎ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও স্থায়ী কালের রুচির উপর নির্ভর করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তিনিই স্বীকার করিয়াছেন যে, কালের আদালত ইংরেজের আদালত হইতেও দীর্ঘসূত্রী। সুতরাং শাশ্বত কালের

আদালতের কাছে আপিল করিবার পুর্ব্বে এখনকার আদালতের রায় মানিতে হইবে। আদালতের ন্যায় এখানেও বিচারক বা সমালোচককে আইন মানিয়া চলিতে হইবে। এই আইনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা দরকার। এই আইনের মাধ্যমেই হয়ত চিরস্থায়ী মানদণ্ডের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

কোন সমালোচক লিখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গের প্রহসন বা কমেডি রচনা করিতে পারেন নাই এবং এই প্রসঙ্গে গীতিকবির প্রতিভা ও হাস্য-রসিকের প্রতিভার বৈসাদৃশ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে মন্তব্য করিয়াছেন, 'আমার "চিরকুমার সভা" ও অন্যান্য প্রহসনের উল্লেখ তাঁকে করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতে তার হাস্যরসটা অগভীর, কারণ—কারণ আর কিছু বলতে হবে না, কারণ তাঁর সংস্কার, যে সংস্কার যুক্তিতর্কের অতীত'।* (সাহিত্যের স্বরূপ—পৃঃ ৫৩০) ইহাকে অভিমানাহত বৃদ্ধ কবির সমালোচনা-অসহিষ্ণুতা বা অপরের যুক্তির প্রতি অন্ধতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে প্রশ্নটির সুষ্ঠু সমাধান হইবে না। এখানে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 'ক্ষণিকা'র কবি সমালোচনার ক্ষেত্রে ভালোমন্দ-লাগা বা তৎকালিক ও তৎস্থানিক সংস্কারের অতীত যুক্তিনিষ্ঠ মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি সমালোচনার দুই তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন: (১) ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীনতা, (২) বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতা, এবং (৩) নির্ব্বিকার চিত্তবৃত্তি। কিন্তু সমালোচক যদি বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতারই আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি বৈজ্ঞানিকের পর্য্যায়ে পড়িবেন এবং বৈজ্ঞানিকের মতই প্যারাডাইজ লষ্ট পড়িয়া প্রশ্ন করিবেন, 'শেষ পর্য্যন্ত, ইহা কি প্রমাণ করিল?' রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলিয়াছেন, সাহিত্যসৃষ্টি ভাবের প্রকাশ: 'এ যে রস এ ভাবের রস।' উমার মত ভাবৈকরস হইয়াই সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেন। সাহিত্যসমালোচনার সময় এই স্থির ভাবৈকরসত্বকে ভাবালুতা বলিয়া অপাংক্তেয় করিলে চলিবে কেন? এই ভাবনাশক্তির দ্বারাই সমালোচক সাহিত্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারেন। সমালোচনা-শক্তিকে যদি 'প্রতিভা' বলা যায় তবে ইহাও মানিতে হইবে যে ইহা এক বিশেষ শক্তি যাহার দ্বারা সমালোচকেরা শুধু কাব্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন না, পরন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিগত রুচি সর্ব্বজনগ্রাহ্যতায় ব্যাপ্ত হয়। 'যাহা চিরন্তন এক মুহূর্ত্তে তাঁহারা চিনিতে পারেন।' কিন্তু সমালোচনা বিচারও বটে; সেইজন্যই

*মৎপ্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ' (চতুর্থ সংস্করণ)—পৃঃ ১১৬-২৩

সমালোচককে বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্লেষণ ও তুলনা করিতে হয়। এইসব কারণে তাঁহাকে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ করিতে হয় এবং এমন সব নিয়ম উদ্ভাবন করিতে হয় যাহার দ্বারা ধ্রুব চিরন্তনকে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে চিনিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি; দ্বিতীয় তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।' (সাহিত্য—পৃঃ ৭৩৮)

॥ ২ ॥

সাহিত্য 'সৃজন' এবং 'নির্ম্মাণ' উভয়ই; ইহারা বিশ্লেষণের দ্বারা পৃথকীকৃত হইলেও মূলতঃ এক। যে সাহিত্যিকের বিশ্বের উপর অধিকার আছে, তিনিই স্থায়ী রূপ দিতে পারেন। সুতরাং 'সাহিত্যের কেবল ভালোমন্দ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যায় না। সেই সঙ্গে তাহার একটা বিকাশের প্রণালী, তাহার একটা বৃহৎ কার্য্যকারণসম্বন্ধ দেখিবার জন্য আগ্রহ জন্মে।' কবির 'কল্পনা একটা বিশেষ কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আকর্ষণবিকর্ষণগ্রহণবর্জ্জনের নিয়মে কোন্ অব্যক্তকে একটা বিশেষ সৌন্দর্য্যে ব্যক্ত করিয়া তুলিল, সমালোচকের তাহা বিচার্য্য।' (সাহিত্য —'সাহিত্যসৃষ্টি') এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কবির সৃষ্টি সত্যের উপর নির্ভরশীল, সমালোচকের সমালোচনা কবির সৃষ্টির উপরে নির্ভরশীল। সমালোচকের বিচারবুদ্ধি কবিকল্পনার মত স্বাধীন নহে। তাঁহাকে কবির সৃষ্টির উপরে অপেক্ষা করিতে হইবে; কবির উদ্দেশ্য, সমগ্র কাব্যের তাৎপর্য্য, প্রকরণের নিয়মাবলী—এই সব ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যবিচার করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান্ কবি ও শক্তিশালী সমালোচক। এই উভয় রকমের প্রজ্ঞারই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার 'রাজসিংহ' সমালোচনায়। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র পারিবারিক ও রাজনৈতিক জগতের যে প্রলয়ংকর চিত্র আঁকিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাহার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের অপরূপ বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু এই উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস, এবং ইহাকে সেইভাবেই বিচার করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইতিহাস অংশের নায়ক ঔরংজেব ও রাজসিংহ; উপন্যাস অংশের নায়িকা জেব-উন্নিসা। তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন অনৈতিহাসিক জেব-উন্নিসা-কাহিনীর উপর; সেই কারণে ঐতিহাসিক

উপন্যাসের ইতিহাস অংশ যথাযোগ্য মর্য্যাদা পায় নাই। এখানে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার ঝোঁক 'সৃষ্টি'র দিকে, 'নির্ম্মাণে'র দিকে ততটা নয়।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ে দুইটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন—'সাহিত্য' ও 'সাহিত্যের পথে'। ইহাদের রচনা ও প্রকাশ কালের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। এই ব্যবধানে তাঁহার মতবাদের অনেকটা পরিণতি (অধোগতি ?) হইয়াছিল। শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি সাহিত্যে বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র, 'অনির্ব্বচনীয়' রসের সন্ধান করিয়াছেন; 'বাস্তব', 'তথ্য', তত্ত্ব ও চিন্তাকে তুচ্ছ করিয়াছেন। কিন্তু 'সাহিত্য'-গ্রন্থে তাঁহার অনুসন্ধান আরও ব্যাপক, তাঁহার দৃষ্টি আরও সামগ্রিক; এখানে তিনি শুধু ভাব নয়, আইডিয়া বা ভাবনারও বিচার করিয়াছেন। 'আমাদের ভাবের সৃষ্টি একটা খামখেয়ালী ব্যাপার নহে, ইহা বস্তুসৃষ্টির মতোই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন।' এই অমোঘ নিয়মকে আবিষ্কার করা, প্রয়োগ করা, কেমন করিয়া 'আরম্ভের সহিত শেষের, প্রধানের সহিত অপ্রধানের, এক অংশের সহিত অন্য অংশের গূঢ়তর সামঞ্জস্য' গড়িয়া উঠে তাহার বিশ্লেষণ ও উদ্ঘাটনই সমালোচকের কর্ত্তব্য। কালিদাসের কাব্য ভাববিলাসীর স্বপ্নমাত্র নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার আমলে সতীত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা ও বিশ্বাস আকাশে বাতাসে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সেই ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কিন্তু ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত ভাবগুলি কুমারসম্ভবের উমার বর্ণনায় সংহত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; ইহা একই কালে তৎকালীন সমাজের চিত্র, কালিদাসের নিজের ভাব ও ভাবনার অভিব্যক্তি এবং সর্ব্বকালের ও সকল দেশের সম্পদ। এইখানে আদর্শবাদী, বাস্তবপন্থী ও প্রচারমূলক সাহিত্যচিন্তার সমন্বয়-চেষ্টার আভাস পাওয়া যায়।

যে অমোঘ নিয়মের কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, একই কাহিনীর গঠনসুষমায় অথবা মহাকাব্যের মধ্যে বহু কাহিনীর সংযোজনে তাহার প্রয়োগ লক্ষিত হয়। কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন অংশ একত্র দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহা বিশ্লেষণ ও বিচার সাপেক্ষ। 'ইলিয়াড এবং অডেসিতে নানা খণ্ড গাথা ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে জোড়া লাগিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে, এ মত প্রায় সর্ব্বত্রই চলিত হইয়াছে।... কিন্তু যে কাঠামোর মধ্যে এই কাব্যগুলি খাড়া হইবার জায়গা পাইয়াছে তাহা যে একজন বড়ো কবির রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ এই কাঠামোর গঠন অনুসারে নূতন নূতন জোড়াগুলি ঐক্যের গণ্ডি হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে নাই।' এই কাঠামোর গঠন-সুষমা যে কোন শ্রেষ্ঠ কাব্যে দেখা যায়; সেখানে

একটি মাত্র কাহিনী ধাপে ধাপে গড়িয়া উঠিয়াছে সেইখানে এই সুসঙ্গতি সমধিক সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। গ্যেটে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের মধ্যে তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফলের সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে লালসার উদ্দামতা ও নিয়মের কঠিন সংযমের সমন্বয় দেখিতে পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন কোন অংশ আছে যাহা নাটকের পক্ষে অনুপযোগী মনে হইতে পারে, কিন্তু নাট্যকার সমস্ত অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। প্রথমেই মনে হইবে এই নাটকে নিসর্গ বর্ণনার প্রাচুর্য্যের কথা। নাটকের উপযুক্ত বিষয় হইল নরনারীর জীবনের ও চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাত—ইহার action বা ঘটনাকেন্দ্রিকতা। নিসর্গশোভার বর্ণনা এখানে অনেকটা অপ্রয়োজনীয় বোঝার মত মনে হইতে পারে। কিন্তু 'কালিদাস তাঁহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই; তাহাকে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন।...শকুন্তলাকে তাহার কাব্যগত পরিবেষ্টন হইতে বাহির করিয়া আনা কঠিন।' (প্রাচীন সাহিত্য) শকুন্তলার প্রণয় ও বিবাহ, দুর্ব্বাসার ক্রোধ, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা, সেইখানে স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যান—এই পর্য্যন্ত কার্য্যকারণশৃঙ্খলা ঠিক বজায় আছে; প্রথম অঙ্কে যাহার সূত্রপাত পঞ্চম অঙ্কে তাহার পরিণতি। কিন্তু শেষ অঙ্কে যে ভাবে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন সংসাধিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক নাটকের নিয়মানুসারে সুসঙ্গত নহে। শকুন্তলার অন্তর্দ্ধান, মারীচের আশ্রমে তাহার অবস্থান এবং পরে দুষ্মন্তের সহিত তাহার মিলন—ইহার মধ্যে **deus ex machina**'র প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু কালিদাস একটি মহান্ ভাবের সূত্রদ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে সংহত করিয়াছেন। শকুন্তলার চরিত্র, দুষ্মন্তের অনুতাপ, কাহিনীর সর্ব্বত্র অলৌকিক শক্তির আনাগোনা এই আকস্মিক মিলনকে অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছে, এবং এই ভাবে নাটকটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।

॥ ৩ ॥

এই প্রশ্নটিই আর এক ভাবে দেখা যাইতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সমালোচনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দুই শ্রেণীর কাব্যের কথা বলিয়াছেন। এক শ্রেণীর কাব্য প্রত্যক্ষ জগতের বর্ণনা দেয়, অপর শ্রেণীর কাব্য অপ্রত্যক্ষ জগতের সংকেত দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই রকমের শ্রেণী-

বিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 'বস্তুগত ও ভাবগত' নামক ছেলেবেলায় লিখিত প্রবন্ধেই তিনি বস্তুগত কবিতাকে স্বীকার করিতে চাহেন নাই। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, 'নদী যে বহিতেছে এই সত্যটুকু কবিতা নহে। কিন্তু এই বহমানা নদী দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে যে ভাববিশেষের জন্ম হয়, সেই সত্যই যথার্থ কবিতা।' (সমালোচনা—পৃঃ ৬০৯) তবে 'আমরা যে অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার বহির্ভূত সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি না।' সুতরাং সৌন্দর্য্যানুভূতিরও একটা বাস্তব ভিত্তি থাকা চাই। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, 'কেবলমাত্র বাছাই করিয়া, জগতের যাহা কিছু বিশেষ ভাবে সুন্দর, বিশেষভাবে মহৎ, তাহারই প্রতি আমাদের রুচিকে বারংবার প্রবর্ত্তিত করিতে থাকিলে আমাদের একটা রসের বিলাসিতা জন্মায়।···ইহাতে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আমাদের অনুভবশক্তির আতিশয্য ঘটাইয়া আর সর্ব্বত্র তাহার জড়ত্ব উৎপাদন করা হয়।' (আধুনিক সাহিত্য—পৃঃ ৯৫৯) মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়াই মনে করিতেন। তবে ভাব যাহাতে গগনকুসুমের মত অলীক না হয়, ইহা যাহাতে ভাববিলাসিতায় পর্য্যবসিত না হয় সেইজন্য তাহার বস্তুর সংস্পর্শ থাকা দরকার এবং অনুরূপ কারণেই তাহাকে নিয়মের সংযম মানিয়া লইতে হয়।

সমালোচনা সম্পর্কেও তিনি এই জাতীয় মত পোষণ করিতেন বলিয়া মনে হয়। সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া চন্দ্রনাথ বসুর মতের প্রতিবাদে তিনি বলিয়াছেন, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ—এখানে শিল্প ও সাহিত্যের সৌন্দর্য্যবোধ—কল্পনার দ্বারা উদ্বোধিত হয়, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নয়। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার মধ্যে যে অংশ সৃজন তাহা কল্পনার অধিগম্য আর যে অংশ নির্ম্মাণ তাহা বিচার-বুদ্ধির আয়ত্তাধীন। অবশ্য এই দুই অংশ অবিচ্ছেদ্য ভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াই কাব্যসৃষ্টিকে সম্পূর্ণতা দান করে। তবু বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা ইহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখি। সাহিত্যের নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রধান প্রয়োজন পরিমিতিবোধ, বিভিন্ন উপাদান ও অংশের সামঞ্জস্য। সমালোচনার প্রথম পর্ব্বে—'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য' প্রভৃতির যুগে তিনি কল্পনাকে প্রাধান্য দিলেও এই অংশের প্রতিও মনোযোগী ছিলেন, কিন্তু শেষের পর্ব্বে—'সাহিত্যের পথে' প্রভৃতির যুগে—তিনি কল্পনার সাহায্যে রসোপলব্ধির উপরে বেশি জোর দিয়াছেন, সাহিত্যের সত্যকে বস্তুর ও চিন্তার ভার হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছেন। শেষের পর্ব্বে ('সাহিত্যে

চিত্রবিভাগ') যখন তিনি পরিমিতিবোধের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন তখন অত্যুক্তির সমর্থনেই করিয়াছেন; তখন তিনি বলিয়াছেন যে, রস সত্যের আসন পায় বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়াই। কিন্তু প্রথম পর্ব্বে তিনি বিচারবুদ্ধিকে, বাস্তবানুগামিতাকে, পৌর্ব্বপর্য্যবোধকে উপেক্ষা করিতে চাহেন নাই। 'রাজসিংহ'-প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, সত্যকে সম্যক্ প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্যই 'বাস্তব-জগতের চিন্তাভার' প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে; ইহার সমর্থনেই 'কল্পনাজগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় ও স্পর্শযোগ্য ও চিরস্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।' কল্পনাজগৎ শুধু যে বাস্তবের মত স্পর্শযোগ্য হয় তাহা নহে, বাস্তব অপেক্ষাও দৃঢ় এবং স্থায়ী বলিয়া বোধ হয়। যে অমোঘ নিয়ম **(necessity)** সাহিত্যজগৎকে নিয়ন্ত্রিত করে জড়জগতে তাহার আভাস থাকিলেও মানবের ব্যবহারিক জগতে তাহার সন্ধান মিলে না। এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন 'শকুন্তলা'-প্রবন্ধে। সংসারে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে কালিদাস তাহার অনুকরণ করেন নাই; তিনি কাব্যের শাসন মানিয়া চলিয়াছেন: 'প্রত্যেক ঘটনাটিকে সমস্ত কাব্যের সহিত তাঁহাকে খাপ খাওয়াইয়া লইতেই হইবে। তিনি সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্ত্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সত্যের বাহ্য মূর্ত্তিকে তাঁহার কাব্যসৌন্দর্যের সহিত সংগত করিয়া লইয়াছেন।'

যে গুণের দ্বারা সাহিত্যের বিচ্ছিন্ন ঘটনা, বিক্ষিপ্ত ভাব ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয় রবীন্দ্রনাথ তাহার নাম দিয়াছেন সুসংলগ্নতা। মানবঘটনায় এই সুসংলগ্নতা নাই বলিয়া তাহার ঐক্য সুস্পষ্ট হয় না। স্বীকার করিতে হইবে যে, এইখানেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও সমালোচনাপদ্ধতিতে একটা ক্রমিক অবনতি দেখা যায়। 'সাহিত্যের পথে'-গ্রন্থে (পৃঃ ৩৭০-৭৩) তিনি যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাদের সুসংলগ্নতা তিনি সুস্পষ্ট করিতে পারেন নাই। ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রতিদিন অনেক খণ্ড খণ্ড ঘটনা ঘটিয়াছিল; কার্লাইল তাহাদিগের মধ্য হইতে কতকগুলি বাছাই করিয়া আপনার কল্পনার পটে সাজাইয়া একটা সমগ্রতার ভূমিকায় দেখিলেন আর আমাদের মন এই সকল বিচ্ছিন্নকে নিরবচ্ছিন্নরূপে পাইল।' এই অপরূপ বাক্যচ্ছটায় কার্লাইলের কৌশলটির পরিচয় পাওয়া গেল না। এইখানে শকুন্তলা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, যেরূপ ঘটনা মানবসংসারে ঘটিতে পারে কবি তাহাই নিবিড়তর করিয়াছেন; এই নিবিড়তরতার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। 'প্রাচীন সাহিত্য'-গ্রন্থে শকুন্তলার কলাসৌন্দর্য্যের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা অনেক বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও স্পষ্ট। রামায়ণে

নানা বিশ্বাসযোগ্য, অবিশ্বাসযোগ্য কাহিনী আছে। তাহারা কেমন করিয়া ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইল সেই সম্পর্কে তিনি 'সাহিত্যের পথে'-গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'রামকে পেলুম, সে তো একটিমাত্র মানুষের রূপ নয়, অনেক কাল থেকে অনেক মানুষের মধ্যে যে-সকল বিশেষ গুণের ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু স্বাদ পাওয়া গেছে কবির মনে সে সমস্তই দানা বেঁধে উঠল রামচন্দ্রের মূর্ত্তিতে।' এই বর্ণনায় রামচন্দ্রকে ঠিক চেনা যায় না এবং রামায়ণের ঐক্যসূত্রও ধরা পড়ে নাই। কিন্তু 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে তিনি রামায়ণ-কাহিনীতে নানা ঘটনা, বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাত, বাল্মীকি হইতে মধুসূদন পর্যন্ত এই কাহিনীর বিবর্ত্তন—এই সকল আলোচনা করিয়া ইহার ভাবগত ও চরিত্রগত ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

যে সুসংলগ্নতা কাব্য ও সাহিত্যের অপরিহার্য্য গুণ তাহা 'সৃজন'গতও বটে, 'নির্ম্মাণ'গতও বটে। নাটক, মহাকাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি আখ্যান-প্রধান সাহিত্যে ইহা প্রথমতঃ বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু গভীরতর বিচারে দেখা যাইবে যে, ইহা আইডিয়া ও অনুভূতির সামঞ্জস্য, যাহা চরিত্র ও ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। অপেক্ষাকৃত অপরিণত রচনায় ঐক্যের অভাব কাহিনীর অসংলগ্নতার মধ্যেই প্রকট হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত : শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর'। (আধুনিক সাহিত্য—পৃঃ ৯৪৩, ৯৪৭) প্রথম গ্রন্থটি ১৬৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ; ১২২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার—রবীন্দ্রনাথের মতে—একটি সুন্দর সরল সমগ্র কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। 'তারপর ৪৪টি পত্রে গ্রন্থকার হঠাৎ একটা নূতন কাণ্ড ঘটাইয়া ……অতি সংক্ষেপে একটি আকস্মিক বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন।' 'যুগান্তর'-উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন, 'দুই স্বতন্ত্র গল্পকে জবরদস্তি করিয়া একত্র বাঁধিয়া দিলে একটা গল্পের হিসাবে তাহাদের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন পরিণতিতে বাধা দেওয়া হয়। দুইটা গল্পের হিসাবেও তাহাদিগকে আড়ষ্ট করিয়া বধ করা হয়।' এই উপন্যাসের আলোচনায় তিনি আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাও সাহিত্যালোচনায় তাৎপর্য্যপূর্ণ। গ্রন্থের শেষের অংশে ঔপন্যাসিক নীতিপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন : 'আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম।' শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী বড় লেখক নহেন ; তাঁহাদের বিস্মৃত উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার মধ্য দিয়াই অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

কিন্তু যুক্তিতর্কের বাহুল্যে শ্রেষ্ঠ লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনাও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতে পারে। দৃষ্টান্ত : বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'। বঙ্কিম অনেকাংশে শুধু তর্কের দ্বারা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। 'তর্কদ্বারা যুক্তিদ্বারা ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড আকারে মনের মধ্যে কিয়দংশে প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু তর্কযুক্তি তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বাংশে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে না।' আবার যুক্তিতর্ক বা ভাবনা (idea) না থাকিলেও সাহিত্য হাল্‌কা হইয়া যায়; সত্যের কিঞ্চিৎ ভার না থাকিলে রসাস্বাদন লঘু বিলাসিতায় পরিণত হইয়া যায়। আমরা মনে করি হাস্যরস নিছক চপলতা; ইহার মধ্যে কোন ভাব বা ভাবনার অবতারণা করিলে ইহার মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু 'আষাঢ়ে' কাব্যসমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'হাস্যরসের সঙ্গে চিন্তা ও ভাবের ভার থাকিলে তবে তাহার স্থায়ী আদর হয়।' পরবর্ত্তী কালে তিনি intellect বা চিন্তাকে তুচ্ছ করিয়া অনেক অস্পষ্ট, স্ববিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম যুগের সাহিত্যালোচনায় তিনি সাহিত্যের যে ঐক্যের কথা বলিয়াছেন তাহা কাহিনীগত, চরিত্রগত, অনুভূতিগত, চিন্তাগত ঐক্য। সাহিত্যের এই সকল প্রবাহ বিরাট সঙ্গমে মিলিয়া ভাবগত ঐক্য রচনা করে।

এই ভাবগত ঐক্য সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেই পাওয়া যায়। কালিদাসের কাব্যের ঐক্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক এবং অনৈতিহাসিক অনেক চরিত্র ও কাহিনীর সমাবেশ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সকল ঘটনার মধ্যেই এমন একটা গতিবেগপ্রাবল্য সঞ্চারিত করিয়াছেন যে তাহাই অংশত ইহাদিগকে ঐক্যদান করিয়াছে। ইহা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক কাহিনী উভয়ের মধ্যেই মানুষের স্পর্দ্ধার পতনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে আরও একটি গভীরতর ঐক্য আভাসিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এই কাহিনীর ঐতিহাসিক অংশের অন্যতম নায়ক বিধাতাপুরুষ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি উভয় অংশেরই প্রধান নায়ক; তাঁহারই অদৃশ্য অঙ্গুলিসংকেতে ক্ষুদ্র রূপনগরের একটি বালিকার মধ্যে দুর্ব্বার, দুর্দ্ধর্ষ প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আঘাত করিল, গৃহপিঞ্জরের নির্ম্মলকুমারী বহিরাকাশে উড়িয়া আসিল, নৃত্যচঞ্চলা দরিয়া অট্টহাস্যে মুক্তকেশে কালনৃত্যে আসিয়া যোগ দিল; আর যিনি অন্ধকার রাত্রে অতন্দ্র

থাকিয়া সমস্ত ইতিহাসপর্য্যায়কে নীরবে নিয়মিত করিয়াছেন তিনিই বাদশাজাদী জেবউন্নিসাকে ধূলায় লুণ্ঠিত করিলেন।

॥ ৪ ॥

সমালোচনার মূল সূত্র নির্দ্দেশের পর কয়েকটি পুরাতন ও নূতন দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যাইতে পারে।

প্রথমে রামায়ণের কথাই ধরা যাক্। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী, দ্রাবিড় জাতি এবং আগন্তুক আর্য্যদের সংঘর্ষ ও মিলনের কাহিনীই রাম-রাবণের যুদ্ধে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ইহার দিকে দৃষ্টি দিলেই বাল্মীকির রাম-চরিত্রের পরিকল্পনা ও রামায়ণ মহাকাব্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে। পরে মহামানব রামচন্দ্র দেবতার পদবী অধিকার করিলেন। 'তখন যে ভাবের দিক্ দিয়া দেখিলে দেবচরিত্র মানুষের কাছে প্রিয় হয় সেই ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠে।' এই নূতন ভাবে পরিকল্পিত নায়ক কৃত্তিবাসের ভক্তবৎসল রামচন্দ্র। ইহার কয়েক শতাব্দী পরে এই কাহিনীতে নূতন ভাব সঞ্চারিত করিলেন মাইকেল মধুসূদন। এই ভাব ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শজনিত বিদ্রোহের ভাব, বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য-আকাঙ্ক্ষার ভাব। মধুসূদন যে কেন রাবণকে নায়কোচিত গুণে বিভূষিত করিয়াছিলেন এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই ভাবের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াই মধুসূদন রাবণের মধ্যে শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তিনি ইহাও অনুভব করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধি ও চরিত্রের স্বকীয় শক্তি আপাত-হীনবল, দৃঢ়মূল সংস্কারের কাছে হার মানিবেই, কিন্তু তাঁহার সহানুভূতি এই সংগ্রামশীল শক্তির সঙ্গেই। এই জন্যই মেঘনাদবধ কাব্য মহাকাব্যও বটে, ট্র্যাজেডিও বটে। 'যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্দ্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।' ('সাহিত্যসৃষ্টি') এই ভাবে বীররস করুণরসের মধ্যে মিশিয়া গেল। নির্ম্মাণ বা গঠন সংক্রান্ত কোন কোন প্রশ্ন বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনায় কল্পনার অধিগম্য সৌন্দর্য্যবোধ, বুদ্ধিদীপ্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বাস্তবের উপলব্ধির অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে।

চিরস্থায়ী সাহিত্যের মধ্য দিয়া ইতিহাসের যে ব্যাপক ও গভীর পরিচয়

পাওয়া যায় তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 'রামায়ণ' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে এই রকম মাত্র একটি প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়—ওয়াজেদ আলির 'রামায়ণ' (মাশুকের দরবার)। ওয়াজেদ আলি দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া সাধারণ বাঙ্গালী বংশপরম্পরাক্রমে রামায়ণের কথা শুনিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভূমিকা আরও বিস্তৃত ; আর ইহা শুধু বস্তুগত, মননশীল সমালোচনা নয়, ভাবগত নূতন রস-সৃষ্টিও বটে। রামায়ণ মহাকাব্যও আবার মহা-ইতিহাসও, এবং মহা-ইতিহাস বলিয়াই মহাকাব্য। সাধারণ ইতিহাসে ঘটনার বিবরণ থাকে ; তাহা প্রকৃতির দর্পণ হইতে চেষ্টা করে। রামায়ণ অন্য রকমের ইতিহাস ; ইহা ভারতবর্ষের ঘরের কথাকে বড় করিয়া দেখাইয়াছে। যে আদর্শ ছোটবড় ভারতবাসী তাহাদের সীমিত পরিবেশে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, যাহা যুগপৎ বাস্তব ও স্বপ্ন তাহাই রামায়ণে দীপ্যমান হইয়াছে। অন্য ইতিহাস কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু এই ইতিহাসের পরিবর্ত্তন হয় নাই ; যে আদর্শ-সমূহ এই মহাকাব্যে সংহত রসরূপ পাইয়াছে তাহাই পরবর্ত্তী কালে ভারত-বাসীর চিন্তাভাবনাকে সঞ্জীবিত করিয়া ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। অন্য কাব্যের আলোচনায় আমরা ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ-লাগাকে প্রাধান্য দিই, কিন্তু এখানে সে সব রুচির প্রশ্ন অবান্তর। শ্রদ্ধাভরে অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে ভারতবর্ষের বহু দিনের সঞ্চিত সাধনা, বহু স্থানে বিক্ষিপ্ত, আদর্শ এখানে কি রূপ পাইয়াছে এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী ইহাকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে। (প্রাচীন সাহিত্য—'রামায়ণ')

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারবিষয়ক একটি প্রশ্নের যে সমাধান দিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য রামায়ণে মূর্ত্ত হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া রামায়ণ এই ঐতিহ্যকে সঞ্জীবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বিদেশী সমালোচক বলিতে পারেন, এই কাহিনী অপ্রকৃত, অসম্ভব। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বহু সহস্র নরনারী ইহাকে অপ্রকৃত মনে করে নাই তাহাই এই আপত্তি খণ্ডন করে। জনসাধারণের স্থির রুচিই সাহিত্য বিচারে শেষ নিয়ামক, বিদগ্ধের একক বুদ্ধি নহে। এই রুচি শুধু বিশেষ কালের বা বিশেষ সম্প্রদায়ের রুচি নহে, একটা সমগ্র দেশের বহুবর্ষব্যাপী সাধনালব্ধ আদর্শ। তাহাই বাস্তবতার চরম সাক্ষ্য। কবির যুক্তির সমর্থনে একটা প্রচলিত ইংরেজি কথা উদ্ধৃত করিতে পারা যায় : **In literature**

three years is boom, thirty years fame, three hundred years immortality, three thousand years is Homer.

এই দিক্ হইতে বিচার করিলে কাব্য একরকমের ইতিহাস, ইহার মধ্যে দেশ ও কালের সমগ্র, সংহত মানসরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। সাহিত্যের এই ব্যাপক তাৎপর্য্য রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন 'গ্রামসাহিত্য' ও 'কবি-সঙ্গীত' প্রবন্ধে। গ্রাম্য ছড়া কল্পনাসমৃদ্ধ সাহিত্য নহে, তাহা কোন শ্রেষ্ঠ কবির বিশিষ্ট ভাবরসে সঞ্জীবিত হয় নাই। কিন্তু ইহার একটি বিশিষ্ট সুর আছে, নিজস্ব আবেদন আছে। ইহার মধ্য দিয়া গ্রাম বাংলার সুখদুঃখ-বিজড়িত নিতান্ত আটপৌরে জীবন স্বীয় সচরাচরতা রক্ষা করিয়াই সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই ছড়াগুলি কতদিনের পুরাতন, ইহাদের মধ্যে নূতন ও পুরাতন কাব্যের সমন্বয় হইয়াছে কিনা তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ বহুকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে যে জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই ছড়াগুলির মধ্যে তাহাই সরস রূপ পাইয়াছে। বাংলার গ্রাম্যসাহিত্যের বিষয়-বস্তুনির্ব্বাচনের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার অনেকগুলি ছড়া হরগৌরী-বিষয়ক; তাহার মধ্যে হিন্দু বাংলার পারিবারিক সম্বন্ধের, বিশেষ করিয়া দাম্পত্যসম্পর্কের, সরল, সহজ চিত্র পাওয়া যায়; সাহিত্যের দিক্ হইতেও সরলতাই ইহাদের প্রধান গুণ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক ছড়াগুলির আবেদন স্বতন্ত্র। আমাদের দেশের সমাজ নানান বিধিনিষেধের দ্বারা বাঁধা, সর্ব্বত্র মনুপরাশরের রাজত্ব। কিন্তু মানুষের হৃদয় সমাজের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিলেও তাহার বিরুদ্ধে সঙ্গোপনে বিদ্রোহের ভাবও পোষণ করে; সে বস্তুজগৎ হইতে ভাবের জগতে, রসের জগতে স্বাধীনভাবে পক্ষবিস্তার করিতে চায়। এই স্বাধীন মনো-বৃত্তিকে অপরূপ অভিব্যক্তি দিয়াছে বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী। গ্রাম্য ছড়াগুলিতে বৈষ্ণবপদাবলীর কাব্যসৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু ইহারা একই ভাবের দ্বারা উদ্বোধিত। এই সব ছড়াগুলির মধ্যে বাংলার গ্রাম্যদৃশ্য, গৃহচিত্র কিছুই নাই, কিন্তু গ্রাম্য নরনারীর মধ্যেও সমস্ত বিধিনিষিধের অন্তরালে স্বাধীন প্রেমের যে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহাই এই সকল ছড়ায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সাধারণ্যে এত প্রচার লাভ করিয়াছে। এখানে ছোটবড় অনেক অসঙ্গতি আছে, কিন্তু এই ছড়াগুলি যে ভাবলোকের চিত্র দেয় সেইখানে এই সকল অসঙ্গতি চোখে পড়ে না এবং কোন কৈফিয়তেরও প্রয়োজন হয় না। এখানে বৃন্দাবনে রাখালবৃত্তি ও মথুরায় রাজত্বের মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্য নাই, বরং প্রথমটিই

অধিকতর গৌরবজনক। 'আমাদের দেশে যেখানে কর্ম্মবিভাগ, শাস্ত্রশাসন এবং সামাজিক উচ্চনীচতার ভাব এমন দৃঢ় বদ্ধমূল সেইখানে কৃষ্ণরাধার কাহিনীতে এই প্রকার আচারবিরুদ্ধ বন্ধনহীন স্বাধীনতা যে কত বিস্ময়কর তাহা চিরাভ্যাসক্রমে আমরা অনুভব করি না।'

রবীন্দ্রনাথ আমাদের গ্রাম্যসাহিত্যের সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা করিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্য ও রসসৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আবার তিনি ইহার মৌলিক অপূর্ণতার প্রতিও অঙ্গুলিসংকেত করিয়াছেন। হরগৌরী-সম্পর্কিতই হউক আর রাধাকৃষ্ণের বিষয়কই হউক বাংলার গ্রাম্য ছড়াগুলির মধ্যে কোমল, মধুর ও কৌতুক রসই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। পশ্চিম ভারতের গ্রাম্য সাহিত্য এই দিক দিয়া অধিক সমৃদ্ধ। সেই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য রাম-সীতা বা রাম-রাবণের কাহিনী—সেই কাহিনীতে আছে বীরত্ব, মহত্ত্ব ও কঠোর আত্মত্যাগের আদর্শ। শুধু যদি দাম্পত্যসম্পর্কের কথাই ধরা যায় তাহা হইলেও বলিতে হইবে রামসীতার কাহিনীতে ইহার যে মহনীয় চিত্র পাওয়া যায় বাঙ্গালী গ্রাম্য কবি হরগৌরীর কাহিনীতে তাহার আভাস মাত্র দিতে পারেন নাই। সাহিত্য মানুষের মানোজগতের ইতিহাস। সুতরাং মানিতেই হইবে যে, এই শূন্যতা শুধু সাহিত্যিক অপরিণতি নয়; ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের আপেক্ষিক নিকৃষ্টতা প্রমাণ করে। 'রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।'

গ্রাম্য ছড়াতে যে সরলতা বা মাধুর্য্য আছে কবিওয়ালাদের সঙ্গীতে তাহা নাই; ইহার সৃষ্টি সহরে, গ্রামে নয়। ইহার রুচি দূষিত এবং শস্তা অনুপ্রাসের বাহাদুরিই ইহার প্রধান বেসাতি। সার্থক কবিসঙ্গীতে কবিত্ব অপেক্ষা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় বেশি। রবীন্দ্রনাথ কবির গানের সপক্ষে কোন ওকালতি করেন নাই, কিন্তু তিনি ইহার ঐতিহাসিক মর্য্যাদা আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন কালে কাব্যের উদ্ভব হইয়াছিল রাজসভায় বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য, আজকালকার সাহিত্য রচিত হয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য, যাহাদের রুচি উন্নত, রসবোধ তীক্ষ্ণ। এই উভয় শ্রেণীর পাঠকই সাহিত্যের সূক্ষ্মশিল্প উপলব্ধি করিতে সক্ষম। কিন্তু ইংরেজ যখন কলিকাতায় নূতন রাজধানী স্থাপন করিল তখন পুরাতন রাজসভা ছিল

না অথচ আধুনিক শিক্ষিত পাঠকসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই। 'তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্ব্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত হইল কবির দলের গান।' এই হঠাৎ-রাজার সভার সভ্য হইল নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্ম্মশ্রান্ত বণিক্‌সম্প্রদায় যাহারা সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে ক্ষণিক আমোদের উত্তেজনা চাহিত, সাহিত্যরস চাহিত না। এই সমাজে শুধু যে নূতন কোন ভাল কাব্য রচিত হইল না তাহাই নহে, পুরাতন বৈষ্ণব সাহিত্যের সৌন্দর্য্যও বিকৃত হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রশ্নের যথাযথ আলোচনা করেন নাই; প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য কাব্যসৌন্দর্য্যে তুলনাহীন; কিন্তু সেই কাব্যও রাজসভার কাব্য নহে, জনসাধারণের কাব্য। এক বিদ্যাপতি ছাড়া অন্য কোন বৈষ্ণব কবি রাজসভায় পরিচিত ছিলেন এমন মনে হয় না। সর্ব্বসাধারণ নামক এক ব্যক্তিই বৈষ্ণব কবিতার সমঝদার ছিল; কিন্তু সে স্থূলকায় স্থূলরুচি হইলে বৈষ্ণবকাব্য সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য পরিবেশন করিতে পারিত না। অবশ্য এই আপত্তি রবীন্দ্রনাথের মূল সিদ্ধান্তের খণ্ডন করে না। 'এই নষ্টপরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ—এবং ইংরাজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক।' (লোকসাহিত্য—পৃঃ ৭৯৪)

॥ ৫ ॥

মননশীল বিচারমূলক সমালোচনায় রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহার স্বকীয়তা বিশেষ করিয়া প্রকট হইয়াছে সেই সব রচনায় যেখানে তিনি সমালোচনার মাধ্যমে নূতন সৃষ্টি পরিবেশন করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহার বঙ্কিম-সমালোচনার কথাই ধরা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা ভাবগদ্গদ হইলেও মূলতঃ বিচার-নিষ্ঠ। এখানে সংক্ষেপে কিন্তু অপ্রতিরোধনীয় যুক্তির সাহায্যে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমের দানের পরিমাপ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস হইতে মধুসূদন পর্য্যন্ত বহু কবি কাব্যসাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তবু বঙ্গসাহিত্যের দীনতা ঘোচে নাই। প্রাচীন সংস্কৃত ও আধুনিক ইংরেজির মাঝখানে পড়িয়া বঙ্গভাষা শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে অপাংক্তেয় হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ তাহার

না ছিল রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা, না ছিল প্রাচীন ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথ সেকালের অবস্থা বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।' তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা দুঃসাহসিক অভিযান মাত্র নহে; তিনি এমন সাহিত্য রচনা করিলেন যাহার জন্য বঙ্গসাহিত্য প্রস্তুত ছিল না, যাহা বাঙ্গালী পাঠক প্রত্যাশা করিতে পারিত না, যাহা শুধু অভিনব নহে পূর্ণ পরিণতিতে দেদীপ্যমান। তাঁহার অপরূপ সাফল্যের আর একটি কারণ তাঁহার প্রতিভার মধ্যে মননশীলতার অভাব ছিল না। অনেকে মনে করেন যে কবিকল্পনার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক নাই। ক্রোচে তো এই বিচ্ছেদকে দার্শনিক যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও দৃঢ়ীভূত। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কল্পনা (Imagination) ও কাল্পনিকতা (Fancy)—এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তাঁহার মতে, 'যথার্থ কল্পনা যুক্তি সংযম ও সত্যের দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট আকারবদ্ধ।'

রবীন্দ্রনাথ একটি উপমার সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানের পরিচয় দিয়াছেন এবং সেই উপমার মধ্যে বুদ্ধিনিষ্ঠ সমালোচনা নূতন সৃষ্টির দীপ্তি লাভ করিয়াছে: 'তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণা করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতঃস্পর্শে জড়ত্ব শাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন—ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, একথা কেবল বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।' এই কথা তিনি বলিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। ইহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের দুইটি গ্রন্থ—রাজসিংহ ও কৃষ্ণচরিত্র—সম্পর্কে তিনি দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উভয় প্রবন্ধই বর্ত্তমান আলোচনায় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে 'রাজসিংহ' প্রবন্ধটির প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে, কারণ ইহার মধ্যে সৃজনী প্রতিভা ও সমালোচনী বুদ্ধির সম্মিলনে এক নূতন ধরণের সাহিত্যপ্রকরণের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা সমালোচনাও বটে, সৃষ্টিও বটে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে জেব-উন্নিসার যে কাহিনী ও চরিত্র ছিল রবীন্দ্রনাথ তাহাকে পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্ত্তিত

করেন নাই ; কিন্তু তিনি তাহার মধ্যে নূতন তাৎপর্য্য যোজনা করিয়াছেন। এই জেব-উন্নিসার কাহিনী অসংযত জীবনের প্রায়শ্চিত্তের ছবি নয়। সম্রাট-দুহিতা পরিহাসরসিক অন্তর্য্যামী বিধাতার হাতে অসহায় ক্রীড়নক আর পতঙ্গ-চপলা, উন্মাদিনী দরিয়া তাঁহার করাল অস্ত্র।

প্রাচীন কবিদের রচনা সম্পর্কে এই জাতীয় কল্পনাসমৃদ্ধ সমালোচনা অধিকতর উপযোগী হইতে পারে, কারণ কালিক দূরত্বের জন্যই কবির উদ্ভাবনী শক্তি সেইখানে স্বাধীন ভাবে সঞ্চরণ করিতে পারে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' বিষয়ক প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই অপরূপ সৃষ্টি। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' ও 'মেঘদূত' প্রবন্ধের তুলনা পৃথিবীর কোন সাহিত্যে পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। এই গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধেও তাঁহার সৃজনধর্ম্মী প্রতিভা অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটির কথা বলা যাইতে পারে, কারণ ইহার প্রায় সব কয়টি চিত্রই সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। ইহার তিনটি অংশ—উর্ম্মিলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা এবং পত্রলেখা। ইহাদের স্রষ্টারা ইহাদের কথা বলেন নাই স্রষ্টারা যেখানে ফাঁক রাখিয়াছেন কবি-সমালোচক—কীট্‌সের ভাষায়—সেই ফাঁকটা সোনা দিয়া ভরিয়া দিয়াছেন। এইখানে উল্লেখযোগ্য, মূল কবি যত কম বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তত বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই প্রবন্ধে পত্রলেখা-চিত্র অপেক্ষা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার চিত্র সুন্দর এবং উর্ম্মিলার চিত্র আরও সুন্দর হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে। ইহার কারণ, কম বলিলেও বাণভট্ট কিছু বলিয়াছেন, কালিদাস অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সম্পর্কে তদপেক্ষা কম বলিয়াছেন আর বাল্মীকি উর্ম্মিলা সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেন নাই। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ উর্ম্মিলার প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকিয়াছেন—বধূবেশে তাহার অযোধ্যায় রাজপুরীতে প্রবেশ, রামচন্দ্রের অভিষেক প্রস্তুতিতে তাহার সম্ভাব্য অংশগ্রহণ, নির্ব্বাসনের দিনে লক্ষ্মণের কাছ হইতে তাহার বিচ্ছেদ, উদ্ভিন্ন যৌবনকালে তাহার সুদীর্ঘ বিরহ ও প্রতীক্ষা। উর্ম্মিলা এবং অংশতঃ অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ও পত্রলেখার যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা স্বকপোলকল্পিত হইলেও মূলের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নয় ; বরং মূলে যেখানে ফাঁক রহিয়াছে তাহা পরিপূরণ করে বলিয়া এই সব চরিত্র চিত্রণ এত সার্থক হইয়াছে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের উর্ম্মিলাকে গ্রহণ করিলে বাল্মীকির রামায়ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত ; বাল্মীকির কাব্যের কাঠামোর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সংযোজন তাৎপর্য্য লাভ করিয়াছে। অন্যান্য উপেক্ষিতাদের

সম্পর্কেও এই কথা খাটে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই রবীন্দ্রনাথের শিল্প-কৌশলের আভাস পাওয়া যাইবে। কণ্বমুনির আশ্রমে দুষ্মন্তের অভ্যাগম আকস্মিক, শকুন্তলার সঙ্গে তাঁহার প্রণয়ব্যাপারও অচিন্তিতপূর্ব্ব। এই ব্যাপারে লজ্জিতা শকুন্তলার অংশ বরং কম। 'বারো-আনা প্রেমালাপ তো তাহারাই [অনসূয়া-প্রিয়ংবদাই] সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিল।' তারপর শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার পর এই সখীদ্বয় আড়ালে চলিয়া গেল ; আমরা আর তাহাদের দেখা পাই না। এই উপেক্ষার সূত্র ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন, 'হায়, তাহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে, যাহা জানিত না তাহা জানিয়াছে।…এখন হইতে অপরাহ্ণে আলবালে জলসেচন করিতে কি তাহারা মাঝে মাঝে বিস্মৃত হইবে না? এখন কি তাহারা মাঝে মাঝে পত্রমর্ম্মরে সচকিত হইয়া অশোক-তরুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কোনো আগন্তুকের আশঙ্কা করিবে না?' এই কারণেই বলিয়াছি যে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটি শুধু নূতন সৃষ্টি নয়, মূলের সঙ্গে সংযুক্ত সমালোচনাও বটে।

লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের একটি মনোরম দৃশ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের উপেক্ষার কথা বলিয়াছেন। এই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজাই এই প্রবন্ধগুলির প্রধান টেকনিক। কালিদাসের ভাব ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের কল্পনার আলোকে নূতন দ্যোতনায় মণ্ডিত হইয়াছে। আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন, 'যেমন বসন্তকালে পুরাতন বৃক্ষ নূতন করিয়া বিকশিত হয়, সেইরূপ অর্থসমূহ পূর্ব্বদৃষ্ট হইলেও কাব্যে রসপরিগ্রহ করিয়া সবই নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়।' (৪।৪) কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনার মত কোন রচনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার মত সমর্থন করিতে পারেন নাই, তাঁহার কাছে এই জাতীয় দৃষ্টান্তই ছিল না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সঙ্গে শেক্সপীয়রের প্রতিভার খুব একটা সাদৃশ্য ছিল না এবং শেক্সপীয়রের নাটক ও 'প্রাচীন সাহিত্য' একেবারে বিভিন্ন ধরণের রচনা। কিন্তু তবু গুণগত বিচারে বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের এই কৃতিত্ব শেক্সপীয়রের কৃতিত্বের সঙ্গেই তুলনীয়।

কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'সেক্সপীয়র অদ্বিতীয় কবি।…………তিনি জানিতেন যে, যে সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে তিনি আপন নাটকের উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে সমকক্ষ নহেন। তিনি যে আকাশে আপন কবিত্বের প্রোজ্জ্বল কিরণমালা বিস্তার করিবেন, সেখানে

পূর্ব্বগামী নক্ষত্রগণের কিরণ লোপ পাইবে। এজন্য ইচ্ছাপূর্ব্বকই পূর্ব্বলেখকদিগের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। তথাপি ইহাও বক্তব্য যে, কেবল একখানি নাটকের উপাখ্যানভাগ তিনি হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ট্রেলস্ ও ক্রেসিদা নাটক প্রণয়নকালে, ভবভূতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, তিনি ও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন।' এই মন্তব্য অর্দ্ধসত্য এবং Troilus and Cressida নাটকের দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কারণ হোমারের বীরদের ব্যঙ্গ করাই শেক্সপীয়রের নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। শেক্সপীয়রের প্রতিভার তুলনায় অন্য সব লেখকই হীনপ্রভ, কিন্তু প্লুটার্ক ক্ষীণ জ্যোতিষ্ক নহেন; তাঁহার জীবনচরিতমালা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। শেক্সপীয়র প্লুটার্ককে অনুসরণ করিয়াছেন, অনেক সময় হুবহু নকল করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুবর্ত্তিতার মধ্য দিয়াই প্লুটার্ক-বর্ণিত চরিত্রগুলি নূতন দ্যোতনায় মণ্ডিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কালিদাস তাঁহারই সমকক্ষ কবি, কালিদাস তাঁহার রচনার দ্বারা আচ্ছন্ন হইবেন এই কথা তিনি কখনও মনে করেন নাই; বরং কালিদাসের রচনার রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কালিদাসের ভাষা, কালিদাসের চিত্র, কালিদাস-বর্ণিত ঘটনার পুনর্বিন্যাস করিয়াই তিনি উমা ও শকুন্তলাকে চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু নূতন ভাবের আলোকে ইহারা উদ্ভাসিত হইয়াছে।

এই ভাব যদি একেবারে নূতন হইত তাহা হইলে কালিদাসের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক থাকিত না। কালিদাসে যাহা ব্যঙ্গ্য রবীন্দ্রনাথে তাহাই বাচ্য হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে, কারণ কালিদাস কাব্য লিখিয়াছেন আর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন সমালোচনা বা ব্যাখ্যা। এই ভাবেই কবি-সমালোচক কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার প্রথম সর্গ ও প্রথম অঙ্ক হইতে সপ্তম সর্গ ও সপ্তম অঙ্কে পরিণতি লক্ষ্য করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ তপস্যার দ্বারা পূত হয় না, যাহা কর্ত্তব্যবিষয়ে আত্মবিস্মৃত হয় তাহা ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। এই তাৎপর্য্য কালিদাসের কাব্যে নিহিত ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনার স্পর্শ না পাইলে ইহার পূর্ণ প্রকাশ ঘটিত না। অথচ ইহা নীতিকথা মাত্র নহে, কারণ কাব্যের চিত্র, ভাব, ঘটনা এবং ভাষাগত ব্যঞ্জনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে ইহার সজীব অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে।

এই শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা মেঘদূত-সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও কবিতা। বর্ষাকাল

ও মেঘদূতই রবীন্দ্রনাথের রচনায় সবচেয়ে বেশি উল্লিখিত হইয়াছে এই কথা সচরাচর বলা হইয়া থাকে। মেঘদূত সম্পর্কে তিনি একটি কবিতা ও একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার 'স্বপ্ন' কবিতাটির ছবিও মেঘদূত হইতেই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই কবিতাটি বিশুদ্ধ কাব্য, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য। ইহাকে সমালোচনা বলা যায় না, কারণ এই কবিতার যে ভাব—প্রাচীনকালের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ—তাহা প্রত্যক্ষতঃ মেঘদূতের ভাব নয় এবং রবীন্দ্রনাথ যে পূর্ব্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ার কথা লিখিয়াছেন—

মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে—

তিনি তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী অলকাবাসিনী যক্ষপ্রিয়া নহেন। কিন্তু এই কবিতাটি একটি আশ্চর্য্য সৃষ্টি ; ইহা ভাবে ও রূপে মৌলিক কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি খণ্ডচিত্র কালিদাসের কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে।

'মেঘদূত' কবিতাটি অন্য রকমের। কাব্য হিসাবে ইহা 'স্বপ্ন' কবিতা হইতে নিকৃষ্ট, ইহার সেই সংক্ষিপ্ত সংহতি নাই, ইহার মৌলিকতা কম। কিন্তু মৌলিকতা কম বলিয়াই ইহাকে কালিদাসের কাব্যের অভিনব সমালোচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার কোন কোন অংশ এত মূলানুগ যে অনুবাদ বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও ভাবনা কালিদাসের সুপরিচিত কাব্যের নূতন পরিচয় দিয়াছে। কালিদাসের কাব্যে জগতের বিরহী জনের শোক চিরকালের জন্য বিধৃত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক পাঠক রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের জগৎ হইতে অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। তিনি কল্পনার সাহায্যে সেই সানুমান আম্রকূট, সেই উপলব্যথিতগতি বিমল বিশীর্ণ রেবা, সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র, সেই কনখল পরিক্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন, কিন্তু কালিদাসের মত তিনি এই জগতের অধিবাসী নহেন। তাই তাঁহার মনে একটা নূতন রকমের বিরহ জাগ্রত হইয়াছে। তিনি কল্পনার দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছেন, সকল প্রেমের মধ্যেই অপূর্ণতার দীনতা আছে, কোন আকাঙ্ক্ষারই পরিতৃপ্তি নাই, আশা ও সফলতার মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। কালিদাস যে অলকাপুরীর কল্পনা করিয়াছেন, তাহা কবির কল্পনামাত্র, ইহা মানুষের অনধিগম্য :

সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে ?

এই ভাবটিই নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে 'মেঘদূত' প্রবন্ধে এবং প্রগাঢ়তা ও জটিলতা লাভ করিয়াছে। এইখানেও কবি আরম্ভ করিয়াছেন দূরত্ববোধের বর্ণনা দিয়া। এই বর্ণনা আরও বেশি স্পষ্ট : 'রামগিরি হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্ব্বাসিত হইয়াছি।' কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে কবির মনে একটা নূতন ভাব জাগ্রত হইয়াছে। যে ব্যবধানের কথা কালিদাস বলিয়াছেন তাহা কি শুধু রামগিরি হইতে হিমালয়ের ভৌগোলিক দূরত্ব? তাহা নহে। তিনি অনুভব করিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষ একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত, পরস্পরের মধ্যে অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। কাজেই এই বিরহ শুধু কোন বিশেষ নায়ক ও নায়িকার সীমিত কালের বিরহ নয়, এই বিরহ কেবল অতীত ও বর্ত্তমানের নহে; যে বিরহশয্যার কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা রহিয়াছে প্রত্যেক মানুষের মানসসরসীতীরে। এই অনতিক্রম্য বিরহ জীবনের মূলীভূত দুর্ভাগ্য। তাই তিনি আশাবাদী বিরহী যক্ষকে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'হে নির্জ্জন গিরিশিখরের বিরহী, স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যলোকে শরৎ পূর্ণিমারাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে?' দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সুসমঞ্জস সমন্বয় হইলে যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি সম্ভব হয় এই প্রবন্ধটি তাহার উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

কালিদাসের মেঘদূত হইতে বাংলার ছেলে-ভুলানো ছড়ার প্রসঙ্গে আসিতে হইলে অনেক ধাপ নামিতে হয়, কিন্তু সেই অবতরণ অবশ্য স্বীকার্য্য, কারণ উভয় কাব্যের আলোচনায়ই রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাক্ষর সমভাবে বিদ্যমান। শুধু ছেলে কেন, বুড়োরা এই ছড়াগুলির দ্বারা মোহিত হইয়া আসিয়াছে। তাহা না হইলে ইহাদের আয়ু এত দীর্ঘ হইল কি করিয়া? কিন্তু সচরাচর কেহ এই ছড়াগুলির অর্থ করিতে চেষ্টা করে না বা ইহার কোন সাহিত্যিক মূল্য দেয় না। ইহারা অতিশয় হাল্‌কা আর ইহাদের সব চেয়ে বড় দোষ অসংলগ্নতা। অথচ রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন—এবং সব সমালোচকই তাঁহাকে সমর্থন করিবেন—সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ সুসংলগ্নতা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এই ছড়াগুলিকে আস্ত জগতের ভাঙ্গা টুকরা বলা যায়। তিনি কল্পনা ও যুক্তির সাহায্যে ভাঙ্গা টুকরা দিয়া আস্ত জগৎকে

পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। ছড়াগুলির প্রত্যেকটি ছত্র বিভিন্ন, কিন্তু সবগুলি ছত্র একত্র করিলে একটি সমগ্র রূপ পাওয়া যায়, এই সংহতি অনুভূতির, কল্পনার সংহতি, যুক্তির আরোহ-অবরোহ নয়। এই ছবিগুলির মধ্যে রহিয়াছে মা বাবা অন্য অভিভাবকের স্নেহ ও শিশুর বন্ধনহীন সহানুভূতি যাহা সম্ভাব্যতার দ্বারা বা যুক্তির দ্বারা সীমিত হয় না। আর এই বিচ্ছিন্ন ছবিগুলির মধ্য হইতে বাঙ্গালীর জীবনের স্বরূপ ভাসিয়া উঠে। এই তিনটি সূত্রই আপাত অসংলগ্নতাকে সংহতি দান করিয়াছে। এই কারণেই ইহারা অলংকারবর্জিত, ব্যাকরণদুষ্ট ও অসংলগ্ন হইলেও খামখেয়ালি কল্পনার খেলা নহে ; ইহাদের মধ্যে অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য্যও আছে। এই ছড়াগুলিকে রবীন্দ্রনাথ মেঘের সঙ্গে তুলিত করিয়াছেন—উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। কিন্তু ইহারা ভারহীন হইলেও চিত্র-বৈচিত্র্যময় এবং অর্থবন্ধনমুক্ত হইলেও ভাবৈকরসে সঞ্জীবিত।

দশম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্র-সমালোচনা

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রনাথ ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি। এই সম্বন্ধে এখন কোন মতদ্বৈধ আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি—এই মতও এখন অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইবে না। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পাইয়া তিনি জগৎসভায় নিঃসন্দিগ্ধ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ সেই সম্মানও খুব বড় বলিয়া মনে হয় না। তিনি যখন এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন তখন এই পুরস্কারের বয়স খুব বেশি হয় নাই। তারপর অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল চলিয়া গিয়াছে; বোধ হয় জন পঁয়ষট্টি লেখক এই পুরস্কার পাইয়াছেন। এই সব এককালের ভাগ্যবান্‌দের অনেকের কবিকীর্ত্তিই এখন নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। অল্প কয়েকজন নোবেল পুরস্কারবিজয়ী সাহিত্যাকাশে এখনও অম্লান দীপ্তিতে ভাস্বর, রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাদের অন্যতম ইহা অবিসংবাদিত।

রবীন্দ্রনাথ যখন অপেক্ষাকৃত তরুণ তখন সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র নিজের গলা হইতে অভিনন্দনমাল্য লইয়া উদীয়মান কবির গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে; তখন রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গ্রন্থই লিখিত হয় নাই। যে প্রতিভা তখনও অর্দ্ধস্ফুট তাহাকে এই স্বীকৃতি দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রখ্যাত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কবির প্রথম বয়সের রচনার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন **The Neo-Romantic Movement in Literature** প্রবন্ধে। ব্রজেন্দ্রনাথ একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতেই সাহিত্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহার রবীন্দ্রব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্যবিচার বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; তবুও তরুণ কবির কাব্যের এই সীমিত অভিনন্দনও তাৎপর্য্যপূর্ণ।

কিন্তু তদানীন্তন ও পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথকে অনেক প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়, অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। ইহার প্রধান কারণ তাঁহার কাব্যের অভিনবত্ব। অনেক বড় সাহিত্যিককেই নিজেদের জন্য উপযুক্ত পাঠকসমাজ গড়িয়া তুলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথকেও তাহা করিতে হইয়াছিল। যৌবনে ও মধ্যবয়সে তাঁহার উপরে যে বিরূপ সমালোচনা

ও বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছিল এখনকার পাঠক তাহা পড়িয়া কৌতুক অনুভব করিবেন। তিনি যখন নোবেল পুরস্কার পাইলেন তখন অনেকে ঘটা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে শান্তিনিকেতন গিয়াছিলেন। দেশবাসীর সেই বিলম্বিত, অপরের দ্বারা প্রণোদিত, অভিনন্দন তিনি গ্রহণ করেন নাই। সেই সময়ও কিন্তু তাঁহার প্রতি বিরূপতার অবসান হয় নাই। পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলা পত্রে একটা প্রশ্ন থাকিত : Render into chaste and elegant Bengali অর্থাৎ কয়েক পংক্তি অশুদ্ধ, অমার্জ্জিত বাংলা পরীক্ষার্থীদের কাছে দেওয়া হইত। তাহারা যেন ঐ অনুচ্ছেদকে বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত ভাষায় রূপান্তরিত করে। যে বৎসর রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান সেই বৎসরই যে অনুচ্ছেদটি এই প্রশ্নপত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথেরই রচনা!

এই সব বিরোধিতা সত্ত্বেও ইহাও মানিতে হইবে যে প্রথম হইতেই রবীন্দ্রনাথের একদল ভক্ত ও অনুগত পাঠক গড়িয়া উঠে এবং অনেক কবি ও সমালোচক তাঁহার কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রচার করিতেন এবং ইঁহাদের পশ্চাতে ছিল ক্রমবর্দ্ধমান সাধারণ পাঠকসম্প্রদায়। পরবর্ত্তী কালে বিরোধীদের বিদূষণকে কেহ বড় একটা আমল দিত না। ইহা বিদূষকের কটুকষায়োক্তির মত কৌতুকই উৎপাদন করিত। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দীর্ঘ সাতাশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এখন তাঁহার সমসাময়িকদের সমালোচনার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কিন্তু সাহিত্যবিচারের দিক্ দিয়াও এই সমালোচনা তাৎপর্য্যহীন নয়; এমন কি এই বিদূষণেরও যথোপযুক্ত বিচার করিতে পারিলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভাল ভাবে বুঝিতে পারিব।

দুঃখের বিষয় উভয় শ্রেণীর সমালোচনাই পক্ষপাতদুষ্ট এবং এই সময়কার অধিকাংশ সমালোচনার মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ নাই। বিরোধীরা রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে পারেন নাই এবং আজ তাঁহাদের পরিবাদ শুধু তাঁহাদের সীমাবদ্ধ উপলব্ধিরই পরিচয় দেয়। তবু পূর্ব্বেই ইঙ্গিত দিয়াছি, ইঁহারা রবীন্দ্রকাব্যের যে দোষখ্যাপন করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রকৃত সমালোচনার দুই একটি সূত্রও পাওয়া যায়। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল মোটামুটি তিনটি : (১) রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্নীতির পরিপোষক, (২) ইহা অস্পষ্ট এবং (৩) বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই সব অভিযোগের আলোচনার পূর্ব্বে রবীন্দ্রসমর্থকদের

কথা একটু উল্লেখ করিতে হয়। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে যে, ইঁহারা বিচারবিশ্লেষণ খুব কমই করিয়াছেন, ইঁহারা প্রশংসার অতিশয়োক্তির দ্বারা নিন্দার অতিশয়োক্তিকে ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মোহিতচন্দ্র সেন, যদুনাথ সরকার, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির রচনায় খাঁটি সমালোচনার স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায়, কিন্তু সেও স্ফুলিঙ্গ মাত্র, দীর্ঘ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার নহে। আর প্রায় সবাই উচ্ছ্বাসকেই উপলব্ধি বলিয়া ভুল করিয়াছেন। কবিবন্ধু প্রিয়নাথ সেন লিখিয়াছেন :

'হাজার কথা দিয়া কোন কালে কেহ যাহা বলিতে পারিত না, কোন কালে কেহ যাহা বলিতে পারিবে না, তাহা এই কতিপয় অলঙ্কারশূন্য সাদাসিধা, অতি সরল, অতি সহজ, অতি সামান্য পদে কি চমৎকার, কি প্রাণভরা উক্তি পাইয়াছে।......বাংলা, ইংরেজী বা ফরাসী সাহিত্যে মিলন ও উপভোগের এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত কেহ কখনও শুনে নাই। ইহার উপযুক্ত প্রশংসা আমার ক্ষমতার বাহিরে।'

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন :

'একদিকে যেমন গানে গানে একটা আনন্দের উৎসরস ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, অপর দিকে তেমনি যে কথাগুলি আমরা বল্‌লাম সেই কথাগুলি নিয়ে একটা বস্তুধ্বনিও যুগপৎ ভেসে উঠেছে, কিন্তু কোনটা থেকে কোনটা পৃথক্ করা যায় না ; অথচ যেন ফুলের গন্ধের মত এরা গায়ে গায়ে জড়িয়ে রয়েছে। অভিধার অতি সূক্ষ্ম তারের উপর সমস্ত রাগ-রাগিণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। শীতের মধ্য দিয়ে বসন্তের আগমন হচ্ছে এর উপাখ্যান ভাগ বা **mythlopic [mythopoeic ?] process** ; এই ব্যাপারটার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করে আমাদের জীবনকে যে নূতন ঢঙে দেখবার চেষ্টা হয়েছে, সেটি হচ্ছে এখানকার জীবন "সমালোচন" ; এবং এই সমালোচনের ফলে জীবনপ্রবাহের মধ্যে জরা যৌবনের যে গূঢ় কথাটি ধ্বনিত হয়েছে সেটি হচ্ছে ব্যঞ্জনফল, ধ্বনি বা **crowning transfiguration**।'

মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন,

'রবীন্দ্রনাথ এই অন্তরগহনের দীপশিখাকেই বস্তু-পরিচয়ের মানস-রঙ্গভূমিতে প্রতিফলিত করিয়া কাব্যরসধারাকে প্রবাহিত করিলেন। তাঁহার কল্পনায় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এক অভিনব ভোগবাদের সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছে ; বৈরাগ্যসাধনার মুক্তি অপেক্ষা অন্যতর মুক্তির পন্থা—এই বহির্জীবনের নাট-

মন্দিরে কবিকরধৃত বাণী-দীপের আরতি-আলোকে—সুপ্রকাশিত হইয়াছে। ……এতকাল কবিপ্রেরণা যে পথে রসসৃষ্টি করিতেছিল তাহার মূলমন্ত্র যেমন সেক্সপীয়ারের নাটকীয় কল্পনাতেই চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করিয়াছে; তেমনই কাব্য-সাধনার যে আর এক পন্থা য়ুরোপীয় সাহিত্যে সূচিত হইয়াছে, যাহা ডাহিনে বামে নানা ভঙ্গিতে নানা দিকে আজও অগ্রসর হইয়া চলিতেছে—কাব্যসাধনার সেই পন্থায় যে চূড়ান্ত-সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় ভাবকল্পনা হয়ত তাহাতেও শক্তি সঞ্চার করিবে;……।'

প্রিয়নাথ সেন 'মানসী'-সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন 'মানসী' প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পরে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। তখন বিশ্লেষণ ও বিচারের সময় আসে নাই, প্রতিকূল সমালোচনার বিরুদ্ধে তখন উচ্ছ্বসিত সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে, প্রিয়নাথ সেনের চল্লিশ বৎসর পরে, রবীন্দ্রনাথ যখন দেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। তখন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও যুক্তিপূর্ণ বিচারের সময় আসিয়াছে। কিন্তু ইঁহারা—এবং আরও অনেকে—শুধু অতিশয়োক্তির জাল বুনিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যকে ঝাপ্‌সা করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সকল অনুরক্ত লেখকদের মধ্যে অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তাঁহার রচনার বিচার যথাস্থানে করা যাইবে। কিন্তু তাঁহার মধ্যেও এই অতিশয়োক্তি-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

॥ ২ ॥

এখন বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে। বিরোধীদের একটি আপত্তি এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য অশ্লীল বা দুর্নীতিপূর্ণ। সাহিত্যে নীতির প্রশ্নটা খুবই বিভ্রান্তিকর। নীতির আদর্শ দেশে দেশে কালে কালে বিভিন্ন হয়। সেই জন্য এই আলোচনায় অনেক সময় **irony** বা (ইতিহাসের) বিপরীতলক্ষণারও পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল যে তাঁহার রচনা দুর্নীতির পরিপোষক, পরবর্ত্তী কালে আধুনিক সাহিত্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনিই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। সাহিত্যে নীতির প্রশ্ন অপরিহার্য্য অথচ ইহা আগন্তুকও বটে। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

অথচ বাস্তব জীবনে অনেক নোংরা ব্যাপার আছে; তাহাদিগকে বাদ দিলে সাহিত্য আকাশকুসুমের অপেক্ষাও অলীক হইয়া যাইবে। সুতরাং দুর্নীতির প্রতি উন্নাসিক হইলে, প্লেটোর নির্দ্দেশমত কবিদিগকে একেবারে নির্ব্বাসন দিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের রচনা দুর্নীতিমূলক এইরূপ অভিযোগ বোধ হয় প্রথমে উত্থাপন করেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁহার 'মিঠে কড়া' নামক প্যারডির ভূমিকায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'স্তন' 'চুম্বন' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করিয়া এইরূপ ইঙ্গিত করেন যে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ কোন স্বামী স্ত্রীর কাছে অথবা স্ত্রী স্বামীর কাছে পাঠ করিতে লজ্জিত হইবেন। পরে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতিও অশ্লীলতার অভিযোগ আনয়ন করেন। সমাজপতির মতে 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ পাপচিত্র আঁকার জন্যই পাপচিত্র আঁকিয়াছেন এবং যতীন্দ্রমোহন সিংহ মনে করেন রবীন্দ্রনাথ সমাজের পূতিগন্ধময় নারকায় চিত্র আঁকিয়াছেন এবং মানবহৃদয়ের যে সকল ভাব প্রকাশযোগ্য নহে তাহাদের উদ্ঘাটন করিয়া সমাজের নৈতিক আবহাওয়া দূষিত করিয়াছেন। ইঁহাদের কাহারও অভিযোগেই কোন সারবত্তা নাই। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্যারডি লিখিয়াছিলেন; তিনি যুক্তির ধার ধারেন নাই। যতীন্দ্রমোহন সিংহ চাহিতেন যে, সাহিত্য প্রচলিত নীতি প্রতিফলিত করিয়া সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করিবে। তাঁহার গুরু টলষ্টয়। যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতি লেখকেরা সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে যাইয়া স্বাস্থ্যই রক্ষা করেন, সাহিত্যকে নয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির যুক্তি সবচেয়ে বিস্ময়কর ও কৌতুকজনক। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা' ও রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র আখ্যানগত সামান্য সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া—তিনি 'উমা' পড়িয়াছেন এমন মনে হয় না—তিনি স্থির করিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুকরণ করিয়াছেন এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'উমা'র যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহাই তিনি 'চোখের বালি'র উপর নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। এই জাতীয় সমালোচনা সম্পর্কে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

দুর্নীতির অভিযোগ সবচেয়ে জোরালো অভিব্যক্তি পাইয়াছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনায়। সুতরাং তাহার একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে। 'চিত্রাঙ্গদা'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন যে, মহাভারতের কাহিনীতে অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন এবং চিত্রাঙ্গদার

পিতার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনী বদলইয়া চিত্রাঙ্গদাকে অনূঢ়া অবস্থায় অর্জ্জুনের প্রণয়াভিলাষিণী করিয়াছেন এবং বর্ষকালব্যাপী ব্যভিচারের বর্ণনা দিয়াছেন। এই কারণে নায়ক ও নায়িকার চিত্র অতিশয় জঘন্য হইয়াছে; এবং ইহা অস্বাভাবিকও, কারণ কোন কুলাঙ্গনা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মত সংকোচসম্ভ্রমহীনা হইতে পারেন না এবং তাঁহার অর্জ্জুনও মহাভারতের জিতেন্দ্রিয়, কৃষ্ণ-সখা তৃতীয় পাণ্ডব নহেন।* দ্বিজেন্দ্রলালের মতে এই পুস্তক দগ্ধ করা উচিত। বাংলার—এবং বাংলার বাহিরের—অগণিত পাঠক 'চিত্রাঙ্গদা' ও Chitra সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের মত সমর্থন করে নাই, যদিও এই কথাও কেহ অস্বীকার করিবে না যে এই গ্রন্থে নিবিড় সম্ভোগের বর্ণনা আছে।

কোন কাব্য দুর্নীতির পরিপোষক কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে কবির উদ্দেশ্য এবং বিশেষ করিয়া কাব্যের সামগ্রিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইবে। কবির উদ্দেশ্য কাব্যবিচারে চরম মানদণ্ড নয়, তবু তাহাকে বাদ দেওয়া নিরাপদ নয়। এই নাটিকার উদ্দেশ্য ও সামগ্রিক তাৎপর্য্য চিত্রাঙ্গদার শেষ উক্তিতে স্পষ্ট হইয়াছে :

তারপর পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি বীরের হৃদয়, ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।
আমি চিত্রাঙ্গদা।

*   *   *

যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

*দ্বিজেন্দ্রলাল অর্জ্জুন-উর্ব্বশীর কাহিনী স্মরণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তৃতীয় পাণ্ডব অনূঢ়া সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন এবং সেই অভিযানে সুভদ্রার ব্যবহার সংকোচ-সম্ভ্রমের পরিচয় দেয় কিনা তাহা বিতর্কের বিষয়।

যদি প্রথম দিকের সম্ভোগ-উন্মাদনার চিত্র না থাকিত, তাহা হইলে এই শেষের আশ্বাসের তাৎপর্য্য ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইত। এই সামগ্রিক তাৎপর্য্য এত বেশি নীতিগন্ধী যে জনৈক ইউরোপীয় সমালোচক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে স্বামীর গুরুতর কর্ত্তব্যের কাছে প্রথম প্রেমের সৌন্দর্য্য, স্বপ্ন ও মায়ার জগৎ লুপ্ত হইয়া গেল। (**But alas ! this sharing by the wife of the husband's thought and action is made to supersede that world of beauty and dreams, of enchantment in which they first have loved one another.**)*

এখানে সাহিত্যের সঙ্গে নীতির প্রশ্নটি পুনরায় উত্থাপিত হইতে পারে। কাব্য আস্বাদের বস্তু, প্রতীতির বিষয় ; আস্বাদ আনন্দ দেয় এবং প্রতীতি জ্ঞান দান করে, জীবনকে ভাল করিয়া বুঝিতে, উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। ইহার আধার মন ; আর নীতির প্রয়োজন হয় ব্যবহারিক জীবনে, কর্ম্মের জগতে। ইহাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। এই কথা ভারতীয় আলংকারিকেরাও বলিয়াছেন, নব্য ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রী ক্রোচেও বলিয়াছেন। ভারতীয় আলংকারিকদের পথ অনুসরণ করিয়া বলিতে পারা যায়, জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠে, কিন্তু সাহিত্যের আস্বাদ ও লৌকিক অভিজ্ঞতার আস্বাদ বিজাতীয় পদার্থ। বাস্তব জীবনে সম্ভোগের চিত্র দেখিলে আমাদের মনে স্পৃহা, লজ্জা, জুগুপ্সা প্রভৃতির উদ্রেক হইবে, সাহিত্যে শুধু আনন্দোপলব্ধি হইবে। কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা যদি আনন্দের সঞ্চার করে, সেই আনন্দ রসাস্বাদের আনন্দ হইতে পৃথক্। বাস্তব সত্য ও সাহিত্যের রস সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু এক জাতীয় বস্তু নয়। সাহিত্য মহান্ ভাবের বর্ণনা দিয়া মহৎ কাজের প্রেরণা জোগাইবে এই নীতিগত প্রশ্নও অবান্তর। হ্যামলেট জগতের শ্রেষ্ঠ নাটক, কিন্তু ইহা কোন বড় কাজের বা আন্দোলনের হেতু হইয়াছে এমন কথা শোনা যায় নাই, আর মিসেস্ ষ্টো'র টমকাকার কাহিনী যে দাসব্যবসায় উচ্ছেদ করিতে সাহায্য করিয়াছিল তাহা স্বয়ং এব্রাহাম লিংকলন্ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই মানদণ্ডে এই দুই গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে না।

* জে. সি. রোলো—টমসন প্রণীত *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist* গ্রন্থে উদ্ধৃত।

'চিত্রাঙ্গদা' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী এই মতই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন : 'গাছের মূল থাকে মাটিতে, কিন্তু তার ফুল ফোটে আকাশে। ফুল দেখবামাত্র যে-লোকের তার মূলের কথাই বেশি মনে পড়ে সে ফুলের যথার্থ সাক্ষাৎ পায় না, পায় শুধু মাটির।…আমরা যাকে প্রেম বলি, তাও মনোজগতের বস্তু হলেও দেহের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়।…যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপলোকের বস্তু কামলোকের নয় তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন।' ইহাই সাহিত্যের প্রকৃত সমস্যা, কেমন করিয়া কামলোক বা বস্তুজগৎ রূপলোকে উন্নীত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নীতিবাগীশরা স্বীকার করিবেন যে, পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ কাব্যে অশ্লীলতা অনুপ্রবেশ করিয়াছে। সফোক্লিসের রাজা ঈদিপাস জগতের এক শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐরূপ অশ্লীল গল্প কেহ কোথাও শোনে নাই। কিন্তু কেহ কোন দিন সফোক্লিসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনয়ন করে নাই। কালিদাসের মেঘদূত কামার্ত্ত যক্ষের মর্ম্মকথা; ইহার অনেক শ্লোকই বস্তুগত বিচারে অশ্লীল বা দুর্নীতিদুষ্ট বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু সহৃদয় পাঠকের মনে সেই সব শ্লোক সৌন্দর্য্যবোধই উদ্দীপিত করে, কামোন্মাদনা আনয়ন করে না। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই বহু পুরাতন কথার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বমেঘে কলিদাস বলিতেছেন :

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থ॥৪৪

(বেতসশাখা জলের উপর হেলে পড়েছে; যেন নদী হাত দিয়ে তার বসন কিঞ্চিৎ ধরে আছে। সখে, সেই নীলসলিলবসন সরিয়ে তটরূপ নিতম্ব মুক্ত করে উপরে লম্বমান হলে তুমি কি ক'রে প্রস্থান করবে? আস্বাদ পেয়ে উন্মুক্তজঘনাকে কে পরিত্যাগ করতে পারে?—রাজশেখর বসুর অনুবাদ)

এই শ্লোকটি যৌনসঙ্গমের প্ররোচনার বর্ণনা। শুধু সেই দিকেই দৃষ্টি দিলে ইহার চতুর্থ পংক্তির মত সংকোচহীন অশ্লীলতার চিত্র খুব নীচু শ্রেণীর সাহিত্যেও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে নদীর রূপের প্রতি এবং তাহাই পাঠককেও বিমুগ্ধ করে। বিশেষতঃ সমাসোক্তিবলে কবি যে

যৌনমিলন আরোপ করিয়াছেন তাহা এতই অসম্ভব ও কাল্পনিক, যে সুদূরতার জন্যই ইহার কামালুতা সৌন্দর্য্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। চিত্রাঙ্গদার ছদ্মবেশও অনুরূপ যন্ত্র; ইহার অলীকতাই কল্পনাকে বাস্তবের পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। ইহা ছাড়া ভাষার ও চিত্রের ঐশ্বর্য্য তো আছেই। নিজেকে খুব সংযত করিয়া লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলিয়াছেন, 'ইহার ('চিত্রাঙ্গদা'র) সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমাচ্ছটা অতুলনীয়।' তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কবিপ্রতিভার ধর্ম্মই এই যে তাহা বস্তুলোককে অপার্থিব রসলোকে উন্নীত করে আর সুন্দর ভাষা ও অতুলনীয় উপমাচ্ছটা স্বয়ংসিদ্ধ পদার্থ নয়; ইহারা মহান্ ভাবের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে সম্পৃক্ত হইয়াই কবিপ্রতিভার সাক্ষ্য দেয়।

॥ ৩ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের—এবং আরও কাহারও কাহারও—মতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অপর দোষ—অস্পষ্টতা; কেহ কেহ বলেন—দুর্ব্বোধ্যতা। জনৈক লেখক বলিয়াছিলেন যে, বরং নাটকে রবীন্দ্রনাথের যিনি আদর্শ সেই মেটার-লিংককে বোঝা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না। দুর্ব্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতা এক জিনিষ নহে। কখনও কখনও কবিরা এমন জটিল ও গভীর ভাব প্রকাশ করেন যে তাহা প্রসাদগুণবিশিষ্ট হইতেই পারে না, তাঁহাদের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করিতে গেলে সেই বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সম্পর্কে ব্রাউনিং ও আধুনিক ইংরেজ কবিদের কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইয়েটসের প্রথম পর্ব্বের কবিতা স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল; শেষের দিকের কবিতা দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু আগেকার কবিতা হইতে ইহা কাব্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ—ইহা এখন প্রায় সর্ব্বজনস্বীকৃত। কোন কোন সমালোচক ambiguity বা একাধিক অর্থের সম্ভাব্যতাজনিত বৈচিত্র্যকে কাব্যের উৎকর্ষের নিদর্শন বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, অস্পষ্টতা কাব্যের একটি দোষ। কাব্য বহু ভাব প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু জটিলতা আর অস্পষ্টতা এক বস্তু নয় এবং যদি একাধিক অর্থের সম্ভাব্যতা থাকে তাহা হইলেও যে অর্থটি যখন প্রযুক্ত হইবে তাহা দ্বিধাহীন ভাবেই প্রযোজ্য হওয়া চাই; হয় অন্যান্য অর্থ তখন উত্থাপিত হইবে না অথবা অঙ্গী অর্থের অঙ্গ হইয়াই প্রকাশিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় এই সকল প্রশ্ন অবান্তর। কারণ মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার কবিতায় অস্পষ্টতা বা স্ববিরোধিতা নাই। ইয়েটস্ ও এজরা পৌণ্ড এক সময়ে তাঁহার প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু ইয়েটসের পরিণত বয়সের কবিতা ও পৌণ্ডের কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিকর্ম্মের সাদৃশ্য নাই বলিলেই চলে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার যে অভিযোগ আনা হইয়াছিল তাহার অনেকটাই অযৌক্তিক। তাঁহার কবিতার অভিনবত্বই প্রথম যুগের পাঠকের মনে খটকা জাগাইয়াছিল। যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন, 'নব প্রথার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথে অন্তর্দৃষ্টি **introspection** বড় বেশী; তিনি মনের ভাবগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করেন। একটি মাত্র হৃদয় অথবা এক হৃদয়ের ভাববিশেষ লইয়া তাহাকে এত নাড়িয়া চাড়িয়া উলটিয়া পালটিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করেন যে তাহার কোন ভগ্নাংশেরও দৃষ্টি এড়াইবার যো নাই।' 'সোনার তরী' কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি কটাক্ষ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের গত ১৬ বৎসরের কবিতাগুলি সম্পূর্ণ রূপে নূতন ভাব প্রচার করিতেছে। ...এই ভাবগুলি আমাদের পুরাতন-স্মৃতি-অভ্যস্ত ভাব হইতে ভিন্ন। অনেকের পক্ষেই নূতন।...না বুঝিতে পারিয়া নববাণীর দূতের প্রতি অথবা রবি-ভক্তগণের মধুচক্রে ঢিল ছুড়িলে শুধু "হাসির সমালোচনা" রচনা করা হয়।'

দ্বিজেন্দ্রলাল—এবং আরও কেহ কেহ—শুধু যে বুঝিতে পারেন নাই তাহা নহে; ইঁহারা বোঝার যে মানদণ্ড প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহাই কাব্যবিচারে বেমানান। কাব্য কল্পনার সৃষ্টি; সেই সৃষ্টি অনুভূতির দ্বারা রঞ্জিত। কল্পনার প্রত্যক্ষতা আর ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষতা এক নয়; বুদ্ধি ও অনুভূতির স্পষ্টতার মাপকাঠি বিভিন্ন রকমের। দ্বিজেন্দ্রলাল 'সোনার তরী' কবিতাটির মধ্যে অনেক স্ববিরোধিতা দেখিতে পাইয়াছেন। একখানি ছোটক্ষেতে রাশি রাশি ধান কেমন করিয়া ভরা হইবে? এই ক্ষেতটির চারিদিকে জল; তবে কি ইহা একটি চর? কিন্তু চরে তো ধান হয় না, আর পরিপূর্ণ বর্ষায় তাহা জলেই ডুবিয়া থাকিবে। তরুচ্ছায়া মসীমাখা গ্রামখানির চিত্রও স্ববিরোধী, কারণ 'মেঘে ঢাকা গ্রামে তরুচ্ছায়া হয় না, অন্ততঃ ওপার হইতে তাহা দেখা যায় না।' এই জাতীয় সমালোচনায় কাব্যের ধর্ম্মকেই বিকৃত করিয়া দেওয়া হয়। কাব্যের সমালোচকেরা—কোল্‌রিজ, এলিয়ট প্রভৃতির নাম সহজেই মনে আসিবে—বলিয়া থাকেন যে কাব্যের প্রধান লক্ষণ বিচিত্র, বিরোধী বস্তুর **fusion** বা

সংমিশ্রণ ও একীকরণ। বহু ভাব, বস্তু বা চিত্র যাহা জীবনে অসংলগ্নভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে তাহা এইখানে এক দেহে লীন হইয়া যায়। শুধু বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া এই সংশ্লেষের বিচার করা যায় না। শেলি পশ্চিমা বায়ুকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন :

……there are spread
On the blue surface of thine airy surge,
Like the bright hair uplifted from the head
Of some fierce Maenad,…………
…………………………
The locks of the approaching storm.

জনৈক বুদ্ধিনিষ্ঠ ইংরেজ সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন, কোন স্ত্রীলোক যদি ঝড়ে দৌড়াইতে থাকে, তবে তাহার চুল পিছনেই থাকিবে, মাথার উপর uplifted হইবে না। ইনি হয়তো দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রসমালোচনার তারিফ করিবেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মতে শেক্সপীয়র একজন 'স্পষ্ট' কবি এবং তিনি যে শ্রেষ্ঠ কবি তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির বিচারে যাহাকে স্ববিরোধিতা বা অস্পষ্টতা বলা হয়, শেক্সপীয়রে তাহার যে নজির পাওয়া যায় কোন অক্ষম কবির রচনায় তাহা মিলিবে না। ওথেলো ও ডেস্‌ডিমোনা এক শয্যায় যে রাত্রিতে প্রথম শয়ন করিল, যেদিন প্রকৃতপক্ষে তাহাদের দাম্পত্য-জীবন আরম্ভ হইল তাহার পরের রাত্রিতেই সন্দেহদীর্ণ ওথেলো সহস্রবার ব্যভিচারের অভিযোগে স্ত্রী ডেসডিমোনাকে হত্যা করিল। এই অসঙ্গতির কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা কেহ দিতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের মতে, গুম্ফময়ী গম্ভীরস্বরা নারী হাস্যরসোদ্দীপক কাব্য ছাড়া অন্যত্র অচল। কিন্তু শেক্সপীয়র গুম্ফময়ী ডাইনীদের জন্য জায়গা করিয়া দিয়াছেন; তাহারা কোকিলকণ্ঠী নহে এবং ম্যাক্‌বেথ রূপকও নয়, কমেডিও নয়।

কাব্যে স্পষ্টতা ছবির স্পষ্টতা, অনুভূতির স্পষ্টতা; ইহা বিজ্ঞানসম্মত যথাযথতা নহে। 'সোনার তরী' কবিতাটিতে বহু চিত্রের সমন্বয়ে এক বিশেষ ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। ছবিগুলি বাস্তবজীবনে অসংলগ্ন হইতে পারে, কিন্তু এইখানে তাহা সুসংলগ্নতা লাভ করিয়াছে, কারণ কল্পনায় বিচ্ছিন্ন বস্তু এক হইতে পারে। তরুচ্ছায়া মসীমাখা গ্রাম সবাই দেখিয়াছেন আবার মেঘে

ঢাকা গ্রামও অজানা নয়। এই সব বিচ্ছিন্ন ছবি কবির বিশিষ্ট অনুভবের সংযোগে এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার অধিক স্পষ্টতা বা সুনির্দিষ্ট অর্থ দাবি করা কাব্যের প্রতি অবিচার। কৃষকটির নিগূঢ় ব্যঞ্জনা কি, তাহার সোনার ধান কিসের প্রতীক, নেয়ে কি ভগবান্ না নিরবধি কাল, না নিষ্করুণ জোতদার তাহা কবিতার তাৎপর্য্যের পক্ষে অবান্তর। এই সব ব্যাখ্যা যে একেবারে অগ্রাহ্য তাহা বলি না, কিন্তু ইহারা করোলারি বা অনুসিদ্ধান্ত। মূল যে ভাবটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট, সংহত এবং সেইখানেই কাব্যের সমাপ্তি; তারপর বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা প্রযুক্ত হইতেও পারে নাও হইতে পারে। হ্যামলেট নাটকের নানা বিরোধী নৈতিক, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়াছে, কিন্তু কেহ বলিবে না যে হ্যামলেট অস্পষ্ট। কেবল দেখিতে হইবে এই সকল অনুসিদ্ধান্ত কাব্যের চিত্র ও ভাষার দ্বারা সমর্থন করা যায় কিনা। যে অস্পষ্টতার অভিযোগ আমরা আনয়ন করি তাহার উৎস আমাদের মনে, কবিতায় নয়। 'কাব্যগ্রন্থ' সম্পাদনকালে ভূমিকায় মোহিতচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, 'বুদ্ধির দ্বারা তাহাদের (রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতার) অর্থ ছাঁকিয়া বাহির করা এক প্রকার দুঃসাধ্য'—আমরা বলিব নিষ্প্রয়োজন—'সোনার তরী'র উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি কে ? হৃদয়-যমুনায় কাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে ? এসব প্রশ্ন আমরা বৃথা জিজ্ঞাসা করি। অথচ এই দুইটি কবিতাতে হৃদয়ের যে ভাবটি প্রকাশিত তাহা কত পরিষ্কার, যে বেদনা ধ্বনিত হইয়াছে তাহা কত সুস্পষ্ট।'

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার সমালোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা নয়। তবু একটি কথা না বলিলে প্রসঙ্গটি অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। রবীন্দ্রকাব্যে কোথাও কোথাও অস্পষ্টতা না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহা ভাবের ও তাহার অভিব্যক্তির অস্পষ্টতা বা অসংলগ্নতা। দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 'আবির্ভাব' কবিতায় যাঁহাকে আবাহন করা হইতেছে প্রথমে মনে হয় তিনি নায়িকা :

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল। ইত্যাদি

কিন্তু পরে মনে হয় তিনি নায়ক :

কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ ?

তোমার যোগ্য করি নাই সাজ,
বাসর-ঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য-বিরচন ;
এ কি রূপে দিলে দরশন !

এইখানে বিভিন্ন চিত্র বা ভাবের সমন্বয় হয় নাই। 'রক্তকরবী' রূপক-নাট্য। ইহার মধ্যে রাজা ও নন্দিনীর বৈপরীত্য স্পষ্ট হইয়াছে; তাহাই নাটকের প্রধান কথা। কিন্তু যে রঞ্জনকে আমরা জীবিত অবস্থায় দেখি না সে নাটকে তাহার যোগ্য জায়গা করিয়া লইতে পারে নাই। বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে রাজার মল্লযুদ্ধের তাৎপর্য্য স্পষ্ট হয় নাই। এই প্রশ্ন এড়াইতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় এক চিঠিতে বলিয়াছিলেন যে, শেক্সপীয়রের নাটকের চরিত্রসমূহের মত এই নাটকের চরিত্রগুলিকেও ব্যক্তি হিসাবেই বিচার করা উচিত। কিন্তু সেই ভাবে এই নাটকের বিচার করা সম্ভব নয় এবং সেইরূপ বিচার করিতে গেলে অন্ততঃ রঞ্জন আরও বেশি অস্পষ্ট হইয়া পড়িবে। তবে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে এই সকল অস্পষ্টতা আকস্মিক এবং কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল, যে অর্থে পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যই স্পষ্ট ও অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রাঞ্জল।

॥ ৪ ॥

রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ ইহার মধ্যে বস্তুতন্ত্রতার অভাব। এই অভিযোগের প্রধান প্রবক্তা বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁহার মতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান লক্ষণ **subjective individualism** বা অন্তর্মুখীনতা; বস্তুজগতের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ নাই। তাই অনুভূতির বিস্তৃতিতে ও অনুভাব্য বিষয়ের বিচিত্রতাতে তিনি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু রসানুভূতির গভীরতা ও বাস্তবতায় তিনি বৈষ্ণব কবিদিগের অপেক্ষা হীন। এই বাস্তবতার অভাবের কারণ অন্তর্মুখীন কবির মনে অহংভাবের প্রাধান্য। অন্তর্মুখীন প্রতিভা সত্যের একদেশ মাত্র প্রত্যক্ষ করে; ফলে ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই প্রামাণ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং অনুভূতিই সত্যের আসন অধিকার করে। এই জন্যই বহির্বিশ্বের তাড়নায়, অভিনব অবস্থার বা অভিজ্ঞতার আঘাতে তাঁহার মনগড়া জগৎ ক্ষণে ক্ষণে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া

যায় ; বস্তুসংস্পর্শে কল্পিত মায়াজগৎ মায়াপুরীর ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যায়। বিপিনচন্দ্র মনে করেন যে, পল্লীজীবনের সংস্পর্শে আসিয়াও এই অন্তর্মুখীনতার জন্যই কবি পল্লীসমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এই অক্ষমতার জন্য রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সৃষ্টিই অ-বাস্তব, মায়িক ; কল্পনার উর্ণনাভ আপনার ভিতর হইতেই তন্তু বাহির করিয়া জাল বিস্তার করিয়াছে। শুধু যেখানে এই সৃষ্টি বাহিরের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেইখানে ইহা বস্তুনিষ্ঠ হইয়াছে—যেমন 'গোরা'র পানুবাবু বা ঐরূপ গুটি কয়েক চরিত্রে। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা ও পরবর্ত্তী যুগের বিশ্বপ্রেমও মায়ার ইন্দ্রজাল। বিপিনচন্দ্রের মতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য আনন্দ দেয়, কিন্তু তৃপ্তি দিতে পারে না।

চিত্তরঞ্জন দাশও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিরুদ্ধে অ-বাস্তবতার অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতা—যেমন, 'শিশু'র 'জন্ম-কথা'—শুধু অস্বাভাবিক নয়, বিজাতীয় প্রেরণার পরিচায়ক। এই সব কবিতায় বুদ্ধির খেলা দেখা যায়, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতির কবিতায় যে বাঙ্গালীসুলভ মধুররস বা বাৎসল্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে তাহার একান্ত অভাব। 'দেশভেদে যেমন চেহারার পার্থক্য আছে, তেমনি কবিতারও আছে।' এই মতকেই বিস্তারিত যুক্তিসহ উপস্থাপিত করিয়াছেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'সাহিত্যে বাস্তবতা' নামক প্রবন্ধে।* (সবুজপত্র—মাঘ ১৩২১) রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মনে করেন, শুধু যে কবিতার ভিত্তিই বাস্তব অভিজ্ঞতায় তাহা নহে, ইহা দেশকাল-অনালিঙ্গিত নয়, অর্থাৎ কোন দেশে কোন সময়ে সমাজের যে অবস্থা থাকে, সেখানে যে চিন্তা সমাজমনকে দোলা দেয় তাহার উপরে ভিত্তি করিয়াই কবি সমাজের কাছে নূতন আদর্শ উপস্থাপিত করেন। অর্থাৎ সাহিত্যিক আদর্শবাদী বটেই, তবে তাঁহার আদর্শবাদ জাতির ধর্ম্ম ও যুগের ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত থাকিবে। ইহাই বাস্তবতা ; ইহার পরিচয় পাওয়া যায় বার্ণার্ড শ'য়ের নাটকে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ইহার সন্ধান মিলে না।

বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধের উত্তর দিয়াছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী এবং প্রমথ চৌধুরী রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগের উত্তর দিতে যাইয়া সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চাহিয়াছেন। অজিত চক্রবর্ত্তীর

*'বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অ-বাস্তবতা সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়াছে।

মতের আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। এইখানে বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির অভিযোগের বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে হইবে। বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রসানুভূতির বিস্তৃতি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি মনে করেন এই কাব্যে বৈষ্ণব কবিতার গভীরতা নাই, কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অন্তর্ম্মুখী, তিনি বৈষ্ণব কবিদের মত মোহান্তগুরুর চর্চ্চা বা সেবা করেন নাই। বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণব সাধনার যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা কাব্যব্যাপারে অপ্রাসঙ্গিক। বৈষ্ণব কবিতায় প্রেমের বর্ণনা যে খুব গভীর ও তীব্র তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা গভীরতায় তদপেক্ষা নিকৃষ্ট এই মত রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠক নাও মানিতে পারেন। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় প্রগাঢ়তা ও তীব্রতার প্রধান কারণ ইহার অন্তর্ম্মুখীনতা এবং ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির অভাব। ঘন পদার্থ তরল হইলেই বিস্তারিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। বৈষ্ণব কবিতায় যে প্রেমের চিত্র পাই তাহার সঙ্গে সামাজিক প্রেমের বা সমাজমনের কোন সম্পর্ক নাই; ইহা কবির নিঃসঙ্গ অনুভূতির প্রকাশ। ইহার ভাষা কোন কালের প্রচলিত ভাষা নহে; ইহার ভাব দেশকাল-অনালিঙ্গিত। ইহার সঙ্গে বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে। কিন্তু তাহা প্রথমতঃ কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং সেই অনুভূতিই কবিপ্রতিভাবলে সার্ব্বজনীনতা লাভ করিয়াছে।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কবির নিকট হইতে দেশধর্ম্ম ও কালধর্ম্মের প্রতি অনুরক্তি দাবি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে প্রেরণা পাইয়াছেন ইউরোপীয় রিয়ালিজ্‌ম্‌ হইতে। ইউরোপীয় বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীতে বাস্তবজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকে; ইহাই প্রধান উপাদান ও উদ্দেশ্য—এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি জোলা। এই ধরণের বস্তু-তন্ত্রতা যে রবীন্দ্রনাথে নাই, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আর এক ধরণের রিয়ালিজ্‌ম্‌ দেখিতে পাওয়া যায় বার্ণার্ড শ'য়ের নাটকে। এখানে সমাজের বাস্তবচিত্র আঁকার কোন চেষ্টা করা হয় নাই; বার্ণার্ড শ' দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন ধনীর জীবনের চিত্রের মাধ্যমে। শ'য়ের নাটকের উপজীব্য বর্ত্তমান কালের সমস্যা; সেই হিসাবে তিনি বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের শিরোমণি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আধুনিক কালের সমস্যা কিছু কিছু যে প্রবেশ না করিয়াছে এমন নয়; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা প্রাধান্য পায় নাই। সুতরাং তিনি এই শ্রেণীর বস্তুতান্ত্রিকও নহেন। কিন্তু তাই

বলিয়া ইহা মনে করিলে ভুল হইবে তাঁহার সাহিত্যের বাস্তব ভিত্তি নাই। প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছেন, যে কবির হাতে বাংলার মাটি এবং বাংলার জল পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহার কাব্যে যে বস্তুতন্ত্রতা নাই তাহা কোন সমালোচক সজ্ঞানে বলিতে পারিবেন না। ('বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি') এই যুক্তি অকাট্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যেখানে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেইখানেও তাঁহার কাব্যের চিত্র দেশের চিত্র, পল্লীগ্রামের চিত্র। 'সোনার তরী' কবিতাটির কথাই বলা যাইতে পারে। এখানে হেমন্তের ধান ও শ্রাবণের বরষা এবং রৌদ্রনিক্ষিপ্ত তরুচ্ছায়া ও মেঘে ঢাকা আকাশের সমন্বয় করিয়া কবি পুর্ব্ব বাংলার গ্রামের ছবি আঁকিয়াছেন।

বিপিনচন্দ্র অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা 'মায়িক'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সঙ্গীত যে স্বদেশী আমল হইতেই প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে তাহা যাঁহার কান আছে তিনিই স্বীকার করিবেন। ইহাও মানিতে হইবে যে, যদি রবীন্দ্রনাথের রসানুভূতি বাস্তবতার সংস্পর্শশূন্য হইত তাহা হইলে স্বাধীন ভারতে তাঁহারই একটি গান জাতীয় সঙ্গীত রূপে নির্ব্বাচিত হইত না।

প্রমথ চৌধুরী ঠিকই বলিয়াছেন, 'অর্থহীন বস্তু কিংবা পদার্থহীন ভাব এ দুয়ের কোনোটাই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয়।' বাস্তবিক পক্ষে, কেমন করিয়া কোন কাব্যে বস্তুর চিত্র অ-লৌকিক অর্থের দ্যোতনা দেয় তাহাই সাহিত্যবিচারে মূল প্রশ্ন। রবীন্দ্ররচনা হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটাকে স্পষ্ট করা যাইতে পারে। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পে যে ছবিটি আছে তাহা একান্তভাবে বাংলার পল্লীগ্রামের ছবি এবং পোষ্টমাষ্টার ও রতন পল্লীগ্রামের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার যে করুণ পরিণতি হইল তাহা অপার্থিব অর্থাৎ সাধারণতঃ যে সম্পর্ক দেখা যায় তাহা হইতে উর্দ্ধায়িত। আলংকারিকের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, এইখানে বাস্তব ভিত্তির উপরেই অ-লৌকিক ব্যঙ্গ্যরস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন রচনার বাস্তব ভিত্তি শিথিল। সাধারণতঃ সমস্যামূলক কাহিনীতে এই অক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'রক্ত-করবী'তে রাজা-রঞ্জনের সংঘর্ষ অবাস্তব—রূপে এবং রূপকে উভয়তঃ। প্রসঙ্গান্তরে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই অপরিণতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

করিয়াছেন। ইবসেনী ঢঙে রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীর পত্র' লিখিয়াছিলেন; ললিতকুমার তাঁহার জবাব দিয়াছিলেন 'ভর্ত্তার উত্তর' নামক রসরচনায়। তাঁহার 'অচলায়তন' নাটকের সমালোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ললিতকুমার রবীন্দ্রনাথের সমস্যামূলক নাটকের একটি মৌলিক ত্রুটির উপর অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রতিপক্ষের একটা বিকৃত চিত্র উত্থাপিত হয় এবং সেই কারণে তিনি যাহাদিগকে নায়ক করেন তাহাদের চিত্রও অপূর্ণাঙ্গ হইয়া পড়ে। মহাপঞ্চক আচার-নিষ্ঠার উপযুক্ত রূপক নহেন। যাহারা তাসের খেলা দেখায় তাহারা কেহ কেহ আগেই তাস এমন ভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া লয় যে অভীষ্ট দান আপনিই পড়ে, যে তাস তাহারা বাহিরে আনিতে চায় তাহা আপনিই বাহিরে আসিয়া পড়ে। ললিতকুমার এই কথাটাই অন্য ভাবে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ধর্ম্মের বিশুদ্ধ অংশকে তাহার ক্লেদাক্ত অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিশুদ্ধ অংশও পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি পায় নাই। কবি আচার হইতে মুক্তিকে বিভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মুক্তির চিত্রও খণ্ডিত হইয়াছে: 'যেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার বলে দাদাঠাকুরের সঙ্গে আচার্য্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারবেন সেদিন আমাদের সব দুঃখ ঘুচবে।'*

॥ ৫ ॥

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচনায় যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহারা সবাই তাঁহার সমসাময়িক—অনেকেই তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ। কিন্তু অতি তরুণ বয়সে তিনি যখন সাহিত্যরঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তখন সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ষীয়ান্ সাহিত্যিকেরা অনেকেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন। যে কবি সম্পূর্ণ নূতন ভাব ও ভাষার সম্ভার লইয়া উপস্থিত অথচ যাঁহার ভাব ও ভাষা পরিণতি লাভ করে নাই তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ইঁহারা শুধু মানসিক ঔদার্য্যের পরিচয় দেন নাই, কবিপ্রতিভা চিনিয়া লইবার ক্ষমতাও প্রমাণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও এগার বছরের বড়—তিনি মাইকেলের সহাধ্যায়ী ও সুহৃদ্। তিনি 'প্রভাতসংগীত' কাব্যগ্রন্থে আর্য্যপ্রতিভার স্বাক্ষর দেখিতে পাইয়াছিলেন।

*ললিতকুমারের প্রবন্ধের আলোচনা করিতে যাইয়া অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'অচলায়তন' সম্পর্কে বলিয়াছেন, ইহাতে 'আছে কেবল—একরূপ বিকৃত হিন্দুয়ানির উপর নপুংসকের নৃত্য।'

তাঁহারও আগে কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকা 'উদীয়মান কবি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কবি-কাহিনীকে' বাংলা ভাষার নূতন একখানি আভরণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকায় অপূর্ব্ব ও অসাধারণ নূতনত্ব দেখিতে পাইয়াছিল। 'পঞ্চানন্দ' ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম অভিনয় দেখিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। এইখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁহার প্রাথমিক কাব্য সম্পর্কে কুণ্ঠা বোধ করিতেন ; তিনি প্রথম জীবনের কবিতাসমূহ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, ইহারা 'কেবল পরিত্যক্ত নদীপথের নুড়িগুলির মত পথের ইতিহাস নির্দ্দেশ করিবে কিন্তু রসধারাকে রক্ষা করিবে না।' এই কারণেও প্রাচীন সমালোচকদের স্বীকৃতি সমধিক তাৎপর্য্যময় হইয়াছে। এই জাতীয় আরও দুইটি সমালোচনার উল্লেখ করিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের প্যারডি লিখিয়া কুখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের চেয়ে এগার বছরের বড় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী এই গ্রন্থের সমালোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, 'ভাষার কমনীয়তায়, ভাবের উচ্ছ্বাসে, চিন্তার গভীরতায় ইনি সকলের শ্রেষ্ঠ।' বিপিনচন্দ্র পাল অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার বহু পূর্ব্বে প্রাচীন চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছিলেন, ' "ক্ষণিকা"য় বঙ্গের পল্লীজীবনের, পল্লীপ্রকৃতির যে অনির্ব্বচনীয় সৌরভ পাইলাম তাহাতে আমি পল্লীপ্রিয়—পাড়াগেঁয়ে—মুগ্ধ হইয়াছি।' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁহার প্রথম ও প্রধান কথা—'রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।'

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হয় ; সেই সময় বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছিলেন, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনীষীদের আলোচনা করিবার সময় টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া আলোচনা না করিয়া সমগ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। উপরে যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা সেই চেষ্টা করেন নাই ; বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রপ্রতিভার অপূর্ণতার প্রতিই অঙ্গুলি-সংকেত করিয়াছেন, তিনিও ইহার সামগ্রিক বিচার করেন নাই। ক্রমে ক্রমে এই দিকে সমালোচকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সামগ্রিক—সামগ্রিক না হইলেও ব্যাপক—আলোচনার উদ্দেশ্য লইয়া যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এডোয়ার্ড টমসনের ***Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist*** গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সমালোচনাগ্রন্থ শুধু যে ইংরেজিতে

লিখিত তাই নয়, বাংলা সমালোচনাধারায় ইহার জন্য জায়গা করা সম্ভব নয়; ইহা ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বা শ্রীঅরবিন্দ লিখিত ইংরেজি সমালোচনাগ্রন্থ হইতে মূলতঃ বিভিন্ন। সুতরাং এই গ্রন্থের আলোচনা করার লোভ সংবরণ করিতে হইল। রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তীদের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রসাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের তিন জনের কথা এখানে উল্লেখ করা হইবে—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ও মোহিতলাল মজুমদার। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রথম সংকলনগ্রন্থ—'চয়নিকা'-সম্পাদনে যুক্ত ছিলেন এবং ইঁহারা রবীন্দ্রভক্তদের অগ্রণী। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ লিখেন এবং শেষ বয়সে 'রবি-রশ্মি' গ্রন্থে সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের—কবিতা ও কাব্যধর্ম্মী নাটকের—পরিক্রমা করেন। কবির পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে অজিতকুমার 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ লিখেন এবং পরে তাঁহার আরও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ 'কাব্যপরিক্রমা' শিরোনামায় একত্রিত হয়। মোহিতলাল মজুমদার এই গোষ্ঠির লোক নহেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় বুঝা যায় না। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অপূর্ণতা দেখাইলেও বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার সমালোচনাও অনুরাগী পাঠকের সপ্রশংস আলোচনা। তিনি কতকগুলি প্রবন্ধে 'রবি-প্রদক্ষিণ' করিয়াছেন এবং দুইখানি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে চাহিয়াছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য, কালানুক্রমের সামান্য ব্যত্যয় করিয়াও, প্রথমে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের, তারপর মোহিতলালের এবং সর্ব্বশেষে অজিত চক্রবর্ত্তীর রবীন্দ্রসমালোচনার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের রচনার সাহায্যেই রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কোন একটি কবিতার তাৎপর্য্য বুঝাইতে যাইয়া তিনি দেখাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ বক্ষ্যমাণ বিষয়ে অন্যত্র কি বলিয়াছেন এবং সেই সকল মন্তব্য আলোচ্য কবিতার উপর কি ভাবে আলোকসম্পাত করে। এই হিসাবে তাঁহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রবীন্দ্রকাব্যপাঠে সাহায্য করে, কিন্তু ইহা ছাড়া চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার কোন সার্থকতা নাই। তিনি বোধ হয় পরীক্ষার্থী-ছাত্রদের কথা মনে করিয়াই অধিকাংশ কবিতার সারসংকলন বা গদ্যরূপ দিয়াছেন; ইহার মধ্যে প্রায় কোথাও রবীন্দ্রপ্রতিভার অভ্যন্তরে প্রবেশের পরিচয় নাই। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়াই তিনি রবীন্দ্রকাব্যের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে

একটি বিশেষ সুরের সন্ধান করিয়াছেন ; সেই সুর হইল সীমার মধ্যে অসীমের, বিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষের, রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধির জন্য অধীরতার সুর। এই ভাবটি কোথায় কোথায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহা তিনি কাব্যের বিষয়বস্তুর সারাংশের সাহায্যে ও প্রচুর উদ্ধৃতির সমর্থনযোগে দেখাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ইহা সমালোচনা নহে। রসবেত্তা সমালোচক কবিতার **paraphrase** বা গদ্য প্রতিরূপ দিতে পারেন, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া কবির অনুভূতি ও চিন্তার সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য ও ভাষার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হওয়া চাই। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার কোনটিই করেন নাই। তিনি রবীন্দ্রকাব্যের কেন্দ্রস্থ ভাবের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা খুবই ভাসা-ভাসা রকমের এবং প্রকাশের বৈচিত্র্যান্বেষণ প্রশস্তিবাক্যের প্রাচুর্য্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। একটি নমুনা দিলেই এই জাতীয় আলোচনার স্বরূপ বোঝা যাইবে। 'পূরবী'-কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দিতে যাইয়া সমালোচক বলিয়াছেন, '......তাঁহার মনের এক দুর্নিবার গতিবেগ—"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনো খানে!" এই চলার বেগে কবি যেন মহোরগের ন্যায় জীবনের পর্যায়ে পর্যায়ে খোলস বদল করিয়া চলিয়াছেন ; বিচিত্র ধরণের বা স্টাইলের কবিতা তিনি পরে পরে লিখিয়া আসিয়াছেন।' স্টাইলের মাহাত্ম্য বা খোলসের বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোথাও কোন বিশ্লেষণ বা আলোচনা নাই।

আর একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া এই জাতীয় আলোচনার ব্যর্থতা দেখান যাইতে পারে। আধুনিক কালের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বের্গসঁ ; তাঁহার দর্শনকে বলা হয় **Philosophy of Change** বা গতিবাদ। যেখানে যেখানে দ্রুত বা অবিশ্রান্ত গতির কথা উঠে, সেইখানেই আমরা বের্গসঁ দর্শনের কথা ভাবি। জনৈক বাঙ্গালী গল্পকার তো মটরগাড়ির দ্রুতগতির মধ্যে **Bergsonism** দেখিতে পাইয়াছিলেন! রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সর্ব্বত্র এবং বিশেষ করিয়া 'বলাকা'য় অশান্ত গতির কথা আছে। এই জন্য শিশির কুমার মৈত্র, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 'বলাকা' ও বের্গসঁ দর্শনের সাদৃশ্য ও তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই জাতীয় আলোচনা তিন পথে ফলপ্রসূ হইতে পারে। বের্গসঁ যে শুধু দার্শনিক ছিলেন তাহাই নহে, তাঁহার কল্পনাও খুব সমৃদ্ধ ছিল। অনুবাদের মধ্য দিয়াও তাঁহার ভাষার ঐশ্বর্য্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কবি ও দার্শনিকের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সাহিত্যরসসমৃদ্ধ দর্শন ও দার্শনিকচিন্তাপ্রণোদিত কাব্যের মধ্যে তুলনা করা

যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও বের্গস'র চিন্তা—ইঁহাদের কল্পনাসমৃদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু এই একটি বিষয়েরই আলোচনা করিয়া উভয়ের মননবৈচিত্র্যের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। অথবা ইহাও দেখা যাইতে পারে, কেমন করিয়া দর্শনের একটি অমূর্ত্ত ভাবকে গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বিচিত্র কাব্যরূপ দান করিয়াছেন। এই সব সমালোচকেরা ইহাদের কোনটিই করেন নাই। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় তো শুধু ভাসা ভাসা সাদৃশ্য দেখাইয়া রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করিয়া কবির প্রশস্তি করিয়াছেন এবং নিজে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বের্গস'র মতে, অতীতের অবিরত প্রবাহ নিরবচ্ছেদে ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবেশ করিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। 'এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ কবিত্বময় ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।' তারপর তিনি 'চঞ্চলা' কবিতাটির নীরস গদ্য প্রতিরূপ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বময়তা কোথায় তাহার কোন ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নাই। 'ছবি' কবিতা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, 'বের্গসঁর প্রধান কথা এই যে গতির ভিতরেই সত্যকে খুঁজিতে হইবে, নিস্তব্ধতার মধ্যে সত্য নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন যে—**intellectual concept**-এর মধ্যে সত্যকে পাওয়া অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথও দেখাইয়াছেন যে—একদিকে আছে সত্য, অপরদিকে আছে কেবল ছবি—একটা **intellectual concept** মাত্র…।' রবীন্দ্রনাথ কি এই কবিতায় ছবিকে কোথাও **intellectual concept** বলিয়াছেন? ছবিকে এই ভাবে বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মর্ম্মকথা অস্পষ্ট হইবে আর এই জাতীয় আলোচনায় বের্গসঁ-প্রস্তাবিত **intellect-intuition**-এর বৈপরীত্যের কোন পরিচয় মিলিবে না। এই ভাবে তুলনা করা অপেক্ষা বের্গসঁ প্রসঙ্গ না তুলিলেই বরং কবিতাটি সহজবোধ্য হইবে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মতের সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বলিয়াছেন, 'বের্গসঁর গতি কেবল অফুরন্ত চলা মাত্র; তাহা কোন লক্ষ্যদ্বারা নির্দিষ্ট নহে, কোন আনন্দদ্বারা অনুপ্রাণিত নহে। এইখানে বের্গসঁ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব—কবি কেবল গতিতেই তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই; তিনি আনন্দরসের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছেন। বের্গসঁ জীবনের মধ্যে কেবল গতি দেখিয়াছেন, তিনি অসীমের সহিত জীবনের কোন যোগ দেখিতে পান নাই...।' বের্গসঁ যে দর্শন উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অসীমতাবোধ বা আনন্দরসের কোন স্থান নাই, কিন্তু তাহাও আধ্যাত্মিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও অনন্তের সন্ধানী। কেহ বলিতে পারেন যে, বের্গসঁ যেরূপ

ভাবে বিবর্ত্তনবাদকে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় তদনুরূপ কিছু নাই। এই জাতীয় সস্তা তুলনায় রবীন্দ্রনাথ বা বের্গসঁ কাহারও ভাবনা বা সৃষ্টির উপর আলোকসম্পাত করা যায় না।

কাব্যবিচারে মোহিতলাল প্রচলিত রীতি অনুসরণ করেন নাই; তিনি ভারতীয় বা ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের চর্য্যা বা ডিসিপ্লিনকে মানেন না। 'রবি-প্রদক্ষিণ' গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'অতি-আধুনিক সস্তা পাণ্ডিত্য অর্থাৎ কেবলমাত্র কয়েকখানা ইংরেজী সমালোচনা পুঁথির বুলি মাত্র সম্বল করিয়া, এবং **Bernard Shaw** ও **Bertrand Russel** [?]-এর ধ্বজা উঁচাইয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনার অথরিটি হওয়া যাইবে না—আমাদের ঐ মহাবিদ্যাপীঠের গিল্‌ট করা মেডাল, কিম্বা ততোধিক মূল্যবান পি-আর-এস্, পি-এইচ্-ডির উপাধি গৌরব সত্ত্বেও।' [ইংরেজী সাহিত্য সমালোচনায় **Bertrand Russell**-এর ধ্বজাটি কি তাহা বোঝা গেল না।] তিনি ইহাও বলিয়াছেন, 'এ যুগেও কেহ কেহ যে ভাবে কাব্য-জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাকে, কাব্যপরিমিতি কেন কাব্য-জ্যামিতিও বলা চলে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সূত্র অনুসারে তাঁহারা যেভাবে রবীন্দ্র-কাব্যের রস-প্রমাণে যত্নবান্ হইয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়—শুধু রবীন্দ্রসাহিত্য নয়, সকল আধুনিক সাহিত্যের রসাস্বাদে তাঁহারা পরাঙ্মুখ।' (পৃঃ ১৭) এই জাতীয় ঘোষণা পড়িয়া প্রথমেই মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ বিদায়' প্রহসনের ঘনরামের কথা: 'দেখাইব। পৃথিবীতে অজ্ঞতার বল।' কিন্তু ইহাও ঠিক নহে, মোহিতলাল বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের সুষ্ঠু সমালোচনা করিতে হইলে, 'প্রাচীন সংস্কৃত, মধ্যযুগের বাংলা ও আধুনিক পাশ্চাত্য—বিশেষ করিয়া—ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে পদ্মলগ্ন ভ্রমরের মত প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইবে।' পাশ্চাত্ত্য ও বিশেষ করিয়া ইংরেজী সাহিত্যের কথা কেন বলিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। কারণ তাঁহার মতে 'বন্দেমাতরম্' মহামন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রেরণা বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন আর রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রকৃতি খাঁটি ভারতীয়। মোহিতলাল বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 'যে কল্পনা-ভঙ্গি আছে তাহা ভারতীয় কাব্য-পন্থার অনুগত না হইলেও ভারতীয় সাধনার আদর্শে অনুপ্রাণিত।......রবীন্দ্রনাথের ভাবমন্ত্র সম্পূর্ণ ভারতীয়; য়ুরোপীয় কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রবীন্দ্রনাথের আত্মসাধনায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভারতীয় ভাবপন্থা য়ুরোপীয় কাব্যপন্থায়

মিলিত হইয়াছে—এই গূঢ় মিলনের তাৎপর্য্য না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় মিলিবে না।' (পৃঃ ৪, ৫) এই তাৎপর্য্য বাস্তবিকই খুব 'গূঢ়', কারণ দেখা যাইতেছে যে, কল্পনা-ভঙ্গি ও কাব্যপন্থা বিভিন্ন ব্যাপার এবং ভাবপন্থা ও কাব্যপন্থাও এক বস্তু নহে।

যাহা হউক, পদ্মলগ্ন ভ্রমরের মত মোহিতলাল ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে যে মধু আহরণ ও পরিবেশন করিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়া পাঠক খুব অস্বস্তি বোধ করিবেন। তিনি একাধিকবার ইংরেজ কবি-সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ডের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উল্লেখ ও উদ্ধৃতিতে আর্ণল্ডের মন্তব্য ও আলোচ্য প্রসঙ্গ ঝাপ্‌সা হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার তুলনাগুলিও বিভ্রান্তিকর। ফ্র্যান্‌সিস্ টমসনের The Hound of Heaven-কবিতায় দেখিতে পাই ঈশ্বর প্রেমবশতঃ শিকারী সারমেয়ের মত মানবাত্মাকে অনুসরণ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাহুর প্রেম' ভিন্ন ধরণের কবিতা। ইহা মোহিতলাল স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি ইহাদের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন। আর একটি তুলনা আরও বেশি উদ্ভট। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' অশ্লীল কিনা ইহা লইয়া আলোচনা হইয়াছে—মোহিতলাল অবশ্য মনে করেন ইহাতে অশ্লীলতা নাই, দুর্নীতি আছে!—কিন্তু ইহার অর্থ স্পষ্ট। এই কাব্যে সম্ভোগের ঐশ্বর্য্যবান্ বর্ণনা আছে এবং সম্ভোগের শেষে চিত্রাঙ্গদা গৃহিণীর দায়িত্ব ও কঠিন বন্ধন সগৌরবে গ্রহণ করিয়াছে। ইব্‌সেনের A Doll's House নাটক বিবাহবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নাটক; নোরা যে স্বামীর গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল ইহা আধুনিক সাহিত্যে ও জগতে নারী-বিদ্রোহের প্রতীক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু মোহিতলাল নোরা ও চিত্রাঙ্গদার মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছেন—উভয়তঃ 'আমি, আমি, আমি।' (রবি-প্রদক্ষিণ—পৃঃ ৮২)।

মোহিতলাল প্রাচীন ভারতীয় ও (নব্য) ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের পন্থা অনুসরণ করেন নাই। কিন্তু তিনি ভাব, রস প্রভৃতি সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সকল শব্দ তিনি কি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার সংজ্ঞা দেন নাই। অথচ ইহাই ছিল তাঁহার প্রাথমিক কর্ত্তব্য। এই সংজ্ঞার অভাবে তাঁহার সমালোচনা অর্থহীন হেঁয়ালীর মত শোনায়। তিনি কয়েকটি নূতন রসের নামকরণ করিয়াছেন—বিস্ময় রস, মিষ্টিক রস, তত্ত্বরস, ভাবরস। ইহাদের মধ্যে মাত্র প্রথমটি বুঝিতে পারা যায়; শুধু

বিস্ময়কে স্থায়িভাব না বলিয়া রস বলিতেছেন। অন্য অনেক স্থলেও 'রস' শব্দের তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন—রসসৃষ্টি, রসদৃষ্টি, রসসাধনা, রসসংবেদনা, রসসত্য, রসচৈতন্য, রসকল্পনা, (কাব্যকলার) রসাবেশ; তারপর, ভাবকল্পনা, ভাবরূপ, ভাবচিন্তা, ভাববন্ধ, ভাবসিদ্ধি, ভাবতন্ত্র, ভাবমুক্তি, কাব্যকল্পনা, (শেক্সপীয়রের) বাস্তবজয়ী বস্তু-কল্পনা! তিনি একই কবিতার ভাব, রস, কল্পনা ও প্রেরণার কথা বলিয়াছেন; ইহার কোন্‌টি কাব্যের কি জাতীয় উপাদান তাহা বলেন নাই। একবার (রবি-প্রদক্ষিণ—পৃঃ ৭) কল্পনার সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই সংজ্ঞা কোলরিজ-উত্তর ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের **imagination**-এর মামুলী সংজ্ঞা, কিন্তু তাহার পরই বলিয়াছেন, কল্পনার সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে এখনও গোল আছে এবং ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'কাব্যসৃষ্টিতে কবির যে ভাবদৃষ্টি সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানমূলক সুন্দরবোধের সাহায্যে এই জগৎ ও জীবনের রস-রূপ আবিষ্কার করে, রস-বাদী তাহাকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।' এই ব্যাখ্যায় কল্পনা ব্যাপারটি আরও ঘোরালো হইয়া গেল। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের কল্পনার বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, ইহা 'শুধু লিরিকধর্ম্মী নয়; তাঁহার সেই রসসৃষ্টি আরও গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টির ফল; সে দৃষ্টিতে জীবনের নিয়তি-কঠিন নাটকীয় শক্তিরূপের পরিবর্ত্তে, নিয়তি-নিয়মহীন আত্মস্ফূর্ত্তির লিরিকরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।' (পৃঃ ২৯) বাক্যের প্রথমাংশের সঙ্গে শেষাংশের সামঞ্জস্য করা কঠিন, মধ্যস্থ অংশের তাৎপর্য্য আরও দুরবগাহ।

মোহিতলাল যখন তত্ত্ব ছাড়িয়া কোন বিশেষ কবিতার ব্যাখ্যায় অবতরণ করেন তখনও তাঁহার আলোচনায় সেই অস্পষ্টতা, সেই দুর্ব্বোধ্যতা ও সেই বাগাড়ম্বর দেখা যায়। 'অহল্যার প্রতি', 'উর্ব্বশী', 'সোনার তরী' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিতার যে ব্যাখ্যা মোহিতলাল দিয়াছেন তাহা অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য; অনেক চেষ্টা করিলে যে অর্থের ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায় তাহা অর্থহীন। 'অহল্যার প্রতি' হেলেনীয়ও বটে আবার রোমাণ্টিকও বটে; এই দুইটি বস্তু কি তাহা বিশৃঙ্খলবাক্ লেখক বলেন নাই। টম্‌সন্-কৃত সমালোচনার সঙ্গে মোহিতলালের সমালোচনার তুলনা করিলে মননশীল সমালোচনা ও শব্দের জাল বোনার পার্থক্য স্পষ্ট হইবে। 'উর্ব্বশী' কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নারীরূপের অধ্যাস, নারীর 'অনন্ত যৌবনা [?] রূপ', অতিরিক্ত **idealize** করান কাব্যকল্পনা, তজ্জনিত ভাববিরোধ—ইত্যাদি ব্যাখ্যার দ্বারা যে

কুহেলিকার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মধ্যে আলোকার্থী পাঠক দিশাহারা হইয়া যাইবেন। ইহা একটা 'দুর্ঘটনা'ই বটে, তবে সমালোচনার, কবিতার নহে। 'সোনার তরী' কবিতার 'হেঁয়ালী'র যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহার অপেক্ষা গুরুতর হেঁয়ালী সমালোচনার ইতিহাসে পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

মোহিতলাল রবীন্দ্রকাব্যের যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার প্রায় সবটাই অর্থহীন বাগ্‌বিস্তার। তাঁহার 'শেষের কবিতা'-সম্পর্কিত প্রবন্ধ ইহার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। অমিত রায় চরিত্রের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা মৌলিকতা দাবী করিতে পারে। বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আধুনিক কবিরা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, আবার তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্তও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে সস্নেহে এই বিদ্রোহের রূপ দিয়াছেন অমিত রায় চরিত্রে এবং যাহা **'absurd'** তাহার মধ্যে প্রাণধারা আবিষ্কার করিয়া এমন একটি গদ্যকাব্য রচনা করিয়াছেন যাহা রূপে, রসে, ছন্দে ও দীপ্তিতে ঝলমল। এই আলোচনা সম্পূর্ণাঙ্গ নয়; ইহার মধ্যে গ্রন্থের কেন্দ্রীয় ব্যাপার—অমিত-লাবণ্য-কেটি-শোভনলালের মন দেয়া-নেওয়া—প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিতই হয় নাই। অনেকে হয়ত অমিত চরিত্রের এই ব্যাখ্যাও গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু ইহা যে গ্রন্থটির উপর নূতন আলোকসম্পাত করে তাহা অস্বীকার করা যায় না এবং যে কেহ এই গদ্যকাব্য পাঠ করিবেন তিনিই এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

॥ ৬ ॥

মোহিতলালের রচনা ছাড়িয়া অজিতকুমার চক্রবর্তীর সমালোচনায় উপনীত হইলে প্রথমেই মনে হয় যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। অজিতকুমারের রচনায় শব্দসম্ভারের অপ্রাচুর্য্য নাই, কিন্তু তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে অর্থ কোথাও শব্দের স্তূপে চাপা পড়ে নাই। বরং ইহাই পরমাশ্চর্য্যের বিষয় যে, একটি বড় প্রবন্ধে —বা ছোট গ্রন্থে—তিনি রবীন্দ্রনাথের (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) সমস্ত রচনার ব্যাখ্যা দিতে পারিয়াছেন। এই গ্রন্থের একটি প্রধান গুণ ইহার সামগ্রিক দৃষ্টি। পরবর্ত্তী কালে আরও কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য, নাটক ও উপন্যাসকে এক সঙ্গে বিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীকেই এই পথের প্রথম পথিক বলা যাইতে পারে এবং পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল চলিয়া

গেলেও তাঁহার রবীন্দ্রব্যাখ্যার তাৎপর্য্য অম্লান রহিয়া গিয়াছে। সমালোচনায় এই কৃতিত্ব স্মরণীয়। অজিতকুমার লিখিয়াছেন, 'বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে ; সেই সূত্র তাহার পূর্ব্বকে উত্তরের সঙ্গে গাঁথিয়া তোলে, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া দেয়।' ('রবীন্দ্রনাথ'—নিবেদন) এই মৌলিক প্রতিজ্ঞা অনেকে স্বীকার করিবেন না, তাঁহারা বলিবেন এইরূপ একটি সূত্রের সন্ধান করিলে অনেক কবিতার জোর করিয়া মানানসই ব্যাখ্যা করা হইবে এবং কাব্যের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইবে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে,কেহ কেহ বহু গাছের দিকে বেশি নজর দেন বলিয়া একক সমগ্র বনমূর্ত্তিকে দেখিতে পান না। অপর অক্ষমতাও দেখা যায়—বিশেষ করিয়া দর্শনে ও সাহিত্যসমালোচনায়। কেহ কেহ সমগ্রের প্রতি এত দৃষ্টি দেন যে সমগ্রের বিচিত্র উপাদানের প্রতি নজর দিতে পারেন না। অজিতকুমারের সমালোচনায় এই দুই রকমের দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্যের আভাস পাওয়া যায়।

তিনি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র রচনাবলীর মধ্যে একটি সূত্রের সন্ধান করিয়াছেন—বিশ্ববোধ বা সর্ব্বানুভূতি। ইহাই কবির জীবনের ও কাব্যের মূল সুর। এইখানে অজিতকুমারের সমালোচনার আর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যের মধ্যেও একটা সঙ্গতি দেখিতে পাইয়াছেন। কবির বাহিরের জীবনের সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার কোন সম্পর্ক আছে কিনা এই প্রশ্ন এখানে পুনরুত্থাপিত করিয়া লাভ নাই। অজিতকুমার এই বিষয়ে পরমাশ্চর্য্য পরিমাণবোধের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বাহিরের ঘটনাকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাধান্য দেন নাই, শুধু কবির মানস-বিকাশের সঙ্গে সেই সকল ঘটনার যতটুকু সম্পর্ক তাহাই সূচিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মানসবিকাশের আলোচনায়ও তিনি দার্শনিক ব্যাখ্যা বা বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই ; কবির চিন্তা ও বিশ্বাস যতটুকু কাব্যে অভিব্যক্তি পাইয়াছে তাহাই মোটামুটিভাবে বলিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা ভাবগত আলোচনা, কিন্তু ইহা রবীন্দ্রকাব্যের বাস্তব ভিত্তির উপর নিবদ্ধদৃষ্টি। অজিত-কুমার রবীন্দ্রভক্ত হইলেও অন্ধভক্ত নহেন। সাহিত্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিত্বকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু অজিতকুমার মনে করেন যে যতদিন পর্য্যন্ত কবির হৃদয়ের অনুভূতির সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত কবির প্রতিভা পরিণতি লাভ করে নাই ; বরং 'অসুস্থ মূর্ত্তি ধারণ

করিতেছিল'। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতার অপরিণতির কারণ। 'প্রভাত-সঙ্গীত' এমনকি 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাতে এই অপরিণতি অনেকাংশে কাটিয়া গেলেও, ইহাদের মধ্যেও একটা 'স্বপ্নাবেশ' আছে, বাস্তব জগতের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ অল্পই। এইভাবে অজিতকুমার কাব্যের ভাব ও অনুভূতি এবং প্রকাশের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই জন্যই বলিয়াছি তাঁহার সমালোচনায় শুধু দার্শনিক সূত্রের সন্ধান করা হয় নাই, কবিতা যে কাব্য, তাহা যে নির্দ্দিষ্ট চিত্রে, নিয়মিত ছন্দে, স্পষ্ট অথচ ব্যঞ্জনাময় ভাষায় প্রকাশের অপেক্ষা রাখে তিনি সেই সম্পর্কে সদা সচেতন। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার প্রথম দিকের কবিতা সম্পর্কে কুণ্ঠাবোধ করিতেন—'[সন্ধ্যাসঙ্গীতের] কবিতাগুলির মধ্যে কবির লজ্জার যথেষ্ট কারণ আছে।......প্রভাতসঙ্গীতের কবিতাগুলি অস্পষ্ট কল্পনার কুহেলিকা হইতে বাহির হইবার পথে আসিয়াছে.........।' অজিতকুমার এই লজ্জার কারণ ও অস্ফুটতার সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

কবি সংকীর্ণ ব্যক্তিত্বের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যে বিশ্বকে উপলব্ধি করিতে পারিলেন, ইহাই তাঁহার কবিমানসের অভিব্যক্তির ইতিহাস; 'তাঁহার অনুভূতিগুলির প্রকাশ ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া উঠিল।' কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয় নাই বা আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই, সকল পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তম হইয়াছে। এইভাবেই জীবনদেবতার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, এইভাবেই 'মানসী' হইতে 'চিত্রা' ও 'চৈতালি' পর্য্যন্ত কবিপ্রতিভার পরিণতির পরিচয় দিতে হইবে। সর্ব্বত্রই বন্ধন হইতে মুক্তির লীলা, সর্ব্বানুভূতির ঐশ্বর্য্য।

কিন্তু ইহার পর কবির কাব্যজীবনে একটা ছেদ পড়িয়া যায়। অজিতকুমারের মতে 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা' প্রভৃতির কবিতা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতা হইতে এত বিভিন্ন যে ইহারা দুই জন স্বতন্ত্র কবির রচনা বলিয়া মনে হইতে পারে। 'কিন্তু এক জীবন হইতে অন্য জীবনে যাইবার গভীরতর কারণ আছে, আপাতবিচ্ছেদের মধ্যেও সত্য বিচ্ছেদ কোথাও নাই।' এইখানে অজিতকুমারের সমালোচনাপদ্ধতির দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে। এই পদ্ধতিতে কাব্যের কাব্যত্ব তত্ত্বের মরুবালুরাশিতে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। অজিতকুমার মনে করেন, 'আর্টের স্বাভাবিক পরিণাম আধ্যাত্মিকতায় ছাড়া হইতেই পারে না—নদীর যেমন স্বাভাবিক অবসান সমুদ্রে।' এই মতটি গুরুতর তর্কের বিষয়, অনেকেই

ইহা মানিবেন না। এইখানে সেই তর্ককণ্টকিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অজিতকুমার 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা'র সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। তিনি বেশ জোর করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 'কল্পনাতে ক্ষণিকাতে পূর্ব্ব জীবনের সৌন্দর্য্য-ভোগের অবশেষকে যেন একেবারে ঝুলি ঝাড়িয়া নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইল।' এই মতের দ্বারা—অথবা আধ্যাত্মজীবনের প্রাধান্যবোধের দ্বারা—চালিত হইয়াছেন বলিয়া তিনি এই দুই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে জোর করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখানে এই মতের বিরুদ্ধে শুধু দুইটি কবিতার উল্লেখই যথেষ্ট হইবে:

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে! (কল্পনা)

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভাল চলে। (ক্ষণিকা)

এই সব কবিতায় কি রিক্ততা, বৈরাগ্য বা ঝুলি ঝাড়ার কোন আভাস পাওয়া যায়?

এই তত্ত্বানুসন্ধানব্যগ্রতা 'কাব্যপরিক্রমা'য় সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে খুব বেশি প্রকট হইয়াছে। সেইজন্য এই প্রবন্ধগুলি সমালোচনা হিসাবে অনেক নিকৃষ্ট। 'রবীন্দ্রনাথ'গ্রন্থে জীবনদেবতার যে পরিচয় পাই তাহা কাব্যগত পরিচয়। তাহা পাঠক সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন বা না পারেন তাহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এই গ্রন্থে তাহার যে পরিচয় পাই তাহা একটি তত্ত্বমাত্র। এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে নানারূপ খট্‌কা লাগে। প্রথমতঃ, এইখানে দেখিতেছি যে ডারুইন ও তাঁহার শিষ্যবর্গের অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র ভাবের বেশ মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু এই ভাবে কাব্য পাঠ করার বিরোধী ছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে **Evolution theory** বা অভিব্যক্তিবাদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।* তারপর সকল অভিব্যক্তিবাদীই ডারুইনের শিষ্য নহেন। তাঁহারা কি জীবনদেবতা-অনুপ্রাণিত কবিতাগুলির মর্ম্ম গ্রহণ

* সাধারণতঃ ইংরেজি Expression-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'অভিব্যক্তি' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ Theory of Evo'ution-এর অনুবাদ করিয়াছেন 'অভিব্যক্তিবাদ'।

করিতে পারিবেন না? প্রসঙ্গক্রমে সমালোচক ফরাসী দার্শনিক বের্গস'র নাম করিয়াছেন; তিনি কি ডারুইনের শিষ্য?

এই গ্রন্থে অনুসৃত রীতির সীমাবদ্ধতা গ্রন্থকারের নিজের স্বীকৃতিতেই প্রকট হইয়াছে: 'কবিতা শুধুই রস কিন্তু সত্য নয়, এমন করিয়া দেখা আমি যথার্থ বলিয়া মনে করি না।' কবিতা সত্য বটে, কিন্তু ইহার সত্য কাব্যের সত্য, বিজ্ঞান বা দর্শনের জগতের সত্য নয়। কবিতাকে সুন্দর হইতে হইবে এবং সত্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে তাহা দেখানই সমালোচকের কর্ত্তব্য। 'কাব্যপরিক্রমা'য় রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসাধনার ব্যাখ্যা কাব্যালোচনার উপরে প্রাধান্য পাইয়াছে। 'রাজা' নাটকের সমালোচনায় দেখি রাজার স্বরূপ কি, রাজার মধ্য দিয়া ভগবানের কোন্ বৈশিষ্ট্য আভাসিত হইয়াছে, ইহাই আলোচনার বিষয়। নাটকের কাহিনী বা চরিত্রের আলোচনা গৌণ হইয়া গিয়াছে এবং অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাই অনাবশ্যকভাবে বিস্তারিত হইয়াছে; এই তত্ত্ব কাহিনীর মধ্য দিয়া স্ফুরিত হইয়াছে কিনা সেই দিকে লক্ষ্য নাই। একটি কেন্দ্রীয় ব্যাপারের দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে। 'রাজা' নাটকে একটি দুর্ব্বোধ্য ঘটনা ঠাকুরদাদার যুদ্ধ। তিনি যতদিন গান করিয়া বেড়াইতেন তাঁহাকে বোঝা যাইত; সুরঙ্গমার মত তিনিও রাজাকে চিনেন; তাঁহাদের অরূপ রাজার সঙ্গে পরিচয় ও সুদর্শনার রূপতৃষ্ণার মধ্য দিয়াই রাজার স্বরূপ আভাসিত হইয়াছে। কিন্তু হঠাৎ তিনিই যে সেনাপতিবেশে কাঞ্চীরাজ ও অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন ইহার জন্য কাহিনীতে কোন পূর্ব্বাভাস বা প্রস্তুতি নাই, এবং ইহার উপযুক্ত নাটকীয় পরিবেশও রচিত হয় নাই। অজিতকুমার বলিয়াছেন, 'ঠাকুরদাদার প্রয়োজন ছিল সুদর্শনাকে, সুদর্শনার প্রয়োজন ছিল ঠাকুরদাদাকে।' কিন্তু এই প্রয়োজন নাটকে কি ভাবে প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহা তিনি দেখান নাই। রাণীর প্রয়োজন অনেকটা স্পষ্ট; ঠাকুরদাদা না আসিলে তিনি কাঞ্চীরাজের নিকট হইতে উদ্ধার পাইতেন না। সেখানেও অবশ্য জিজ্ঞাস্য ঠাকুরদাদা কেমন করিয়া নাটকে রাজার প্রয়োজন সিদ্ধ করিলেন। ঠাকুরদাদা যে সুদর্শনার প্রতি নির্ভরশীল সেই সম্পর্কে অজিতকুমার বলিয়াছেন, 'ঠাকুরদা যতদিন রাণীর ভিতর দিয়া রাজাকে দেখেন নাই ততদিন রাজাকে পুরা করিয়া সমগ্র করিয়া দেখিতে পারেন নাই।' এই তত্ত্বটি নাটকীয় ঘটনাবলীর মধ্যে কেমন করিয়া ব্যঞ্জিত হইয়াছে তাহা সমালোচক বিশ্লেষণ ও বিচার করেন নাই।

'ডাকঘর'-নাটকের আলোচনা ইহা অপেক্ষা ভাল, কারণ সেইখানে সমালোচক নাটকের বক্ষ্যমাণ বস্তুর উপর অধিক মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই নাটকের তত্ত্বকথা খুবই সরল—অমলের মধ্য দিয়া মানবের সুদূরের পিয়াসা চিত্রিত হইয়াছে। ইহার পরিবেশ খুব আটপৌরে, চরিত্রগুলিও সাধারণ জীবনের প্রতিনিধি কিন্তু কবিপ্রতিভাবলে সাধারণ জীবনের ছবিগুলি অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছে। অজিতকুমারের সূক্ষ্ম রসানুভূতি এই ছবিগুলির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছে: 'ঠিক যেন একটি অজানা দেশের মত। তাহার পথের প্রত্যেক মোড়ে, প্রত্যেক বাঁকে নব নব বিস্ময়—তাহা ছাড়া তাহার নানা গলিঘুঁজির তো কথাই নাই। সেই বিস্ময়ের আলোড়নেই সমস্ত নাটকটি সজীব হইয়া আছে।' সমালোচক আর একটি নাটকোচিত কৌশলের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রথম দিকের চিত্রগুলি যতই অসাধারণ হউক, তাহাদের বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা একটানা ভাব আছে। শুধু রাজার চিঠির প্রত্যাশা একটু অভিনব এবং এইখানে নাটকের মোড় ফিরিয়াছে। কিন্তু অমলের চিঠির প্রত্যাশার মধ্যে সমালোচক **progression of thought** বা ভাব হইতে ভাবান্তরে গমনের রূপক দেখিতে পাইয়াছেন এবং দার্শনিক তর্কে রসবিচার আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে। তর্ক হিসাবেও যে এই আলোচনা খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছে এমন বলিতে পারি না; শুধু রাজার চিঠির রহস্য আরও জটিল হইয়াছে। সুধা যে শেষ কথা বলিয়াছিল, 'ও যখন জাগবে তখন বোলো যে সুধা তোমাকে ভোলেনি', এই বালিকাসুলভ মর্ম্মস্পর্শী উক্তির সহজ মানবিকতাটুকু অজিতকুমারের ব্যাখ্যায় ঘোরালো হইয়া গিয়াছে, কারণ ইহার মধ্যে তিনি নারীপ্রকৃতির চিরন্তন রহস্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য' গ্রন্থদ্বয়ের আলোচনাও তত্ত্বের ভারে পীড়িত হইয়াছে এবং তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিয়াছেন বলিয়াই সমালোচক 'গীতাঞ্জলি'র কাব্যরস সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও ইহা মানিতে হইবে যে, অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির আলোচনাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ কবির কাব্যালোচনায় প্রথম স্মরণীয় পদক্ষেপ। তাঁহার আলোচনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা প্রত্যেক রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিবেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে সমগ্রভাবে দেখিয়াছেন, তিনি কবির বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য সূত্র আবিষ্কার করিতে

পারিয়াছেন, এবং যদিও তিনি প্রধানতঃ ভাবের বা আইডিয়ার দিক্ হইতেই অগ্রসর হইয়াছেন তবু তাঁহার অধিকাংশ আলোচনায় রবীন্দ্রকাব্যের বর্ণাঢ্য রূপ জীবন্ত অভিব্যক্তি পাইয়াছে। সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবন ও বিশ্বানুভূতির মধ্যে সংযোগ আবিষ্কার করিয়া তিনি কবির সৃষ্টিকে বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।*

* কিছু কাল পূর্ব্বে রবীন্দ্র-সমালোচনার দুইখানি সংকলন গ্রন্থ বাহির হইয়াছে : (১) 'রবীন্দ্র সাগরসঙ্গমে' (সম্পাদক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়), (২) 'রবীন্দ্রবিতান' (সম্পাদক শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়)। উপরের পরিচ্ছেদটি লিখিবার সময় এই দুই সংগ্রহ-গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শরৎচন্দ্র

॥ ১ ॥

সমালোচনাসাহিত্যের আসরে শরৎচন্দ্রকে হাজির করান উচিত কিনা ইহা লইয়া প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে। শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক; তিনি সাহিত্য-সমালোচনা করেন নাই এবং সাহিত্যতত্ত্ব লইয়া কোন গ্রন্থও রচনা করেন নাই। সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে দুই একটি বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বা এখানে ওখানে পঠিত দুই একটি অভিভাষণে বা একে ওকে লেখা দুই একখানা চিঠিতে। এই ক্ষীণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও শরৎচন্দ্রের সমালোচনার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে; ইহা একটি বিশেষ ধারার সূচনা করে এবং তাহা তাৎপর্য্যপূর্ণ।

আমরা ভারতবাসী, আমাদের জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব খুব বেশি। তাই আমরা সাহিত্যের মধ্যেও চতুর্ব্বর্গের সন্ধান করি; যদিও কাব্যের বাক্য কান্তাসম্মিত তাহা হইলেও কাব্যের আস্বাদকে আমরা ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর বলিয়া মনে করি। কাজেই আমরা সাহিত্যকে নীতির সঙ্গে জুড়িয়া দিব ইহা খুব স্বাভাবিক। ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় এই প্রবণতাকে বাড়াইয়া দিয়াছে। প্লেটো নালিশ করিয়াছিলেন যে, কাব্য-পাঠ সুস্থ জীবন-যাত্রার পরিপন্থী। তাহার পর অধিকাংশ সাহিত্যশাস্ত্রীই কাব্যের নৈতিক মূল্য ও জীবনে তাহার উপকারিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশের প্রথম বড় সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সাহিত্যের অন্যতর উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা। তাঁহার এই মত কি ভাবে পরবর্ত্তী সমালোচনাকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সোজাসুজি নীতির কথা বলেন নাই এবং প্রথম যুগে তাঁহার কাব্যের বিরুদ্ধ সমালোচকেরা ইহাকে দুর্নীতিগন্ধী বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও নীতিবাদী; পার্থক্য এই, নীতি না বলিয়া তিনি কল্যাণের কথা বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাহিত্যের কাজ জগতের হিতসাধন, রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য মঙ্গল। রবীন্দ্রশিষ্য অজিতকুমার অধ্যাত্মসাধনাকে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি অপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি সাহিত্যকে স্বাবলম্বী করিতে চাহিয়াছেন। **Art for art's sake** নামে যে মতবাদ প্রচার লাভ করিয়াছে তিনি তাহার সমর্থক ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। তাঁহার মত শুধু এই যে, সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্নের দ্বারা সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হইবে না। সুনীতি ও দুর্নীতি সাহিত্যে আছে; সাহিত্যে ভাল'র চিত্রও পাওয়া যায়, মন্দ'র চিত্রও পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রশ্ন সাহিত্যের পক্ষে অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়। সাহিত্য জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে, কয়লার মধ্যে হীরা আবিষ্কার করে। ইহাই তাহার সম্পর্কে প্রথম ও শেষ কথা।

॥ ২ ॥

শরৎচন্দ্রের মতব্যাখ্যার পূর্ব্বে তাঁহার বলিবার ভঙ্গি সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা দরকার। তিনি সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন সহজ, সরল ভাবে। এই কারণে তাঁহার উক্তি আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কটা একটু ঘোরালো ছিল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রভক্তদের অগ্রণী, কিন্তু অনেক বিষয়ে তিনি কবির মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি পার্থক্য ছিল সাহিত্যের উদ্দেশ্য বা সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে। শরৎচন্দ্রের অন্যতম প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, কবি অবান্তর বস্তু ঢুকাইয়া দিয়া সরল জিনিষকে ঝাপ্‌সা করিয়া তোলেন। কবি সাহিত্যের রসকে উপনিষদ্-উক্ত রসের সঙ্গে সমীকৃত করিয়া এবং ব্রহ্মার এক হইতে বহু হওয়া প্রভৃতি তত্ত্বের অনুপ্রবেশ করাইয়া অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্বমানব, অনির্ব্বচনীয়তা, আনন্দরূপ প্রভৃতি শব্দ ও পরিকল্পনার দ্বারা সাহিত্যের সহজ আবেদন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এই অভিযোগ শরৎচন্দ্র 'গুরু-শিষ্য সংবাদ' নামক ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধে আনয়ন করিয়াছেন। নাম না করিলেও রবীন্দ্রনাথই যে তাঁহার লক্ষ্য সেই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ইহা তিনি লিখিয়াছিলেন বহু পূর্ব্বে, ১৩২০ সালে 'যমুনা' পত্রিকায় যখন সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি প্রায় অপরিচিত।

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যধর্ম্ম' প্রবন্ধ লিখেন ১৩৩৪ সালে। এই প্রবন্ধে তিনি আধুনিক বাস্তবনিষ্ঠ বা বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্যের নিন্দা করেন। ইহা লইয়া সেই সময় খুব একটা বাদানুবাদ হয়। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের

জবাব দেন মাস দুই পরে। এইখানে তিনি তীব্র কটাক্ষ করেন রবীন্দ্রনাথের উপমাবাহুল্যের উপর। শরৎচন্দ্র কবির উপমাগুলি খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উপমা যুক্তি নয়; সাহিত্যধর্ম্মের আলোচনায় ইহারা বিভ্রান্তিকর। কবি যে সকল উপমা দিয়াছেন তাহার প্রায় একটাও টিকে না। গঙ্গাদেবীর বাহন মকর কেহ খায় না। কিন্তু বাগ্দেবীর বাহন হাঁস ভোজ্যবস্তু, বিম্বফলেরও রান্নাঘরে জায়গা হয়; কদলীর সঙ্গে রমণীর জানুর উপমার কথা প্রবন্ধান্তরে উল্লেখ করিয়াছি। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের আলোচনাপদ্ধতিই ভ্রান্ত। ইহার ছয় বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ আক্রমণ করিলেন তর্কবহুল, সমস্যাকণ্টকিত আধুনিক সাহিত্যকে, বিশেষ করিয়া আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যকে। কবির আপত্তি, 'উপন্যাস-সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।' শরৎচন্দ্র বলিতে চাহেন 'চিন্তার স্তূপ' একটা উপমান মাত্র। অন্য একটা উপমান দিলেই বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়: 'প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে, "উপন্যাস-সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েনি। চিন্তার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।" তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজীর দিয়ে?' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত পত্রাবলী—পৃঃ ১৪৮) শরৎচন্দ্রের আসল বক্তব্য: উপমা ও অতিশয়োক্তি জমা করিয়া এই সকল প্রশ্নের সমাধান হইবে না—সমাধান হয়ত কিছুতেই হইবে না—তবে সুষ্ঠু আলোচনাও সম্ভব হইবে না। অন্যত্র তিনি বহুবার বলিয়াছেন, লেখার কৌশল অপেক্ষা না লেখার কৌশল অনেক বড় অর্থাৎ অবান্তর বস্তুর পরিবর্জ্জনই সাহিত্যের প্রধান কাজ। সাহিত্যিকের প্রথম ও প্রধান গুণ—বাক্সংযম।

॥ ৩ ॥

এই সংযম বা অপ্রয়োজনীয়ের পরিহারই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের গোড়ার কথা। সাহিত্যে ভাল মন্দ, সুনীতি দুর্নীতি দুইই আছে, কারণ জীবনে ইহারা আছে এবং জীবন লইয়াই সাহিত্যিকের কারবার। শেক্সপীয়রের নাটকের নীতির কথা আলোচনা করিতে যাইয়া কোল্‌রিজ বলিয়াছেন, শেক্সপীয়রের নীতি প্রকৃতির মত: জগতে যাহা ভাল শেক্সপীয়রের নাটকেও তাহা ভাল, জগতে যাহা খারাপ শেক্সপীয়রের নাটকেও তাহা খারাপ। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক

মতও অনেকটা এই ধরণের। সাহিত্যে সুনীতি ও দুর্নীতি দুইই আছে ; 'সুমতি' ও 'কুমতি' সেখানে আপনাদের নিয়মে আবর্ত্তিত হইতেছে। গোল বাধে সাহিত্যিক যখন বাহির হইতে সামাজিক বা নিজস্ব নীতির দ্বারা সাহিত্যের জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন। এই বিচারে বাহিরের সুনীতি ও দুর্নীতি একই মূল্য বহন করে—ইহারা উভয়েই অবান্তর, অপ্রয়োজনীয় ; সাহিত্যজগতের স্বাধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিবার অধিকার ইহাদের নাই।

এই প্রসঙ্গে অ্যারিষ্টটলের সাহিত্যতত্ত্বের অবতারণা করা যাইতে পারে। অবশ্য কেহ যেন মনে না করেন যে, শরৎচন্দ্র অ্যারিষ্টটল পড়িয়াছিলেন বা তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে, সাহিত্য-জগতের প্রধান লক্ষণ অবশ্যম্ভাবিতা—ইংরেজ অনুবাদকেরা বলেন **necessity** —ইহার প্রত্যেক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সংলগ্ন হইয়া আছে। হেগেলপন্থীরা বলিবেন, দ্বিবিধ অর্থে সাহিত্য কংক্রিট। ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ সৃষ্টি করে—ইহার ভাষা ও ছন্দ কান দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করে, ইহা যে ছবি আঁকে তাহা আমরা মনশ্চক্ষে দেখি, ইহার উপলব্ধির নাম রসাস্বাদন। তাই ইহা কংক্রিট। আবার অন্য, দার্শনিক অর্থেও, ইহা কংক্রিট ; ইহার প্রত্যেক অবয়বের সঙ্গে অন্য অবয়বের দৃঢ় সংসক্তি আছে, কেহই অবান্তর নয়, অসংশ্লিষ্ট নয় আবার বাহিরের কোন কিছুর প্রবেশেরও অধিকার নাই। সফোক্লিসের রাজা ঈদিপাস নাটক এই সংশ্লেষের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ।

শরৎচন্দ্র দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বাংলা সাহিত্য হইতেই। ইহাও সরলতা ও স্পষ্টতার একটি অঙ্গ ; বাঙ্গালী পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এক সময়ে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য খুব জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন। আমরা তাঁহার 'মিলন-মন্দির' প্রভৃতি গ্রন্থ ঘরে ঘরে পঠিত হইতে দেখিয়াছি। শরৎচন্দ্র সুরেন্দ্রমোহনের দুইটি কাহিনীর পরিণতির উল্লেখ করিয়াছেন। একটিতে দরিদ্র নায়ক মা কালীর কৃপায় সাতঘড়া সোনার মোহর গাছতলা হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিয়া বড়লোক হইল। আর একটিতে ছেলে মরিল, কিন্তু ভয় নাই। শ্মশানে জটা-জুট-ধারী তেজঃপুঞ্জ এক সন্ন্যাসী আসিয়া ছেলেকে বাঁচাইয়া দিলেন। ('সাহিত্যের রীতি ও নীতি') দৃষ্টান্ত দুইটি শরৎচন্দ্র অন্য প্রসঙ্গে অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গেও তাহাদের উপযোগিতা আছে। এই দুইটি গল্পের যে পরিণতি তাহা যে শুধু আজগুবি তাই নয়, গল্পের প্রথমাংশের সঙ্গে ইহাদের অবশ্যম্ভাব্য সংযোগ নাই। শরৎচন্দ্র উত্থাপন করেন

নাই, কিন্তু বুঝিবার সুবিধার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি উপন্যাস হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রফুল্ল আকস্মিকভাবে বহু অর্থ পাইয়াছিল; কিন্তু তাহার এই অর্থপ্রাপ্তি গ্রন্থের ঘটনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত হইয়াছে, সেইখানে কার্য্যকারণের শৃঙ্খলার খুব বেশি ব্যত্যয় হয় নাই।* 'রজনী'তে সন্ন্যাসীর দৈববলের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক খুব ক্ষীণ। রজনী, লবঙ্গলতা ও অমরনাথের কাহিনীই উপন্যাসকে রস যোগাইয়াছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর দৈববলের দ্বারা রজনীর প্রতি শচীন্দ্রকে অনুরক্ত করার মধ্যে খানিকটা জবরদস্তি আছে। অ্যারিষ্টটলীয় যুক্তিতে ইহাকে বলা যাইতে পারে **deus ex machina** বা আকস্মিক ঐশ্বরীয় শক্তির অভ্যাগম করাইয়া নাটকের (বা উপন্যাসের) সমস্যার সমাধান করা।

রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে শরৎচন্দ্র এই জবরদস্তির একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশ করিবার ভঙ্গি খুব তীক্ষ্ণ; ততোধিক তীক্ষ্ণ তাঁহার রসবোধ। রবীন্দ্রনাথ 'যোগাযোগ' উপন্যাসে এক জটিল সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছেন। দুই পরিবারের বংশগত বিরোধ লইয়াই এই কাহিনীর সূচনা; মধুসূদন, বিপ্রদাস, কুমু, শ্যামা, মোতির মা—প্রভৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরও জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা ইহাদের সমস্যা সমাধান করিতে পারিত, নাও পারিত। সমস্যার সমাধান ঔপন্যাসিকের কাজ নহে; কিন্তু যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইল তাহার মধ্য দিয়া কাহিনী ও চরিত্রের পরিণতি দেখান সাহিত্যের কাজ। এই উপন্যাসে তাহা হয় নাই। হঠাৎ দেখা গেল কুমু সন্তানসম্ভবা। কুমু স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে, কিন্তু সন্তানকে তো তাহার পিতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। কাজেই এই নবজাতকের অভ্যাগমের সম্ভাবনাই গ্রন্থের গ্রন্থিমোচন করিয়া দিল। ইহা সাহিত্যের উপর জবরদস্তি। প্রবল বিরুদ্ধতা ও বিতৃষ্ণার মধ্যেও যৌনমিলন সম্ভব এবং কুমুর সন্তানসম্ভাবনা অপ্রত্যাশিত হইলেও অসম্ভব নয়। কিন্তু ইহা দ্বারা উপন্যাসের সহজ গতি ব্যাহত হইয়া গিয়াছে। যদি যৌন-মিলনের সঙ্গে পরিবেশের সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য দেখানই এই গ্রন্থের উপপাদ্য বিষয় হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া প্রবল বিরুদ্ধতার মধ্যেও কুমুর রিরংসাবৃত্তি জাগ্রত হইল তাহার চিত্র আঁকা যাইতে পারিত। আর যদি প্রধান নর-নারীদের মানসবিকাশই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্যার

* শুধু সময়মত ঝড়ের উৎপত্তি ও সেই সুযোগে দেবীরাণীর প্রাণরক্ষা এই শৃঙ্খলাবহির্ভূত

এই সহজ সমাধান সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের সমাধানের মতই আগন্তুক ও অবান্তর। শরৎচন্দ্র এই কথাই সকৌতুকে উপস্থাপিত করিয়াছেন, 'যোগাযোগ বইখানা যখন "বিচিত্রায়" চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবলপরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ-ওফ-ওয়ারের শেষ হবে কি করে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্ত্তে এসে।' (পত্রাবলী—পৃঃ ১৪৯)

শরৎচন্দ্র যখন রোহিণীর প্রতি সহানুভূতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-উপন্যাসের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলেন তখন সবাই মনে করিয়াছিল তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সেকেলে নীতির সংকীর্ণতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমালোচনা আরও সূক্ষ্ম; তিনি আপত্তি করিয়াছেন এই উপন্যাসের নীতির বিরুদ্ধে নয়, ইহার রীতির বিরুদ্ধে। নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি আসিয়াছে গৌণভাবে। তাঁহার মতে, বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর চরিত্র যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রথমার্দ্ধের সঙ্গে অপরার্দ্ধের কোন সঙ্গতি নাই। নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র যাহাই মনে করুন না কেন, স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র তাহার মনে গোবিন্দলালের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ সঞ্চারিত করিয়াছেন। বিধবাবিবাহে বাধা আছে, গোবিন্দলালের স্ত্রী আছে। ইহা হইল কাহিনীর কথা। ইহাদের মধ্য দিয়াই গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর প্রেম পরিণতি লাভ করিবে অথবা করিবে না। কিন্তু বিধবা রোহিণী পরপুরুষের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। ইহা সমাজ-নীতির দিক্ দিয়া গুরুতর অন্যায়, শুধু অন্যায় নয়, অনপনেয় পাপ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে বিশ্বাসঘাতিনী করিয়া চিত্রিত করিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন। এই খানেই শরৎচন্দ্রের আপত্তি; ইহা শুধু নীতির জয় নয়, উপন্যাসের উপর নীতির জবরদস্তি। শরৎচন্দ্রের মতে, প্রত্যেক সাহিত্যিকের মধ্যে দুইটি ব্যক্তিত্ব থাকে—একটি বড়, আর একটি ছোট। যে বড় সে স্রষ্টা, সে সৃষ্টির নিয়ম মানিয়া চলে, সে অনাগত কালের বিচারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। আর যে 'ছোট্ট মানুষটি' আছে যে সংসারের দ্বারা বদ্ধ, সে সমসাময়িক মানদণ্ডের দ্বারা চালিত। ('সাহিত্য ও নীতি') বলা যাইতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে 'ছোট্ট মানুষটি' ছিল সেই স্রষ্টার হাত হইতে কলম তুলিয়া লইয়া রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতা ও তাহার শাস্তির ব্যবস্থা

করিয়াছিল। শরৎচন্দ্র যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পর্কে প্রযোজ্য কিনা তাহা বিতর্কের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু তিনি সাহিত্যসৃষ্টির যে সূত্রটি উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহার যৌক্তিকতা কোন বিশেষ দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে না। ইহা নীতির প্রশ্ন নহে, রচনারীতির প্রশ্ন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস হইতে শরৎচন্দ্র আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেম। এখানে শৈবলিনীর প্রেম ও প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে তিনি কোন পাকা মন্তব্য করেন নাই। কিন্তু প্রতাপের সম্পর্কে তিনি নানা প্রশ্ন তুলিয়াছেন। সাহিত্যসমালোচনার দিক্ হইতে উভয়ের সম্পর্কে একই প্রশ্ন: ইহাদের জীবনের ও চরিত্রের যে পরিণতি দেখান হইয়াছে তাহার মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যসম্বন্ধ ঠিক বজায় রহিয়াছে কিনা। তদুপরি অবশ্য মূল্যগত, নীতিগত প্রশ্ন আছে। কিন্তু সাহিত্য রচনার দিক্ হইতে প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন: 'শৈবলিনী লোক কিরূপ ছিল, তাহার কতখানি প্রেম জন্মিয়াছিল, জন্মান সম্ভবপর কিনা এবং এত বড় একটা অন্যায় করিবার পক্ষে সেই প্রেমের শক্তি যথেষ্ট কিনা।' ('আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ') এই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাই সাহিত্যের পক্ষে বড় কথা।

'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বৈজ্ঞানিকতার আম্‌দানির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান অপক্ষপাত কৌতূহলসহযোগে সত্যের অনুসন্ধান করে, কিন্তু সাহিত্যের বিশেষত্বই তাহার পক্ষপাতধর্ম্ম। সাহিত্যের বাণী স্বয়ংবরা। শরৎচন্দ্র এই পক্ষপাতধর্ম্মের কথা কিছুই বলেন নাই, কিন্তু তিনি মনে করেন সাহিত্য ও বিজ্ঞানে মৌলিক পার্থক্য থাকিলেও মৌলিক সাদৃশ্যও আছে এবং এই সাদৃশ্যের কথা ভুলিয়া গেলে রূপকথা রচনা করা যাইতে পারে—হয়ত বা কবিতাও রচনা করা যাইতে পারে—কিন্তু উপন্যাস রচনা করা যাইবে না, কারণ উপন্যাস-সাহিত্যের গোড়ার কথা হইতেছে কার্য্যকারণের সহিতত্ব। আখ্যানমূলক রচনায় কার্য্যকারণশৃঙ্খলা থাকা চাই এবং এই শৃঙ্খলার অনুসন্ধান সাহিত্যিক দৃষ্টির লক্ষণ। প্রধানতঃ এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলার অভাবের জন্যই সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের উপন্যাস প্রকৃত উপন্যাস হইতে পারে নাই। ('সাহিত্যের রীতি ও নীতি')

॥ ৪ ॥

বিজ্ঞান কার্য্যকারণশৃঙ্খলা বাহির করিবার জন্য অনাবশ্যক, আনুষঙ্গিক বস্তুকে বাদ দেয়। সেইজন্য বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান কাজ আনুষঙ্গিক ব্যাপারের বর্জ্জন। যাহা বিজ্ঞান বর্জ্জন করে তাহা অবাস্তব নয়, কিন্তু বিজ্ঞানের কাজের পক্ষে অবান্তর। সাহিত্যিককেও সেই কথা মনে রাখিতে হইবে। বাস্তবজীবনে অনেক কিছু ঘটে; সবই সাহিত্যে জায়গা পাইতে পারে না। জলধর সেনের কোনও বইতে একটা লোক ভারি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল; তাহার মীমাংসা হইল অন্য উপায়ে। ফোঁস করিয়া একটা গোখরো সাপ তাহাকে কামড়াইয়া দিল এবং সে রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া গেল। এইরূপ ঘটনা জীবনে না ঘটিতে পারে এমন নয়—জলধর সেন নাকি বলিয়াছিলেন, কেন, সাপে কি কাউকে কামড়ায় না? (পত্রাবলী—পৃঃ ১৪৯) কিন্তু সাহিত্যে এই জাতীয় ঘটনা অচল। সাহিত্যের ঘটনাকে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা, পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়ম ইত্যাদি মানিয়া চলিতে হইবে। বার্ণার্ড শ' বলিয়াছিলেন, টোকিওর ভূমিকম্পে বহু লোক মারা গেল, কিন্তু ইহা মর্ম্মান্তিক হইলেও ট্র্যাজিক নয়।

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, 'Art জিনিষটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোংরা জিনিষই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা **photography** হ'তে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হ'বে?' ('সাহিত্য ও নীতি') এই প্রসঙ্গে তাঁহার আর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর্টে সব রকমের নোংরা জিনিষ থাকিবে কিনা, থাকিলে কি ভাবে তাহা পরিবেশিত হইবে সেই প্রশ্ন পরে আলোচনা করা যাইবে। রীতির দিক্ দিয়া শুধু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতির যে উপকরণবাহুল্য আর্টের সুষম রূপ ও সুসঙ্গত পরিণতিকে ভারাক্রান্ত করে তাহা বর্জ্জন করা হইয়াছে কিনা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

'ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

শরৎচন্দ্র এই স্মরণীয় পংক্তি দুইটির এক নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়াছেন:

'যত ঘটনা ঘটে তার সবটুকু লিখতে নেই—কতক পরিস্ফুট ক'রে বলা, কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক পাঠকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া।'

(পত্রাবলী—পৃঃ ৭৮) পুনরায় স্মরণ করা যাইতে পারে যে, শরৎচন্দ্রের মতে রচনার প্রধান গুণ সংযম বা বাহুল্যবর্জ্জন।

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন যে, সাহিত্য বিচারে **idealist** ও **realist** কথা দুইটিকে পৃথক্ করা যাইতে পারে না। আর্ট অবান্তর বস্তু পরিহার করে এবং তাহার দিক্ হইতে যাহা প্রয়োজনীয় এইরূপ নূতন বস্তুর সংযোজন করে। এইখানে শিল্পী **idealist**। কিন্তু এই পরিবর্জ্জন ও সংযোজনের গভীরতর উদ্দেশ্য হইল বাস্তবের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা এবং এই জন্যই আধুনিক এবং তথা-কথিত গণতান্ত্রিক বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। আগের আমলে পাঠকসম্প্রদায় ছিল অভিজাত শ্রেণীর এবং তাহাদের কথাই সাহিত্যে বিশেষভাবে লিখিত হইত। আজ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়া গিয়াছে, নিম্নশ্রেণীর লোকের সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে। ইহাদের কাহিনীকেই বাস্তব সাহিত্য বলা হয়। শরৎচন্দ্র এই নূতন অনুসন্ধিৎসাকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিয়াছেন, 'এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুষ-সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে দিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।' ('সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি')

প্রত্যেক লেখকের রচনায়ই বাস্তবের অনুরূপ বর্ণনা ও চিত্র থাকে, আবার প্রত্যেকেই নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বাস্তবকে রূপান্তরিত করেন। যিনি বাস্তবকে বেশি অনুসরণ করেন তাঁহাকে আমরা বলি রিয়ালিষ্ট আর যিনি নিজের অনুভূতি ও চিন্তার উপর বেশি জোর দেন তাঁহাকে আমরা আইডিয়্যালিষ্ট নাম দিই। শরৎচন্দ্রও এইভাবে মোটামুটি রকমের বিভাগের পক্ষপাতী। কিন্তু 'বাস্তব' কথাটাও একটু মোটা রকমের। বাস্তব বলিতে কি বুঝি তাহা স্পষ্ট করা দরকার। শরৎচন্দ্র মনে করেন যে মানুষের বহির্জীবন নানা ঘটনার সমষ্টি ও নানা নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নানা বন্ধনের দ্বারা শৃঙ্খলিত ইহার মধ্যে মানুষের সত্য পরিচয় পাইতে হইলে ঘটনার অন্তরালে যে অন্তর্গূঢ় বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা আছে তাহার রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে হইবে— যেখানে মানুষ শ্রেণীগত জীবমাত্র নয়, পাপী বা পুণ্যাত্মা নয়, যেখানে সে মানুষ। মানুষের মনুষ্যত্ববিচারে সমাজগত মানদণ্ডের উপযোগিতা গৌণ, অনেক সময় ইহা অনুপযোগীও বটে। হয়ত এই জাতীয় অন্বেষণ ও অনুশীলন

প্রচলিত নীতির পক্ষে সহায়ক হইবে না, কিন্তু সোজাসুজিভাবে সমাজসংস্কার বা সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা বা ঐ জাতীয় প্রোপাগাণ্ডা সাহিত্যের কর্ত্তব্য নয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্রের মতে 'মানবের সুগভীর বাসনা, নরনারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ' সাহিত্যিকের প্রধান কাজ। 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধে তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে শুধু বাস্তবের যথাযথ বর্ণনা দিলে অথবা খবরের কাগজের মত রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনার কথা বলিলেই সাহিত্য হইবে না। চরিত্রসৃষ্টি অত সহজ নয়। অর্থাৎ চরিত্র সৃষ্টিই—অ্যারিষ্টটল-বিঘোষিত প্লট নয়—সাহিত্যের প্রধান নিয়ামক এবং ইহার দ্বারা বাস্তব চিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত করিতে হইবে। জনৈকা লেখিকাকে তিনি উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নাই। যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়।...প্রথমেই গল্পের প্লট লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না। যাহার হয় তাহার গল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।' (পত্রাবলী—পৃঃ ৮৬)

আর এক দিক্ হইতেও বস্তুনিষ্ঠতা একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে। অন্তর্জীবন ও সমাজ-জীবনের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া মানুষ নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেই সব সমস্যা বাদ দিয়া চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় সম্ভব হয় না। সুতরাং সাহিত্যে চিন্তা বা সমস্যার প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। তবে এখানেও সেই ঝোঁকের প্রশ্ন আছে—কেহ সমস্যার উপর, বিতর্কের উপর বেশি জোর দিবেন, আবার কেহ অনুভূতি, বিশ্লেষণ ও বর্ণনাকে প্রাধান্য দিবেন, তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের অন্তর্জীবনেও সমস্যা আছে এবং অনুভূতিও বুদ্ধি ও চিন্তার উপর নির্ভর করে। শরৎচন্দ্র বলেন, 'জগতের যা' চিরস্মরণীয় কাব্য ও সাহিত্য, তা'তেও কোন না কোন রূপে এ বস্তু [রূপকারের সংস্কারক হওয়ার নেশা] আছে। রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণীতে আছে, ইব্‌সেন মেটারলিঙ্ক টলষ্টয়ে আছে, হামসুন-বোয়ার-ওয়েলসে আছে।' (স্বদেশ ও সাহিত্য—পৃঃ ১৩৮-৯) তবে ইহা অবশ্য মানিতে হইবে কালে কালে বা গ্রন্থে গ্রন্থে ব্যবধান হয়। সাহিত্য চিত্তরঞ্জন করে, কিন্তু চিত্তেরও স্বরূপ বদ্‌লায়। সেইজন্য উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক সমস্যার প্রতি যতটা ঝোঁক দিল বিংশ-শতাব্দীতে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি ঝোঁক দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত

আগের আমলেও, 'দুর্গেশনন্দিনী' অপেক্ষা 'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী' অনেক বেশি বিতর্কমূলক বা সমস্যানিষ্ঠ। এই সমস্যানিষ্ঠতাও বাস্তবতারই অঙ্গ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, শেক্সপীয়রের অনেক নাটকেই সমস্যা আছে; কতকগুলিকে প্রোব্লেম (**problem**) নাটক এই আখ্যাই দেওয়া হইয়াছে।

॥ ৫ ॥

শরৎচন্দ্র যখন যাহা বলিয়াছেন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি তীক্ষ্ণ, ভাষা ধারাল। কিন্তু তিনি যে মত প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহার মধ্যে স্ববিরোধিতা আছে। তিনি বলিয়াছেন আর্টের কাজ মানুষের অন্তর্গূঢ় বেদনার বা বাসনার চিত্র আঁকা; ইহা সুনীতি-দুর্নীতির তর্কের ঊর্দ্ধে। সাহিত্যিক সুখদুঃখের কথা বলিবেন, চরিত্রসৃষ্টি করিবেন; সমাজসংস্কার তাঁহার কাজ নয়। কিন্তু অনুভূতি প্রকাশ করিতে গেলেই সহানুভূতির দরকার; যাহার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে যাইতেছি তাহার বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও অবশ্যই সঞ্চারিত হইবে। ইহাও এক প্রকারের নীতি-প্রচার বা প্রোপাগাণ্ডা। এই প্রোপাগাণ্ডা আখ্যানপ্রধান সাহিত্যেও থাকিবে, সমস্যাপ্রধান সাহিত্যেও থাকিবে। শরৎচন্দ্র আরও দাবি করিয়াছেন যে, যাঁহারা প্রচলিত নীতির সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন তাঁহারা হয়ত আজ স্বীকৃতি পাইবেন না। কিন্তু সমসাময়িক বিচারই শেষ বিচার নয়। অনাগত ভবিষ্যতের চরম বিচারের জন্য তাঁহারা ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবেন। এইখানেও স্ববিরোধিতা স্পষ্ট। ত্রিপঞ্চাশত্তম জন্মবার্ষিকীর অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'কোন দেশের কোন সাহিত্যই কখনো নিত্যকালের হ'য়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত বস্তুর মত তারও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে।' আবার তিনিই অন্যত্র বলিয়াছেন, 'সত্যকার যা' ঐশ্বর্য্য সে চিরদিনই মানুষের নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত।......যা' সর্ব্বমানবের একার লোভ সেখানে পরাভূত হবেই হ'বে আর এই ঐশ্বর্য্যের চরম পরিণতি কোথায়? সুন্দর এবং মঙ্গলের সাধনায়,— **art, morality** এবং ধর্ম্মে।' ('সাহিত্য ও নীতি')

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন যে, যাহা অসুন্দর, যাহা অকল্যাণ তাহা কখনই আর্ট হইতে পারে না। এই কারণেই তিনি **art for art's sake** তত্ত্বও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে মনে হয় তিনি যাহা শিব

তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে সুন্দর বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের মত তিনি নীতিকেও সাহিত্যের নিয়ামক করিয়াছেন। আর এক দিক্ হইতেও তিনি **art for art's sake** তত্ত্বকে সংশোধন করিতে চাহিয়াছেন। সাহিত্য শুধু যে কল্যাণকর হইবে তাহাই নয়, ইহা জীবনের সমস্যা প্রতিফলিত করিবে, তাহা না হইলে ইহা কোন কাজে আসিবে না, যে কল্যাণ বা মঙ্গল ইহার আদর্শ তাহার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। সাহিত্যকে বলা হয় ভাবের অভিব্যক্তি, কিন্তু ভাব শুধু **feeling** বা অনুভূতি নয়। ইহা আইডিয়াও বটে। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে যাঁহারা বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী তাঁহারা সাহিত্যে চিরাচরিত ভারতীয় ভাবধারার প্রকাশের পক্ষপাতী। শরৎচন্দ্র অনেক সময় এমন কথা বলিয়াছেন যাহাতে মনে হয় তাঁহার সঙ্গে প্রাচীনপন্থীদের বিরোধ শুধু আইডিয়ার জাতিভেদ লইয়া। তিনিও নীতিবাদী ; শুধু তাঁহার নীতি সংস্কার-বিরোধী, পশ্চিমের যুক্তিবাদী নীতি। তাঁহার মতে, 'সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক্ দিয়া তাহাকে উন্নত করা। **Idea** পশ্চিমের কি উত্তরের ইহা বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাষার ও জাতির কল্যাণকর কি না।' ('সাহিত্যের রীতি ও নীতি') তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের বা অন্য নীতিবাদীদের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য শুধু কোন্ শ্রেণীর আইডিয়া জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইবে তাহা লইয়া। সেই প্রশ্ন ব্যবহারিক জীবনের প্রশ্ন, **ethics** বা নীতিশাস্ত্রের প্রশ্ন, সাহিত্য বা আর্টের প্রশ্ন নয়।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যস্রষ্টা, সাহিত্যশাস্ত্রী নহেন। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি তাঁহার মত সুবিন্যস্ত করিয়া প্রকাশ করেন নাই, বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিতে চাহেন নাই। তাঁহার মতের মধ্যে সেই অংশই স্মরণীয় যেখানে তথাকথিত **art for art's sake** বা কলাকৈবল্যবাদ গ্রহণ না করিয়াও তিনি সাহিত্যকে বন্ধনমুক্ত করিতে চাহিয়াছেন, এমন কি 'অ-সত্য' এবং 'অ-মঙ্গল'ও যে সাহিত্যে প্রবেশ করে তাহাও তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধার করা যাইতে পারে : 'সত্য ও সুন্দরে বাধে পদে পদে বিরোধ। জগতে যা ঘটনায় সত্য, সাহিত্যে হয়ত সে সুন্দর নয়, এবং যা সুন্দর সে হয়ত সাহিত্যে একেবারে মিথ্যা। যাকে সত্য বলে মানি তাকে মূর্ত্তি দিতে গিয়ে দেখি সে হয়ে ওঠে বীভৎস ও কদাকার, আবার অসত্যকে বর্জ্জন ক'রেও পাই নে সুন্দরের রূপ। তেমনি মঙ্গল-অমঙ্গলও। সাহিত্যে এ-প্রশ্ন স্বীকার না ক'রেও ত পারি নে।' (পত্রাবলী—পৃঃ ১৫৪)

শরৎচন্দ্র পত্র বা প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া দার্শনিকসুলভ সূক্ষ্মবিচারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। সেই কারণে 'সত্য' 'মঙ্গল' প্রভৃতি শব্দ কোন এক প্রসঙ্গে ঠিক কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। তবে মনে হয় এইখানে 'মঙ্গল' বলিতে তিনি সমাজানুমোদিত শুভকে বুঝিয়াছেন আর 'সত্য' শব্দ ব্যবহারিক জীবনের ঘটনাগত সত্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই দুইটি আইডিয়া বা ভাবনাকে এক করিয়া শরৎচন্দ্রের মতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। শরৎচন্দ্র মনে করেন যে, জীবনের যে সত্য অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে তাহার প্রকাশের মাধ্যমেই জাতিগঠন বা অনুরূপ মঙ্গল সাধন করা যাইতে পারে। বাহিরে যাহা অসুন্দর বলিয়া মনে হয় তাহার যথাযথ বর্ণনা দিয়া থামিয়া গেলে তাহাকে বীভৎস ও কদাকার বলিয়া মনে হইবে, হয়ত তাহার অভ্যন্তরস্থিত, গুহাহিত সত্য প্রকাশ পাইবে না, আবার বাহিরের যে সৌন্দর্য্য আছে হয়ত তাহা একটা মুখোশ মাত্র, তাহা খসিয়া পড়িলে কদাকার, বীভৎস জিনিষ প্রকাশিত হইবে। তাই যাহা বাহিরের দিক্ দিয়া কদাকার তাহার সাহিত্যিক অভিব্যক্তিতে অ-সত্য বস্তুর প্রবেশ অনিবার্য; তবে মনে রাখিতে হইবে এই অ-সত্যতা ব্যবহারিক, বহির্জীবনের অসত্যতা। শরৎচন্দ্র নিজেই নিজের রচনা হইতে যে একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা তাঁহার মতবাদকে উদ্ভাসিত করে। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র সাবিত্রী—তাহাকে নায়িকাই বলা যাইতে পারে—মেসের ঝি। মেসের ঝির পরিবেশ নোংরা এবং শরৎচন্দ্র এই পরিবেশের কদর্য্যতার যথাযথ বর্ণনাও দিয়াছেন। ইহা লইয়া কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছিল। তদুত্তরে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, 'তাহারা সাবিত্রীকে "মেসের ঝি" বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত, এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কি ভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য হীরা মাণিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তা হলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না।' (পত্রাবলী—পৃঃ ১০) ইহাই সাহিত্যের কাজ; সে কয়লার মধ্য হইতে হীরা মাণিক তুলিয়া আনে, কয়লাকে ধুইয়া মুছিয়া তাহার মধ্যে যে মাণিক লুক্কায়িত আছে তাহা উদ্ঘাটিত করে। এই অর্থেই রসাস্বাদ সত্যের স্বরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎকার; গৌণ অর্থে এই সাক্ষাৎকারকেই বলা হয় অভিব্যক্তি বা রূপান্তরীকরণ। এই অর্থেই বলা যাইতে পারে, **'Truth is beauty, beauty truth'** অর্থাৎ যাহা সত্য তাহা সুন্দর, যাহা সুন্দর তাহাই সত্য—এবং তাহাই শিব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রসতত্ত্ব : কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত

॥ ১ ॥

বাংলায় সাহিত্যতত্ত্ববিচার খুব বেশি হয় নাই। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার সাহেবদের বাংলা শিখিবার সুবিধার জন্য নানাবিষয়ক নিবন্ধসমন্বিত একখানা গ্রন্থ লিখেন—নাম 'প্রবোধচন্দ্রিকা'। ইহা প্রকাশিত হয় মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যুঞ্জয়কে মার্শম্যান আখ্যা দিয়াছিলেন Colossus of literature এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের দিক্‌পাল ডক্টর জনসনের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করিয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্রিকায় মৃত্যুঞ্জয় সাহেবদিগকে বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে চাহিয়াছেন; সাহিত্যের আলোচনা তাঁহার বিষয় নয়। রচনার গুণাগুণ নির্ণয় করিতে যাইয়া তিনি প্রসঙ্গক্রমে কাব্যতত্ত্ব বা সাহিত্যতত্ত্বের কথাও উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'সদর্থবিশিষ্ট যে ক্রিয়াকারকাদি পদ তৎসমূহাত্মক কাব্যশরীর হয় সে কাব্য তিন প্রকার হয় পদ্য ও গদ্য ও মিশ্র।' 'সদর্থ' যে কি তাহা মৃত্যুঞ্জয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলেন নাই। তাঁহার সংজ্ঞায়ও কোন নূতনত্ব নাই, কারণ প্রাচীন আলংকারিকেরাও বলিয়াছেন যে রমণীয় অর্থই কাব্যের প্রাণ। শব্দের যে সকল শক্তির বলে অর্থ গৃহীত হয় মৃত্যুঞ্জয় শুধু তাহার বিবরণ দিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে ব্যঞ্জকত্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের আলোচনা খুব সংক্ষিপ্ত; রসপ্রতীতির সঙ্গে ব্যঞ্জকত্বের কি সম্বন্ধ তাহা তিনি কোথাও বলেন নাই। তিনি ব্যঞ্জনার দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একটি ধ্বন্যালোক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে কোন নূতনত্ব নাই। দ্বিতীয়টি কোথায় পাইয়াছেন বলিতে পারি না; স্বকল্পিতও হইতে পারে। তাহার ব্যাখ্যা হইতে মনে হয় ব্যঞ্জনা, বিশেষ করিয়া ব্যঞ্জনা ও কাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁহার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। যদি ইহাকে ধ্বনি বলিয়া মানা হয়, তাহা হইলেও ইহা বস্তুধ্বনি, রসধ্বনি নহে। দ্বিতীয়তঃ, যে অর্থ তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাও কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন, 'যে ব্যাপারেতে এতাদৃশ অর্থদ্বয় বুঝায় সে ব্যাপারকে আলংকারিকেরা ব্যঞ্জনাবৃত্তি কহিয়া থাকেন।' কিন্তু এই সংজ্ঞায় অতিব্যাপ্তি

দোষ আসিয়া যায়। যদি 'অর্থদ্বয়' থাকিলেই ব্যঞ্জনা হয় তাহা হইলে শ্লেষ অলংকারও ব্যঞ্জনার অন্তর্ভুক্ত হইবে। মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন নৈয়ায়িক পণ্ডিত, আর নৈয়ায়িকেরা ব্যঞ্জনা মানেন না। তাই তিনি ব্যঞ্জনার নিগূঢ় তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন নাই। মনে হয় অলংকার ও ছন্দের প্রয়োগকেই তিনি কাব্যের (অথবা পদ্যের) বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করিতেন।

ইহার পর বাংলা সাহিত্যসমালোচনায়—বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রভাবের ফলে—'রস'-শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু সাহিত্যশাস্ত্রের রীতিতে রসতত্ত্বের বিচার বড় একটা দেখা যায় না। রস বা ধ্বনির যেখানে উল্লেখ আছে তাহা নৈরাশ্যেরই সঞ্চার করে। উমেশচন্দ্র বটব্যাল চণ্ডীদাসের একটি কবিতা সম্পর্কে লিখিয়াছেন, 'কবিতাটি একটি হীরকখণ্ডের ন্যায়, ইহাতে নানা বর্ণের ভাব প্রতিফলিত। তাই ইহা উৎকৃষ্ট "ধ্বনি" কাব্যের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য।' এই উক্তিটি বিভ্রান্তিকর। নানা বর্ণের ভাবের প্রতিফলনকে 'ধ্বনি' বলা যায় না। 'প্রতিফলন' বলিতেই বা লেখক কি মনে করিয়াছেন তাহাও বুঝা কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্র আলংকারিকদের নমস্কার করিয়া বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'রস'-শব্দের প্রচুর প্রয়োগ করিয়াছেন এবং দুই একবার প্রাচীন আলংকারিকদের উল্লেখও করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আলোচনা শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে নাই। সেই আলোচনার ত্রুটিবিচ্যুতির কথা যথাস্থানে বলিয়াছি। অক্ষয়কুমার বড়ালের 'প্রদীপ'-গ্রন্থের ভূমিকা বা 'প্রস্তুতি' লিখিতে যাইয়া সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলিয়াছেন, 'এই সকল কবিতায় ভাবকে পূর্ণাবয়বে প্রকাশ করিবার চেষ্টা বা প্রয়াস। তাহা যতটুকু প্রকাশ করে, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক আভাসে ফুটিয়া উঠে।...যে দেখে, সে মুগ্ধ হয়; ....ফুলের সৌন্দর্য্য, সৌরভ ও স্ব-স্বরূপের অতিরিক্ত কিছু তাহার মনে ফুটিয়া উঠে।.........কবিতার যে উপাদানে এই গূঢ় শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাই ব্যঞ্জনা। কবিতা সুন্দর, ব্যঞ্জনা সুন্দরতম।' ব্যঞ্জনার প্রধান লক্ষণ যে অতিরিক্তত্ব সমালোচক তাহা জানেন, কিন্তু তাহার পরই কবিতার উপাদান, সামাজিকের উপলব্ধি, নিসর্গসৌন্দর্য্য ইত্যাদি বিষয়ের অনুপ্রবেশের ফলে ব্যঞ্জনার তাৎপর্য্য আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্যঞ্জনা কি ভাবুক পাঠকের সৃষ্টি না কবির? নিসর্গসৌন্দর্য্যের সঙ্গে ব্যঞ্জনার সম্পর্ক কি? কবিতা ও ব্যঞ্জনা কি পৃথক্ ব্যাপার?

বাংলার লেখকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর রচনায় সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র

হইতে বহুল উদ্ধৃতি দেখা যায়। কিন্তু এই সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা খুব ভাসা-ভাসা ; অনেকটা চুটকি সাহিত্যের মত। তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, নৈয়ায়িকেরা ব্যঞ্জনা মানেন না, কিন্তু আনন্দবর্দ্ধন যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে নৈয়ায়িকদের মতের সঙ্গে ব্যঞ্জনার সামঞ্জস্য করা সম্ভব এমন কি মীমাংসকদের সঙ্গেও তাঁহার প্রকৃত বিরোধ নাই সেই সব সূক্ষ্ম বিচারে প্রমথ চৌধুরী প্রবেশ করেন নাই। 'কাব্যজিজ্ঞাসা'য় এক জায়গায় কাণ্টের উল্লেখ আছে—মন ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভবের উপর তাহার Categories বা তত্ত্ব প্রয়োগ করে এবং তাহার ফলেই জ্ঞান সম্ভব হয়। ইহা কাণ্ট-দর্শনের গোড়ার কথা, ইহার সঙ্গে ধ্বনিবাদের সাদৃশ্য বা নৈকট্য নাই। বোধ হয় এখানে কাণ্টের উল্লেখ দেখিয়াই তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, 'অভিনব গুপ্তের রস-বিচার পড়লে Kant-এর দর্শনের কথা মনে পড়ে।' কেন মনে পড়ে সেই কথা বলেন নাই। প্রমথ চৌধুরী অভিনবগুপ্তের রসবিচারকে এই ভাবে সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 'তাঁর কথা হচ্ছে এই—"রস অর্থে সাধারণ-ভাবে emotion বোঝায়। শিল্পের দ্বারা অভিব্যক্ত emotion ভাবকেই রস বলে।" সংক্ষেপে, ভীত হলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, তার নাম রস নয়। রস বস্তুতেও নেই, মনেও নেই। কবিরা রসের সৃষ্টি করেন ও আমাদের মনে তা সংক্রামিত করেন।'*

এই সংক্ষিপ্তসার অভিনবগুপ্তের রসবিচারের প্যারডি বলিয়া মনে হয়। শিল্পের দ্বারা অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্যই সাহিত্যশাস্ত্রের জিজ্ঞাস্য ও আলোচ্য। তাহার ব্যাখ্যা না দিলে এই বিষয়ে মন্তব্যের কোন সার্থকতা থাকে না। তারপর emotion যদি 'ভাব' ও 'রস' উভয়েরই প্রতিশব্দ হয় তাহা হইলে উহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে কোথায়? যদি বলা হয় ভাবের অভিব্যক্তিই রস তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে এই মতে কোন অভিনবত্ব নাই, এবং ইহা ঠিক অভিনবগুপ্তের মতও নয়।

॥ ২ ॥

প্রমথ চৌধুরী রসস্বরূপ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বিরচিত 'কাব্যবিচার' গ্রন্থের পরিচয় দিবার উপলক্ষ্যে। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

* শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রমথ চৌধুরীর সংস্কৃতবিষয়ক মতের সংকলন করিয়াছেন 'সাহিত্যতীর্থ' বার্ষিকীতে (১৩৭৫)।

রসতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। 'কাব্যবিচার' প্রধানতঃ ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের আলোচনা; সঙ্গে সঙ্গে লংগাইনুস হইতে আরম্ভ করিয়া রিচার্ডস পর্য্যন্ত ইউরোপীয় মনীষীদের মতের বিচারও সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রমথ চৌধুরী ঠিকই বলিয়াছেন, 'কাব্যবিচার গ্রন্থটি একটি বিশ্বকোষ বিশেষ। এতে যা নেই, সমগ্র অলংকারশাস্ত্রে তা নেই।' ইহা ছাড়া স্বরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আর একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন—'সাহিত্য-পরিচয়'; ইহাও মূলতঃ সাহিত্যশাস্ত্রসম্পর্কিত গ্রন্থ। ইহার মধ্যে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থকার নিজস্ব মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যশাস্ত্রী ক্রোচের মতবাদের আলোচনা করিয়াছেন। এই জাতীয় বিচারে স্বরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বিশেষ যোগ্যতা ও প্রবণতা ছিল। ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যে তাঁহার প্রভূত পাণ্ডিত্য ছিল; আর ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁহার ব্যাপক পরিচয় ছিল। দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, প্রধানতঃ ভারতীয় দর্শনেই যাঁহার অধিকার তিনি কাণ্ট হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন মূল জার্ম্মান হইতে, আর ক্রোচে হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন ইতালীয় হইতে; ফরাসী কবিতার মূল হইতে উদ্ধৃতি তো আছেই। শুধু লংগাইনুসের উক্তি ইংরেজি তর্জ্জমা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বরেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য তাঁহার রচনায় সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান।

কিন্তু এইরূপ বহুশ্রুত লেখকের আলোচনা কাব্যবিচারে বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারিয়াছে বা পারিবে বলিয়া মনে করি না। প্রমথ চৌধুরী 'কাব্য-বিচার' গ্রন্থের ধ্বনিবাদ-আলোচনা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, 'ধ্বনি সম্বন্ধে দাশগুপ্ত মহাশয় যে স্বদীর্ঘ বিচার করেছেন, সে বিষয়ে কিছু বলব না কেন না সে হচ্ছে ন্যায়ের তর্ক যা আমাদের মাথা ঘুলিয়ে দেয়।' দাশগুপ্ত অন্যান্য বিষয়ের যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাও ঐরূপ বিভ্রান্তির স্বষ্টি করে। কিন্তু তাহার কারণ ইহা নহে যে এখানে ন্যায়ের তর্ক আছে। ন্যায়ের তর্ক অস্পষ্ট বা বিভ্রান্তিজনক নহে, তাহা সূক্ষ্ম বলিয়া দুরূহ হইয়া উঠে। স্বরেন্দ্রনাথ যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে তর্কাভাস আছে, তর্ক নাই। নানা মুনির নানা মত এলোমেলোভাবে ভিড় করিয়াছে; তথ্যাকীর্ণ অরণ্যে তত্ত্বের সন্ধান করা কঠিন। গ্রন্থকার যে ভাবে শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাও বিভ্রান্তির স্বষ্টি করে। বড় বড় আলংকারিকদের রচনায় বাসনাসংস্কারের উল্লেখ আছে। সাধারণ পাঠক তাহা এক রকম বুঝিতে পারে; কিন্তু

দাশগুপ্ত ইহাদের সঙ্গে আর একটি ব্যাপার জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহার নাম 'প্রমুষ্টতত্তাক-স্মৃতি।' ইংরেজি realism ও idealism আমাদের কাছে অপরিচিত নয়, কিন্তু যথাস্থিতবাদ (realism) ও পরিকল্পনাবিবর্ত্তবাদ (idealism) তত সহজ নয়। এই দুই গ্রন্থে শুধু যে গুরুগম্ভীর গালভরা শব্দই অসুবিধার সৃষ্টি করে তাহা নয়। শব্দের অসতর্ক প্রয়োগ আরও বেশি বিভ্রান্তিকর। রসতত্ত্বে প্রাচীন আলংকারিকদের তিনটি প্রধান মতের উল্লেখ দেখা যায়—লোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শংকুকের অনুমিতিবাদ ও ভট্টনায়কের ভোগীকরণবাদ। অভিনব এই তিনটিরই খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; বাস্তবিকপক্ষে অভিনবের আপত্তির মধ্য দিয়াই এই সব আলংকারিকেরা এখন বাঁচিয়া আছেন। অভিনবের প্রতীতিবাদ বা চর্ব্বণাবাদই এখন প্রচলিত। সুতরাং ভট্টলোল্লটের প্রসঙ্গ ছাড়া রসের উৎপত্তির কথা বলিলে আলোচনা ঝাপ্‌সা হইতে বাধ্য। রসের অভিব্যক্তির কথা বলিতে গেলেও অনুরূপ সতর্কতার আবশ্যক। সুরেন্দ্রনাথ অনেক সময়ই এই সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ঠিক কি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দ চয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আবার অনেক অতি সাধারণ শব্দের প্রয়োগ করিয়া গোল বাধাইয়াছেন। ক্রোচে মনে করেন, আমাদের যে সকল প্রাথমিক, অস্পষ্ট অনুভব বা সংস্কার (sensation, impression) হয় তাহাকে বিশিষ্ট, একক রূপ দান করে intuition এবং intuitionই কাব্যপ্রতিভা বা কাব্য। দাশগুপ্ত ইহাকে বলিয়াছেন, বিষয়োপলব্ধি। কিন্তু অন্যত্র বিষয়ানন্দ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তিনি 'বিষয়' শব্দের প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে যতদূর বুঝি তিনি matter, subject-matter, object প্রভৃতি প্রচলিত শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবেই ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। এইভাবে প্রচলিত শব্দের অপপ্রয়োগে ও অপ্রচলিত শব্দের প্রাচুর্য্যে কাব্যবিচার আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

বাক্যপ্রয়োগেও অনুরূপ অসাবধানতা বা অসতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যাইতে পারে :

'কবির মনের ছবি যখন তাহার ভাবভূমির সম্বন্ধের সাহায্যে নানা শব্দের ও অর্থের বিচিত্র বিন্যাসে ধ্বনিত হইয়া শ্রোতার ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া তাহার বুদ্ধিভূমিকে মথিত করিয়া তাহার অন্তর্নিবিষ্ট ভাবভূমিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া

তাহার হৃদয়কে দ্যোতনায় ও রসে বিচিত্র ও মনোহর করিয়া তোলে তখনই তাঁহার সুন্দরের অনুভূতি হয় ও মনঃপ্রাণ সিক্ত হইয়া উঠে। ('সাহিত্য-পরিচয়')

প্রশ্ন জাগে, মনের ছবি যখন নিষ্পন্ন হইল তখন কি কাব্যক্রিয়া সমাপ্ত হইল না? ছবির ধ্বনন ব্যাপার কি রকম? বুদ্ধিভূমির মন্থন ব্যাপারটিই বা কি? যে রস বিচিত্র ও মনোহর করে আর যে রস সিক্ত করে তাহারা কি বিভিন্ন বস্তু?

'অনুভূতিপুরুষটির যে ছায়া, বেদনাবেগ, বুদ্ধিপুরুষটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তাহাই প্রধানতঃ সেই অনুভূতিপুরুষটির অজ্ঞাত শক্তিতে যখন শব্দার্থের মধ্যে বিধৃত হয় তখনই সেটি হয় সাহিত্য।' ('সাহিত্য-পরিচয়')

উপরি-উল্লিখিত বুদ্ধিভূমির মন্থনক্রিয়া ও বর্ত্তমান উদ্ধৃতির বুদ্ধিপুরুষের প্রতিফলনক্রিয়া—ইহারা কি পৃথক্ ব্যাপার? অনুভূতিপুরুষটির 'ছায়া' বলিতে কি বুঝায়?

'চিৎপুরুষেরই অভিব্যক্তির স্বরূপ বলিয়া অনুভূতিমাত্রেরই সহিত ভাব-বিক্রুতি অপরোক্ষভাবে সংসক্ত হইয়া রহিয়াছে।' ('ক্রোচের বীক্ষাশাস্ত্র বা ইস্থেটিক')

কে কাহার স্বরূপ এবং কে কাহার সঙ্গে সংসক্ত হইল বুঝা কঠিন।

'কোন মধুর গানশ্রবণে, কোন মধুর চন্দনাদিস্পর্শে এই সঙ্কুচিত জীব, যখন এই সঙ্কুচিত স্বভাব পরিত্যাগ করে, তখন তাহার হৃদয়ে যে স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা দ্বারা সেই অনুভবস্বভাবের সহিত তাহার পার্থক্য দূরীভূত হয়।' ('কাব্যানন্দে বিষয়ানন্দ')

'সঙ্কুচিত স্বভাব' বুঝিতে পারি, কিন্তু 'অনুভবস্বভাব' বস্তুটি কি? এবং কাহার সঙ্গে কাহার পার্থক্য দূরীভূত হইল।

গ্রন্থকার কোন তর্ককেই সরল, সহজ পথে অগ্রসর হইতে দেন নাই। অবান্তর প্রসঙ্গ ও শব্দের অবতারণা করিয়া মূল প্রশ্নটিকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছেন এবং যে সকল আসল বিচার্য্য বিষয় তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। রস ও ধ্বনি সম্পর্কে তিনি অনেক আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু ভরতের সূত্রে ভাবের উল্লেখ নাই কেন, 'সংযোগ' ও 'নিষ্পত্তি' বলিতে তিনি কি বুঝেন তাহা বলেন নাই। বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে সম্পর্ক কি, ধ্বনির অসংখ্য শ্রেণীবিভাগের সার্থকতা কি, একটি সার্থক ধ্বনি ও অপর একটি সার্থক ধ্বনির মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে কিনা—এই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই

অথবা ইহারা আসিয়া পড়িলে তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন। ক্রোচের দর্শনের সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন আপনিই মনে আসে: **Concept**—যাহাকে দাশগুপ্ত বলেন বীজভাব—আর্ট হইতে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা যায় কি না; আর্টের বিচারে আমরা কি শুধু ব্যাপকতা (**extension**) বিচার করি? তীব্রতা (**intensity**) কি বিচারের মানদণ্ড হইতে পারে না? যে মালমসলা লইয়া শিল্পী কাজ করেন তাহা কি শিল্পসৃষ্টিতে অবান্তর? এই সকল প্রশ্নের আভাসমাত্র দাশগুপ্তের আলোচনায় পাওয়া যাইবে না।

ইহার একটি কারণ আছে। তিনি কোন মতের সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া শেষ সিদ্ধান্তে যাইতে চাহেন নাই। সমস্ত মত একত্রিত করিয়া একটি বিশ্বম্ভর সংজ্ঞা দিতে চাহিয়াছিলেন যাহার মধ্যে সব কিছুই থাকিবে:

'শব্দের বিন্যাসে, রচনার বিন্যাসে, ছন্দের ঝংকারে, ছবিতে, তাৎপর্য্যে, ইঙ্গিতে, সাধারণীকরণে, অনুভূতিতে, রসের উচ্ছ্বাসে যাহা যত প্রচুর সম্ভোগে ভূয়িষ্ঠ হইয়া উঠিবে, তাহাকে সেই পরিমাণে সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলা যায়।' ('সাহিত্য-পরিচয়')

এখানে 'তাৎপর্য্য' শব্দ ছাড়া অন্য কোথাও **intellect** বা বুদ্ধি বা এজাতীয় কোন কিছুর উল্লেখ নাই। বোধ হয় এই অভাব পূরণ করিবার জন্যই তিনি একটু পরেই বলিয়াছেন:

'রূপ-রসাদির বোধ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা, রাগ, দ্বেষ, প্রীতি, অপ্রীতি, মত, স্মৃতি, সংস্কার প্রভৃতি লইয়া যে অখণ্ড অনুভূতিপুরুষটি গড়িয়া উঠেন তাঁহারি আত্মপ্রকাশে সাহিত্যের সৃষ্টি।' ('সাহিত্য-পরিচয়')

এই সংজ্ঞায় সব কিছুই আছে আবার কোন কিছুই নাই; ইহা ধাঁধাঁ লাগাইতে পারে, কিন্তু আলো দিতে পারে না।

মনে হয় অন্য আলংকারিক মত অপেক্ষা সুরেন্দ্রনাথ কুন্তকের বক্রোক্তি-বাদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে কুন্তক যেরূপ সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের সব দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা ধ্বনিকার ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদের লেখায় পাওয়া যায় না।' (কাব্য-বিচার—পৃঃ ৮৬) এই মতের একটু পরীক্ষা করা দরকার। গ্রন্থের নাম হইতেই বুঝা যায় যে কুন্তক উক্তির বা ভণিতির বৈচিত্র্যকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। বক্রোক্তি হইতেছে উক্তির বৈদগ্ধ্য অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অভিধানব্যতিরেকী শব্দচয়ন ও শব্দযোজনার কবিকৌশল।

তিনি কবির অপূর্ব্ব বস্তুনির্মাণক্ষমা প্রতিভাকে মানিয়া লইয়া বলিবার ভঙ্গি বা কৌশলের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রথম উন্মেষে বক্রোক্তির সংজ্ঞা দিয়া তিনি অলংকার, গুণ প্রভৃতির বিচার করিয়াছেন। দ্বিতীয় উন্মেষের বিষয় বর্ণবিন্যাস-বক্রতা, তৃতীয় উন্মেষে তিনি আলোচনা করিয়াছেন বাক্যবৈচিত্র্যবক্রতার এবং চতুর্থ উন্মেষে প্রকরণবক্রতা ও প্রবন্ধবক্রতার। সমস্ত গ্রন্থটির আলোচনার বিষয় মুখ্যতঃ ভাষাসংযোজনের, অর্থ আসিয়াছে গৌণভাবে। কবি যে প্রতিভাবলে বক্রোক্তি রচনা করেন তাহাকে কুন্তক অনির্ব্বচনীয় বলিয়া মানিয়া লইয়া শুধু তাঁহার উক্তির চাতুর্য্যের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি যে যথেষ্ট বিশ্লেষণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার আলোচনা যে মূল্যবান্ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু এই আলোচনার পরিধি যে খুব সীমিত এই চেতনাও তাঁহার নিজেরই ছিল। কাব্যের সামগ্রিক আবেদনের বিশ্লেষণ কুন্তক করেন নাই ; তাঁহার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ইহা মানিয়া লইয়াই তাঁহার কৃতিত্বের বিচার করিতে হইবে। সুরেন্দ্রনাথ নিজেও বলিয়াছেন যে, **intultion** ও **expression** অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকিলেও ব্যুৎপত্তির সৌকর্য্যের জন্য কুন্তক ইহাদিগকে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন (পৃঃ ৬৮), কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কুন্তক শুধু উক্তির বক্রতাই দেখাইয়াছেন, অর্থের আলোচনা করিয়াছেন এই বৈচিত্র্যের অঙ্গ হিসাবে। ইহার পরেও কি বলা যায় যে, কুন্তক 'সাহিত্য সৌন্দর্য্যের সব দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়াছেন' ? বরং মনে হয়— কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেনও —যে কাব্যের মূল প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি আনন্দবর্দ্ধনাদি পূর্ব্বসূরিদের মত গ্রহণ করিয়া কবিকর্মের ভাষা-বৈচিত্র্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায়, দাশগুপ্ত যেখানে কোন একটি বিশেষ মতের প্রতি ঝুঁকিয়াছেন সেইখানেও মৌলিক সমস্যায় প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার আলোচনায় প্রকৃত কাব্য-বিচার বা সাহিত্য-পরিচয়ের বিশেষ নিদর্শন নাই।

॥ ৩ ॥

দুই জন আধুনিক বাঙ্গালী লেখক রসশাস্ত্র সম্পর্কে খুব উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন—ইঁহারা হইলেন দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত। আর একজনেরও নাম করিতে হয় যদিও তাঁহার কাজের বিস্তারিত আলোচনা এখানে অবান্তর হইবে। সুশীলকুমার দে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের তথ্যপূর্ণ ইতিহাস রচনা করেন ; তিনিই সর্ব্বপ্রথমে অভিনবভারতীর রসবিষয়ক

আলোচনা সম্পাদন করেন, তিনিই লোচনের চতুর্থ উদ্দ্যোত আবিষ্কার করেন। তৎসম্পাদিত 'বক্রোক্তিজীবিত' সম্পাদনার আদর্শস্থানীয়। কিন্তু সুশীলকুমার ঐতিহাসিক ও সম্পাদক; সাহিত্যতত্ত্বের বিচার ও বিশ্লেষণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সেইজন্য তাঁহার কাজের বিস্তারিত বিবরণ বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয় হইতে পারে না।

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য The Concept of Rasa-নামক একটি প্রবন্ধ লিখেন ইংরেজিতে (Studies in Philosophy, First Volume, pp. 349-63)। বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার ধারায় এই প্রবন্ধের আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইবে কিনা এই প্রশ্ন প্রথমেই উঠিবে। ইহা দার্শনিক প্রবন্ধ; লিখিত হইয়াছে ইংরেজিতে এবং কোথাও বাংলা সাহিত্যের উল্লেখ নাই। কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া অযৌক্তিক হইবে না বলিয়া মনে করি। আধুনিক ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের চিন্তা যে সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক ইহা সকলেই স্বীকার করেন; কেহ কেহ তো মনে করেন আধুনিক ভারতে তিনিই একমাত্র দার্শনিক। তিনি বাঙ্গালী; তাঁহার প্রবন্ধটির মূল অংশ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭৪)। অন্ততঃ এই অনুবাদের মারফতে কৃষ্ণচন্দ্রের অসামান্য মৌলিকতা বাংলার সমালোচনাকে প্রভাবিত করিবে এইরূপ আশা করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণচন্দ্রের মতে, রসের অর্থ—নান্দনিক সম্ভোগ; ইহা একটা অনুভূতি; অন্ততঃ ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে, রসকে বুঝিতে হইলে অনুভূতির পথেই যাইতে হইবে। রস আর ন্যায়শাস্ত্রের সামান্য সত্য এই দুই মোটেই এক নয়। রস আর আদর্শ (spiritual ideal)—এরাও এক নয়। রস এক বিশিষ্টতম শুদ্ধতম অনুভূতি (the feeling par excellence)—আমাদের মনে একটি সম্পূর্ণ অভিনব ভূমিতে ইহার অধিষ্ঠান।*

বুদ্ধি বা ন্যায়শাস্ত্রের সামান্য সত্য (logical universal) অথবা আধ্যাত্মিক আদর্শ ইহাদের কথা বাদ দিয়া দেখা যাইতে পারে কোন্ অর্থে—ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের মতে—রসসম্ভোগকে বিশিষ্টতম, শুদ্ধতম (the feeling par excellence) বলা যাইতে পারে। এই অনুভূতি অন্য সকল অনুভূতি হইতে উচ্চতর স্তরের। এই যে শ্রেষ্ঠতা বা বিশুদ্ধতা ইহার মূলে

* বর্ত্তমান আলোচনায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়ের অনুবাদ অনুসরণ করা হইতেছে।

রহিয়াছে বন্ধন হইতে মুক্তি। আমাদের প্রাথমিক স্তরে যে সকল অনুভূতি থাকে সেইখানে আমরা অনুভূতির বিষয়ের মধ্যে লীন হইয়া যাই ; বিষয় হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি না। ভীত ব্যক্তি ভয়ানক জিনিষে এমন একটা কিছু দেখিতে পায় যাহা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। যে ভয় তাহার মনে জাগ্রত হইয়াছে তাহা ভয়ংকর বস্তুকেও মণ্ডিত করিয়া আছে। যে শিশু খেলনা ভালবাসে সে বিষয়ের অর্থাৎ খেলনার সঙ্গে নিজের পার্থক্যকে, অথবা বিষয় হইতে নিজের দূরত্বকে, বজায় রাখিতে পারে না। বিষয়বস্তুর আকর্ষণে ভোক্তা নিজেই আসিয়া যেন বিষয়ে সংসক্ত হয়, বিষয়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে।

সহানুভূতি অনুভূতি হইতে ভিন্ন রকমের—ইহা মনের আর এক স্তরের ব্যাপার। সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি মূল অনুভূতির বিষয়বস্তু অপেক্ষা একটু দূরে থাকে। 'কোন শিশু যখন তার খেলনা নিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে, তখন শিশুটির মন খেলনাতে যে ভাবে আসক্ত, আমার মন কিন্তু খেলনাতে সে ভাবে আসক্ত নয়। আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়ে আছে শিশুর মনের আনন্দ-সম্ভোগের দিকেই। আনন্দের প্রতি সহানুভূতি নিজেও একটা আনন্দের অনুভব বটে, কিন্তু প্রাথমিক আনন্দানুভূতির থেকে তা মুক্ততর।' মুক্ততর হইলেও তাহা মুক্ত নয়, সহানুভূতিও অনুভূতির সঙ্গে বিষয়বস্তুতে খানিকটা সংলগ্ন থাকে। যে ভীত ব্যক্তির সঙ্গে সহানুভূতি করে সে ভয়ের বিষয়বস্তুকে ভয়ংকর রূপে দেখে না, কিন্তু ভয়ংকরত্বের কল্পনা করিয়া লয়। এখানে সংলগ্নতা অনুভূতির বিষয়ের সঙ্গে ততটা নয়, যতটা অনুভবকারী ব্যক্তির সঙ্গে এবং তাহারই মারফতে বিষয়বস্তুও সহানুভূতিকে আচ্ছন্ন করে। ইহার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত রুগ্ন শিশুর সঙ্গে মা'র সহানুভূতি। মা শিশুর সঙ্গে এতই একাত্ম যে তাঁহার কাছে শিশুর কষ্ট কল্পনায় অনুভূত নয় ; ইহা অনেকটা তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতির অঙ্গ।

কিন্তু আর এক রকমের অনুভূতি আছে যাহাকে বলা যাইতে পারে সহানুভূতির—প্রতি—সহানুভূতি (sympathy with sympathy)। এখানে অনুভূতি প্রাথমিক অনুভূতির বিষয়বস্তু হইতে তিন ধাপ দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং প্রাথমিক অনুভূতির যে ব্যক্তি বিষয়ী বা কর্ত্তা তাহার সঙ্গেও কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। মনে করা যাক্ কোন শিশু একটি খেলনা লইয়া খেলা করিতেছে আর তাহার ঠাকুর্দা তাহা উপভোগ করিতেছেন। শিশুটি খেলনাটিতে তন্ময় হইয়া আছে। যে পিতামহ শিশুটির সঙ্গে সহানুভূতিতে মুগ্ধ হইয়া খেলাটি দেখিতেছেন, তিনি খেলনার মধ্যে মগ্ন হয়েন নাই, 'কিন্তু

পিতামহের এই অনুভূতির মধ্যে ব্যক্তিগত ভাল-লাগার নির্ব্বাচন ক্রিয়াশীল, এখনো এর মধ্যে এক বিশেষ অনুভূতির প্রতি পক্ষপাত বর্ত্তমান।' শিল্পানুভূতি কিন্তু একেবারে ধ্যানাত্মক ('contemplative) এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ। যে শিল্পী পিতামহের সহানুভূতির সঙ্গে সহানুভূতি বোধ করিবেন, তিনি শিশুর আনন্দানুভূতির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব আচ্ছন্ন হইবে না। শিল্পীর জবানীতে কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, 'I can no longer feel the distinction between my feeling and the child's feeling, as the old man does between his feeling and the child's feeling. My personality is, as it were, dissolved and yet I am not caught in the object like the chiid. I freely became impersonal.' (বৃদ্ধটির মনে শিশুর অনুভূতি আর তাঁর নিজস্ব অনুভূতি এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের বোধটি যেমন সজাগ, আমার মনে কিন্তু এখন আর শিশুর অনুভূতি এবং আমার নিজের অনুভূতির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্যের সচেতনতা নেই। আমার ব্যক্তিত্ব যেন বিগলিত হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে, অথচ এই শিশুটি যেমন তার অনুভূতির বিষয়বস্তুতে বাঁধা পড়েছে, আমি মোটেই তা পড়ি নি। আমি হয়ে উঠেছি নৈর্ব্যক্তিক—সহজে এবং বিনা বাধায়।)

শিল্পানুভূতিকে বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া কৃষ্ণচন্দ্র তিনটি পুরুষের কল্পনা করিয়াছেন—প্রথম যে কোন কিছু অনুভব করে, দ্বিতীয় যে সহানুভূতি দেখায় এবং তৃতীয় (শিল্পী) যে সহানুভূতির-প্রতি-সহানুভূতি বোধ করে। প্রথম ব্যক্তি শিল্পী হইতে পারে না, কারণ সে বিষয়ের মধ্যে মগ্ন, আবদ্ধ। দ্বিতীয় ব্যক্তি বিষয় হইতে মুক্ত—পিতামহের কাছে খেলনার কোন মূল্য নাই—কিন্তু প্রথম অনুভবকারীর প্রতি মায়ায় আবদ্ধ; তৃতীয় ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত এবং এই বন্ধনহীনতার জন্যই সে প্রথম ব্যক্তির অনুভবের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে অথচ তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। বিষয়ের ও বিষয়ীর বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য অনুভূতিকে তিন স্তরের মধ্য দিয়া পরিস্রুত করিয়া লওয়ার দরকার। প্রত্যেক শিল্পকর্ম্মের মধ্যেই এই তিন স্তর আছে; সাধারণতঃ শিল্পীর মনের মধ্যেই এই তিনটি ব্যক্তি সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়—আমি, তুমি, রাম শ্যাম যে কেহ। কৃষ্ণচন্দ্র পুরাণ-কল্পনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহার নাম করিয়াছেন—সর্ব্বজনীন হৃদয় ('...the felt person-in-general may be semi-mythologically called the

'Heart Universal')। কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সাহিত্য বা শিল্প হইতে কোন দৃষ্টান্ত দেন নাই। তাঁহার মত বুঝাইবার জন্য আদি কবির আদি শ্লোকের কথাই বলা যাইতে পারে। প্রথমে মুনি বাল্মীকি ব্যাধের নৃশংস কাণ্ডে শোক অনুভব করিলেন। তারপর তিনি শাশ্বত কালের পটভূমিকায় এই শোককে সন্নিবেশিত করিলেন; ইহাই Heart Universal * বা সর্বজনীন হৃদয়ে অনুভব করা; তৃতীয় স্তরে কবি বাল্মীকির শোক শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইল।

কৃষ্ণচন্দ্র যে ভাবে শিল্পানুভূতির বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, বিষয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া শিল্পকর্ম্মের অন্যতর প্রধান সমস্যা; ইহাকেই মূল সমস্যা বলা বলা যাইতে পারে। এই ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য শিল্প ও শিল্পালোচনায় পার্থক্য দেখা যায়। কবির (বা শিল্পীর) প্রধান কাজ অনাসক্ত দৃষ্টিতে বিষয়কে অনুভব করা; ইহার নাম বিষয় হইতে মুক্ত হওয়া। ইহা দুই ভাবে সম্ভব হইতে পারে। প্রাথমিক অনুভবে—লৌকিক অভিজ্ঞতা বা রতি, শোক প্রভৃতি ভাবে—বস্তু ও অনুভব ইহাদের পার্থক্যবোধটা লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যেও দুইটি বিভিন্ন দিকে ঝোঁক দেখা যায়। যদি বিষয়ের দিকে ঝোঁক থাকে, তাহা হইলে নিজের সম্পর্কে সচেতনতা বা আত্মবোধ ক্ষীণ হইয়া আসে, বস্তুটিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া যায়। কিন্তু যিনি অনুভব করিতেছেন—অর্থাৎ ভোক্তা—তিনি অন্তর্ম্মুখীও হইতে পারেন, তখন বাহিরের জগৎ তাঁহার কাছে অস্পষ্ট হইয়া আসিবে, তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তির কাছে বাহিরের জগৎ যেমন ছায়াছবির মত মিলাইয়া যায়। সহানুভূতির মধ্যেও এই দ্বিমুখী ঝোঁক সম্ভব; আমি নিজের সংকীর্ণ সত্তা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া যাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেছি তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে পারি; অথবা তাহাকে টানিয়া আনিয়া আমার সঙ্গে একাত্ম করিতে পারি। আমি নিজেকে তাহার প্রতি আক্ষিপ্ত করিতে পারি অথবা তাহার অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করিতে পারি।

এইভাবে বলা যাইতে পারে যে, শিল্পসম্ভোগেও দুই রকমের অভিযান সম্ভব। বস্তুর মধ্যে যে সৌন্দর্য্য দেখি বা রস আস্বাদন করি, তাহা চিরন্তন, স্বয়ংসিদ্ধ মূল্য (value)। বস্তু তাহার প্রতীকমাত্র। এমন হইতে পারে যে, বস্তু তাহার তথ্যগত বিশিষ্টতা অটুট রাখিয়াছে, কিন্তু বস্তুকে অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্য্য বা শাশ্বত মূল্য প্রতিভাত হইতেছে। অথবা এমন

* 'শাশ্বতীঃ সমাঃ' এবং 'Heart Universal' – ইহাদের মধ্যে শব্দার্থগত সাদৃশ্য আছে।

হইতে পারে যে বস্তুর তথ্যগত রূপ মিলাইয়া গিয়াছে ; হৃদয়ে শুধু লোকাতিশায়ী, শাশ্বত রসমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে।* যে ভাবেই দেখা যাক্, যে মূল্যবোধ সঞ্চারিত হইল, বস্তু যাহার প্রতীকমাত্র, তাহার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিতে হইবে। বন্ধনমুক্ত ভোক্তা বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন অথবা বস্তুর কঠিন দেহ দ্রবীভূত হইয়া যাইতে পারে এবং সম্ভোগকর্ত্তা অনুভব করেন যেন বস্তুর আত্মাটি বস্তু হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া তাঁহার সম্ভোগের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে। প্রথম পথের নাম সৌন্দর্য্যদর্শন—ইহাই ইউরোপীয় শিল্প সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ইহা objective বা বস্তুনিষ্ঠ। দ্বিতীয় পথের নাম রসাস্বাদ। ইহা অন্তর্মুখী। ইহাই ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা। এইভাবে বিচার করিলে বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপীয় শিল্পচর্চ্চা objective ; আর ভারতীয় শিল্পচর্চ্চা subjective ; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে উভয়ত্র শিল্পের লক্ষণ তিনটি—রূপাভিব্যক্তি (expression), বস্তু হইতে দূরত্ব (detachment from the object); নিত্যতা, চিরন্তনত্ব (eternity)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কৃষ্ণচন্দ্র শিল্প বা সাহিত্য হইতে কোন দৃষ্টান্ত দিয়া স্বীয় মতের ব্যাখ্যা করেন নাই। দুঃসাহসিক হইলেও আমরা সেই চেষ্টা করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় সাহিত্য ও ভারতীয় সাহিত্য হইতে নিসর্গবর্ণনার নিদর্শন লওয়া যাইতে পারে। কালিদাসের মেঘদূতে বহু প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা আছে—নদ, নদী, নগরী, ক্ষেত, মেঘ, তুষার ইত্যাদি। এই বর্ণনার বাস্তবভিত্তি সুদৃঢ় ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীন ভারতের ভূগোল উদ্ধার করিয়া মেঘের যাত্রার তথ্যগত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের কাব্যে নদী গিরি সবকিছুই যক্ষের অনুভূতির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে ; কবি যে এইভাবে বহির্জ্জগৎকে আত্মস্থ করিতে বা assimilate করিতে পারিয়াছেন ইহাই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব। পূর্ব্বমেঘে বস্তুর রূপ সমধিক স্পষ্ট ; তাহার আবরণ সমধিক কঠিন। তাই সেখানে তাঁহার ক্ষমতাও খুব বিস্ময়কর। তবে এখানে উত্তর

* 'The object that is the symbol may retain its definite character of fact and express a value as its transcendent significance, or its fact-character may get evanescent while the value symbolised gets defined out as a subtle spirit-from, as a dream floating in the ether of the heart and nowhere in space and time.'

মেঘ হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ; সেইখানে ইহা সহজভাবে উপলব্ধি করা যাইবে :

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ।।

('শ্যামলতায় তোমার দেহ, চকিতহরিণীর নয়নে তোমার দৃষ্টিপাত, চন্দ্রে তোমার মুখপ্রতিবিম্ব, শিখীর পুচ্ছভারে তোমার কেশরাশি, ক্ষীণ নদীতরঙ্গে তোমার ভ্রূবিলাস দেখছি। হায় চণ্ডি, তোমার সাদৃশ্য একত্র কোথাও নেই।' —রাজশেখর বসুর অনুবাদ) শ্যামলতা, চকিতহরিণী, ময়ূর, চন্দ্র, নদীতরঙ্গ—বস্তুজগতে ইহাদের যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা দ্রবীভূত হইয়া যক্ষের অনুভূতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ইহার সঙ্গে তুলনা করুণ পার্ডিটার পুষ্পশোভার :

Daffodils
That come before the swallow dares, and take
The winds of March with beauty, violets dim,
But sweeter than the lids of Juno's eyes
Or Cytherea's breath ; pale primroses,
That die unmarried, ere they can behold
Bright Phoebus in his strength, a malady
Most incident to maids ; bold oxlips and
The crown imperial, lilies of all kinds,
The flower-de-luce being one.

(*The Winter's Tale*, IV. iii. 118-27)

শেক্সপীয়রের এই বিখ্যাত বর্ণনায় প্রকৃতি তাহার বাস্তব বৈশিষ্ট্য অটুট রাখিয়াছে, কিন্তু পার্ডিটার কল্পনা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার রূপ ছানিয়া লইয়াছে, যেমন করিয়া ডেফোডিল পুষ্প প্রথম বসন্তের বাতাসকে অতর্কিতে ধরিয়া ফেলিয়া তাহার উপর সৌন্দর্য্য ছিটাইয়া দিয়াছে। সৌন্দর্য্য দেখা ও রসাস্বাদ মূলতঃ এক, কিন্তু গতিতে, ভঙ্গিতে পার্থক্য আছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের রসবিচার খুব দুরূহ তত্ত্ব। ইহার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা হয় নাই। উপরে যে সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল তাহা প্রথম ব্রতীর চেষ্টা ;

পাঠক ইহাকে সেই ভাবেই দেখিবেন। এই তত্ত্বে সমালোচনা করিতে যাওয়া আরও দুঃসাহসের কাজ। তবু দুইটি প্রশ্ন মনে আসিয়াছে; সসংকোচে তাহার উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। (১) কৃষ্ণচন্দ্র পর পর তিন ব্যক্তির অনুভবের কথা বলিয়াছেন, তাঁহার মতে তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ কবি-শিল্পী বিষয়ী হইতে মুক্ত হইয়া প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করিতে পারেন, ইহার নির্যাসটুকু গ্রহণ করিতে পারেন। (অনুচ্ছেদ—৯) কিন্তু তিনি এত দূরে সরিয়া গিয়াছেন যে সেইখানে অনুভূতি ফিকে হইয়া যাওয়ারই কথা। কাব্য ও শিল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষণ তীব্রতা। তৃতীয় ব্যক্তির পরিস্রুত অনুভূতিতে এই তীব্রতা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে কি? (২) যে তিনটি ব্যক্তির কথা কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বজনীন হৃদয় (Heart Universal) দ্বিতীয়; শিল্পস্রষ্টা তৃতীয়। কিন্তু কবি কি প্রথমে শাশ্বত কালের সাক্ষ্য নেন না। তিনি প্রাথমিক অনুভূতিই এমনভাবে রূপান্তরিত করেন যাহাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিশ্বজনীন আবেদন লাভ করে? অর্থাৎ Heart Universal দ্বিতীয় ব্যক্তি না তৃতীয় ব্যক্তি? ইহা শুধু ক্রমের প্রশ্ন নয়। কবি কি কৌশলে ব্যক্তিগত, সীমিত অনুভবকে অসীমের ক্ষেত্রে প্রসারিত করেন তাহাই সাহিত্যতত্ত্বের গোড়ার প্রশ্ন। সেইজন্য বিশ্বজনীন আবেদন—যাহা কাব্যের ফল -তাহাকেই তৃতীয় বা শেষ কক্ষ্যায় প্রতিষ্ঠিত করা যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া মনে হয়।

॥ ৫ ॥

অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' বাংলা সাহিত্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ। সাহিত্যশাস্ত্র বা সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্পর্কে বাংলায় যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে শুধু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনার সঙ্গেই এই গ্রন্থের তুলনা করা যাইতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্পর্কে; কাব্যসৌন্দর্য্য ইহার অংশবিশেষ। অতুলচন্দ্র লিখিয়াছেন সোজাসুজি কাব্যরস সম্পর্কে। তাঁহার রচনা কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গবেষণার মত মৌলিকতা দাবি করিতে পারে না, কারণ তিনি শুধু আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনব গুপ্তের মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তবু তাঁহার আলোচনা স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। তিনি মনে করেন যে, কোন দেশে কোন কালে আর কেহ কাব্যের সম্বন্ধে এমন খাঁটি কথা বলেন নাই।

তাঁহার এই দাবির বিচার এইখানে প্রাসঙ্গিক হইবে না। আমি এই বিষয়ে অন্যত্র যাহা বলিয়াছিলাম তাহারই পুনরাবৃত্তি করিব। কাব্যে যে সংস্কার কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা শুধু আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্তের নয়, তাহা আনন্দবর্দ্ধন, অভিনব গুপ্ত ও অতুলচন্দ্র গুপ্তের। তিনিই ভারতীয় রসবাদকে আধুনিক সাহিত্যশাস্ত্রের পরিবেশে ফেলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছেন। অপরের মত ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি মৌলিক চিন্তাশীলতারও পরিচয় দিয়াছেন।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে আর কৃষ্ণচন্দ্রের The Concept of Rasa—যখনই লিখিত হউক—প্রকাশিত হইয়াছে 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধগুলির ত্রিশ বৎসর পর। কিন্তু তাঁহার রসতত্ত্বব্যাখ্যা কৃষ্ণচন্দ্রের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। ভারতীয় রসবাদ বাস্তবিকই অন্তর্ম্মুখী এবং অতুলচন্দ্রের রচনায় এই অন্তর্ম্মুখীনতা আরও তীক্ষ্ণ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রধান গুণ মৌলিকতা ও প্রগাঢ়তা, 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'-য় পাই প্রসাদ ও দীপ্তি। ভারতীয় রসশাস্ত্র খুব জটিল ও দুরূহ ব্যাপার। অতুলচন্দ্র ইহাকে সূর্য্যালোকের মত স্বচ্ছ করিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যাখ্যা সূর্য্যালোকের মতই দীপ্তিমান্। 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'র আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ ইহার সুসঙ্গত, সুষম গঠন। একটি অনুচ্ছেদের পর আর একটি অনুচ্ছেদ, একটি প্রবন্ধের পর আর একটি প্রবন্ধ—ইহাদের মধ্য দিয়া বক্তব্য কথা ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে, কোথাও থামে নাই, কোথাও দক্ষিণে বামে হেলে নাই, কোথাও অবান্তর কথার চাপে ঢাকা পড়ে নাই। ইহার গঠনকৌশল শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম্মের—ধরুন, সফোক্লিসের কোন নাটকের—দেহসৌষ্ঠবের কথা মনে করাইয়া দেয়।

অতুলচন্দ্রের আলোচনার প্রধান কথা—রস ইমোশন নয়। এইখানে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি ছোট বড় লেখকের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য। আর এইখানেই বস্তুজগৎ ও কাব্যজগতের পার্থক্য। মনের মধ্যে ভাবকে সঞ্চারিত করা, অথবা নিজের ভাব নিজের কাছে প্রকাশ করা, ইহা কাব্যের বিষয় নহে। কাব্যেও ভাব অভিব্যক্ত হয়, ব্যঞ্জনার অর্থই প্রকাশ, কিন্তু সে এক বিশেষ উপচরিত প্রয়োগের বলে যেখানে প্রকাশ ও স্বরূপের সাক্ষাৎকারে কোন পার্থক্য থাকে না। অতুলচন্দ্র বলিয়াছেন, 'মনে যাতে

"ভাব" উদ্বুদ্ধ হয়, তাই যদি কাব্য হ'ত, তবে আজ বাঙ্গালা দেশে যে সব হিন্দু-মুসলমান খবরের কাগজ মুসলমানদের উপর হিন্দুর, ও হিন্দুর উপর মুসলমানের ক্রোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, তারা প্রথম শ্রেণীর কাব্য হ'ত।' রস ও 'ভাবের উচ্ছ্বাস' এক বস্তু নয়।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নন্দনতত্ত্ববিদ্ ক্রোচের মতের সঙ্গে কোথাও কোথাও অভিনব গুপ্তের রসবাদের সাদৃশ্য আছে এই কথা অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন এবং তিনিই এই সাদৃশ্য সর্ব্বপ্রথমে দেখাইয়াছেন। ইহার পরে এই সাদৃশ্যের কথা কোন ভারতীয় দার্শনিক বোধ হয় ক্রোচেকে বলেন এবং এই বক্তাকে 'ক্রোচেবিজয়ী দার্শনিক' বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হয়! অতুলচন্দ্র এই আধুনিক ভারতীয় দার্শনিকের ঢক্কানিনাদ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নাই। এইখানে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করার উদ্দেশ্য এই যে, অভিনবের সঙ্গে ক্রোচের অন্যতম মতের সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও আছে। এই পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম, কিন্তু রসানুভূতি ব্যাপারটাই তো সূক্ষ্ম। ক্রোচের মতে, আমাদের যে সকল প্রাথমিক অনুভব (impression) হয় অথবা মনে যে সকল প্রাথমিক প্রবর্ত্তনা (impulse) জাগে সেই সব এলোমেলো, অস্ফুট ব্যাপারকে কেন্দ্রীভূত, সংহত রূপ দেওয়া (intuition) বা কবিপ্রতিভার কাজ। সুতরাং এই intuitionকে বলা যাইতে পারে expression বা অভিব্যক্তি; ইহা প্রতীতিও বটে, নির্ম্মাণও বটে, কিন্তু প্রধানতঃ প্রতীতি। অভিনব বলেন, আমাদের মনে যে সকল ভাব বা বাসনাসংস্কার থাকে তাহা নানা বাধার দ্বারা বিঘ্নিত হয়। কবির প্রতিভা বাহিরের বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির সাহায্যে এই বিঘ্ন অপসারণ করিয়া ভগ্নাবরণ চৈতন্যকে আস্বাদ্যমান করেন। এই প্রতীতি প্রধানতঃ আবরণ উন্মোচন বা বিঘ্নাপসারণ, নূতন রূপদান বা নির্ম্মাণ নয়। শুধু analogy বা উপচারবলেই ইহাকে অভিব্যক্তি বা সৃষ্টি বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে, যাহা আছে ইহা তাহারই সম্ভোগ বা সাক্ষাৎকার।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত ক্রোচের সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েন নাই। সুতরাং তাহার বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেন নাই; শুধু প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বিষয় ধ্বনি ও রসের বিচার এবং এই মতের সার্ব্বজনীনতা প্রমাণ করা। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্তের থিওরি তাঁহার আলোচনার মধ্য দিয়া বিস্তৃতিও লাভ করিয়াছে। তিনি যখন 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি লিখেন—১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রবন্ধগুলি

প্রকাশিত হয়—মনে হয় তখন রামকৃষ্ণ কবি-সম্পাদিত 'অভিনবভারতী' বাহির হয় নাই। ঐ গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯২৬ সালে। ভূমিকায় এই গ্রন্থের উল্লেখ থাকিলেও মূলে তাহার সঙ্গে পরিচয়ের নিদর্শন নাই। ইহার পূর্ব্বে সুশীলকুমার দে যে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ নাই। এই সব কথা বলিতেছি দুই কারণে। অভিনবভারতীর সাক্ষ্য না লইয়া, শুধু ধ্বন্যালোক ও লোচন-টীকার উপর ভিত্তি করিয়া রসতত্ত্বের এইরূপ বিশদ আলোচনা খুবই বিস্ময়কর মনে হয়। অপর পক্ষে ইহাও মনে হয় যে, অভিনব-ভারতীর সাহায্য লইলে এই আলোচনা পূর্ণতর হইত; যে সব প্রসঙ্গ বাদ পড়িয়া গিয়াছে সেই সকল প্রসঙ্গও সন্নিবেশিত হইত।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত কবিকর্ম্মকে বর্ণনা করিয়াছেন লৌকিক ভাবকে রসে রূপান্তরীকরণ প্রক্রিয়া হিসাবে। ইহাও খানিকটা উপচরিত প্রয়োগ (analogy)। রসের মৌলিক উপাদান ভাব বা ইমোশন মনের মধ্যেই থাকে এবং মনেই ইহা আস্বাদিত হয়; অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, ইহা 'স্বচিত্তবৃত্তিসমাস্বাদ্যসারঃ'। কবি প্রতিভাবলে বাহিরের বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি এবং শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা মনোগত ভাবকে আস্বাদ্যমান করেন। এই অর্থেই ভাব রসরূপতা প্রাপ্ত হয় বা অভিব্যক্ত হয় বা সঞ্চারিত হয়। কবি নিজের মনের ইমোশন অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করেন এইরূপ বলিলে ঠিক হইবে না। এই প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র কাণ্টের দর্শনের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি নিজে তুলনাটি শেষ পর্য্যন্ত না টানিলেও তাঁহার আলোচনা হইতেই কাণ্টের দর্শনের সঙ্গে অভিনবগুপ্তের রসবিচারের পার্থক্যও অনুমিত হইবে। কাণ্টের মতে, আমাদের জ্ঞানের উপাদান আসে বাহিরের জগৎ হইতে; সেই উপাদানকে জ্ঞানে পরিণত করে মন তাহার কতকগুলি **categories** বা তত্ত্ব দিয়া। কিন্তু অভিনব, অতুলচন্দ্র প্রভৃতির মতে রসের মূল উপাদান কবি-সহৃদয়ের মনে; তাহাকে রসে রূপান্তরিত করে বাহিরের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা প্রভৃতি বিভাবাদি। অভিনব বলিয়াছেন, এই জন্যই ভাবকে বাদ দিয়া ভরত রসের এই সূত্র নির্দ্দেশ করিলেন, 'বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়'। ভাবই রসের উপাদান, উপচারবলে বলা যায়, ভাবই রসে পরিণত হয় অথচ ভরত ভাবেরই উল্লেখ করিলেন না। ইহার কারণ, ভাব স্বীয় চিত্তবৃত্তির অবস্থাবিশেষ আর রূপান্তরীকরণের উপায়—বিভাবাদি—আসে বাহির হইতে।

উপরে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা হইতেই কৃষ্ণচন্দ্রের

মতের সার্থকতাও প্রমাণিত হইবে। ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্র বা রসতত্ত্ব **subjective** অর্থাৎ বিষয়িগত, বিষয়গত নহে। কবি বা সামাজিকের নিজ নিজ চিত্তবৃত্তিতেই ইহা অধিষ্ঠিত। ইহা প্রমাণব্যাপার নহে, আজ্ঞাশাস্ত্র নহে, ইতিহাসের মত ঘটনার যথাযথ বিবরণও নহে। ইহার একমাত্র মানদণ্ড আস্বাদযোগ্যতা। কাব্যে নীতিকথা আছে কিনা, সাহিত্যিকের জীবনদর্শন কি, বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করা হইয়াছে কিনা এই সব প্রশ্নও অবান্তর। এখানকার একমাত্র ঔচিত্য রসের ঔচিত্য, সমাজ বা ধর্মের ঔচিত্য নয়।

আনন্দবর্দ্ধন হইতে অভিনব গুপ্ত, অভিনব গুপ্ত হইতে অতুলচন্দ্র গুপ্ত—রসবাদের এই ধারা পর্য্যালোচনা করিলে ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের ক্রমবর্দ্ধমান **subjectivity** বা অন্তর্মুখীনতা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। আনন্দবর্দ্ধন ব্যঞ্জনাবাদ প্রচার করিয়াছেন; তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়াছেন, ধ্বনিই কাব্যের আত্মা, কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বাচ্য ব্যঙ্গ্যের ভিত্তিভূমি; বাচ্য ব্যঙ্গ্যের কাছে নিজেকে গৌণ করিলেও একেবারে লুপ্ত হয় না; আলোকার্থী যেমন দীপশিখায় যত্নবান্ হয়েন সেইরূপ যিনি ব্যঙ্গ্য অর্থ চাহিবেন তিনি বাচ্যের প্রতিও মনোযোগী হইবেন। এইভাবে শাস্ত্র-ইতিহাসমূলক বাচ্য অর্থ রস-প্রতীতিজনক ব্যঙ্গ্যের পরিপোষক হইবে। আনন্দবর্দ্ধন ধ্বন্যালোক-গ্রন্থের চতুর্থ উদ্দ্যোতে মহাভারতের মধ্যে শান্তরসের প্রাধান্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা নীতিঘেঁষা ব্যাখ্যা। সেই ব্যাখ্যাতে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য, নীতিশিক্ষা ও রসাস্বাদ একই সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আনন্দবর্দ্ধনের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:

যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমনিশং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়ন ত্বদ্ভক্তিতুল্যং সুখম্ ॥৩।৪৩*

(হে সমুদ্রশয্যাশায়ি, কবিদিগের যে নবীন দৃষ্টি রসসমূহকে রসান্বিত করিতে ব্যাপৃত থাকে, পণ্ডিতদের যে দৃষ্টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত বিষয়ের উন্মেষণে নিয়োজিত, আমরা এই দুইটিকেই অবলম্বন করিয়া বিশ্বকে

* সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই শ্লোকটি অভিনব গুপ্তের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (কাব্য-বিচার—পৃঃ ১৩৪) তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও মূলানুগ বলিয়া মনে হয় না।

নিঃশেষে বর্ণনা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু তোমার প্রতি ভক্তিতুল্য সুখ আমরা একেবারেই পাই নাই।)

লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে যে, আনন্দবর্দ্ধন এখানে কবির দৃষ্টি ও পণ্ডিতের বুদ্ধি ইহাদের পৃথক্ করিয়া দেখিয়াছেন আবার ইহাদিগকে একসঙ্গে যুক্ত করিয়াই ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এই শ্লোক হইতে মনে হয় যে, তাঁহার মতে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে ইহারা উভয়েই বিশ্বকে বর্ণনা করে আর পার্থক্য এই যে পণ্ডিতের বুদ্ধি নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে আর কবির দৃষ্টি বিশ্বকে নূতন ভাবে দেখে।

এই পার্থক্যই আরও স্পষ্ট হইয়াছে অভিনবগুপ্তের রসব্যাখ্যায়। তিনি চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির কথা বলিলেও রসকে অ-লৌকিকের ভূমিতে উন্নীত করিয়াছেন; সেখানে লৌকিক বুদ্ধি, লৌকিক জগতের ব্যবহার ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। আনন্দবর্দ্ধন মহাভারতের যে নীতিঘেঁষা ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কি ইহাও বলিয়াছেন শান্তরসের স্থায়ী ভাব নির্বেদ তত্ত্বজ্ঞান হইতে উত্থিত হয়। (লোচন ৪।৫) কিন্তু তারপরই বলিয়াছেন 'তত্র আস্বাদযোগাভাবে পুরুষেণার্থ্যত ইত্যয়মেব ব্যপদেশঃ সাদরঃ, চমৎকারযোগেন রসব্যপদেশ ইতি ভাবঃ'। অর্থাৎ শাস্ত্রনয়ে আস্বাদের সংযোগ না থাকায় মোক্ষকে পুরুষার্থ বলা যাইবে, চমৎকারিত্বসংযোগে শান্তরস বলা যাইবে। প্রশ্ন এই, চমৎকারিত্ব কি বাহিরের প্রলেপ মাত্র? যে তত্ত্বজ্ঞান হইতে স্থায়ী ভাব ও পরে রসাস্বাদ উত্থিত হয় রসাস্বাদব্যাপারে কি তাহার কোন ভূমিকা নাই? এই প্রশ্নটির যথাযথ মীমাংসা অভিনব করেন নাই। তাঁহার ঝোঁক রসের অ-লৌকিকতার দিকে, রসের আস্বাদের দিকে।

এই ঝোঁকটা অতুলচন্দ্র গুপ্তের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রাচীন আলংকারিকেরা চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা এমন কথাও বলিয়াছেন যে, কাব্যের উদ্দেশ্য লোককে রামের মত হইতে প্রবৃত্ত করা এবং রাবণাদির অনুকরণ হইতে নিবৃত্ত করা। কিন্তু অতুলচন্দ্রের মতে, এই ফলশ্রুতি 'আলংকারিকদের মনের কথা নয়, সমাজ ও সামাজিক লোকের সঙ্গে মুখের আপোসের কথা, তার প্রমাণ ও-সব কথা তাঁদের গ্রন্থারম্ভেই আছে, গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে তাদের লেশমাত্রেরও খোঁজ পাওয়া যায় না।' মহাভারতের যে ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা কিন্তু আনন্দবর্দ্ধনের গ্রন্থশেষে, গ্রন্থের

ফলশ্রুতি হিসাবেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় আইডিয়া বা তত্ত্বকথা গ্রন্থারম্ভে বা গ্রন্থশেষে নয় গ্রন্থের সবটার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত তিন শ্রেণীর সাহিত্যের কথা বলিয়াছেন—(১) যেখানে সামাজিক তত্ত্ব রসসৃষ্টিতে ঢাকা পড়িয়া যায়, যেমন শেক্সপীয়রের নাটকে ; (২) যেখানে ইহা এত প্রবল যে রসসৃষ্টিকে ব্যাহত না করিয়া তাহার সঙ্গে সহ-অবস্থান করে, যেমন টল্‌ষ্টয়ের 'বিগ্রহ ও শান্তি'-উপন্যাসে ; (৩) যেখানে উৎকট সামাজিকতাকে রসসৃষ্টি সংবরণ করিতে পারে না বলিয়া কাব্যত্বের লাঘব ঘটে, যেমন রম্যাঁ রলাঁর 'জ্যাঁ ক্রিসতফ' গ্রন্থে। প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর কথা বাদ দিয়া এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর কথাই বলা যাইতে পারে, কারণ সেইখানে সার্থক রসসৃষ্টির মধ্যে তিনি তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'ঐ সামাজিকতাকে একটা উপরি পাওনা হিসাবে গণ্য করা চলে।' কিন্তু ইহা কি ঠিক ? টল্‌ষ্টয়ের বিরাট উপন্যাস যে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসাবে গণ্য হইতেছে তাহার প্রধান কারণ ইহার মধ্যে একটা ব্যাপক ও প্রগাঢ় জীবনবোধ পরিচ্ছিন্ন মূর্তি পাইয়াছে। ইহা 'উপরি পাওনা' নহে, আসলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

রসব্যাখ্যার অভিযানে অগ্রসর হইয়া অতুলচন্দ্র গুপ্ত আরও সাহসী হইয়া বলিয়াছেন যে, কাব্যের সঙ্গে সত্যের কোন মৌলিক সম্বন্ধ নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সত্যকে খুব প্রেষ্টিজ দিয়াছে এবং আধুনিক যুগের প্রতিনিধি হিসাবেই কবি কীট্‌স সত্য সুন্দরের অদ্বৈতবাদ (Truth is beauty, beauty truth) প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। 'নইলে শুদ্ধ কবির চোখ থেকে এ সত্য কিছুতেই গোপন থাকে না যে, সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের উপাদান।' কাব্যের অন্যফলনিরপেক্ষত্বে অবিচল বিশ্বাস সমালোচককে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কাব্যের স্থায়ী মূল্য সম্পর্কেও সন্দিহান করিয়াছে। আধুনিক দর্শনের গতিবাদ ও রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতার বিশেষ করিয়া 'বলাকা'র সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাইয়া অনেকে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করিয়াছেন। অতুলচন্দ্রের মন অনেক বেশি সন্ধানী, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি অনেক বেশি সূক্ষ্ম, তাঁহার জিজ্ঞাসা অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও ব্যাপক। তিনি বলিয়াছেন, 'যেমন প্রাচীন যুগের অনেক কাব্য আমাদের মনে আর রস জোগায় না, তেমনি আমাদের নবীন যুগের অনেক কাব্যও আমাদের যে রস দেয় ভবিষ্যবংশীয়েরা তা থেকে ঠিক সে রস পাবে না।' তাঁহার মতে, ইহার দৃষ্টান্ত—আগেকার

আমলের Divina Commedia আর এখনকার আমলের 'বলাকা'। এইসব কাব্যের মূলে আছে কতকগুলি সঞ্চারী, ব্যভিচারী, সমসাময়িক কালে উদ্ভূত অস্থায়ী ভাব। সেই সব ভাব হইতে যে রস পাওয়া যায় তাহা চিরন্তন হইতে পারে না। তিনি দ্বিধা না করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'এ কথা কি অস্বীকার করা চলে যে, মধ্যযুগের খ্রীষ্টান কাব্যরসিক দান্তের "ডিভাইন কমিডি"তে যে রস পেতেন এ যুগের খ্রীষ্টান অখ্রীষ্টান কোনও কাব্যরসিক ঠিক সে রস পান না।' এই সকল কাব্যের স্থায়ী ভাবের রসই আমরা পাই, 'সঞ্চারী' ভাবের রস তখনকার আমলের পাঠক পাইত, কিন্তু আমরা সেই রস হইতে বঞ্চিত।

বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যবাদ তত্ত্বটা নূতন নয়; কিন্তু অতুলচন্দ্র গুপ্তের রচনায় ইহার যেরূপ শাণিত, জোরালো, দ্বিধাহীন অভিব্যক্তি পাওয়া যায় সেরূপ অভিব্যক্তি যে কোন দেশের সাহিত্যে বা নন্দনতত্ত্বে বিরল। 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচনাগ্রন্থের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। কাব্যকে নীতি বা মঙ্গলের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে যাইয়া অতুলচন্দ্র যে সকল যুক্তি দিয়াছেন তাহা তিনি একটি উপমার সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন : 'কাব্যের রসকে তাঁরা [প্রাচীন আলংকারিকেরা] সংসার-বিষবৃক্ষের অমৃতফল বলেই জানতেন।......একথা কি অস্বীকার করা যায় যে, গাছের ফলের কাজ তার মূলকে পরিপুষ্ট করা নয়।......নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্য্যয় না ঘটলে, মূলের কাজে ফলের কতটা সহায়তা, তা দিয়ে তার দাম যাচাইয়ের কথা কেউ ভাবে না। সেই ফলই কেবল গাছের পুষ্টি সাধন করে, যা মুকুলেই ঝরে যায়।' সত্য প্রতিপাদন সম্পর্কেও একই যুক্তি প্রযোজ্য, কারণ মানুষ যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তাহাই নীতি হিসাবে প্রচার করে। অতুলচন্দ্র যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার বিচার বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে ও অন্যত্র করা হইয়াছে। এইখানে শুধু তাঁহার দেওয়া উপমার আলোচনা করা যাইতে পারে, কারণ উপমা যুক্তিকে প্রত্যক্ষও করে আবার যুক্তির মধ্যে কোথায় ফাঁক আছে সেই দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতুলচন্দ্র একবার নীতিকে বলিয়াছেন রসবৃক্ষের মূল, ফল নয়, আবার বলিয়াছেন সত্য রসের উপাদান। বলা বাহুল্য, মূল ও উপাদান এক বস্তু নয় আর মূল ফলের লক্ষ্যও নয়। যে অভিনব গুপ্তের রসতত্ত্ব তিনি ব্যাখ্যা করিতেছেন, তিনিও উপাদানঘটিত উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু এই উপমা অন্যফলনিরপেক্ষত্ববাদ সমর্থন করে

কিনা সন্দেহ। অভিনব বলিয়াছেন, রস পানক রসের ন্যায়, বহু উপাদানের মিশ্রণ। পানকরস যিনি ঠিকমত আস্বাদ করিতে পারেন তিনি সমগ্র পানীয়ের আস্বাদ পান আবার গুড়মরিচাদি উপাদানেরও আস্বাদ পান। এই জটিল ও মিশ্র আস্বাদই রসাস্বাদ—ইহার মধ্যে ছন্দের ঝংকার ও পদলালিত্যের, লৌকিক ইতিহাস ও শাস্ত্রাদির, আস্বাদ আছে এবং ইহারা যে অ-লৌকিক রসে বিলীন হইয়া গিয়াছে তাহারও আস্বাদ আছে। অতুলচন্দ্র স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারী ভাবের যে পার্থক্য করিয়াছেন তাহা তাঁহার চিন্তার মৌলিকতার পরিচয় দেয়। কিন্তু সেইখানেও দুই একটি প্রশ্ন জাগে। সঞ্চারী ভাবের আস্বাদ ও স্থায়ী ভাবের আস্বাদ—ইহাদিগকে কি পৃথক্ করিয়া দেখা যায়? টি. এস্. এলিয়ট প্রভৃতি আধুনিক দান্তে-ভক্তদের রচনা পড়িলে মনে হয় না যে দান্তের কাব্যে তাঁহারা শুধু স্থায়ী ভাবের আস্বাদ পাইতেছেন, সঞ্চারী ভাবের আস্বাদ পাইতেছেন না, বা মধ্যযুগীয় ক্রীষ্টান পাঠক ইঁহাদের অপেক্ষা নিবিড়তর আনন্দ পাইতেন।

অভিনবগুপ্ত-অতুলচন্দ্র গুপ্তের ব্যঞ্জনাবাদ বা ক্রোচের expression বা অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে আরও দুই একটি সন্দেহ উত্থাপন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এক কাব্য হইতে আর এক কাব্যের তারতম্য করিব কি উপায়ে? আনন্দবর্দ্ধন গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্য, চিত্রকাব্য প্রভৃতির সঙ্গে সার্থক কাব্যের পার্থক্য বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ব্যঙ্গ্যেরও অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, কিন্তু দুইটি ব্যঙ্গ্যের মধ্যে তারতম্য করিতে পারেন নাই। ক্রোচেও অনুরূপ সমস্যায় পড়িয়াছেন। তাঁহার মত অনুসরণ করিলেও দেখা যায় যে, কাব্য ও অ-কাব্যের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ, কিন্তু দুইটি কাব্যখণ্ড বা দুইটি intuition-এর ভেদরেখা টানা যায় না। সেইজন্য তিনি পরিমাণগত বা সংখ্যাগত বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন এই ভাবে: বড় কবিতায় intuition বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়া থাকে অথবা অধিকসংখ্যক intuition সন্নিবেশিত হয়। বৃহত্তর ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, ইহার মধ্যে বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তা, নীতিকথা, বাস্তবজীবনের মূল্যবোধ প্রভৃতির চোরাই চালান হইয়াছে। আর যদি intuition অথবা ব্যঙ্গ্যের সংখ্যা গণনা করিয়াই বিচার করিতে হয় তাহা হইলে কোন কাব্যের সামগ্রিক রূপ উপলব্ধি করা যাইবে না। এইখানে ধ্বনিবাদ ও অলংকারবাদের সমান অসুবিধা। এই সকল মতের পরিপ্রেক্ষিতে বিচ্ছিন্ন

শ্লোকের বিশ্লেষণ যত সহজ গোটা কাব্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রের পরিমাপ তত সহজ হয় না। এই জন্যই ক্রোচের সমালোচনা অনেক সময়ই ক্যাটালগের মত শোনায় আর যেখানে তিনি বৃহত্তর ক্ষেত্রকে সমগ্রভাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেইখানে তাঁহার মতও আংশিকভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে।

অতুলচন্দ্র বিচারের প্রশ্নকে এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন অন্যভাবে। আমরা বলিয়া থাকি যে, সমালোচকের কাজ তিনি যে রস উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা অন্য পাঠকের মধ্যে সংক্রামিত করা। ইহার জন্য ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বিচারের প্রয়োজন। খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, বিচার করা হইল সমালোচকের কি ভাল লাগিয়াছে না লাগিয়াছে তাহা বলা। কিন্তু সেই মতের সমর্থনে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও তুলনার প্রয়োজন; তাহা না হইলে ভালমন্দ বলার কোন সার্থকতা থাকে না। ব্যাখ্যা হইল কাব্যের মধ্যে যাহা আছে· বলিয়া আমি মনে করি তাহার বিবরণ। অতুলচন্দ্রের মতে এই চেষ্টা ভ্রান্ত ও হাস্যকর। এইভাবে অগ্রসর হইতে হইলে কবি যাহা সুন্দরভাবে বলিয়াছেন সমালোচক তাহাকেই আটপৌরে ভাবে বলিবেন, কারণ সমালোচক কবি নহেন। এই জন্য অতুলচন্দ্র সমালোচনাকে প্রায় অস্বীকার করিতেই চাহিয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ সমালোচনার নাম দিয়াছেন **constructive criticism** বা গঠনমূলক সমালোচনা। তাঁহার মতে, 'কাব্যের তত্ত্ববিশ্লেষণ রসজ্ঞের বুদ্ধির ব্যাপার। কাব্যের রস, দরকার হ'লে পাতলা করে, পাঠককে গিলিয়ে দেওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল না।.........কাব্যের রস-আস্বাদন লোকে কাব্য পড়েই করবে।' সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় তাঁহার রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রভৃতির কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল। তাই তিনি যোগ করিলেন, 'সমালোচনার কবিত্ব কাব্যের রস মনে সঞ্চার করতে পারে যদি সমালোচক হন একাধারে সমালোচক ও কবি। এ যোগ দুর্লভ। আলংকারিকেরা জানতেন, তাঁরা কাব্যতত্ত্ববিৎ সহৃদয় মাত্র।'

উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্য ব্যবহারজীবের তর্ক, কাব্যরসিকের যুক্তি নয়। প্রথমতঃ, অভিনবগুপ্ত সহৃদয়কে কাব্যতত্ত্ববিৎ মাত্র বলেন নাই। তাঁহার মত পুনরায় উদ্ধৃত করা যাইতে পারে: 'কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশতঃ হৃদয়মুকুর অতিশয় স্বচ্ছ হওয়ায় যাঁহারা বর্ণনীয় বিভাবাদি বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা বা তন্ময়তা লাভ করিতে পারেন তাঁহারাই সহৃদয়।' ইঁহারা শুধু

কাব্যতত্ত্ববিৎ নহেন; এমন কি ইঁহারা কাব্যতত্ত্বানুসন্ধানবিষয়ে উদাসীনও হইতে পারেন। তাঁহাদের হৃদয়মুকুরে কাব্যের যে ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই ছবিই অপেক্ষাকৃত অনচ্ছ হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে চাহেন। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' বা 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধ কবিসমালোচকের সমালোচনা; ব্র্যাড্‌লির শেক্সপীয়রসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সমালোচকের সমালোচনা। উভয়েরই সার্থকতা আছে এবং ইহাও মানিতে হইবে ব্র্যাড্‌লির রচনা পড়িয়া শেক্সপীয়রকে বুঝিতে যে সাহায্য পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি পড়িয়া কালিদাসকে বুঝিতে ততটা সাহায্য হয় না। ইহার কারণ ব্র্যাড্‌লি 'কবিত্ব' করেন নাই, শেক্সপীয়রের কাব্য পড়িয়া যে রস আস্বাদন করিয়াছেন তাহারই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতে চাহিয়াছেন; মল্লিনাথের মতে যাহা 'অনপেক্ষিত' ও 'অমূল' সেইরূপ কিছু বলেন নাই।

অতুলচন্দ্র নিজেও সেই চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই চেষ্টার বিশ্লেষণ করিলে এই জাতীয় বিচারের দোষগুণ বুঝা যাইবে। এখানে দুইটি আলোচনা দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সাদৃশ্য লইয়া আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি প্রথমতঃ তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন: শব্দসম্পদের নিটোল পরিপূর্ণতা, ধ্বনি-সামঞ্জস্য এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ। এই বিষয়ে তাঁহার মত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল অভিব্যক্তি পাইয়াছে, কিন্তু তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যানেই এই শ্রেণীই সমালোচনার অপূর্ণতা ধরা পড়িয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ রসের যোগ, তত্ত্বের যোগ নয়। 'রসের যোগ' ব্যাপারটি তিনি বিশ্লেষণ করেন নাই; যে ভাবের উচ্ছ্বাসকে তিনিই কাব্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই, ইহার সঙ্গে তাহার পার্থক্য কোথায়? ওয়ার্ডসওয়ার্থের নিসর্গ কবিতা তাঁহার কাছে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মনে হইয়াছে, কারণ সেখানকার যোগ তত্ত্বের যোগ, সেখানে ভাবৈকরসত্ব নাই। কিন্তু তত্ত্ব কি অনুভূতি হইতে পৃথক্, আমি বুদ্ধি দিয়া যাহাকে গ্রহণ করি অনুভূতি দিয়া কি তাহাকে অনুরঞ্জিত করি না? সেই যে ভাবৈকরসত্ব, তত্ত্বের প্রেরণায় তাহা কি অধিকতর প্রগাঢ় হইবে না? ওয়ার্ডসওয়ার্থের কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:

And I have felt
A presence that disturbs me with the joy

Of elevated thoughts ; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man :
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things.

তত্ত্ববিরোধী সংস্কারে অন্ধ না হইলে স্বীকার করিতে হইবে এখানে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়তম সংযোগের পরিচয় আছে এবং তত্ত্বের অনুপ্রবেশে 'ভাবৈকরসত্ব' গভীরতা লাভ করিয়াছে।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত আরও দাবি করিয়াছেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতর লক্ষণ আভিজাত্যের সংযম এবং এই সংযম রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও প্রতিফলিত হইয়াছে। এই মত বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা যায় না। 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি কবিতার গৌরব ভাবের ঐশ্বর্য্য, ভাবের সংযম নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের কবিতার পরিবর্ত্তন করিবার সময় সংক্ষেপণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলির কবিতাগুলির সঙ্গে মূল বাংলা কবিতার তুলনা করিলেই দেখা যাইবে যে, অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি সংযত হইয়াছেন ; অন্যান্য ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন যে, অন্ততঃ ভাষাসংযমের দিক্ হইতে ইংরেজি গীতাঞ্জলির কবিতা মূল বাংলা কবিতা হইতে শ্রেষ্ঠ। 'রাজা ও রাণী', 'King and Queen', 'তপতী' —এই তিনটি নাটকের বিষয়বস্তু এক ; মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন উত্তরোত্তর প্রকাশের সংযম আয়ত্ত করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা—'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'এবার ফিরাও মোরে', 'মানস-সুন্দরী', 'শাহজাহান'—ভাব ও ভাষার উচ্ছ্বাসের পরিচয় দেয়, ভাষাসংযমের নয়। 'উর্ব্বশী' কবিতায় সংযমের স্বাক্ষর স্পষ্টতর ; তবু প্রথম 'চয়নিকা'র সম্পাদকেরা এই কবিতা নির্ব্বাচন করিবার সময় শেষের স্তবকটি বাদ দিয়াছিলেন। পাঠক সম্প্রদায় এই অঙ্গচ্ছেদ মানিয়া লইয়াছে।

অতুলচন্দ্রের আর একটি সমালোচনার এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে— 'জাগরী' উপন্যাসের বিচার। (দেশ—৩০শে চৈত্র ১৩৫৮) এই

সমালোচনাটিতে প্রাচীন সমালোচক নবীন ঔপন্যাসিককে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। ইহা সমালোচকের বিদগ্ধ মননশীলতা ও ব্যাপক সংবেদন-শক্তির পরিচয় দেয়। রসের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী সমালোচকের রচনা হিসাবেও ইহা উল্লেখযোগ্য। 'জাগরী' উপন্যাসের ঘটনা সমসাময়িক কালের ঘটনা। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ইহার উপাদান; ইহার পটভূমিকা অধুনাতন কালের এক চাঞ্চল্যকর অভিযান। অতুলচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, গ্রন্থকার এখানে নরনারীর অনুভূতি ও চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য রূপায়িত করিয়াছেন, পটভূমিকার চমকে মোহাবিষ্ট হয়েন নাই। এই নিরপেক্ষতা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এই মানসিক দূরত্ব এই উপন্যাসটিকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছে।

এই অনাসক্ত দৃষ্টির জন্যই গ্রন্থকার ছোট-বড় চরিত্রগুলিকে আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। প্রত্যেকগুলি চরিত্র কোন না কোন একটি শ্রেণীর অন্তর্গত; কিন্তু ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি তাহাদের শ্রেণীগত পরিচয়ের অন্তরালে ব্যক্তিগত পরিচয়কে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। উপন্যাসের পরিসর ছোট; কিন্তু এখানে বহু চরিত্র ভিড় করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক চরিত্রই নিজের অনুভূতি ও ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে। ইহাকেই বলা যাইতে পারে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি। অতুলচন্দ্র ভরতের সূত্র উদ্ধৃত করেন নাই, কিন্তু অভিনবগুপ্তের অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা প্রাচীনরসতত্ত্বানুসরণকারী সাহিত্যবিচারের আধুনিকতা প্রমাণ করে।

সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদের সংকীর্ণতার নিদর্শনও এই সমালোচনায় পাওয়া যায়। সমালোচক বলিয়াছেন, 'কাহিনীটি বলা হয়েছে চার অধ্যায়ে এই চারজনের সেই রাত্রের মুখের কথায়। খুব সহজসাধ্য কৌশল নয়।' কিন্তু শুধু বলার কৌশল বলিয়া থামিয়া গেলে চলিবে না। এই চারটি বক্তার মধ্য দিয়া চারটি আইডিয়ার সংঘাত ফুটিয়া উঠিয়াছে; তিন জন বক্তা বিশেষ বিশেষ জীবনদর্শনে বিশ্বাসী ও সেই দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্মী। ইহাদের আইডিয়ার সংঘর্ষই উক্তিকে বৈচিত্র্য ও বিচ্ছিত্তি দান করিয়াছে। অতুলচন্দ্র এই দিকে যান নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন, 'বিলুর মুখে পুর্ণিয়া অঞ্চলের আগষ্ট আন্দোলন উন্মাদনায়, সাহসে, ভয়ে, মুক্তির উল্লাসে, নিষ্ফলতার নৈরাশ্যে, ছোটবড় অসঙ্গতিতে—যা মানুষের জীবন—জ্বলজ্বল করছে। জীবনের একটা

কোণ থেকে যেন ঢাক্‌না খুলে গেছে।' কিন্তু জীবন তো শুধু উন্মাদনা ও উল্লাস নয়—তত্ত্বকথাও বটে। আগষ্ট আন্দোলনের একটা দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া চার রকমের চিন্তাধারা যে মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে ইহাই ঔপন্যাসিকের প্রধান কৃতিত্ব। কিন্তু সেই কথা সমালোচক বলেন নাই। এই তত্ত্বভীরুতা রসবাদী সমালোচনার অপূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। কাব্যজিজ্ঞাসাকে অতুলচন্দ্র কংকালের বিশ্লেষণের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন ; রসপিপাসু সমালোচক অস্থি বা কংকালকে বাদ দিয়া রক্তমাংসের স্বরূপ বিচার করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং তাঁহার আলোচনা খানিকটা ফিকে হইতে বাধ্য। অবশ্য এই উপমা—অন্য সকল উপমার মতই—একদেশদর্শী। আমাদের বক্তব্য এই যে, তত্ত্ব বা দর্শন বা আইডিয়ার সংঘর্ষের কথা বাদ দিয়া 'জাগরী'র সমালোচনা সম্ভব নয়।

অতুলচন্দ্র যে মত গ্রহণ করিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার আংশিক অপূর্ণতাসত্ত্বেও ইহা মানিতেই হইবে যে, বাংলা সাহিত্যসমালোচনার এক দিকে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রসের অলৌকিকত্ব, কবির অনাসক্তি, কাব্যের সর্ব্বজনীনত্ব ও অন্যফলনিরপেক্ষত্ব, সর্ব্বোপরি আধুনিক কালে প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের প্রয়োগযোগ্যতা—এই সকল বিষয়ে তাঁহার দান অতুলনীয়। অভিনবগুপ্তের কাল হইতে প্রায় নয়শত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে ; তাঁহার পরবর্ত্তী সকল লেখকদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারেন। ইঁহাদের তুলনায়—বিশেষ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের তুলনায়—আর সবাই পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রোত্তর সমালোচনা

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তাহাই নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যের উপর সর্ব্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টির উৎকর্ষও যেমন প্রাচুর্য্যও তেমনি ; কাজেই কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রভাব দেদীপ্যমান। আধুনিক বাংলার সমালোচনাসাহিত্যেও এই গভীর ও ব্যাপক প্রভাবের স্বাক্ষর দেখা যায়। তিনি খুব জোর করিয়া বলিয়াছেন যে, কাব্য ও সাহিত্যের সৃষ্টি অপ্রয়োজনীয়তায়, ব্যবহারিক জীবনের বন্ধন হইতে মুক্তিতে। এই অপ্রয়োজনীয়তাবাদকেই দার্শনিক ভিত্তি ও যুক্তি দিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশ্যতঃ অভিনব গুপ্তের রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের অপ্রয়োজনীয়তাবাদকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে সম্পূর্ণরূপে নীতিনিরপেক্ষ করিতে পারেন নাই, কারণ তিনি মনে করিতেন যাহা মানুষে মানুষে সংযোগ স্থাপন করে, যাহা সংকীর্ণ স্বার্থবোধ হইতে মুক্তি দেয় তাহাই মানুষের মঙ্গল সাধন করে। কিন্তু তাহা হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির প্রভূত পার্থক্য। বঙ্কিমচন্দ্র নীতিশিক্ষাকে সাহিত্য-সৃষ্টির গৌণ উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য, তাহাও তাঁহার মতে আদর্শ চরিত্রচিত্রণে প্রকাশিত হয়। এই আদর্শ নৈতিক আদর্শ, সুতরাং নীতিকথা সাহিত্যের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করে। রবীন্দ্রনাথ কোন আদর্শকে প্রত্যক্ষ করা বা কোন নীতিকথাকে রূপ দেওয়া সাহিত্যের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন না। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের বিশুদ্ধ প্রকাশই তাঁহার মতে সাহিত্যের কাজ। তিনি বলিয়াছেন, প্রকাশের ঐশ্বর্য্যই সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য। এই প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা প্রচলিত নীতির নিয়ম মানিয়া চলে নাই বলিয়াই কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি তাঁহার কাব্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার অভিযোগ আনিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে নবীন সাহিত্যিকেরা

বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের দ্বারা চালিত হইয়া নিরংকুশ প্রকাশকেই কাব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রকাশও বিশুদ্ধ নহে, কারণ ইহার মধ্যে বস্তুর অধীনতা আছে, ইহা সম্পূর্ণভাবে মনোজগতের সম্পদ্ নহে। রিরংসাবৃত্তি ও বুভুক্ষা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি, কিন্তু ইহারা দৈহিক কামনার দ্বারা আচ্ছন্ন, ব্যবহারিক প্রয়োজনের দ্বারা সীমিত। মনের ভাব যখন এই সীমা অতিক্রম করে—অভিনবগুপ্তের ভাষায়, যখন এই সকল বিঘ্ন অপসারণ করিতে পারে—তখনই তাহা রসলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তখনই বিশুদ্ধ প্রকাশের ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। বাস্তবানুগামী বা নীতিবাদী পাঠক বলিবেন এই প্রকাশ মায়িক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাইতে পারে, বস্তু চেয়ে সেই মায়া তো সত্যতর।

রবীন্দ্রনাথের দ্বারা যে সকল সমালোচক প্রভাবিত হইয়াছেন তাঁহারা এই প্রকাশের ঐশ্বর্য্যকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহাই রবীন্দ্র-অনুসারী সমালোচনার প্রধান লক্ষণ। ইহা এক হিসাবে নীতিবাদী, কারণ ইহা বাস্তবকে পরিশুদ্ধ করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য ছানিয়া লইতে চাহিয়াছে। আবার আর এক দিক্ দিয়া ইহা নীতিবিরোধী বা নীতিনিরপেক্ষ, কারণ ইহা ব্যবহারিক জীবনে সাহিত্যের উপযোগিতা অস্বীকার করে, ইহা সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে সচেষ্ট হয় নাই। এই জাতীয় সমালোচনার প্রতিনিধি হিসাবে তিন জন লেখকের রচনার বিচার করা যাইতে পারে—প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী। ইঁহারা তিন জনই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ। ইঁহারা সাহিত্যের মধ্যে প্রধানতঃ প্রকাশের সৌন্দর্য্য খুঁজিয়াছেন এবং তাহাই পাঠকের অনুভূতিগম্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহারা নীতিবাদী বা রুচিবাগীশ নহেন। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর প্রিয়নাথ সেন ও প্রমথ চৌধুরী—উভয়েই এই নাট্যকাব্যের প্রকাশের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছেন। প্রিয়নাথ সেন আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এই কাব্যে প্রেমের মধুর, পবিত্র এবং পাবক উন্মাদনা ধ্বনিত হইয়াছে, কামান্ধ প্রেমিকের ইন্দ্রিয়বিকার বা উপভোগলালসা ব্যক্ত হয় নাই। প্রমথ চৌধুরীও দেখাইয়াছেন যে, কবি কামলোক হইতে রূপলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং এই উত্তরণই কবিকৃতি। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী জয়দেবের কবিতাকে স্বীকার করিতে পারেন নাই; এইখানে নীতিবাদী বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁহারা একমত, কারণ জয়দেবের কাব্য ইন্দ্রিয়পরতা-

দোষদুষ্ট। তাই বলিয়াছি যে, রবীন্দ্রানুসারী সমালোচনা যুগপৎ নীতিসম্মত ও নীতিনিরপেক্ষ। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রানুসারী সমালোচক নহেন; কিন্তু এই যুগের রুচিতে যে বিরোধাভাস ছিল তাহা তাঁহার রচনায় তির্য্যক অভিব্যক্তি পাইয়াছে। 'চিত্রাঙ্গদা' নীতিসম্মত না নীতিবিরুদ্ধ এই বিতর্কের পরিহাস করিবার জন্য তিনি এই কাব্যের কৌতুককর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। এইভাবে তিনি এই অর্থহীন বিতর্কের উপর কৌতুক-হাস্যের যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন।

আরও দুই একটি সামান্য লক্ষণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের লেখকগণ বাংলাভাষার মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমশ: 'জাতিবৈর' বা উগ্র স্বাদেশিকতার প্রাবল্যে গদ্যলেখকেরা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার অপেক্ষা স্বদেশের দর্শন-সাহিত্য প্রভৃতির প্রতি বেশি মনোযোগী হইয়া পড়িতেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তো দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে আমরা গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, কুমারসম্ভব ছাড়িয়া স্থইনবর্ণ পড়ি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে যুগের প্রবর্ত্তক সেই যুগ কুমারসম্ভব ও স্থইনবর্ণ উভয়ের রসই সমানভাবে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছে; সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়াই বিচার করিয়াছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'মৃচ্ছকটিক'কে আর্য্যসভ্যতার চিত্র হিসাবে প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাকে শুধু নাটক হিসাবে দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্য-আলোচনার প্রধান সূত্র—সহিতত্ব ও প্রকাশের সৌন্দর্য্য যাহা দেশকাল-অনালিঙ্গিত। অন্য অনেক কারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও আমাদের সাহিত্যচর্চ্চাকে বিশ্বাভিমুখী করিয়া তোলে। কবিবন্ধু প্রিয়নাথ সেন নানা সাহিত্যের রস উপভোগ করিয়াছেন, ফরাসী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও অধিকার ছিল। তাঁহার Ruskin, Guy de Maupassant সম্পর্কিত রচনা প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি অন্যান্য বিদেশী সাহিত্যিকদের সম্পর্কেও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর বিদ্যা ছিল বহুমুখী। তিনি ফরাসীসাহিত্য সম্পর্কে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা শুধু তাঁহার রচনার মধ্যেই উল্লেখযোগ্য নয়, ইহা ফরাসী সাহিত্য সমালোচনায়ও একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করিতে পারে। বলেন্দ্রনাথ অবশ্য পুরোপুরি স্বদেশীভাবাপন্ন লেখক। তিনি অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বাঙ্গালী জীবন এবং সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে। রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী লিখিয়াছেন, 'বাঙালীর অন্তঃপুরে বাঙালীর গৃহস্থালীতে, সামাজিক প্রথায় ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।' ইহা সত্ত্বেও বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে যে গুণ সমধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা তাঁহার দৃষ্টির প্রসার এবং ইহা বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে ব্যাপক পরিচয়ের ফল। যে মানদণ্ডে তিনি সাহিত্যের বিচার করিয়াছেন তাহা ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের মানদণ্ড।

যে সকল সমালোচকদের রচনা এখানে বিচার করা হইতেছে তাঁহাদের আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ এই যে, ইঁহারা কাব্যের রচনারীতি, প্রকরণ-বিন্যাস, ভাষা, এক কথায় উহার form সম্পর্কে খুব সচেতন। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-গ্রন্থের আলোচনায় প্রিয়নাথ সেন বিস্তারিতভাবে সনেটের আঙ্গিক-বিচার করিয়াছেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিকাব্য, মহাকাব্য, উপন্যাস প্রভৃতির প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি রাখিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী কাব্যের আত্মা অপেক্ষা কাব্যশরীর অর্থাৎ তাহার ভাষার বিচার বেশি করিয়া করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই জাতীয় আলোচনা একটু আটপৌরে বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু সাহিত্যের উপলব্ধি ও বিচারের পক্ষে তাহার গঠন-পারিপাট্য ও ভাষা-বৈচিত্র্যের আলোচনা অপরিহার্য্য।

(২)

প্রিয়নাথ সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বছর সাতেকের বড়। 'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে তিনি ছিলেন বঙ্কিমের যুগের —বা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগের—মানুষ। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বাস্তবিকপক্ষে বঙ্কিমের অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ যে যুগের সূচনা করিয়াছেন, তিনি সেই যুগের মানুষ এবং সেই যুগের অরুণোদয়কে তিনি যে অভিনন্দন জানাইতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব। কাব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বঙ্কিমের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হইলেও সমগ্র প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যেরই পুনরুক্তি। তাঁহার শেষ কথা: 'সেই রসসাহিত্যকে—সেই আনন্দের সৃষ্টি বিশাল দেব-মন্দিরকে—সৌন্দর্য্যের অসীম পীঠস্থানকে, কে পাঠশালার সংকীর্ণ আয়তনের

মধ্যে আবদ্ধ রাখিবে?' কলাবিদ্, সৌন্দর্য্যোপাসক Ruskin-কে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু Ruskin যে সত্য ও নীতিকে সৌন্দর্য্যের উপরে স্থান দিয়াছিলেন ইহার জন্য তিনি বিরূপ সমালোচনাও করিয়াছিলেন। অথচ তিনি নিজে অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার প্রণয়ের বিশ্লেষণ করিয়া ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে ইহার মধ্যে নীতিবহির্ভূত কিছু নাই। কলা ও কল্যাণের সমন্বয়চেষ্টাই এই যুগের সাহিত্যজিজ্ঞাসার প্রধান লক্ষণ।

প্রিয়নাথ সেনের সমালোচনার প্রধান গুণ নূতন ও অপরিচিত সাহিত্যের রসগ্রহণ করার ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ যখন তরুণ ছিলেন, যখন তাঁহার উদীয়মান প্রতিভা বিরুদ্ধ সমালোচনার দ্বারা লাঞ্ছিত হইতেছিল, তখন যাঁহারা সেই প্রতিভাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন প্রিয়নাথ সেন তাঁহাদের অগ্রণী। কবি নিজে একাধিকবার এই ঋণ সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমালোচনার ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলেও স্থায়ী মূল্য কম, কারণ তাঁহার রসগ্রহণক্ষমতার অনুপাতে রসবিচার শক্তি ছিল না। তাঁহার আলোচনায় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি বা গভীরতার পরিচয় নাই। কাব্যের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি যেখানে যাহা বলিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথের মতের পুনরুক্তি মাত্র; সাহিত্যের প্রকৃত সমস্যার মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'মানসী'র আলোচনা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সকৌতুকে বলিয়াছেন যে, 'চিত্রাঙ্গদা'র গুণ ব্যাখ্যান করিতে যাইয়া তিনি প্রায় সমগ্র কাব্যখানাকে উদ্ধৃত করিয়া ফেলিয়াছেন অর্থাৎ তিনি নিজে বিশেষ কিছু বলিতে পারেন নাই। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', 'অলীকবাবু', মোপাঁসা প্রভৃতির আলোচনা ভাসা-ভাসা এবং সনেট পঞ্চাশৎ-গ্রন্থের তিনি যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তন্মধ্যে বিচারশক্তি অপেক্ষা সপ্রশংস আবেগের পরিচয় বেশি।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-আলোচনায়ও প্রগাঢ়তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবু তাহার মধ্যে মৌলিকতার ইঙ্গিতও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি কাব্য ও চিত্রকলার সমঝদার ছিলেন, তাঁহার একমাত্র গ্রন্থের নাম—'চিত্র ও কাব্য'—তাঁহার কাব্যসমালোচনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। অর্থাৎ তিনি কাব্যের মধ্যেও বর্ণনা ও চিত্রের সৌন্দর্য্যই খুঁজিতেন। তিনি কালিদাসের কবিতার মধ্যে নানা খণ্ডচিত্রের সমাবেশ

দেখিতে পাইয়াছেন ; ভবভূতির উত্তরচরিতকেও সেই মানদণ্ডে বিচার করিতে চাহিয়াছেন। এই কারণে তিনি উত্তরচরিত কাব্যে নাটকোচিত গুণাগুণের বিচার করিতে পারেন নাই। কালিদাসের কাব্যেরও শুধু চিত্র সৌন্দর্য্যেরই বিবরণ দিতে পারিয়াছেন তাহার গভীরতর তাৎপর্য্যের মধ্য প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই ক্ষমতা যে তাঁহার একেবারে ছিল না এমন কথা বলা যায় না। মুকুন্দরামের কবিতা বর্ণনাসমৃদ্ধ। সুতরাং এই কবিতা স্বভাবতঃই বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তিনি ইহার বর্ণনাসমৃদ্ধির পরিচয়ও দিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহাও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠ কবি নহেন এবং শ্রেষ্ঠতার অভাবের কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবিতার আসল ঐশ্বর্য্য প্রাণের ঐশ্বর্য্য। কাব্য অলংকৃত বাক্য ; চিত্রকলার মত কাব্যও ছবি আঁকে। তাহা হইলেও সেই ছবিই শ্রেষ্ঠ শিল্পের মর্য্যাদা দাবি করিতে পারে যেখানে বর্ণনার অন্তরালে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। এই স্পন্দন মুকুন্দ-রামের কাব্যে তেমন পাওয়া যায় না বলিয়াই সেই কাব্য বর্ণনামাত্র, শিল্প-সুষমামণ্ডিত চিত্র নহে। প্রাণের প্রধান লক্ষণ স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলা ও স্বাভাবিকতা। সেইজন্য বলেন্দ্রনাথ অলংকারবহুল কবিতা অপেক্ষা সহজ স্বাভাবিক কাব্য বেশি পছন্দ করিতেন এবং চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। বিদ্যাপতির কাব্য কৃত্রিম, চণ্ডীদাসের কাব্য স্বাভাবিক। তাঁহার এই মতে অবশ্য খুব একটা মৌলিকতা নাই। এইখানে তিনি রবীন্দ্রনাথেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।

বলেন্দ্রনাথের সমালোচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ কাব্যের সামগ্রিকতার প্রতি দৃষ্টি। ইহা ইউরোপীয় সমালোচনার প্রভাবের ফল। কালিদাস প্রভৃতির কাব্যে যে নিসর্গ সৌন্দর্য্যের চিত্র আছে তিনি তাহার প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে প্রাচ্য সাহিত্যে স্বভাবের খণ্ড সৌন্দর্য্যের চিত্র থাকিলেও প্রকৃতির সামগ্রিক সত্তার স্পন্দন তেমন পাওয়া যায় না। ('কাব্যে প্রকৃতি') এই সামগ্রিকতা বোধই বলেন্দ্রনাথকে গীতিকাব্য, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যিক প্রকরণের বিশ্লেষণে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল এবং এইখানেই তাঁহার সমালোচনার বৈশিষ্ট্য। পুর্ব্বেই বলিয়াছি অনেক সমালোচক এই প্রকরণগত আলোচনায় বিশ্বাস করেন না ; ইহা সত্যও বটে যে, প্রকরণগত আলোচনাকে প্রাধান্য দিলে প্রত্যেক কাব্যের নিজস্ব সৌন্দর্য্য—যেখানে ইহা মৌলিক—ভালভাবে প্রতিভাত হইবে না। কিন্তু

সাহিত্যের জগতে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকিলেও সাহিত্য সুসংহতও বটে সুশৃঙ্খলও বটে এবং প্রকরণগত আলোচনার মারফতে আলোচ্য কাব্যের সামগ্রিক রূপের, একটি ব্যাপক পরিমণ্ডলে ইহার বিশিষ্ট স্থানের, সন্ধান পাওয়া যাইবে। কোন কাব্যকে সমগ্রভাবে দেখিতে গেলেই তাহার সঙ্গে সেই জাতীয় অন্য কাব্যের সাদৃশ্য ও বৈলক্ষণ্য চোখে পড়িবে। তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে এবং সেই শ্রেণীবিভাগ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে সাহায্য করিবে। বলেন্দ্রনাথের দেওয়া একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা কথাটাকে স্পষ্ট করা যাইতে পারে। কালিদাসের ঋতুসংহারে প্রকৃতির বর্ণনা আছে এবং প্রকৃতির বর্ণনা শকুন্তলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। অন্যান্য বৈষম্যের কথা বাদ দিলেও ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, ঋতুসংহার খণ্ডকাব্য, শকুন্তলা নাটক। সুতরাং প্রকৃতির বর্ণনা দুইটি কাব্যে দুই রকমের হইবে। এই প্রসঙ্গের অন্য আর একটা দিক্ আছে। লেখকের প্রতিভাই কাব্য-সৃষ্টির নিমিত্তকারণ, কিন্তু যে উপাদানের মধ্যে লেখকের প্রতিভা নিয়োজিত হয় তাহারও উপযোগিতা প্রতিভাকে অংশতঃ নিয়ন্ত্রিত করে, যেমন শ্রীরাধার কাহিনীতে ভাবের আতিশয্য আছে, কিন্তু ঘটনার প্রাচুর্য্য নাই। সেই জন্য এই কাহিনী গীতিকাব্যের পক্ষে সমধিক উপযোগী; উপন্যাসে—বা নাটকে—এই ঘটনা-বিরল জীবনচরিত সহজ অভিব্যক্তি পাইত না। এই সমস্ত তাৎপর্যময় ইঙ্গিতই বলেন্দ্রনাথের সমালোচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। দুঃখের বিষয়, এই সূচনা পরিণতি লাভ করিবার পূর্ব্বেই তিনি জীবনের তথা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত হয়েন। সেইজন্য তাঁহাকে *critic* **of unfulfilled renown** বলা যাইতে পারে।

॥ ২ ॥

প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রধান গুণ পরিণত বৈদগ্ধ্য। তাঁহার প্রথম রচনা জয়দেব-সম্পর্কিত প্রবন্ধেও কোন অপরিণতির লক্ষণ নাই। তাঁহার সমালোচনার অন্যতর লক্ষণ বিভিন্ন মনোভাব ও বিচারপদ্ধতির সমাবেশ। তিনি আমাদের সাহিত্যে ক্ল্যাসিকাল সমালোচনারীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁহার আদর্শ ফরাসী সাহিত্য; ফরাসী সাহিত্য আধুনিক জগতে ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের অগ্রণী। ফরাসী সাহিত্য শুধু ক্ল্যাসিকাল নয়, রিয়ালিষ্টিক ও এবং সেই কারণেও প্রমথ চৌধুরী ফরাসী সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত। রিয়ালিষ্ট সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ ইহা বস্তুর বর্ণনা দেয়। বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের মারফতেই আমরা বস্তুকে জানি এবং এই জ্ঞানই

কাব্যের ভিত্তি। অবশ্য ইহা মানিতে হইবে যে, শুধু প্রত্যক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান থাকিলেই কাব্য হয় না; কিন্তু অপর দিকে ইহাও মানিতে হইবে যে, যে কল্পনা বস্তুজ্ঞানকে পরিহার করিয়া চলে তাহা রসোত্তীর্ণ হইতে পারে না। সত্য মাত্রই সুন্দর নয়, কিন্তু সুন্দরের ভিত্তি সত্য। 'গরু তৃণ খায়' এই বর্ণনা সত্য হইলেও কাব্য নয়। কিন্তু 'গোরুরা ফুলে ফুলে মধুপান করিতেছে'—এইরূপ বলিলে কি বস্তুজ্ঞান কি রসজ্ঞান কোনোরূপ জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া যায় না। (প্রবন্ধসংগ্রহ—১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০) কবি শুধু যে নিসর্গ জগৎই স্পষ্ট করিয়া দেখিবেন তাহা নহে, তাঁহার অনুভূতি ও কল্পনার সঙ্গে দেশের মাটির যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। নচেৎ কবির সৃষ্টি শুকাইয়া যাইবে বা পরগাছা হইবে। 'এই কারণেই মেঘনাদ-বধ পরগাছার ফুল।... খাঁটি স্বদেশি বলে অন্নদামঙ্গল স্বল্পপ্রাণ হলেও কাব্য; এবং কোনো দেশেরই নয় বলে বৃত্রসংহার মহাপ্রাণ হলেও মহান্ নয়।' (পৃঃ ৩৮)

প্রমথ চৌধুরী তাঁহার মতকে দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তাহার অতিরিক্তও। সাহিত্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান; প্রত্যক্ষ সত্য ছাড়া সাহিত্যে অন্য কোন সত্য নাই। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই সৃষ্টির রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে নয়। (পৃঃ ৫২—৫৫) সৃষ্টির এই যে রহস্য—যাহা কাব্যের বিষয়—তাহা অনুভূতিসাপেক্ষ নয়। (পৃঃ ১০৫) একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমথ চৌধুরী প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অনুভূতি ও সৃষ্টি রহস্যে অনুপ্রবেশের সংযোগ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ একথা তাঁরই কাছে সত্য, যাঁর কাছে এটি প্রত্যক্ষ সত্য। কেননা, কোনোরূপ আঁকের সাহায্যে কিংবা মাপের সাহায্যে ও-সত্য পাওয়া যায় না। একত্বের জ্ঞান অনুভূতিসাপেক্ষ।' (পৃঃ ৫৪) এই যুক্তি গ্রাহ্য না হইতে পারে, কারণ মিষ্টিক অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা জ্ঞান এক জিনিষ নয়। কিন্তু ইহা প্রমথ চৌধুরীর মনের তথা সমালোচনার পরিচয় দেয়।

অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর জোর দিলেও প্রমথ চৌধুরী বুদ্ধির প্রাধান্য অস্বীকার করেন নাই। বুদ্ধি বলিতে তিনি ব্যবহারিক বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও দার্শনিক বুদ্ধি সবটাই বুঝিয়াছেন। প্রথম কথা, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান পরস্পরসম্পর্কিত; ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি একে অপরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সেইজন্য

বুদ্ধির আলোকে আমাদের রসবোধও স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা লাভ করে। ফরাসী দার্শনিক দেকার্তকে অনুসরণ করিয়া তিনিও বলিয়াছেন, 'যে জ্ঞান আমাদের জাগ্রত বুদ্ধির আয়ত্ত এবং যা ন্যায়শাস্ত্রের বিরুদ্ধ নয়, তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য।' (পৃঃ ১৩১) অন্যত্র তিনি দাবি করিয়াছেন, সাহিত্য মানুষের সমগ্র মনের প্রকাশ; ইহার মধ্যে মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা —সব কিছুই প্রকাশ পায়; (পৃঃ ১৬৭), 'জ্ঞানের ভাষা, কর্ম্মের ভাষা ও ভক্তির ভাষা, এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসংগম হয়।' (পৃঃ ১৪৯) তিনি জার্ম্মাণ সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি তেমন অনুরাগ বোধ করেন নাই, কারণ উহার ভাব ও ভাষা ঘোলাটে রকমের। ফরাসী দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার ভক্তির কারণ ফরাসী সাহিত্য ও দর্শন বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, 'সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।' (পৃঃ ৩৪) এই জাগরণ, এই মুক্তি বুদ্ধির জাগরণ, বুদ্ধির মুক্তি। তিনি যে ফরাসী সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত তার একটি প্রধান কারণ এই যে, ফরাসী সাহিত্য মগ্নচৈতন্যে বিশ্বাস করে না, যা ইন্দ্রিয়ের অগোচর আর যা বুদ্ধির অগম্য তার বড় একটা সন্ধান করে না।

এই প্রকার মনোভাবের জন্যই প্রমথ চৌধুরী কাব্যের গঠনপারিপাট্য, ভাষার কৌশলের প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়াছেন। কাব্যের যে আর্ট, তাহার সঙ্গে লজিকের বিশেষ সম্পর্ক আছে। ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে লিটন ষ্ট্রেচির মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি ফরাসী রচনার মধ্যে যে **Principle of deliberation** থাকে তাহার সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের সাহিত্যের প্রধান দোষ নিজের ভাব প্রকাশ করার অদম্য উৎসাহ। সাহিত্যের প্রধান কাজ অপরের মনের উপর আধিপত্য করা, নিজের বীণা বাজান নয়, অপরের মনোবীণার বাদক হওয়া। তাই সাহিত্যের মূল্য 'তার প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।' সেইজন্য তিনি ভাষার সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্যের উপর জোর দিয়াছেন। ইহাই ভারতচন্দ্রের প্রতি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে; তিনি ভারতচন্দ্রের মত কৃষ্ণনাগরিক, ভাষার কারুশিল্পী। এখানেই রোমান্টিক বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য। বলেন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিত্বের সন্ধান পান নাই, কারণ ভারতচন্দ্রের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য্য নাই, প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি নাই। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর মতে,

'Bharatchandra, as a supreme liteary craftsman, will ever remain a master to us writers of the Bengali language.' অর্থাৎ ভাষার পারিপাট্যের জন্যই ভারতচন্দ্র চিরকাল বাঙ্গালী লেখকদের আদর্শ হইয়া থাকিবেন।

প্রমথ চৌধুরী প্রাচীন সংস্কৃত আলংকারিদের প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন; তিনি প্রায়ই তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিতেন বা উদ্ধৃত করিতেন। কিন্তু সেইখানেও ভাষার কৌশল বা ভণিতিবৈচিত্র্যের প্রতি পক্ষপাত লক্ষিত হয়। তিনি অভিনবগুপ্তের নাম এখানে ওখানে করিয়াছেন, কিন্তু অভিনবগুপ্তের রসতত্ত্বে তাঁহার প্রবেশ ছিল বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একবার তিনি এই তত্ত্বের যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রমাদপূর্ণ। তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে দণ্ডী বামন প্রভৃতি যাঁহারা কাব্যের আত্মা রসকে বাদ দিয়া কাব্যের শরীর রীতি ও অলংকারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী একজন প্রকৃত আলংকারিক। তিনি বলিয়াছেন, 'সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে দেখতে পাই কবি কি বল্‌লেন তার চাইতে কি ভাবে বল্‌লেন তার মর্য্যাদা ঢের বেশী।' (পৃঃ ১৬৬) অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, 'কোনো কাব্যের আত্মার পরিচয় দেওয়ার চাইতে তার দেহের পরিচয় দেওয়া ঢের সহজ, কেন না দেহ জিনিসটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিচ্ছিন্ন। আর, সকলেই জানেন যে ভাষা হচ্ছে ভাবের দেহ।' (পৃঃ ২২৭)

কিন্তু প্রমথ চৌধুরী শুধু কৃষ্ণনাগরিক নহেন, রাবীন্দ্রিকও। তিনি রবীন্দ্রনাথের খুব কাছের লোক, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনুরাগী পাঠক এবং রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ বড় কবি এবং বড কাব্যের প্রধান লক্ষণ আত্মার ঐশ্বর্য্য; দেহের ঐশ্বর্য্য তাহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তবু গৌণ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ঐশ্বর্য্য কলানৈপুণ্যের ফল নয়, তাহার অলংকারসমৃদ্ধি অপৃথক্ যত্নের দ্বারা নির্বর্ত্তিত, অনায়াসলব্ধ। তারপর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধেও রসের উৎসের সন্ধান করিয়াছেন, রূপের অন্তরালে অ-রূপকে পাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু কাব্যের মধ্যে যে **mystery, magic** বা **mysticism** আছে প্রমথ চৌধুরীর তাহার প্রতি একটা স্বাভাবিক বিরোধিতা ছিল। অথচ—বোধহয় রবীন্দ্রপ্রভাবের ফলে—তাহাকে তিনি স্বীকারও করিয়াছেন। এই প্রভাবে পড়িয়া তিনি বলিয়াছেন, সামাজিক মন বলিয়া কোন বস্তু নাই, ঐ পদার্থ একটা অ্যাবস্ট্রাকশন। তবু এই অ্যাবস্ট্রাকশনকে স্বীকার

করিয়াই আবার তিনি অন্নদামঙ্গলকে মেঘনাদ বধ বা বৃত্রসংহার অপেক্ষা বেশি মূল্য দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়া তিনি সাহিত্যে সনাতনের সন্ধান করিয়াছেন এবং সামাজিক, ব্যবহারিক সত্য হইতে অতিরিক্ত কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহার নাম রস—ইহা সংগৃহীত হয় আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে। এইজন্য তিনি জর্ম্মাণ দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে বিরূপতা প্রদর্শন করিলেও ইংরেজি রোমাণ্টিক কাব্যের প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াছেন, কারণ সেই কাব্য বাস্তবের অতিরিক্ত অন্তরাত্মার পরিচয় দেয়। '**The light that never was on land or sea,** সেই আলোকে বিশ্বদর্শন করবার শক্তিকেই আমরা কবিপ্রতিভা বলি, কেননা সে জ্যোতি বাহ্যজগতে নেই। অন্তর্জগতেই তা আবির্ভূত হয়।' (পৃঃ ৬৮)

প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্য ক্ল্যাসিকাল; সাহিত্যে তিনি দেহাত্মবাদী নহেন, দেহবাদী। তাহার উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রলেপের মত; ইহা তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 'চিত্রাঙ্গদা'র বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেন; ইহা তাঁহার সমালোচনার বৈশিষ্ট্যের ও বৈদগ্ধ্যের সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়। তিনি কবিতার কল্পলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, কবিতার সত্য একটা **mystery,** লজিকের দ্বারা যাহার অনুধাবন করিতে পারা যায় না। আবার সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে তিনি শুধু এই কাব্যের ভাষার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন এবং তিনি আশা করেন যে তাহা হইলে আত্মার সাক্ষাৎকার পাঠকবর্গ নিজেরাই করিতে পারিবেন। তিনি দেহ ও আত্মার নিবিড় সম্পর্ক উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করেন নাই: 'তাহা হইলে' বলিয়া সমালোচনার আসল সমস্যা এড়াইয়া গিয়াছেন।

গ্রীক্ সাহিত্যশাস্ত্রী লঙ্গাইনুস একখানা ছোট বই লিখিয়াছিলেন **On the Sublime**। বইটি এই নামে প্রচলিত হইলেও গ্রীক্ ভাষায় (ইংরেজ) পণ্ডিতগণ বলেন, ইহাকে **On Elevated Speech** বলা উচিত। লঙ্গাইনুস আরম্ভ করিয়াছেন বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের বিচার দিয়া এবং তারপর তিনি বাগ্মিতার সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক ও দূরত্ব বিচার করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। তিনি মনে করেন বাগবৈদগ্ধ্যের দ্বারা মানুষের মনকে বোঝান যায়; কিন্তু কবির প্রতিভা আমাদের চিত্তে উন্মাদনা আনে, আমাদিগকে উচ্চতর লোকে উন্নীত করে। এই যে উর্দ্ধায়ন বা উন্নয়ন

কাজ ইহা প্রতিভাসাপেক্ষ কিন্তু প্রতিভারও হাতিয়ার দরকার ; ভণিতিবৈচিত্র্য, ভাষার কৌশল, অলংকার প্রয়োগ সেই হাতিয়ার। তিনি Sublimity বা কাব্য-মাহাত্ম্যের পাঁচটি সূত্রের সন্ধান দিয়াছেন : প্রথম দুইটি মহান্ চিন্তা আর গভীর ও তীব্র অনুভূতি (passion) এবং শেষের তিনটি ভাষা ও অলংকার সম্পর্কিত কৌশল। বলা যাইতে পারে প্রথম দুইটি স্বাভাবিক, শেষের তিনটি কৃত্রিম। লঙ্গাইনুস দেখাইয়াছেন যে, এই দুই শ্রেণীর সূত্রের মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই। বাক্ ও অর্থ—সংস্কৃত আলংকারিকদের ভাষায়—পার্বতী-পরমেশ্বরের মত নিবিড় ঐক্যে সম্পৃক্ত। আমরা যাহাকে স্বাভাবিক প্রতিভা বলি তাহা বিশৃঙ্খল নহে এবং রচনাচাতুর্যের যে সকল নিয়ম অনুধাবিত হইয়াছে তাহা প্রতিভার স্ফূর্তির পরিপোষক, বাহ্য অলংকরণ মাত্র নহে। আর এই সব নিয়মের বলেই আমরা জানিতে পারি সাহিত্যের কোন্ অংশ অলংকারাদির অনধিগম্য, নিছক প্রতিভার দ্বারা প্রণোদিত। প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনায় দেহ ও আত্মা, অলংকার ও অলংকার্যের গভীর সম্পর্কের কোন পরিচয় নাই। এখানে বিভিন্ন মতের সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু সামঞ্জস্য ও সমন্বয় হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন যে, প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে চালকপদের উপযুক্ত অধিকারী এবং এই প্রসঙ্গে তাঁহার বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতা, মনের ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন সচেতনতা, উজ্জ্বল আভিজাত্য প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবই রূপান্তরিত, অভিব্যক্ত বা স্বস্বরূপে উদ্ঘাটিত হইয়া রসত্ব লাভ করে। যে মন ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শ-হীন এবং যে মন কাব্যের আত্মাকে পরিহার করিয়া দেহের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণে নিমগ্ন হয় তাহার কাছে মেঘনাদবধ অপেক্ষা অন্নদামঙ্গল অধিক আস্বাদ্য হইবে ; সেই মন কাব্যের বহিরঙ্গনেই সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইবে, কাব্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর আন্তরিক সংযোগ ছিল না। যে চালকপদে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন সেই পদের যোগ্যতা তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি প্রকৃতপক্ষে ভামহ-দণ্ডী-বামনের উত্তরসূরি !

॥ ৩ ॥

দীনেশচন্দ্র সেন ঠিক রবীন্দ্রগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না ; তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কতদূর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন সেই বিষয়েও সন্দেহ আছে। অন্ততঃ

তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় দান—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'—রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারীদের সাহিত্যচর্চ্চার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু দীনেশচন্দ্র আর এক শ্রেণীর বইও লিখিয়াছিলেন—যেমন 'সতী', 'বেহুলা' প্রভৃতি। যে সমস্ত কাহিনী পুরাণে, প্রাচীন সাহিত্যে ও লোকমুখে বর্ণিত হইয়াছে তাহাদিগকে তিনি নূতন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদিগকে সাহিত্য সমালোচনার পর্য্যায়ে আনা যায় না। তাঁহার 'রামায়ণী কথা' ঠিক এই শ্রেণীর রচনা নহে। ইহার ভিত্তি একটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। ইহার মধ্যে অমূল ও অনপেক্ষিত একটি কথাও নাই; ইহার উদ্দেশ্য কাহিনীর বিবরণ নয়, চরিত্রের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও পুনরুজ্জীবন। রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন সাহিত্য ব্যক্তি-স্বরূপের প্রকাশ; ইহার প্রধান কাজ চরিত্রসৃষ্টি এবং সেই চরিত্র মানুষের শ্রেণীগত পরিচয় নয়, ব্যক্তিগত রূপ। দীনেশচন্দ্র রামাদি চরিত্রের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। আরও স্মরণীয় যে, এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই সব কারণে 'রামায়ণী কথা'কে রবীন্দ্রোত্তর সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ও এই গ্রন্থের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সাহিত্যের ইতিহাস; উহার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এই যে, সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী জীবনের ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, 'আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাস বনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।' 'রামায়ণী কথা' সেই ভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহে নাই। এই গ্রন্থের শেষের ছোট অধ্যায়টি রামায়ণ ও ভারতবর্ষীয় সমাজের কথা বলিয়াছে; কিন্তু তাহা নিতান্ত গৌণভাবে আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, রামায়ণ যুগপৎ ভারতবাসীর ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র ও কাব্য। ইহা এই অর্থে ইতিহাস যে ইহার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের যুগযুগবাহিত আদর্শ কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই ইতিহাস কতকগুলি অনুপম চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেই চরিত্রগুলিরই স্বরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি নূতন কিছু কল্পনা করেন নাই; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মল্লিনাথ যাহাকে 'অনপেক্ষিত' ও 'অমূল' বলিয়াছেন এমন একটি কথাও এই আলোচনায় নাই। রামায়ণের কবি নানা জায়গায় চরিত্রগুলি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, সেই ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত মন্তব্য ও বর্ণনাকে একত্র করিয়া তিনি তাহাদের সম্পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকিয়াছেন। সেই কারণে শুধু যে রামসীতার চরিত্রই আস্বাদ্যমান হইয়াছে তাহা নহে, কৈকেয়ী, বালী প্রভৃতি গৌণ চরিত্রও সমগ্রতা লাভ করিয়া বিশ্বাসযোগ্য হইয়াছে, ভরত ও লক্ষ্মণের মত একজাতীয় চরিত্রের মধ্যেও সূক্ষ্ম পার্থক্য সূচিত হইয়াছে।

'কাব্য-জিজ্ঞাসা'য় অতুলচন্দ্র গুপ্ত একটু যেন গায়ে পড়িয়া constructive criticism বা গঠনমূলক সমালোচনাকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ঐ অনবদ্য গ্রন্থের ইহাই নিকৃষ্টতম অংশ। তিনি ইহাই মনে করেন বলিয়া বোধ হয় যে, সমালোচক ভাল মন্দ বিচার করিয়া দিবেন, অলংকার বা ধ্বনি নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন ; ইহার অধিক অগ্রসর হইয়া রসের আস্বাদকে সংক্রামিত করিতে চেষ্টা করিবেন না অথবা কাব্যের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করিবেন না। সে কাজ প্রত্যেক পাঠক নিজেই করিবেন – কেহ পরের মুখে রসের আস্বাদন করিতে পারিবেন না। এইখানে অতুলচন্দ্র গুপ্তের উপর প্রমথ চৌধুরীর অপপ্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে ; পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রমথ চৌধুরী ভাষার ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ করিয়া রসাস্বাদনের ভার পাঠকের উপরেই ন্যস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত বিস্তারিত বিশ্লেষণমূলক সমালোচনাকে 'কবিত্ব' বলিয়া পরিহাস করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সমালোচক যদি নিজে কবি হয়েন তাহা হইলেই তিনি অপরের মনে নিজের আস্বাদন সঞ্চারিত করিতে পারেন। দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' এই অভিযোগের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর। সমালোচক নিজে কবি হইলে কি অপূর্ব্ব বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন রবীন্দ্রনাথের উর্ম্মিলাচরিত্রকল্পনা তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাল্মীকি যেখানে ফাঁক রাখিয়া গিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাহা সোনা দিয়া ভরিয়া দিয়াছেন। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' গদ্যকাব্যের রসাস্বাদনে রবীন্দ্রনাথই মুখ্য, বাল্মীকি গৌণ। দীনেশচন্দ্র কবি নহেন ; তিনি রসজ্ঞ পাঠক মাত্র। রামায়ণের পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলে ঐ কাব্য তাঁহার মনে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও সমালোচকের সীমিত কল্পনাশক্তির সাহায্যে তিনি রামায়ণের চরিত্রগুলির জীবন্ত প্রতিবিম্ব উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছেন। তিনি যে রস পরিবেশন করিয়াছেন তাহা বাল্মীকির কাব্যের রস ; সমালোচক দর্পণমাত্র, তবে সাধারণ দর্পণের মত নিষ্ক্রিয় নহেন।

॥ ৪ ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের জন্যই হউক অথবা বাংলাসাহিত্যের অধিকতর অভ্যাসের জন্যই হউক গত পঞ্চাশ বৎসরে সমালোচনাসাহিত্যের খুব প্রসার হইয়াছে। যে সব সমালোচক রচনার প্রাচুর্য্য ও প্রভাবের ব্যাপকতার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে দুই জনের কথা এইখানে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে—শশাঙ্কমোহন সেন ও মোহিতলাল মজুমদার। ইঁহাদের মধ্যে খানিকটা সাদৃশ্যও আছে। ইঁহারা উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এম-এ পরীক্ষার বিষয় বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার অল্পকাল মধ্যেই শশাঙ্কমোহন সেন বাংলা বিভাগের লেক্‌চারার নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং আমরণ সেই কাজ করিয়া গিয়াছেন। মোহিতলাল অনেক দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের লেক্‌চারার ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই উচ্চতম মানের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আবহাওয়ায় ইঁহাদের সাহিত্যচিন্তা পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে আরও দুই একটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সাহিত্যে ইঁহারা উভয়েই শিল্পকলা (form) অপেক্ষা বিষয়বস্তুর উপর বেশি জোর দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। শশাঙ্কমোহন সেন ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি বেশি অনুরক্ত ছিলেন। মোহিতলাল ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের, বিশেষ করিয়া ইংরেজি সাহিত্যসমালোচনার, পক্ষপাতী ছিলেন। তবে উভয়েরই ঝোঁক—মোহিতলালের সমালোচনায় যদি কোন নির্দিষ্ট ঝোঁক থাকে—বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, ব্যাপকতা ও প্রগাঢ়তার দিকে। ইঁহারা রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বকে শিরোধার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু কেহই যেন রবীন্দ্রপ্রতিভাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃতি দিতে পারেন নাই। শশাঙ্কমোহনের মতে রবীন্দ্রনাথ বস্তুগত উপন্যাস রচনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটক অস্পষ্ট; রবীন্দ্রনাথ অদৃশ্যতাকে অধ্যাত্ম শক্তি বলিয়া ভুল করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যে অর্থের প্রগাঢ়তা নাই। 'সোনার তরী' কবিতার ব্যাখ্যায়ও শশাঙ্কমোহন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কেই অনুসরণ করিয়া ইহাকে 'অস্ফুট' ও 'বিকলাঙ্গ' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। মোহিতলালের রবীন্দ্রসমালোচনার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে শুধু এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক সাহিত্যের

অবনতির জন্য দায়ী করিয়াছেন। এই হিসাবে ইঁহারা একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি ; ইঁহারা রবীন্দ্রানুরাগী, কিন্তু রবীন্দ্রানুসারী নহেন।

শশাঙ্কমোহন সেন ও মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন প্রচুর এবং সর্ব্বত্রই তাঁহাদের পাণ্ডিত্য আমাদিগকে বিস্মিত, বিভ্রান্ত করে। এই যুগে ইংরেজি-শিক্ষিত পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে ইউরোপীয়, বিশেষ করিয়া ইংরেজি সাহিত্যের আলোকে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করার প্রবৃত্তি প্রবল হয়। তারপর এই সময়ই সংস্কৃত রসশাস্ত্রের প্রতিও পাঠকসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের তুলনা করার চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়। শশাঙ্কমোহন ও মোহিতলালের মধ্যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার প্রবৃত্তি উৎকট আকার ধারণ করে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্পবয়সে মারা যান, তবু এই কালের মধ্যেই তিনি নানা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন ; ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বহুশ্রুত অধ্যাপকরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ; প্রমথ চৌধুরী ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত নানা সাহিত্য, দর্শন ও অলংকারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহাদের পাণ্ডিত্য সংযত ও সীমিত, পাণ্ডিত্যের চাপে প্রস্তুত বিষয় আচ্ছন্ন হয় নাই। যেখানে বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হইয়াছে সেইখানেই দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে এবং বক্তব্য বিষয়ের উপর আলোকসম্পাতই তাহার লক্ষ্য। কিন্তু শশাঙ্কমোহন ও মোহিতলালের এবং সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের রচনায় পাণ্ডিত্যের বিস্তারে ও বাগ্‌বাহুল্যে প্রস্তুত বিষয় সর্ব্বত্রই চাপা পড়িয়া গিয়াছে, কোনও বিষয়ের আসল সমস্যার উপর আলোকপাত একেবারেই হয় নাই। কোন সূত্রকেই শেষ পর্য্যন্ত চালিত করা হয় নাই, যাহা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ছিল সমালোচনার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যে তাহা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বাংলা সমালোচনায় ইহা এক প্রকারের **inferiority complex**। মনে হয় লেখক কেবলই ভয় করিতেছেন যে বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখিতে পারিলে বাংলা সমালোচনা ও বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট মর্য্যাদা পাইবে না এবং তাহার ফলেই ইঁহাদের বহুবিষয়িণী বিদ্যা অহংপূর্ব্বিকা হইয়া ঠেলাঠেলি করিয়া আগাইয়া আসে এবং পাঠককে বিভ্রান্ত করে। যেখানে হয়ত প্রকৃতপক্ষেই ইঁহাদের কিছু বলিবার আছে, সেইখানেও অনাবশ্যক পাণ্ডিত্যের চাপে আসল কথাটা সম্মুখে আসিতে পারে না। বেদ হইতে বের্গস, হোমার হইতে হামসুন—এই বহু বিস্তীর্ণ, ঘনসন্নিবিশিষ্ট পাণ্ডিত্যের ব্যূহ ভেদ করিয়া কোন কাব্যের তাৎপর্য্য উঁকি দিতে পারে না

শশাঙ্কমোহন সেন মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথ ও মেটারলিংকের রূপক নাটকের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে ; মেটারলিংকের নাটকের গোড়ার কথা সংশয়, রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভিত্তি বিশ্বাস। কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মত ; এই ভাবগত পার্থক্য কেমন করিয়া ইঁহাদের নাটকের রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং রসের আস্বাদনে বৈচিত্র্য আনিয়াছে সাহিত্যে তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। কিন্তু ইউরোপীয় symbolist নাটক, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতি অর্দ্ধপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণার ফলে এই ইঙ্গিতটি ইঙ্গিতই রহিয়া গিয়াছে। ম্যাথ্ আর্ণল্ড কাব্যকে বলিয়াছেন criticism of life অথবা জীবনসমালোচনা বা জীবনজিজ্ঞাসা। ইংরেজি সাহিত্যশাস্ত্রে ইহা একটি বহুল প্রচারিত, বহু-আলোচিত সংজ্ঞা। আপাত দৃষ্টিতে ইহার মধ্যে অতিব্যাপ্তি দোষ আছে, কারণ দর্শন প্রভৃতির মধ্যেও criticism of life আছে। ম্যাথ্ আর্ণল্ড এই সম্ভাব্য আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন এই বলিয়া যে laws of poetic truth and poetic beauty অর্থাৎ কাব্যের সত্য ও কাব্যের সৌন্দর্য্যের দ্বারা এই জীবনজিজ্ঞাসা সীমিত। ইহাও আপত্তিজনক, কারণ কাব্যের দ্বারাই কাব্যের সংজ্ঞা করা হইয়াছে এবং ম্যাথ্ আর্ণল্ড এই চক্রক এড়াইবার চেষ্টাও করিয়াছেন। এই সংজ্ঞার এই সকল প্রশ্নই সমাধানের অপেক্ষা রাখে : poetic truth ও poetic beauty কাহাকে বলে এবং জীবন-জিজ্ঞাসামূলক চিন্তার সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক কি। শশাঙ্কমোহন জীব-পরম-নিসর্গের সম্বন্ধগত নানা তত্ত্বের অবতারণা করিয়া এই সংজ্ঞাকে ঝাপ্সা করিয়া দিয়াছেন আর মোহিতলাল এই সংজ্ঞার যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা অন্ধকার হইতে অধিকতর অন্ধকারে লইয়া যায়। মনে হয় যে, ইঁহারা যদি অন্য—বিশেষ করিয়া ইউরোপীয়—সাহিত্য ও সাহিত্য-শাস্ত্রকে বাদ দিয়া নিজেদের রসোপলব্ধিকে ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেন এবং মল্লিনাথের মত প্রতিজ্ঞা করিতেন যে অমূল ও অনপেক্ষিত কিছু বলিবেন না, তাহা হইলে ইঁহাদের সমালোচনা - অন্তত শশাঙ্কমোহনের সমালোচনা—সার্থক হইতে পারিত। মোহিতলাল বলিয়াছেন, সমালোচনার উদ্দেশ্য হইল অস্ফুটকে স্পষ্ট করা। তাঁহার নিজের সমালোচনায় কিন্তু স্ফুট কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং যাহা পূর্ব্বে কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল তাহা তিমিরাবৃত হইয়াছে।

॥ ৫ ॥

ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বাগ্‌বাহুল্য এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির অভাব সত্ত্বেও শশাঙ্কমোহনের সমালোচনার মূল সূত্রগুলি বোঝা যায় এবং অন্ততঃ মধুসূদনের ক্ষেত্রে তাঁহার রচনায় মৌলিকতা ও রসোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সাহিত্যে নানা উপাদানের সন্ধান করিয়াছেনঃ আকৃতি ও প্রকৃতি; জীব, নিসর্গ ও পরম; বস্তু, তত্ত্ব ও ভাব; ভাব ও কাঠামো; আকৃতি, রসাত্মা ও প্রাণগত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই সব উপাদানের মধ্যে তিনি সূক্ষ্ম বিভেদরেখা টানিতে পারেন নাই। মনে হয় প্রচলিত সমালোচনায় যাহাকে content ও form বলা হয় তাহাই তিনি তিন ভাগে বিশ্লিষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন–কাব্যের বিষয়বস্তু, কবির তত্ত্ব বা আইডিয়া এবং কাব্যের শিল্পরূপ। এই তিনের সামঞ্জস্য থাকিলেই কাব্য; কিন্তু শুধু সামঞ্জস্য থাকিলেই কাব্য হইবে না, সেই সামঞ্জস্যের মধ্যে প্রাণ থাকা চাই এবং তাহা মঙ্গলময় হওয়া চাই। তাঁহার মতে সত্যসুন্দরের আসল লক্ষ্য শিব এবং এই জন্যই তিনি art for art's sake নীতির বিরোধী। তাঁহার বিস্তারিত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তিনি কাব্যে শিল্পকর্ম্ম অপেক্ষা সমুন্নত ভাবের উপর বেশি জোর দিতেন। মধুসূদন প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেঘনাদ 'অপূর্ব্ব বীর বিভূতির প্রদর্শনপূর্ব্বক নীতি-ধর্ম্মশাস্ত্র কিংবা ধর্ম্মভীরুতার নিঃসম্পর্কভাবে কেবল "মনুষ্যত্ব" মাত্র উপস্থাপন করিয়া, বঙ্গসাহিত্যে একটা অতর্কিত যুগান্তর এবং নীরুক্ত বিপ্লবেরই সূত্রপাত করিয়াছে।' (বঙ্গবাণী—পৃঃ ৯৪) বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি পূর্ণাঙ্গ শিল্পী বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছেন। কিন্তু সেই অভিনন্দন ঋষি বঙ্কিমকে, শিল্পী বঙ্কিমকে ততটা নয়।

কাব্যের শিল্পসৌন্দর্য্য সম্পর্কে শশাঙ্কমোহনের উপলব্ধি বা ধারণা খুব প্রখর ছিল না। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই বলা যাইতে পারে। 'কপালকুণ্ডলা'য় যে অদৃষ্টবাদ পাওয়া যায় তাহা ভারতীয় অদৃষ্টবাদের অনুরূপ নয়; তাই ইহা সমালোচকের মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু তবু ইহার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠাশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তিনি খানিকটা কুণ্ঠার সহিত স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে এই প্রাণপ্রতিষ্ঠাশক্তিই সাহিত্য-প্রতিভার শেষ কথা। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পকর্ম্মের মধ্যে কিছু দোষত্রুটি দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শপ্রবণতা, স্বদেশপ্রীতি, ভাবের উচ্ছ্বাস ও মহনীয়তার

উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রশংসায় তিনি এতটা পরিমাণবোধ হারাইয়া ফেলিয়াছেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তুলনায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ইব্‌সেনের হীনতা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি শুধু হেমচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসাই করেন নাই, মধুসূদন ও হেমচন্দ্রকে একই পর্য্যায়ে ফেলিয়া তাঁহাদের মধ্যে 'কঠোর এবং নিরাভরণ সরলতা, সমুচ্চ কণ্ঠ ও অনম্য পৌরুষ' দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার মতে বৃত্রসংহার 'বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পূর্ণ, সুগঠিত এবং সুলিখিত কাব্য।' এমন কি, 'কণ্ঠসমুন্নতি'তে তিনি হেমচন্দ্রকে মিল্‌টনের সমকক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি নবীনচন্দ্রের মধ্যে উন্নত ভাবাবেগ, বিস্তৃত দূরগামী কল্পনার প্রসার দেখিতে পাইয়াছেন; শুধু শিল্প-সংযমের অভাবে নবীনচন্দ্র উন্নত শ্রেণীর আর্টিষ্ট হইতে পারেন নাই। 'বঙ্গ-বাণী' ও 'বাণী-মন্দির' এই উভয় গ্রন্থে শশাঙ্কমোহন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক অনুকূল ও প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথ উচ্চশ্রেণীর শিল্পী, কিন্তু তাঁহার কাব্যে উন্নত ভাব, অর্থের প্রগাঢ়তা, দৃঢ় বস্তুতন্ত্রতা নাই। তাঁহার মতে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য অস্পষ্ট, সেখানে অর্থের দীপ্তি অপেক্ষা ইশারার প্রাধান্য এবং ইহা জলছবির সঙ্গে তুলনীয়; তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন ইহা 'তরল' ও 'জলীয়'!

শশাঙ্কমোহন সেন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িকদের মধ্যে কোন কোন লেখকও আনিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তীদের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, শশাঙ্কমোহনের সমসাময়িকদের মধ্যে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব সমালোচক সাহিত্যের ও জাতীয় জীবনের নিবিড় সংযোগ দাবি করেন এবং ইঁহারা মনে করেন দেশ-কালের সীমিত সত্য ও সীমিত সমস্যার আলোচনা করিয়াই সাহিত্য নিত্য বস্তু ও নিত্য রসের সন্ধান করে। রসের যদি অপ্রতুলতা থাকে তাহা হইলেও তত ক্ষতি নাই, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে যোগ থাকিতে হইবে, সমুন্নত ভাব থাকিতে হইবে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'রাজা', 'ডাকঘর', 'গোরা' আর্ট হিসাবে পরম সুন্দর নহে, কিন্তু তাহাদের ভিতরকার তত্ত্ব বা যুক্তি অতি গভীর ও সুন্দর; কবি এই সকল গ্রন্থে সমাজের কয়েকটি জটিল সমস্যার আলোচনা করিতে ও মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সব সমালোচকেরা রবীন্দ্রোত্তর যুগের লেখক। কিন্তু ইহারা স্বদেশী

যুগের ভাবধারার দ্বারাই সমধিক প্রভাবিত ; তাই শিল্পকে শিল্পাতিরিক্ত মানদণ্ডের দ্বারা বিচার করিয়াছেন। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে সাহিত্যের শেষ বিচার সাহিত্যের মানদণ্ডের সাহায্যেই করিতে হইবে। নিত্য বস্তু বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তাহা রসরূপ না পায় তাহা হইলে সাহিত্য বিচারে তাহার কোন মূল্য থাকিবে না। রাধাকমলের ভাষায়ই বলিতে পারি পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' পর্য্যন্ত সাহিত্যের চঞ্চল রসস্রোতের মধ্যে এই সনাতন সত্যই নিত্য ভাসমান। বস্তুজগতের যে বিষয় লইয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহা সমাজের বড় সমস্যা হইতে পারে অথবা তাহা আপাত অলীক ও আজগুবি ব্যাপারও হইতে পারে। শশাঙ্কমোহন যাহাকে প্রাণপ্রতিষ্ঠাশক্তি বলিয়াছেন তাহার দ্বারাই কবি ইহাকে নিত্য রসে মণ্ডিত করেন এবং রসসৃষ্টির দ্বারাই তিনি নিত্যবস্তুরও সন্ধান করেন। রাজা ঈদিপাসের কাহিনীতে পাই পুত্র পিতাকে হত্যা করিয়া মাতাকে বিবাহ করিয়াছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা যাহাই বলুন, ইহা অপেক্ষা অ-বাস্তব কাহিনী কেহ কল্পনা করিতে পারে না এবং ইহা নীতি-বিরুদ্ধও বটে। বস্তুতান্ত্রিক সমালোচক স্বীকার করিবেন যে শুধু **art for art's sake**—মন্ত্রবলেই এই নীতিবিরুদ্ধ কাহিনী বাঁচিয়া আছে। হ্যাম্‌লেট সম্পর্কে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের সম্রাট বার্ণার্ড শ' বলিয়াছেন, আমাদের পিতৃব্যেরা আমাদের পিতাদিগকে হত্যা করে না বা আমাদের জননীদিগকে বিবাহ করে না। কিন্তু বিশ্বের রসিক সমাজ হ্যাম্‌লেট নাটকে বস্তুতন্ত্রতা বা সমুন্নত কণ্ঠের অভাব দেখিতে পায় নাই। যদি কবির শিল্পপ্রতিভা থাকে তাহা হইলে তিনি ক্ষুদ্র বস্তুকে বিশালতা দান করিতে পারেন, আপাত-তরল ভাবকে প্রগাঢ়তা দান করিতে পারেন। আর এই প্রতিভা না থাকিলে ভাবুকতা **sentimentalism** বা ভাবালুতায় পরিণত হইবে, সমুন্নত কণ্ঠ বেসুরো শুনাইবে।

শিল্পসৌন্দর্য্যকে সমুচিত মর্য্যাদা দিতে পারেন নাই বলিয়াই শশাঙ্কমোহনের সাহিত্যবিচার স্থায়ী মূল্য পাইবে না। তিনি নবীনচন্দ্রের মধ্যে শিল্পসংযমের অভাবের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র 'রৈবতক' প্রভৃতি সম্পর্কে ইংরেজিতে নবীনচন্দ্রকে যে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার তিন চার পংক্তিতে শিল্পকর্ম্মের যে আলোচনা আছে শশাঙ্কমোহনের দুই বিরাট্ গ্রন্থে তাহার অনুরূপ কিছু নাই। হেমচন্দ্রের

উৎকৃষ্ট শিল্পচাতুর্য্যের তিনি যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা হাস্যকর। হেমচন্দ্রের সমুন্নত ভাবই তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন এমন একজন কবি যাঁহার কাব্যে সমুন্নত ভাব ও সমুন্নত শিল্পের সমন্বয় হইয়াছিল। মধুসূদনের কাব্যসমালোচনায় শশাঙ্কমোহনের সমালোচনাশক্তি যথাযোগ্য বিকাশ লাভ করিয়াছে। তিনি 'মধুসূদন'-গ্রন্থে মধুসূদনের কবিপ্রতিভার যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার সবটাই তাঁহার রসোপলব্ধির পরিচয় দেয়। বিশেষ করিয়া তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার মত উৎকৃষ্ট সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। এইখানে নিয়তির লীলার যে বিশ্লেষণ পাই (পৃঃ ১০৪—১০৯) তাহা যে কোন শ্রেষ্ঠ সমালোচনার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। মধুসূদন বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় কাহিনী হইলেও মেঘনাদের তিন-চতুর্থাংশ গ্রীক। শশাঙ্কমোহন এই উক্তির বিস্তৃত ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিয়াছেন। একটি মৌলিক গ্রীক ভাব কাব্যের ঘটনাসংস্থান ও চরিত্রসৃষ্টিকে কেমন করিয়া প্রভাবিত করিয়াছে এবং কেমন করিয়া সৌন্দর্য্যপিপাসু কবি মহৎ নীতি আক্ষিপ্ত করিয়াছেন তাহাও এইখানে অতি বিশদ্ ভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। চেষ্টারটন যে বলিয়াছিলেন, the good fable *is* a moral আর the bad fable *has* a moral তাহারও সঙ্গত ব্যাখ্যা এই সমালোচনায় পাওয়া যায়। এই কাব্যের নায়ক কে —রাবণ না মেঘনাদ? ইহার মধ্যে বীররস ও করুণরসের সমন্বয় সুসমঞ্জস হইয়াছে কি? মধুসূদনের রাবণ কেন সীতাকে অঙ্কশায়িনী করিতে চাহেন নাই? রাম ও লক্ষ্মণকে হীনচরিত্র করিয়া আঁকিবার কাব্যগত সার্থকতা কি?—অন্য কোন সমালোচক এই সকল প্রশ্নের এমন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। শশাঙ্কমোহনের আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী 'বাণী-মন্দির' পাণ্ডিত্যের আবর্জনাপূর্ণ, 'বঙ্গ-বাণী'তে এখানে ওখানে অর্দ্ধসত্যের পরিচয় থাকিলেও উৎকৃষ্ট সমালোচনার নিদর্শন কমই আছে, কিন্তু তাঁহার 'মধুসূদন', বিশেষ করিয়া এই গ্রন্থের মেঘনাদবধের বিশ্লেষণ, উচ্চাঙ্গের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দেয়।

॥ ৬ ॥

সাহিত্যসমালোচনায় মোহিতলাল মজুমদারের উৎসাহ ছিল প্রচুর, অধ্যবসায় ছিল অদম্য, কিন্তু তাঁহার যোগ্যতা ও কৃতিত্ব যৎসামান্য। তিনি বহুশ্রুত লেখক, তাঁহার রচনায় নানা দিগ্দেশের সাহিত্য ও দর্শনবিষয়ক

পাণ্ডিত্য দেদীপ্যমান, কিন্তু তবু তিনি পাণ্ডিত্য অপেক্ষা সহজাত রসোপলব্ধিকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁহার নিজের রসগ্রহণ শক্তির দুই একটা নমুনা দিতেছি। কালিদাসের মেঘদূতের অনেক শ্লোকই খুব বিখ্যাত। তন্মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও উদ্ধৃত পাঁচ সাতটি শ্লোকের মধ্যে একটির উল্লেখ মোহিতলাল করিয়াছেন :

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
গণ্ডচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্থং ক্বচিদপি ন তে ভীরু সাদৃশ্যমস্তি।

এই অপরূপ শ্লোকটির মধ্যে মোহিতলাল শুধু অবাস্তব কল্পনা-বিলাস দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহার মতে বাস্তবের নামগন্ধ নাই বলিয়াই নাকি রসবাদী আলংকারিকের মতে ইহা একটি উৎকৃষ্ট রস-রচনা।* তিনি ইহার সঙ্গে তুলনা করিয়া শ্রেষ্ঠ কাব্যের সন্ধান পাইয়াছেন স্থইনবর্ণের নিম্নোদ্ধৃত উচ্ছ্বাসে :

Love, that for very life shall not be sold,
Nor bought nor bound with iron nor with gold ;

* * *

Through many and lovely days and much delight
Led these twain to the lifeless life of night.

বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমরা কুমারসম্ভব ছাড়িয়া স্থইনবর্ণ পড়ি। বঙ্কিমভক্ত মোহিতলালের সমালোচনা পড়িবার পূর্ব্বে আমরা এই আক্ষেপোক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারি নাই !

ইব্‌সেন জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার। দীনবন্ধু মিত্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম বড় নাট্যকার ; সেই কারণে তিনি আমাদের প্রিয়। কিন্তু যতদূর জানি দেশীয় সাহিত্যের প্রতি প্রীতি আমাদের পরিমাণবোধকে আচ্ছন্ন করে নাই ; কেহ দীনবন্ধু মিত্রকে ইব্‌সেনের সঙ্গে তুলনা করার কথা কল্পনা করেন নাই। কিন্তু মোহিতলাল এই তুলনা করিয়াছেন এবং দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। A Doll's House ও নীলদর্পণের তুলনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, নীল-

* (সাহিত্য-কথা – পৃঃ ৪৮-৪৯) কোন্ রসবাদী আলংকারিক বাস্তবের নামগন্ধ নাই বলিয়া ইহাকে উৎকৃষ্ট রস-রচনা বলিয়াছেন জানিনা। আনন্দবর্দ্ধন এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মন্তব্য যোজনা করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে এইরূপ মন্তব্যের নামগন্ধও নাই।

দর্পণে 'মানবচরিত্ররসের অভাব নাই' আর 'ইব্‌সেনের নাটকখানিতে সে রসের বালাই নাই।' (সাহিত্য কথা—পৃঃ ২০২) এই তুলনা ও মন্তব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করা কঠিন। বঙ্কিমের প্রতাপ বলিয়াছিল, 'আমার ভালবাসার নাম—জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।'* মৃত্যুর প্রাক্কালে শেক্সপীয়রের ক্লিওপ্যাট্রা বলিয়াছিল, 'I have immortal longings in me' এবং এই বলিয়া সে মৃত্যুকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছিল। মোহিতলাল এই দুই ব্যাপার ও এই দুই বিভিন্ন উক্তির মধ্যে শুধু সাদৃশ্য দেখিতে পান নাই, ক্লিওপ্যাট্রার উক্তির মধ্যে প্রতাপের উক্তির অর্থ খুঁজিয়া পাইয়াছেন! আর একটি মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রশংসাবাদ করিলেও মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল ছিলেন না। তাঁহার কাছে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত 'পৃথিবী' কবিতাটি 'পালোয়ানী প্যাচ' বলিয়া মনে হইয়াছে। (সাহিত্য-বিতান—পৃঃ ১১৬)

মোহিতলাল অনেক ভারতীয় ও ইউরোপীয় দার্শনিক ও সাহিত্যিক তথ্যের সন্নিবেশ করিয়া সাহিত্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এইখানেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি, প্রয়োগনৈপুণ্য ও পরিমাণবোধ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। তিনি লিখিয়াছেন, 'সৃষ্টির নিয়তিনিয়মের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতেই এক নূতন দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হইল, এবং মানব-চেতনার সর্ব্বোচ্চ ক্রিয়াকে একই তত্ত্বের অধীন করিয়া, Aesthetic বা রসতত্ত্বের নূতন ভিত্তি-স্থাপনা হইল। সোপেন-হাওয়ার হইতে এই নূতন রসতত্ত্বের সূচনা হয় এবং বেনেদেত্তো ক্রোচের মনীষায় ইহা স্ফুটতর ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে।' (সাহিত্য-বিতান—পৃঃ ২৪) সোপেনহাওয়ারের রসতত্ত্বের সঙ্গে নিয়তিনিয়মের কি সম্পর্ক আছে জানিনা। ক্রোচে সম্পর্কে এই উক্তি আরও বিভ্রান্তিকর, কারণ ক্রোচে সাহিত্যে বাস্তব-জগৎকে স্বীকার করেন না আর মানব মনের ক্রিয়ার বৈচিত্র্য বা বৈষম্যই তাঁহার রসতত্ত্বের ভিত্তি। ভারতীয় দর্শনের প্রয়োগও অধিকাংশক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্ভট হইয়াছে। একটি চরম দৃষ্টান্ত দিলেই মোহিতলালের সমালোচনাভঙ্গি প্রকট হইবে। কিশোর ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে আশ্বাস দিয়াছে সে নির্ভয়ে রামনাম করিলে ভূতপ্রেতেরা মাছ চাহিতে আসিতে পারে না। কিশোর বালকের এই সরল উক্তির সুদীর্ঘ দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া সমালোচক বলিতেছেন,

* (বঙ্কিম-বরণ—পৃঃ ২১৯) মোহিতলাল বলিয়াছেন, রামানন্দ স্বামীর প্রশ্নে প্রতাপ উত্তর করিল, 'মরিতে যাইতেছি'। এই রকম কথা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নাই।

'দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে, উহাতে কোন দ্বৈত জ্ঞান নাই......আসলে, উহাতে একটি পরম তত্ত্বের ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহার ভাষাও ঠিকই হইয়াছে। সেই অদ্বৈত বুদ্ধি যাহার প্রাণে প্রবেশ করিয়া সমস্ত চেতনায় ব্যাপ্ত হইয়াছে, সে সর্ব্বজীবকে "রামময়" দেখিতেছে—বিশেষ করিয়া, সেই সকলকে, যাহারা মানুষের মত বুদ্ধিসম্পন্ন নয়। এই বালক "বেদান্তবিদ্" নয়—"বেদান্তকৃৎ" '! (শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র—পৃঃ ৪১-৪২)

মোহিতলালের সমালোচনায় নানা বিষয় ও তথ্যের সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু তিনি ঠিক কি বলিতে চাহেন তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় না। মনে হয় তাঁহার মতে কাব্য কবিমানসের অভিব্যক্তি, তাই কাব্যের অন্তরালে কবির যে ব্যক্তিসত্তা আছে তাহার রহস্য তিনি উদ্ঘাটিত করিতে চাহিয়াছেন। এই ভাবেই তিনি মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য সাহিত্যিকদের সমালোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় মত, সাহিত্য বাস্তবজীবনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত, সাহিত্য জীবন ও জগতের পরিচয় দেয়। মনে হয় এই জন্য তিনি ভারতীয় অলংকারের রসতত্ত্বকে স্বীকার করিতে পারেন নাই, কারণ রসবাদী আলংকারিকেরা রসকে অলৌকিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন যে, এই জাতীয় সাহিত্যচর্চ্চায় সাহিত্যের নিগূঢ় জীবনজিজ্ঞাসার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। যে রসাস্বাদকে তাঁহারা ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলিয়াছেন তাহা তাঁহার মতে 'চিত্তবিনোদন' মাত্র এবং কমেডির সমগোত্রীয়। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুরাগী ছিলেন কারণ ইউরোপীয় সমালোচনা জীবনের স্বাক্ষরের অনুসন্ধান করিয়াছে।

সাহিত্য জীবনের বা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই কথা কেহই বলেন নাই। যাঁহারা রসকে অলৌকিক বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন তাঁহারাও শাস্ত্র-ইতিহাসাদির মধ্যে ইহার মূল দেখিতে পাইয়াছেন এবং রসের মধ্যে একটা মিশ্র আস্বাদ পাইয়াছেন। কোল্‌রিজ যে স্বপ্নজগৎ রচনা করিয়াছেন আধুনিক সমালোচকেরা বাস্তব জীবনে তাহার সূত্র খুঁজিয়াছেন। সোস্যালিষ্ট সমালোচকেরা তো সাহিত্যকে সমাজজীবনের প্রতিরূপ বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন এবং সাহিত্যকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বে অ্যারিষ্টটল কাব্যকে জীবনের অনুকরণ বা mimesis বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন; তর্ক শুধু mimesis শব্দটির তাৎপর্য্য লইয়া। জীবনে যাহা ঘটে, কবির মনে যে জিজ্ঞাসা

আগে ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রেও তাহা প্রকাশিত হয়। সাহিত্যসমালোচকের পক্ষে প্রধান প্রশ্ন, কাব্যে বাস্তব যে রূপান্তর লাভ করে তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ কি, কারণ তাহা বস্তু হইতে 'অভিন্ন' হইলেও পার্থিব বিচারে ঠিক বাস্তব নয়। মোহিতলালও বলিয়াছেন, 'আমি যে রূপের কথা বলিয়াছি, তাহা বস্তুর সহিত অভিন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা বস্তুতন্ত্রের বাস্তব নহে।' (সাহিত্য-বিতান —পৃঃ ১৪) যে পদার্থ বস্তুতন্ত্রের বাস্তব নয় অথচ বস্তু হইতে অভিন্ন তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে মোহিতলাল চেষ্টা করেন নাই। কেমন করিয়া এই অপরূপ বস্তু সৃষ্ট হয় তাহাও তিনি বলেন নাই। তিনি সাহিত্য-সমালোচনার মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলিয়াই মনে হয় না। তিনি মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও আরও কয়েকজন লেখকের 'ব্যক্তিস্বরূপ' বা কবিপুরুষের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মধুসূদন-আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য। তিনি রাবণচরিত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে মধুসূদনের কবি-মানসের চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন মৌলিকতা নাই। বরং ইহা একদেশদর্শী বলিয়া ইহার মধ্যে মেঘনাদ বিভীষণ প্রভৃতির চরিত্র যথাযোগ্য জায়গা পায় নাই; ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক আদর্শের সমন্বয় করিতে যাইয়া সমালোচক কিছু গোলযোগ করিয়াছেন এবং প্যারাডাইস লষ্টের Satan-কে রোমাণ্টিক কল্পনার দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। মোহিতলালের রবীন্দ্রসমালোচনার বিচার পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের কবিমানসের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। মানুষ বঙ্কিম ও মানুষ শরৎচন্দ্র এবং শিল্পী বঙ্কিম ও শিল্পী শরৎচন্দ্র ইহাদের মধ্যে তিনি সীমারেখা টানিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় অনাবশ্যকভাবে তন্ত্রদর্শনের আমদানি করিয়া 'সামরস্য', 'কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ' প্রভৃতি গালভরা শব্দ ও গভীর তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে; 'কাব্যের রোমান্স' ও জীবনের কাব্য—ইহাদের সম্পর্ক ও পার্থক্যও সূচিত হয় নাই। শ্রীকান্ত সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন, তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৈষ্ণব প্রেম প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে; এই সব বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য্য কোনটাই সহজে অনুমেয় নহে। সব চেয়ে আক্ষেপের কথা এই যে, শরৎচন্দ্র বা শ্রীকান্ত—কাহারও ব্যক্তিত্ব স্ফুট হয় নাই।

যেখানে মোহিতলাল নিছক সাহিত্যচর্চ্চা করিয়াছেন সেই সব অংশেরও

কোন মূল্য নাই। মধুসূদনের আলোচনায় ভাষা ও ছন্দের কথা বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে, কিন্তু ভাষা ও ছন্দ কেমন করিয়া বাস্তবকে কাব্যরূপ দান করে বা রসের সৃষ্টি করে তাহার কোন আভাস নাই। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসকে তিনি নাটকরূপে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ইহার নাটকত্বের কোন ব্যাখ্যা নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেই মোহিতলাল বেশি উৎসাহী ছিলেন, এবং তাঁহার বঙ্কিমসমালোচনাই সব চেয়ে বিভ্রান্তিকর। তিনি বঙ্কিমের সৃষ্টিকে তন্ত্রের প্রকৃতিপুরুষের দ্বন্দ্ব মিলনতত্ত্বের আলোকে দেখিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু 'প্রকৃতি' শব্দকে নানা অর্থে প্রয়োগ করায় ও 'পুরুষ' শব্দের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না করায় সমস্ত বিষয়টি ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে। তিনি আবার ব্র্যাড্‌লির শেক্সপীয়র-সমালোচনার সাহায্যেও বঙ্কিমকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার মধ্যে ব্র্যাড্‌লিকে চেনা যায় না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-কে তিনি শেক্সপীয়রের যুগের মেলোড্রামা বলিয়াছেন আবার হার্ডির **'Life's Little Ironies'** গ্রন্থেরও সামিল করিয়াছেন। এই জাতীয় সমালোচনা অস্ফুটকে স্ফুট করে না, বরং যাহা সহজ ছিল তাহাকে দুর্বোধ্য করিয়া তোলে। মোহিতলাল 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। (বঙ্কিম-বরণ—পৃঃ ৬১-৯৩) তাঁহার মতে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস হিসাবে বিশেষ নৈপুণ্যের দাবি করিতে পারে না, কারণ ইহার ঘটনাধারা অবিচ্ছিন্ন নয়; এখানে রোমান্টিক কাব্যকল্পনা নাটকীয় রসরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ঘটনাবিন্যাসের সংসক্তির অভাব নাটকের লক্ষণ —এইরূপ কথা পূর্ব্বে শুনি নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'কপালকুণ্ডলা 'গ্রীকনাটক' এই কথা অধিকাংশে সত্য। আবার ইহাও বলিয়াছেন, 'কপালকুণ্ডলা' বিলাতী আদর্শের খাঁটি ট্র্যাজেডির অন্তর্গত নয়। একবার বলিয়াছেন, ইহা অতিশয় সাধারণ জীবনের কাহিনী; কিন্তু তাহার পরই বলিয়াছেন একটি অসাধারণ ও অস্বাভাবিক চরিত্রের জন্য ইহার মধ্যে চিত্ত-চমৎকারের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্ত অর্দ্ধ-সত্য ও অ-যথার্থ মত ও মন্তব্যের সমাবেশের জন্য প্রবন্ধটি একটি গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে; পাঠক ইহার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিবেন এবং বঙ্কিমের উপন্যাস সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিবেন না।

॥ ৭ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে সুশীলকুমার দে'র নামোল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সমালোচনার বিবরণ দিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করা যাইবে। সুশীলকুমার ইংরেজি তথা ইউরোপীয় সাহিত্যে এবং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও বৈদগ্ধ্য প্রযুক্ত হইয়াছে সাহিত্য ও সাহিত্য-শাস্ত্রের ইতিহাস রচনায় ও গ্রন্থ সম্পাদনায়। তিনি প্রধানতঃ সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন না। তবুও তিনি এখানে ওখানে সাহিত্যবিষয়ক যে নানা নিবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার যথেষ্ট সাহিত্যিক মূল্য আছে; সেই সকল নিবন্ধ বাংলা সাহিত্য সমালোচনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। সুশীলকুমার সংস্কৃত রসশাস্ত্রের ঐতিহাসিক হিসাবেই সমধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমালোচনা ইউরোপীয় সাহিত্য বিচারের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। এই সমালোচনার একটি প্রধান গুণ চিন্তার ও ভাষার পরিচ্ছিন্নতা; **realism, humanism, paganism** প্রভৃতি ইউরোপীয় **concept** বা ভাবনার তিনি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারিয়াছেন। ভাষা ও ভাবের উপর তাঁহার নিশ্চিত অধিকার ছিল বলিয়া তাঁহার সমালোচনা কোথাও ঘোলাটে হয় নাই; কোথায়ও প্রাঞ্জলতা বা সুনির্দিষ্টতার অভাব হয় নাই।

সুশীলকুমারের সমালোচনার মৌলিকতা তাঁহার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্য ইহাকে ঠিক মৌলিক বলা যায় কিনা সেই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। সমালোচনায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান—কবিগান ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের ব্যাখ্যা ও বিচার। প্রথমটিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন, দ্বিতীয়টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া সূত্রকেই বিস্তারিত করিয়াছেন। কিন্তু মৌলিকতার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বার্ণার্ড শ' বলিয়াছেন, আন্‌কোরা নূতন কোন বস্তু নাই, সব কিছুরই কোথাও না কোথাও সূত্রপাত হইয়া থাকে; গাছ হাওয়াতে জন্মায় না। রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঋণী হইলেও সুশীলকুমারের কবিগান ও দীনবন্ধু সম্পর্কিত আলোচনা মৌলিকতায় ভাস্বর; কবিগান ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের বাস্তব ভিত্তির তিনি যে বিস্তারিত ও ব্যাপক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার আভাসমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে পাইয়াছিলেন।

যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কবিগানের জন্ম রবীন্দ্রনাথ তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ ইহাও দেখাইয়াছেন যে, কবি-সঙ্গীত বৈষ্ণব-

পদাবলীর একপ্রকার সাহিত্যিক অপভ্রংশ মাত্র। সুশীলকুমার এই সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিস্তারিত আলোচনা ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহাদিগকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। যে পরিবেশে কবিগানের জন্ম হইয়াছিল, যে ভাবে এই সকল গান রচিত হইত, যাহাদের মনোরঞ্জন এই গানের উদ্দেশ্য ছিল—কোনটিই সাহিত্যিক উৎকর্ষের পরিপোষক নয়। যদিও খুব হাল আমলে কবি-সঙ্গীতের দিকে লোকের দৃষ্টি পুনরায় আকৃষ্ট হইয়াছে, এই পর্যন্ত এই গান সাহিত্যের মর্য্যাদা পায় নাই ; ইহা অমার্জ্জিত পাঠকসম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হইত, ইহার ভাব ও ভাষায় ইতরতার ছাপ সর্ব্বত্র স্পষ্ট। সেইজন্য সুধীসমাজ ইহাকে সাহিত্যিক আবর্জ্জনা বলিয়া গণ্য করিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার পক্ষে কিছু বলিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন স্থায়ী সাহিত্যিক মূল্য আছে এইরূপ দাবি করেন নাই। স্থানে স্থানে সৌন্দর্য্য ও ভাবের উচ্চতা দেখিতে পাইলেও তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 'কবিওয়ালাদের গানে সাহিত্যরসের সৃষ্টি অপেক্ষা ক্ষণিক উত্তেজনা-উদ্রেকই প্রধান লক্ষ্য।' রবীন্দ্রনাথ যেখানে থামিয়াছেন, সুশীলকুমার সেইখানেই সমালোচনার সুরু করিয়াছেন। সাহিত্যবিষয়ে তাঁহার পরিমাণবোধ কখনও আচ্ছন্ন হয় নাই ; তিনি ইহাদের মধ্যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য আছে এমন কথা বলেন নাই। কিন্তু তিনি ইহাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট মূল্য আবিষ্কার করিয়াছেন। কবিওয়ালাদের গানে কখনও কখনও কৃত্রিমতা দেখা যায়। কিন্তু এই প্রলেপের অন্তরালে বাস্তবজীবনের সহজ, সরল প্রাণলীলার ছবি রহিয়াছে ; এই গানগুলির রস বাস্তবজীবনের রস। সেই দিক্ দিয়া ইহারা স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল এবং ইহারা কাব্য হিসাবেও খানিকটা কৃতিত্ব দাবি করিতে পারে।

সমালোচনাসাহিত্যে সুশীলকুমার দে'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান—দীনবন্ধু মিত্র-বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি আয়তনে ছোট, কিন্তু মৌলিকতায় ভাস্বর। বাস্তবিক পক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রের পরে দীনবন্ধু মিত্রের নাটক সম্পর্কে এমন সুন্দর আলোচনা আর কেহ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের বাস্তবানুগামিতার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বাস্তবানুগামিতা বলিতে ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, দীনবন্ধুর চরিত্রগুলি বাস্তবের প্রতিরূপ. তিনি যে সমস্ত চিত্র ও বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুশীলকুমার আরও অগ্রসর হইয়া যে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে দীনবন্ধুর প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছিল সেই পরিবেশের, বিশেষ করিয়া সেই পরিবেশের মধ্যে যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব

ছিল তাহার উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়া দীনবন্ধুর খাঁটি বাঙ্গালীত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, এবং দীনবন্ধুর সৃষ্টির সঙ্গে সমসাময়িক কালের সংযোগ দেখাইয়াছেন। এই শেষের কথাটি বলার প্রয়োজন আছে, কারণ সুশীলকুমারের আলোচনা নিছক ঐতিহাসিক বিবরণ নয়; এখানে ইতিহাসের মাধ্যমে সাহিত্যের অর্থ পরিস্ফুট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এই বাস্তবতার অনুসন্ধান সম্ভব ছিল না, কারণ তিনিও এই যুগের সন্তান, বোধ হয় ইহার শ্রেষ্ঠ সন্তান। দীনবন্ধুর মধ্যে যে অপরিণতি ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা পুরণ করিয়াছেন, ইহা সুশীলকুমার দেখাইয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আলোচনা করেন নাই; শুধু রোহিণী সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ছোটবড় সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্ত্তির একটি প্রধান অংশের উপরে আলোকসম্পাত করে। সেই হিসাবে তাঁহার আলোচনা বঙ্কিম-প্রতিভারও উল্লেখযোগ্য মূল্যায়ন এবং ইহা তাঁহার বাস্তবানুগ সমালোচনার বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য দেয়।

বাংলাসাহিত্যের প্রথম নাট্যকার তারাচরণ শীকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন—সুশীলকুমার দে ইঁহাদের নাটকের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইঁহাদের অল্পবিস্তর নাট্য-প্রতিভা ছিল, কিন্তু ইঁহারা সার্থক নাটক লিখিতে পারেন নাই। মধুসূদনের প্রতিভা বাংলা কাব্যকে অপরিসীম ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছে, কিন্তু তিনিও নাটকের ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। দীনবন্ধু মিত্র প্রতিভাবান্ নাট্যকার, কিন্তু তিনি মাত্র অংশতঃ সফলকাম হইয়াছেন। তাঁহার কমিক নাটকে শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ আছে, গুরুগম্ভীর নাটকে যেখানে তিনি চাষার প্রাণ, চাষার বুদ্ধি ও নিম্নশ্রেণীর লোকের জীবনের চিত্র আঁকিয়াছেন সেইখানেও তিনি কিছু কিছু উৎকৃষ্ট নাট্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই গণ্ডির সীমা যেখানে ছাড়াইয়া গিয়াছেন সেইখানেই ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহার কারণ এই সব লেখকরা—মায় মধুসূদন, দীনবন্ধু পর্য্যন্ত—নাটকের উপযুক্ত গদ্য আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে ইঁহাদের অপেক্ষা অনেক বড় কথাসাহিত্যিক রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, তাহার কারণ তিনি কথাসাহিত্যের উপযোগী ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। আর সবাই পথ খুঁজিয়াছেন, তিনিই ঠিক পথ আবিষ্কার করিয়া গন্তব্যস্থলে পঁহুছিতে পারিয়াছেন। দীনবন্ধু কমেডির অথবা সাধারণ মানুষের সাধারণ কথার উপযুক্ত

ভাষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু বৃহত্তর, মহত্তর জীবনের চিত্র আঁকিবার মত ভাষা তাঁহার জানা ছিল না, কাজেই সেই জীবনের অভ্যন্তরে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ভাষা ভাবের বাহন মাত্র নহে, ইহাই ভাব মন্দাকিনীকে প্রবাহিত করে এবং যে ধারা প্রবাহিত হয় তাহা ভাব ও ভাষা উভয়েরই সম্মিলিত ধারা। কথাটা পুরাতন, কিন্তু সুশীলকুমার বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগ হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া অতি সুন্দরভাবে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহা বাস্তবভিত্তিক সমালোচনার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ভাষার সঙ্গে ভাবের যে সম্পর্ক দেহজ কামের সঙ্গে হৃদয়ের প্রেমের সম্পর্ক অনেকটা সেইরকম। বাস্তবপন্থী সমালোচক সুশীলকুমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনার কবিতাকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে চাহিয়াছেন 'জয়দেব ও গীতগোবিন্দ প্রবন্ধে। জয়দেব বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন বাঙ্গালী কবির প্রভাব এত বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গালী সমালোচকেরা জয়দেবের প্রতি খুব প্রসন্ন নহেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কাব্যকে ইন্দ্রিয়পরতাদুষ্ট বলিয়া সমালোচনা করিলেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিযাছেন। 'জীবন-স্মৃতি'-পাঠে জানা যায় যে, বালক রবীন্দ্রনাথ গীতগোবিন্দের পদলালিত্য ও ছন্দোমাধুর্য্যে অভিভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিণতবুদ্ধি রবীন্দ্রনাথ সেই প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। 'কেকাধ্বনি'-প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতা" ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়।' প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি আধুনিক সমালোচকেরা জয়দেবের কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহেন নাই। সুশীলকুমার দে জয়দেবের কাব্যের প্রতি সুবিচার করিতে যাইয়া দাবি করিয়াছেন যে, জয়দেবের কাব্যে সংস্কৃতকাব্যের গীতি-কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এবং যদি গীতি-প্রাণতা এবং আত্মগত ভাবনার দ্বারা বহির্জ্জগৎকে আত্মসাৎ করা গীতি-কবিতার মূল লক্ষণ হয়, তাহা হইলে জয়দেবের পদাবলী গীতি-কবিতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। 'আত্মসাৎ করা' বলিতে সুশীলকুমার কি বুঝিয়াছেন বলিতে পারি না; তবে গীতি-কবিতার মূল লক্ষণ হইল এই যে, অন্তর্জ্জগৎ বহির্জ্জগতের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবে। কীট্সের কাব্য sensuous অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে পরিপূর্ণ, কিন্তু সেখানে মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

বাস্তবপন্থী সুশীলকুমার এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি লক্ষ্য করেন নাই। জয়দেবের কাব্য যে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে তাহার কারণ, এই কাব্য 'বাস্তবজগতের বিচিত্র রূপে ও রসে প্রত্যক্ষ মূর্তি ধারণ করিয়াছিল।' বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার কাব্যের দুইটি পরস্পর-সম্পৃক্ত দোষ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন—ইন্দ্রিয়পরতা ও বাহ্যপ্রকৃতির প্রাধান্য। সুশীলকুমার জয়দেবের কাব্যের মধ্যে অন্তর ও বাহিরের সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়া বলিয়াছেন যে এখানে বাস্তব ও কল্পনার, ইন্দ্রিয়গত ও অতীন্দ্রিয় ভাবের সমন্বয় হইয়াছে। (নানা নিবন্ধ, পৃঃ ৫২—৫৩) কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধির বর্ণনা অতীন্দ্রিয় ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়াছে সুশীলকুমার তাহার একটি উদাহরণও দিতে পারেন নাই। তাঁহার জয়দেব-সমালোচনায় বৈদগ্ধ্যের ছাপ আছে, কিন্তু ইহা বস্তুতান্ত্রিক সমালোচনার সীমাও নির্দেশ করে।

কাব্যের উৎপত্তি বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে এবং কবির প্রতিভা বাস্তবকে রসলোকে রূপান্তরিত করে অথবা বস্তুর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার রসরূপ আবিষ্কার করে, বস্তুতে যাহা খণ্ডিত, তৎস্থানিক ও তৎকালিক কাব্য তাহাকে অখণ্ড, দেশকাল-অনালিঙ্গিত, চিন্ময় রূপ দেয়। বস্তুতান্ত্রিক সমালোচক সাহিত্যের এই রূপান্তরীকরণ বা সামগ্রিকতার প্রতি অবহিত হয়েন না। সুশীলকুমার দে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখিয়াছেন—'রোহিণী'। উপন্যাসের ট্র্যাজেডি ও তাহার জন্য গোবিন্দলালের দায়িত্ব সম্পর্কে এই প্রবন্ধটি আলোকপাত করে। এই কারণে এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'সাহিত্যকথা' প্রবন্ধ পাঠকের মনে আসিবে, কারণ রামেন্দ্রসুন্দরও গোবিন্দলালের দায়িত্বই আলোচনা করিয়াছেন। সুশীলকুমার দে'র প্রবন্ধ 'সাহিত্যকথা'র তুলনায় খুবই আটপৌরে। রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার ছিল না; তিনি নিতান্তই বাস্তবপন্থী। যে রোমান্টিক কল্পনাবলে রামেন্দ্রসুন্দর উপন্যাসের ট্র্যাজেডির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, সুশীলকুমারের বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণে তাহার বাষ্পমাত্র নাই। মধুসূদনের কাব্যালোচনায়ও বাস্তবপ্রীতি তাঁহার রসদৃষ্টিকে অংশতঃ আচ্ছন্ন করিয়াছে, তিনি মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন, তখনকার বাঙ্গালীর মনোভাব প্রভৃতিকে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং মেঘনাদবধ-কাব্যকে রোমান্টিক গীতি-কবিতার পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহিয়াছেন। কথাটা শুনিতে অদ্ভুত হইতে পারে। কিন্তু এই রিয়ালিষ্ট সমালোচক কল্পনার মধ্যে বাস্তবভিত্তি খুঁজিতে

যাইয়া গ্রীক আদর্শে রচিত মহাকাব্যকে রোমাণ্টিক মহাকাব্য বলিয়া ভুল করিয়াছেন। মিল্‌টনের Satan চরিত্রে অংশতঃ মিল্‌টনের ব্যক্তিজীবনের পরিচয় আছে এবং Satan প্যারাডাইস্ লষ্টের অন্যতম প্রধান চরিত্র, কাহারও কাহারও মতে প্রধানতম চরিত্র। কিন্তু এই চরিত্রের মধ্য দিয়া মিল্‌টনের ব্যক্তিজীবনের ক্ষোভ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কোন স্থিরবুদ্ধি সমালোচক বলিবেন না যে, প্যারাডাইস লষ্ট রোমাণ্টিক কাব্য বা গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রান্ত। সুশীলকুমার লিখিয়াছেন, 'যখন মধুসূদন দাবী করেন যে তাঁহার কাব্য three-fourths Greek, তখন তাহা কবিজনোচিত অত্যুক্তি বলিয়াই মনে হয়।' (নানা নিবন্ধ, পৃঃ ২৪৪) শশাঙ্কমোহন সেনের আলোচনা পড়িলে মধুসূদনের 'অত্যুক্তি'র সার্থকতা বোঝা যায়।

সুশীলকুমার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন শুধু দীনবন্ধু মিত্রের নাটকাবলীর। এই গ্রন্থটি ছোট, কিন্তু তিনি দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিভার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই আলোচনার প্রধান গুণ ইহার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণনৈপুণ্য। তিনি দীনবন্ধুর যুগকে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, দীনবন্ধুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন এবং যে উপাদান—গদ্য-ভাষা—দীনবন্ধুর প্রতিভার আলম্বন তাহার উপযোগিতার বিচার করিয়াছেন, কিন্তু এইখানেও বাস্তবপন্থী সমালোচকের একদেশদর্শিতার চিহ্ন রহিয়াছে। তিনি তোরাপ, আদুরি, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি চরিত্র-চিত্রণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন; ইহারা সবাই বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত। এই সব চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। কিন্তু ইহারা কেহই সম্পূর্ণাঙ্গ নহে; সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্রের সঙ্গে তুলিত হওয়ার যোগ্য নহে। নাটক বা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র কেমন করিয়া কাহিনীর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করে সুশীলকুমার সেই বিচারে প্রবেশ করেন নাই। মনে হয় ইহাদের বাস্তভিত্তিকতাই তাঁহার কাছে যথেষ্ট মনে হইয়াছে। দীনবন্ধুর হাস্যরসসৃষ্টির ক্ষমতাই তাঁহার নাটকাবলীর প্রধান গুণ এবং সুশীলকুমার এই বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দিয়া হাস্যরসের বৈশিষ্ট্যের, দীনবন্ধুর প্রতিভার এবং দীনবন্ধুর নাটকে হাস্যরস ও করুণরসের সমাবেশের মনোজ্ঞ বিবরণ ও বিশ্লেষণ দিয়াছেন, কিন্তু এখানেও তিনি বস্তুতান্ত্রিক সমালোচনার গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

সুশীলকুমার বলিয়াছেন, 'যাহা যেমন আছে তেমনি তাহারই মধ্যে অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপের মধ্যেই, হাস্যরসিক রস সংগ্রহ করে, কবি বস্তুকে নিজের ভাবকল্পনার উচ্চতর ক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়া রসসৃষ্টি করে।' (দীনবন্ধু মিত্র, পৃঃ ৫৮) এই মত অংশতঃ সত্য, কিন্তু এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে, শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক কবির মতই বস্তুকে ভাবকল্পনার উচ্চতর ক্ষেত্রে উন্নীত করিতে পারেন। তিনটি শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্রের আলোচনা করিলেই হাস্যরসিকের এই উচ্চতর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সারভেন্টিস রোমান্সে knight-errant-দের অনেক আজগুবি কাহিনী পড়িয়া এবং— অনুমান করা যাইতে পারে—বাস্তবজীবনে বেয়াকুবির দৃষ্টান্ত দেখিয়া ডন কুইক্সোট রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি বইয়ে পড়া বা চোখে দেখা উপাদানকে অনেক পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। শেক্সপীয়র যে স্যার জন ওল্‌ডক্যাস্‌ল্‌ নামক কোন চরিত্রকে ভিত্তি করিয়া ফলষ্টাফ্‌ চরিত্র আঁকিতে উদ্বোধিত হইয়াছিলেন সেই অনুমানের সাক্ষ্য শেক্সপীয়রের নাটকেই আছে, কিন্তু ফল্‌ষ্টাফ যে বাস্তব ভিত্তিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে সেই সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। শেক্সপীয়র শেষ পর্য্যন্ত নিজেই বলিয়াছেন, '—Oldcastle died a martyr, and this is not the man'। পিক্‌উইকের ইতিবৃত্ত সকলেরই জানা আছে। কয়েকজন তথাকথিত শিকারীর ভুলভ্রান্তি ও অপকর্ম্মের ছবি আঁকিবেন একজন ব্যঙ্গচিত্রকর এবং তাহার বর্ণনা দিবেন ডিকেন্স—ইহাই ছিল প্রাথমিক পরিকল্পনা। ডিকেন্সের গ্রন্থে অপটু শিকারীর অপকর্ম্মের কথা আছে এবং বস্তুনিষ্ঠ চরিত্রও একাধিক আছে, কিন্তু পিক্‌উইক ও স্যাম ওয়েলার বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করিয়াই অমরত্ব লাভ করিয়াছে। দীনবন্ধুর সবচেয়ে বিখ্যাত চিত্র নিমচাঁদ। ইহা সেকালেও সবাই স্বীকার করিয়াছেন। এখন তো অনেকেই এই চরিত্রকে দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ কবি-কীর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। এই চরিত্র ডন কুইক্সোট-ফলষ্টাফ-পিক্‌উইকের সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু এইখানেও সেই জাতীয় প্রতিভার আভাস দেখা যায়। সুশীলকুমার ইহার বাস্তব ভিত্তি ও পরিবেশের উপর এত জোর দিয়াছেন যে, নিমচাঁদের স্বরূপ ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে এবং দীনবন্ধুর প্রতিভার পরিচয় খণ্ডিত হইয়াছে।

এইসকল ত্রুটিবিচ্যুতি এবং আয়তনের স্বল্পতা সত্ত্বেও সুশীলকুমার দে'র সমালোচনা তাৎপর্য্যপূর্ণ। বিশেষ করিয়া তিনিই বস্তুতান্ত্রিক সমালোচনার

শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। বিপিনচন্দ্র পাল বস্তুতান্ত্রিক সমালোচনার সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনায় ব্রতী হয়েন নাই বা তেমন সাফল্য লাভ করেন নাই। প্রমথ চৌধুরী রিয়ালিজম্-এর গা ঘেঁষিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সমালোচনা প্রধানতঃ ক্ল্যাসিকাল। সুশীলকুমার দে'ই প্রকৃতপক্ষে বাস্তবপন্থী সমালোচক। তাঁহার সমালোচনার অন্য গুণ প্রাঞ্জলতা ও পরিমাণবোধ, তাঁহার বিচারবুদ্ধি পাণ্ডিত্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নাই। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু কোথাও পাণ্ডিত্য জাহির করেন নাই। তিনি যে সকল সমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা আয়তনে ছোট হইলেও বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার একটি বৈশিষ্ট্য, আয়তনের বিপুলতা। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের নানা বিভাগের সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সমালোচনা যেমন বিস্তারিত তেমনি পুঙ্খানুপুঙ্খ। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্যগত নিষ্ঠা। তিনি সাহিত্যকে সাহিত্য হিসাবেই, সৃজনীপ্রতিভার নির্ম্মিতি হিসাবেই দেখিয়াছেন; কখনও সেই উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। ইহার তৃতীয় লক্ষণ বিশ্লেষণপ্রবণতা। সাহিত্যিকের সৃষ্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি ইহাকে পাঠকের কাছে পুনঃস্থাপিত করিয়াছেন; কবির সৃষ্টি তাহার স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আমাদের কাছে নূতন রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এইজন্য, শুধু প্রাচুর্য্যের জন্য নহে, গুণগত বিচারেও তাঁহার সমালোচনা অনন্যতা দাবি করিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সমালোচনার কর্ত্তব্য ও কৃতিত্বের কথা পুনরুত্থাপন করা যাইতে পারে। সমালোচকের প্রধান গুণ উপলব্ধির ক্ষমতা। ইহা শুধু আনন্দ বা বিস্ময়ে আপ্লুত হওয়ার যোগ্যতা নয়; কবি যে জগৎ রচনা করিয়াছেন তাহার অন্তরে প্রবেশ করিবার শক্তি। এই হিসাবে কবির তিনি সহৃদয়, কবির মত তিনিও এক প্রকারের শিল্পী। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন সাহিত্যরসিকের মন মুকুরের মত, সেখানে কবির কাব্য প্রতিবিম্বিত হইবে; কিন্তু এইমত ঠিক নহে। সমালোচক নিষ্ক্রিয় নহেন; তাঁহার মনে কাব্যের যথাযথ ছায়া প্রতিভাসিত হইতে পারে না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে তিনিও কবি হইতেন এবং যে কাব্য তিনি পাঠ করিতেছেন তাহার স্বরূপ তিনি উদ্ঘাটন করিতে পারিতেন না; এক কথায় সমালোচনার কোন স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকিত না। আনাতোল ফ্রাঁস যে বলিয়াছিলেন যে, শেক্সপীয়র ও রাসিনকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি নিজের কথাই বলিবেন, সেই সকৌতুক উক্তির মধ্যে গভীর তাৎপর্য্য আছে। কিন্তু সমালোচক স্রষ্টা নহেন, কারণ তাঁহার শক্তি প্রধানতঃ বিশ্লেষণ

ও বিচারের শক্তি আর কবির প্রতিভা বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে এক অখণ্ড নূতন বস্তু সৃষ্টি করে; এই প্রতিভা সংশ্লেষণাত্মক। সমালোচকের কল্পনাশক্তি বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আর কবির বুদ্ধি কল্পনার অনুগমন করে। কবির সৃষ্টির প্রধান লক্ষণ অপূর্ব্বতা, সমালোচকের উপলব্ধির প্রধান কৃতিত্ব বস্তুনিষ্ঠতা। তিনি শেক্সপীয়র ও রাসিনকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজের কথা বলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথা শেক্সপীয়র ও রাসিনের সৃষ্টির রহস্যও উদ্ঘাটিত করে। এই আনুগত্য তাঁহার শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করে আবার এইখানেই তাঁহার প্রাধান্য, কারণ তাঁহার রচনা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর সৃষ্টি নয়। তিনি বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক নহেন, কিন্তু তাঁহার বিশিষ্ট উপলব্ধিতে শিল্পীর কল্পনাশক্তি, বৈজ্ঞানিকের বস্তুনিষ্ঠতা ও বিশ্লেষণনৈপুণ্য এবং দার্শনিকের জীবনবোধের সমন্বয় হইয়া থাকে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে এই বিশিষ্ট উপলব্ধির প্রাচুর্য্য দেখা যায়। তিনি রোমাণ্টিক কাব্যের ব্যাখ্যাতা বলিয়া সুপরিচিত। যে শক্তির বলে তিনি অনায়াসে আলোচ্য গ্রন্থ বা কবিতার মর্ম্মদেশে প্রবেশ করিয়া উহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন তাহা কোল্‌রিজ প্রভৃতি রোমাণ্টিক সমালোচকদের উত্তরাধিকার। তিনি রোমাণ্টিক সমালোচনার অতিরঞ্জন-প্রবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিয়াছেন এমন কথা সব সময় বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার রোমাণ্টিক সহমর্ম্মিতা বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক সমালোচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং আলোচ্য গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সমালোচনাই যে সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা তিনি কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই।

এই গ্রন্থের প্রথম দিকে যে অপেক্ষিত অনপেক্ষার কথা বলা হইয়াছে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনায় তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মিলে। তাঁহার বিপুল রচনাসম্ভারে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট সূত্র আবিষ্কার করা যাইতে পারে এবং অনেক জায়গায় তিনি সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে বিক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ মন্তব্যও করিয়াছেন, কিন্তু সমালোচনায় তিনি থিওরি এড়াইয়া চলিয়াছেন। ইহা অংশতঃ তাঁহার সমালোচনাকে সীমিত করিয়াছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে 'প্রাথমিক সূত্রের আলোচনা অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ কবি ও সাহিত্যিকের মধ্যে এই সূত্রসমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগ, তাঁহাদের সৌন্দর্য্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের নির্দ্ধারণ ও রসোপভোগপ্রয়াসই' তাঁহার নিকট অধিক প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। (বাংলা সাহিত্যের কথা—ভূমিকা)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার প্রথম লক্ষণীয় গুণ তাঁহার দৃষ্টির সমগ্রতা ও অখণ্ডতা। সাহিত্যসমালোচকদের মধ্যে দুইটি প্রধান শ্রেণী আছে। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে এক দল রোমাণ্টিক; ইঁহাদের সমালোচনার গোড়ার কথা সাহিত্যের অন্য বস্তুসম্পর্কে অনপেক্ষা; ভাবে ও ভাষায় মিলিয়া যে একটি অনির্ব্বচনীয় সুষমা প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশের সৌন্দর্য্যই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য। বস্তুজগতে ইহার একটা আধার আছে, কিন্তু সেই আধারের বা বস্তুপিণ্ডের ওজনে সাহিত্যের বিচার হইবে না। রস প্রমাণব্যাপার নহে; রসের আস্বাদ প্রতীতি, জ্ঞানার্জ্জন নয়। ক্রোচে তো সাহিত্যের বিচারে বস্তুজগতের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মত পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার মূল বক্তব্য এই যে, কবি বস্তু-পিণ্ড ও চিন্তার ভার হইতে মানবমনকে মুক্তি দেন; এই মুক্তির আস্বাদই রসের আস্বাদ। অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন যে, গাছের মূল থাকেই, কিন্তু বুদ্ধিবিভ্রম না হইলে কেহ বলিবে না যে ফুলের বা ফলের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মূলের সম্পর্ক আছে; সেই ফলই মূলের রস জোগায় যা' মুকুলেই ঝরিয়া পড়ে। কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, চরম রসবাদী—যেমন ক্রোচে বা অতুলচন্দ্র গুপ্ত—যে সাহিত্যসমালোচনা করেন তাহার মধ্যে মননশীলতা ও রসোপলব্ধির পরিচয় থাকিলেও গভীরতা বা বিস্তার নাই। ইংরেজি সমালোচনার পরিভাষায় বলা যাইতে পারে যে, এই সমালোচনা anaemic বা রক্তাল্পতাদুষ্ট। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রোমাণ্টিক সমালোচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, কিন্তু তিনি সব সময় বাস্তব-জীবনের সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির নিগূঢ় সংযোগ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনায়—রূপকথা সম্পর্কিত প্রবন্ধটিতে—রূপকথার সাংকেতিকতা ও অপার্থিব আবেদন বিধৃত হইয়াছে, কিন্তু তিনি এই প্রবন্ধে ও অন্য প্রসঙ্গে রূপকথার দৃঢ় বাস্তব-ভিত্তির উপর জোর দিয়াছেন এবং সেইখানেই এই আলোচনার মৌলিকতা। বৈষ্ণব কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক নিরপেক্ষ, রসজ্ঞ সমালোচকই স্বীকার করিয়াছেন যে ইহার মধ্যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পদের সঙ্গে বহু নিকৃষ্ট, অকিঞ্চিৎকর পদ যুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার একটি কারণ এই অলৌকিক রসলীলা সমাজজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। ইহা শেষের দিকের বৈষ্ণব কবিতায় সমধিক লক্ষণীয়; ইহার কারণ 'বৈষ্ণব পদাবলীর অলৌকিক রস, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার নিগূঢ় সাধনা, ভগবানকে কান্তরূপে উপলব্ধি করিবার অসামান্য অনুভূতি ক্রমশঃ

সমাজজীবনের বাস্তব-সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল।' রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমের যে কাহিনী প্রচলিত আছে এই জন্যই তাহা সাহিত্য বিচারে প্রাসঙ্গিক। 'এই প্রেম কাহিনী চণ্ডীদাসের অনুপম প্রেম-কবিতাগুলির অপরিহার্য্য ভূমিকা—জীবনের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে তাঁহার পদাবলীর আকুল, আন্তরিকতার হৃদয়-গলানো সুরের অন্য উৎসমুখ আবিষ্কার করা দুরূহ।' শাক্ত পদাবলী এই তুলনায় অনেক বেশি আটপৌরে। কিন্তু তাহার একটি বিশিষ্ট আবেদন আছে, যাহা বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায় না; সেখানে 'বাংলার প্রতিদিনকার কাজ ও খেলা, শ্রম ও বিরাম, তাহার তুচ্ছ ক্ষুদ্র উপকরণগুলি এক গহন রহস্যময় সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া অভিনব অর্থদ্যোতনায় মণ্ডিত হইয়াছে।' (সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে, পৃঃ ৩-৪) সাহিত্য ভাবের অভিব্যক্তি, কিন্তু ভাব তো আকাশস্থ নিরালম্ব বস্তু নহে, তাহা সাহিত্যিকের জীবনবোধ বা জীবনজিজ্ঞাসার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং এই জীবনবোধকে বাদ দিয়া রসাস্বাদ বা রসবিচার সম্ভব নয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহ বোধ করেন নাই, এবং ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের চর্চ্চা করেন নাই। কিন্তু সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি রসসংজ্ঞার অন্তরে প্রবেশ করিয়া চরম রসবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, ভাব রসে নীত হয়, কিন্তু ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন জ্ঞান ও চিন্তা হইল ভাবের আলম্বন। একটু সংশোধন করিয়া বলা যাইতে পারে যে এই আলম্বন বা উদ্দীপন বিভাবের সাহায্যে ভাব রসে পরিণত হয়। কবির জীবন-বোধ বা মতবাদের দ্বারা তাঁহার অনুভূতি বা ভাব উদ্দীপিত হয়; সুতরাং ইহা রসসৃষ্টি ও রসাস্বাদের অপরিহার্য্য অঙ্গ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে দুইটি উপমার প্রয়োগ করিয়াছেন—যুক্তির সমর্থনে, যুক্তির বদলে নয় – তাহাও প্রণিধানযোগ্য। ভাবনা ও মননকার্য্যকে বাদ দিয়া যদি শুধু ভাবকে আশ্রয় করা হয় তাহা হইলে শাঁসকে বাদ দিয়া খোলসকে ধরা হইবে। 'সমাজ ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক' নামক প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন 'যে প্রাণবায়ু নিষ্কাশিত করিলে কাব্যের জ্যোতির্গোলক শূন্যগর্ভ রঙ্গীন ফানুসে পর্য্যবসিত হয়। আমরা তাহাই লোফালুফি করিয়া পরম আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি; শুক্তির গর্ভ হইতে মুক্তা বাহির করিয়া দিয়া উপরের খোলসটিকেই সযত্নে গৃহসজ্জার মহামূল্য উপকরণরূপে ব্যবহার করিতেছি।'

কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাস্তব অভিজ্ঞতা সাহিত্যের ভিত্তি

এবং জীবনজিজ্ঞাসা সাহিত্যের নিয়ামক হইলেও ইহারা সাহিত্যে প্রধান নহে ; বিভাব ভাবের তুলনায় গৌণ। 'আমরা কবির নিকট তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও সমাজ-সমালোচনা মুখ্যভাবে দাবী করি না—এই উপাদানগুলি যখন সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত, কবি কল্পনার দ্বারা রূপান্তরিত ও গভীর ভাবাবেগের আলম্বন হইয়া উপস্থাপিত হয়, তখনই ইহারা আমাদের আস্বাদনীয় হইয়া উঠে।' (সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে, পৃঃ ৩০৯) বাস্তবকে বৈশিষ্ট্য দান করে স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গি ; ইহাই বাস্তবানুগামিতা ও বাস্তব রস আস্বাদনের মধ্যে পার্থক্য। বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরাম বাস্তবতার জন্য বিখ্যাত, কিন্তু শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় বিস্তারিত বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, বাস্তবতা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটা সামান্য লক্ষণ। শুধু এই নিরিখ প্রয়োগ করিলে দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য মুকুন্দরামের কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ মুকুন্দরাম মাধব অপেক্ষা অধিক আদর্শ-বাদী। মুকুন্দরামের কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে তাঁহার 'তির্য্যক কটাক্ষ ও বিচারের কৌতুকাবহ মানদণ্ড'। ইহার জন্যই তাঁহার কাব্যে বহির্ঘটনার অন্তরালশায়ী মর্ম্মস্পন্দন চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাণরসের স্বচ্ছন্দ প্রবাহই সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি এবং এই জন্যই—অ্যারিষ্টটল, লঙ্গাইনুসের অনুরূপ নির্দ্দেশ সত্ত্বেও—চরিত্রসৃষ্টিকে অন্যান্য উপাদান হইতে প্রাধান্য দিতে হইবে। ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাস মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু ইতিহাস-অনুগামিতা ইহার সার্থকতার গৌণ লক্ষণ। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস তথ্যনিষ্ঠ, কিন্তু তাহার মধ্যে যেটুকু সজীবতা আছে তাহা স্বদেশানুরাগ হইতে আহৃত। পরবর্তী কালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি যে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, কারণ সেইখানে 'প্রাণস্পন্দনের নিগূঢ় রহস্যের বিশেষ পরিচয়' পাওয়া যায় না। এই স্পন্দন, সামাজিক প্রতিবেশ এবং বুদ্ধির অধিগম্য মতবাদ—এই উভয় উপাদান হইতেই বিভিন্ন। এই জন্যই তিনি শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'কেও উচ্চাঙ্গের উপন্যাস বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে পারেন নাই, কারণ 'কমল একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য মতবাদের সুস্পষ্ট ও জোরাল অভিব্যক্তি মাত্র, জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ নহে ; একটা ইঞ্জিনের বাঁশি, হৃদয়ের স্পন্দন নহে।' কিরণময়ীও খুব তার্কিক, তাহার আলোচনাও বুদ্ধিদীপ্ত, তাহার চরিত্র যে খুব বাস্তবানুগ এমন কথাও বলা যায় না, কিন্তু তাহার অনন্যসাধারণ শক্তি, দৃপ্ত তেজস্বিতা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি ও বিচারবুদ্ধি, কুণ্ঠাহীন, সংস্কার-

প্রভাবমুক্ত, ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত সুবিধাবাদ—এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় তাহাকে অপূর্ব সজীবতা দান করিয়াছে।

শুধু প্রাণশক্তির স্পন্দন বা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকিলেই মহৎ কাব্য সৃষ্টি হয় না। এইখানেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোমান্টিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কাব্যের নিকট আরও কিছু দাবি করেন। তাঁহার দাবি উর্দ্ধায়ন—ইহা আমাদের আটপৌরে জীবনকে অপার্থিব আলোকে উদ্ভাসিত করিবে। তিনি অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; একটি অন্বয়ী ও একটি ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে। 'গানের সুরের মত কবিতার ছন্দ ঘরোয়া কথা বলিলেও সেই অতি-তুচ্ছ, অতি-পরিচিত বিষয়ের মধ্যে উর্দ্ধলোক বিহারের আমন্ত্রণ বহন করে। রবীন্দ্রনাথের "কিনু গোয়ালার গলি" গলির সমস্ত বীভৎসতা ও জঞ্জালসমাবেশকে কারুণ্যক্লিষ্ট উর্দ্ধজগৎ হইতে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কোথাও যেন একটা সুষমার সুপ্ত সম্ভাষণকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই পরীক্ষায় সমস্ত কাব্যকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে।' (সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে—পৃঃ ২৬২) অপরদিকে, আধুনিক ইংরেজ কবি Louis Macneice ও Stephen Spender-এর কোন কোন কাব্য সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'ইহারা বস্তুলোক ছাড়াইয়া রূপের সংকেত-লোকে পৌছায় নাই।' (বাংলা সাহিত্যের কথা—পৃঃ ২৩৮) এই সাংকেতিকতা বাস্তবানুগামী উচ্চাঙ্গের গদ্যসাহিত্যেও দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ইহার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন।

আদর্শবাদী সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা সাহিত্যকে বাস্তবজীবনের ও বিজ্ঞানদর্শনাদির বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছেন। অপরদিকে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকেরা রোমান্সকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। এই শেষের পক্ষের সেরা প্রচারক হইলেন বার্ণার্ড শ', কারণ তিনি স্রষ্টা ও সমালোচক উভয়ই। তিনি রোমান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, **'To me the tragedy and comedy of life lie in the consequences, sometimes terrible, sometimes ludicrous, of our persistent attempts to found our institutions on the ideals suggested to our imaginations by our half-satisfied passions, instead of on a genuinely scientific natural history.'** অর্থাৎ রোমান্স কল্পনার স্বপ্ন; ইহার ভিত্তি আমাদের অর্দ্ধতৃপ্ত আবেগ-আকাঙ্ক্ষা,

মানবের বিজ্ঞানসম্মত, তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস নয়। সাহিত্য-সমালোচনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি উপরি-উল্লিখিত দুই বিরোধী মতের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাব্য ও সাহিত্যের সৌন্দর্য্য স্রষ্টার ঊর্দ্ধমুখী অভীপ্সার সৃষ্টি, অর্দ্ধতৃপ্ত বাসনার অলীক স্বপ্ন নয়; ইহার ভিত্তি **scientific natural history** এবং ইহাদের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়েই সৃষ্টির সার্থকতা।

এই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সর্ব্বব্যাপী; কাব্যের সকল উপাদান—ভাব, ভাষা, ছন্দ, চিত্র, চরিত্র, ঘটনা—ইহার আওতায় আসে। এই জন্যই শ্রীকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় অতন্দ্র দৃষ্টি দিয়াছেন সামগ্রিক সৌষ্ঠবের উপর। তিনি ইহার নানা দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন—'ভাবপরিমিতি', 'অন্তঃসঙ্গতি' ও 'অবয়বসুষমা'র উপর। যেখানে কাহিনীর কোন অংশ শিথিলভাবে গ্রথিত হইয়াছে, কোন চরিত্র যথাযোগ্য জায়গা পায় নাই বা অতিরিক্ত জায়গা জুড়িয়াছে, জীবনবোধ অস্পষ্ট রহিয়াছে বা আতিশয্যের দ্বারা কাহিনীসংস্থান ও চরিত্রসৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, অনুভূতি চিন্তাকে সঞ্জীবিত করে নাই অথবা ভাবাতিরেকে উপচাইয়া পড়িয়াছে, ভাষা আপন সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, সেইখানেই তাঁহার বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে। এই হিসাবে তাঁহার সমালোচনা শ্রেষ্ঠ ক্ল্যাসিকাল আদর্শের অনুগামী হইয়াছে। রিয়ালিষ্টিক, রোমাণ্টিক ও ক্লাসিক—সমালোচনার এই তিনটি ধারাই তাঁহার সাহিত্যবিচারকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। ক্লাসিক আদর্শ ও পদ্ধতি বিচার করিতে গেলে তাঁহার সমালোচনার আর একটি নিয়মানুবর্ত্তিতার বিষয়ও উল্লেখ করিতে হইবে। রোমাণ্টিক সমালোচকগণ মনে করেন যে প্রত্যেক সৃষ্টি আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর; সুতরাং তাঁহারা সাধারণতঃ প্রকরণগত আলোচনায় বিশ্বাস করেন না। কোল্‌রিজ হইতে ক্রোচে পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ক্লাসিকধর্ম্মী সমালোচকেরা কতকগুলি রীতি ও প্রকরণকে মানিয়া চলেন; তাঁহারা সাহিত্যকে মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, নাটককে ট্র্যাজেডি, কমেডি প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়া সেই শ্রেণীর নিয়মানুসারে ইহার বিশ্লেষণ ও বিচার করেন। ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যরীতির জনক অ্যারিষ্টটল এই রীতির প্রবর্তন করেন এবং প্রকরণগত সাহিত্যবিচারের অনুশাসন রচনা করেন। অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেও পরবর্ত্তী ক্ল্যাসিকাল সমালোচনা এই অনুশাসন মানিয়া লইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রোমাণ্টিক সাহিত্য-সমালোচনা এই বিষয়ে

অনেকটা উদাসীন, কখনও কখনও ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘোষণা করিয়াছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রোমাণ্টিক মনোভাবাপন্ন সমালোচক, কিন্তু তাঁহার সমালোচনা নিয়মনিষ্ঠও বটে। তাই তিনি প্রত্যেক কাব্যের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লইলেও বিভিন্ন প্রকরণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এই স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে চাহিয়াছেন। 'আধুনিক ও অতি-আধুনিক সাহিত্যে জীবনবোধের তারতম্য' বিচার করিতে যাইয়া তিনি এই নিয়মানুবর্ত্তিতার কারণ দর্শাইয়াছেন : কাব্যের রূপ ও সাহিত্যের প্রেরণার পিছনে একটা সুদীর্ঘ অনুশীলন ও তাহা হইতে জাত একটি বিশিষ্ট প্রথার প্রভাব অনস্বীকার্য্য। কাব্যরীতি কোনও একক প্রতিভার নিজস্ব সৃষ্টি নহে ; প্রতিভার নিজস্ব অনুভূতিকে, যতদূর সম্ভব এই প্রথানুগত্যের মধ্যেই সংকুলান করিতে হইবে। মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি প্রভৃতির সংজ্ঞা তিনি অ্যারিষ্টটল-প্রবর্ত্তিত সমালোচনা-ধারা হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। উপন্যাস আধুনিক জগতের সৃষ্টি। ইহার সংজ্ঞা সমালোচক নিজেই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ; এই সংজ্ঞা তাঁহার মৌলিক মননশক্তির পরিচয় দেয়। তবু এখানেও তিনি অ্যারিষ্টটল প্রদর্শিত পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। বহু উপন্যাসের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া এবং তাহাদের সাধারণ লক্ষণ একত্র করিয়া তিনি একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞায় পঁহুছিয়াছেন ও তাহার দ্বারা প্রত্যেক উপন্যাসকে পৃথক্‌ভাবে বিচার করিয়াছেন এবং এই সাধারণ শ্রেণীর অভ্যন্তরে তাহার স্বকীয়তা নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি অ্যারিষ্টটল নির্দ্দেশিত পন্থায় শ্রেণীবিভাগে অগ্রসর হইয়াছেন এবং অনেক সময় সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগের দ্বারাই আলোচ্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সূচিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের তিনি যে বিষয়গত শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন তাহা এই পদ্ধতির উজ্জ্বল নিদর্শন। ক্লাসিক সমালোচকেরা ভাষার সহিত ভাবের নিকট সম্পর্ক স্বীকার করিয়া সাহিত্যবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েন। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, অ্যারিষ্টটলের Rhetoric বা অলংকার-তত্ত্ব পোয়েটিক্সের পরিপূরক। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অলংকার-তত্ত্ব লিখেন নাই, কিন্তু ভাষার সঙ্গে সাহিত্যকর্ম্মের নিবিড় সংযোগ সম্পর্কে তিনি সদা সচেতন। বৌদ্ধ জাতকের গল্প যে বাস্তবধর্ম্মী উপন্যাসের সমগোত্রীয় তাহার কারণ ইহার বাহন কথ্য পালি ভাষা, দুরস্থিত, সমাসবহুল সংস্কৃত নয়। জয়দেব ও বিদ্যাপতি যে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীতে যুগান্তর আনিয়াছিলেন তাহার অন্যতম কারণ তাঁহাদের ভাষা প্রাচীন সংস্কৃতের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত।

বিদ্যাপতি তো সংস্কৃত ছাড়িয়া মৈথিলী ও বাংলায় মিশ্রিত এক অভিনব ভাষায় তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষা কৃত্রিম, কিন্তু নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে উপযোগী। এই জাতীয় আলোচনা একাধারে সমালোচকের বাস্তবপ্রীতি ও ক্ল্যাসিকাল আদর্শের অনুবর্ত্তিতার পরিচয় দেয়।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার আর একটি গুণের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। ইহা তাঁহার দৃষ্টির ব্যাপকতা। তিনি ইউরোপীয় সমালোচনাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং বাংলা সাহিত্যকে অন্যান্য সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় ও ইংরেজি সাহিত্যের—পটভূমিকায় বিচার করিয়াছেন। হোমারের ইলিয়াড ও অডেসি, দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়া, বিওউল্‌ফ্, প্যারাডাইস লষ্ট, আমাদের দেশের মহাভারত ও রামায়ণ—ইহাদের বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া মহাকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সেই পটভূমিকায় মধুসূদন প্রভৃতির কবিকৃতির আলোচনা করিয়াছেন। ডক্টর জনসনকে অবলম্বন করিয়া তিনি সাহিত্যে ক্ল্যাসিকাল আদর্শের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন; গ্যেটের কাব্যের সঙ্গে পরিচয় তাঁহার রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। শেক্সপীয়র ও মেটারলিংকের নাটক, ইংরেজ ও ফরাসী লেখকদের উপন্যাস, ইংরেজি রোমাণ্টিক কাব্য—ইহাদের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের বিচার দীপ্তি লাভ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় এই গুণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আধুনিক কালে বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় ইংরেজি তথা ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্র ও সাহিত্যের উল্লেখ খুব প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি দুই একটি স্মরণীয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই উল্লেখ বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করে। যাঁহারা এই সকল বাংলা লেখকদের সাহায্য ছাড়া ইংরেজি পড়িয়াছেন এবং সেই পরিচয় অবলম্বন করিয়া এই সকল আলোচনার সম্মুখীন হয়েন তাঁহারা সুইফট ও ল্যাম্বের হাস্যরসের সাদৃশ্যের কথা শুনিয়া, ইবসেনের নোরা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার সামিল হইয়াছে দেখিয়া বা ডন কুইক্সোট ও কমলাকান্তের তুলনা দেখিয়া, ক্রোচেকে বাস্তবপন্থী সমালোচক হিসাবে বিচার করিতে আহূত হইয়া অথবা ডন কুইক্সোট গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে ডি কুইন্সীর পরিচয় পাইয়া খুবই অস্বস্তি বোধ করেন। যেখানে মন্তব্য ও তথ্য এত উদ্ভট ও উৎকট নয় সেইখানেও পাণ্ডিত্যের বিস্তার উপলব্ধি ও বিচারের সহায়ক হয় নাই। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে ব্যগ্রতা দেখান নাই;

তিনি যেখানে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের উল্লেখ করিয়াছেন প্রসঙ্গের প্রয়োজনেই করিয়াছেন এবং সেই উল্লেখের দ্বারা আলোচ্য বিষয় স্পষ্টতা লাভ করিয়াছে।

॥ ২ ॥

ব্যাপকতায়, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণনৈপুণ্যে, সহানুভূতির বিস্তারে, সর্ব্বোপরি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সমালোচনায় কয়েকটি দোষও আছে এবং এই দোষগুলি অংশতঃ তাঁহার রোমান্টিক মনোবৃত্তিসঞ্জাত। প্রথমতঃ, তাঁহার ভাষার দুরূহতা। তিনি কাব্য ও উপন্যাসের জটিল জালের চুলচেরা বিশ্লেষণ করিতে চাহিয়াছেন এবং বাংলায় সমালোচনার উপযুক্ত পরিভাষা না থাকায় নিজেই নূতন শব্দ উদ্ভাবন করিয়াছেন অথবা পুরান শব্দের নূতন দ্যোতনা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু শব্দচয়ন সব সময় শ্রুতিসুখকর হয় নাই। অবশ্য ক্রমশঃ পরিচয়ের সঙ্গে এই দুঃশ্রবত্বদোষ কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাক্যবিন্যাসও কখনও কখনও আপত্তিজনক মনে হইবে। বাংলা গদ্যের বাক্যবিন্যাস ইংরেজি syntax দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। অথচ বাংলার আদি জননী সংস্কৃতভাষা এবং সমাস-বদ্ধ-পদ-প্রবণতা বাংলার বাক্যগঠনপ্রণালীকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তাহা ছাড়া বাংলারও নিজস্ব শব্দ-বিন্যাসরীতি আছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা খুব ঐশ্বর্য্যময়, কিন্তু এই তিন রীতির সম্মিশ্রণে উহা অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যেরূপ সূক্ষ্ম ও জটিল বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার জন্য খানিকটা দুরূহতা হয়ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তবু মানিতে হইবে যে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বা অতুলচন্দ্র গুপ্তের রচনায় যে পরিচ্ছন্ন প্রাঞ্জলতা আমাদিগকে আকৃষ্ট করে তাহা তাঁহার সমালোচনায় পাওয়া যায় না।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনায় দ্বিতীয় দোষ উপমার বাহুল্য; ইহা তাঁহার রোমান্টিক উপলব্ধির সঙ্গে জড়িত। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব-আলোচনা উপমার দ্বারা জর্জ্জরিত, কবি অনেক সময় উপমাকে যুক্তি বলিয়া চালাইয়াছেন এবং শরৎচন্দ্র অতি নৈপুণ্যের সহিত এই উপমাগর্ভ তর্কের অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা

যুক্তিনিষ্ঠ, এখানে উপমার সমাবেশ হইয়াছে যুক্তির সমর্থনে, যুক্তির পরিবর্তে নয়। সেই জন্য এই বাহুল্য ততটা দুর্বিষহ নয়; তবুও ইহাও পীড়াদায়ক, দুই এক জায়গায় উপমাবাহুল্যে আসল প্রশ্নটি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। এক দিক্ দিয়া ইহা একটি অভিনব প্রচেষ্টা। ইহার মূল বিষয় সাহিত্যতত্ত্বের একটি অমূর্ত্ত থিওরি—ঘটে যা তা সব সত্য নয়, কবির মনোভূমিই রামায়ণের রামের আসল জন্মস্থান; অ্যারিষ্টটলের কথায়, কাব্য ইতিহাস অপেক্ষা দার্শনিকতাসম্পন্ন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা উদ্ধার করিয়াই বলা যাইতে পারে, কবিমনের বিচ্ছুরিত আলোকে কেমন করিয়া এই নীরস তত্ত্বকথা প্রাণরসে সঞ্জীবিত হইল, তাঁহার বিশ্লেষণে সেই আসল ব্যাপার উপমার উচ্ছ্বাসে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, কবিকর্ম্মের প্রকৃত রহস্য যাহা সমালোচকের ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে তাহা অনুদ্ঘাটিতই রহিয়া গিয়াছে। এইরূপ বিচ্যুতির সংখ্যা বেশি নয়, তবু উপমাবহুল সমালোচনায় এই প্রবণতা থাকে বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার আর একটি ত্রুটি মৌলিক; এই দোষ কল্পনাসমৃদ্ধ রোমান্টিক সমালোচনার গুণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁহার সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ, ক্ল্যাসিকাল আদর্শের পরিমিতিবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তবু কখনও কখনও তিনি স্বীয় কল্পনাবলে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রচনাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা রোমান্টিক কল্পনা-ঐশ্বর্য্যের আনুষঙ্গিক অপচয়। শেক্সপীয়রের সব রচনাই উচ্চাঙ্গের, সব নাটকেই কোথাও না কোথাও তাঁহার প্রতিভার অনন্যত্বের স্বাক্ষর আছে, কিন্তু তাঁহার নাটকাবলীর মধ্যেও তারতম্য আছে। Love's Labour's Lost তাঁহার অপরিণত নাটক বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ওয়ালটার পেটার ইহার যে কল্পনাসমৃদ্ধ সমালোচনা লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া মনে হয় এই নাটক Hamlet, Twelfth Night প্রভৃতির সমগোত্রীয়। পেটারের প্রবন্ধ ইংরেজি সাহিত্যের অমূল্য রত্ন, ইহার মধ্যে সাহিত্যতত্ত্বের মননশীল আলোচনা আছে, ইহা শেক্সপীয়রের নাটকের উপরেও আলোক-সম্পাত করে, কিন্তু ইহা ঠিক সমালোচনা নয়। ইয়েটস্ এই যুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি। তাই তিনি যখন The Oxford Book of Modern Verse সম্পাদন করিতে আহূত হয়েন তখন সবাই আশা করিয়াছিল যে এই যুগের

কাব্যের শ্রেষ্ঠ সংকলনগ্রন্থের সাক্ষাৎ মিলিবে। কিন্তু তিনি Dorothy Wellesley প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত গৌণ কবিকে এত প্রাধান্য দিয়া ফেলিলেন যে এই সংকলন পাঠকবর্গের আশা পূরণ করিতে পারিল না। তাঁহার ভূমিকা পড়িয়া মনে হয় সেই সকল কবিরা তাঁহার মনে যে 'excitement' সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মূল্যবোধকে অংশতঃ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা' বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অন্য দেশের সমালোচনা সাহিত্যের যে কোন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সঙ্গে ইহা তুলিত হইতে পারে। কিন্তু তিনি বহু গৌণ লেখককে ও গৌণ উপন্যাসকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়াছেন। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের আলোচনা সম্পর্কে এই কথা বিশেষ করিয়া মনে হয়। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধ ও অন্যান্য আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, তিনি এই সকল উপন্যাসের অ-বাস্তবতা, একদেশদর্শিতা, অপ্রগাঢ়তা বিষয়ে সচেতন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে তিনি ইহাদের যে ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন তাহা ইহাদের সকলের সম্পর্কে প্রযোজ্য কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তিনি হয়ত মনে করেন যে যাঁহারা নূতন আগন্তুক তাঁহাদের রচনার সার্থকতা অপেক্ষা সম্ভাব্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কিন্তু ইহা বিজ্ঞাপকের যুক্তি, সাহিত্যসমালোচকের নয়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের আলোচনা সম্পর্কেও কখনও কখনও এই পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। তিনি 'সীতারাম', 'রাজা ও রাণী' ও 'পল্লীসমাজ' প্রভৃতির যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা এই সকল গ্রন্থের নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা নয়, ইহাদের সম্ভাব্যতার সহানুভূতিপূর্ণ উপলব্ধি।* পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই জাতীয় অতিরঞ্জন রোমান্টিক সমালোচনার আনুষঙ্গিক ফল।

॥ ৩ ॥

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের সমালোচনার সঙ্গে তুলনা করিলে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করা সহজ হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেব ও বিদ্যাপতির মধ্যে যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার

*'রাজা ও রাণী'র আলোচনা করিয়াছেন 'রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য' প্রবন্ধে ও 'রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা'য়।

অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। তাঁহার মূল বক্তব্য পুনরুদ্ধৃত হইতে পারে :

'জয়দেবাদির কবিতায় সতত মাধবীযামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বিম্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য।·········বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত।'

অন্যত্র তিনি সমাজতত্ত্ব ও নীতির পরিপ্রেক্ষিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাব্যের আলোচনা করিয়াছেন। রাধা ভাগবতকারের সৃষ্টি ; ভাগবতে তিনি পরা প্রকৃতির রূপক। জয়দেব ধর্ম্মের ও নীতির দিক্ দিয়া অধঃপতিত, বিলাসপ্রিয় সমাজের কবি। তাঁহার কাব্যে রূপকের নামগন্ধ নাই ; তিনি কৃষ্ণকে মোহন কিশোর নায়করূপে এবং রাধিকাকে মোহিনী কিশোরী নায়িকা হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতি 'পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয় জীবনের প্রথম শিখা। তিনি জয়দেবের চিত্রখানি তুলিয়া লইলেন—তাহাতে নূতন রঙ ঢালিলেন।··· জয়দেব কেবল বাহ্য প্রকৃতি দেখিয়াছিলেন—বিদ্যাপতি অন্তঃপ্রকৃতি পর্য্যন্ত দেখিলেন।'

জয়দেব যে ইন্দ্রিয়পরতার কবি তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকীয়তা প্রতিফলিত হইয়াছে নিসর্গপ্রীতির সঙ্গে ইন্দ্রিয়পরতার সম্বন্ধ নির্ণয়ে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে জয়দেবের ছন্দোমাধুর্য্যে ও পদলালিত্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিণত বয়সে জয়দেবের কাব্যের সৌন্দর্য্য তাঁহার অন্তর স্পর্শ করে নাই। তিনি বিদ্যাপতির কাব্য ভালবাসিতেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের সরলতা, আবেগের গভীরতা তাঁহাকে অনেক বেশি স্পন্দিত করিয়াছে। তিনি ইঁহাদের কাব্য, ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতিনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, শুধু কাব্য হিসাবেই আস্বাদন ও বিচার করিয়াছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস—ইঁহাদের রাধা তাঁহার কাছে কাব্যের নায়িকারূপেই প্রতিভাত হইয়াছে, কোন তত্ত্বের রূপক হিসাবে নহে। এইখানেও তিনি বিদ্যাপতির রাধিকার নবীন চঞ্চল প্রেম-হিল্লোলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ

হইয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকার প্রেমের গভীরতা, বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা তাঁহার কাছে আরও চিত্তাকর্ষক মনে হইয়াছে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জয়দেবের কাব্যকে কাব্যহিসাবেই বিচার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির মত সীমাবদ্ধ নয়। তিনি জয়দেবের কাব্যকে বৈষ্ণব কবিতার, বাংলা কবিতার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ যাহার শেষ কবি, বাঙালী কবিপ্রতিভার সেই জয়যাত্রা জয়দেবেই শুরু হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র গীতগোবিন্দকে তদানীন্তন অধঃপতিত সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসাবে বিচার করিয়া ইহাকে ইন্দ্রিয়পরতাদোষদুষ্ট কাব্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। ইহাও একদেশদর্শিতার ফল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জয়দেবের কাব্যের সামগ্রিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া, বিশেষ করিয়া পূর্ব্বাপর সাহিত্যের সঙ্গে ইহাকে যুক্ত করিয়া, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য উদ্ঘাটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টির ব্যাপকতা বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতার মতই লক্ষণীয়। তিনি জয়দেবকে দেখিয়াছেন বাংলা গীতিকবিতার উৎস হিসাবে; জয়দেবই প্রথম নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিয়া সংস্কৃত শ্লোকত্বের বন্ধন হইতে গীতিকাব্যকে মুক্ত করেন এবং রাধাকৃষ্ণকে মানবিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করেন ও মানবোচিত প্রেমরসে আপ্লুত করেন। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্র-আনীত অভিযোগের গুরুত্ব কমিয়া যাইবে। ইহা সত্য বটে যে, জয়দেবের কাব্যে অলংকারবাহুল্যের প্রাধান্যের নিকট ভাবগভীরতা গৌণ হইয়াছে এবং মাধুর্য্যসৃষ্টি আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা মুখ্য হইয়াছে। কিন্তু এইটুকু বলিলেই সব বলা হইল না। অপর পক্ষে, চৈতন্যোত্তর টীকাকার ও ভক্তরা যে গীতগোবিন্দে পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসাধনার প্রতিরূপ দেখিয়া ইহাকে বৈষ্ণবতত্ত্বানুমোদিত ধর্ম্মগ্রন্থরূপে প্রচার করিতে চাহিয়াছেন তাহাও কষ্টকল্পনা। জয়দেবের কৃতিত্ব এই যে, তিনি রাধাকৃষ্ণকে মানবিকতাগুণসম্পন্ন নায়কনায়িকারূপে কল্পনা করিয়াছেন; শুধু শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য নয়, 'কংসারি', 'কেশীমথন' নায়কের ঐশ্বর্য্যও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন এবং 'তিনিই রাধিকাকে ধর্ম্মশাস্ত্রের ধূসর অনামিকতা হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে প্রেমিকের হৃদয়াকাশে তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী শুকতারারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।' বঙ্কিমচন্দ্র যে বলিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী যুগের বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবি বিপরীত দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণলীলাকে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। অভিনিবেশ-

সহকারে গীতগোবিন্দ পাঠ করিলে এবং সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যের ধারায় তাহার যথাস্থান সম্পর্কে অবহিত হইলে দেখা যাইবে যে, জয়দেবে গীতিকাব্যের যে সূচনা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি তাহাকেই পূর্ণতা দান করিয়াছেন।

শৃঙ্গাররস ও আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সঙ্গে যে বিরোধ নীতিবাদী সমালোচকেরা দেখিতে পান তাহাও সর্ব্বতঃগ্রাহ্য নয়। বাইবেলের কোন কোন প্রাচীন অংশে নরনারীর প্রেমের আবেগবিহ্বলতা ঈশ্বরে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 'কামকলার মাধ্যমে ভগবৎ ভজনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে।...মানবচিত্তের প্রবলতম প্রেরণা, তাহার জীবনীশক্তির কেন্দ্রীয় উৎস যদি ঊর্দ্ধ্বায়িত হয়, তবে তাহার মোক্ষ-পথের অগ্রগতি যে বেগবান্ ও অপ্রতিরুদ্ধ হইবে, তাহা সহজেই বোঝা যায়।' অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, চৈতন্যপূর্ববর্ত্তী কবিদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া জয়দেবে, দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্বের পরিপূর্ণ নিরসন হয় নাই এবং জয়দেব যে যুগপ্রভাব অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী ভক্ত-সাধকদের দিব্যানুভূতির সহিত একাত্ম হইতে পারিয়াছিলেন এইরূপ ধারণা অনৈতিহাসিক হইবে। কিন্তু ইহাও স্মরণ করিতে হইবে যে, তিনিই রাধাকৃষ্ণ-সংবাদকে মানবিক লীলারূপে চিত্রিত করিয়া পরবর্ত্তী দিব্যানুভূতিবিশিষ্ট কাব্যের ভিত্তিভূমি রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু 'রাজসভার চটুল আমোদপূর্ণ প্রতিবেশে, যুগের বিকৃত সৌন্দর্য্যরুচির তৃপ্তির প্রয়োজনে ও সুপ্রাচীন আদিরসপ্রধান কাব্যধারার ঐতিহ্যানুবর্ত্তনে রচিত কাব্যের মধ্যে ভক্তহৃদয়ের সদ্যোজাগ্রত আকুতি, নব-ধর্ম্মসাধনার প্রথম বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ ইঙ্গিত যতটুকু অনুপ্রবিষ্ট করা যায়, জয়দেব তাহাই করিয়াছেন।' এই অধ্যাত্মব্যঞ্জনাকে বাড়াইয়া দেখাও ভুল, আবার ইহাকে অগ্রাহ্য করাও ভুল।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাপতির কাব্যের যে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার মধ্যেও তাহার দৃষ্টির ব্যাপকতা ও বিশ্লেষণনৈপুণ্য সমভাবে লক্ষিত হয়। তিনি ভাষা, ছন্দোমাধুর্য্য ও প্রতিবেশের প্রভাবের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া বিদ্যাপতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই আলোচনার শুধু একটি অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেই তাঁহার বিচারপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সূচিত হইবে। বিদ্যাপতির কাব্যকৃতির প্রধান লক্ষণ ইহার বিস্তৃতি—কবির অভিজ্ঞতার প্রসার ও বৈচিত্র্য, বিশ্বব্যাপী শক্তির অচিন্তনীয় মহিমার উপলব্ধি। এই প্রসঙ্গে তাঁহার সর্ব্বাধিক বিখ্যাত পদের আলোচনা করা যাইতে পারে:

সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয় !
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়। ইত্যাদি

ইংরেজিতে শেক্সপীয়র-সমালোচনায় এক শ্রেণীর বিশ্লেষকের উদ্ভব হইয়াছে যাঁহাদিগকে বলা হয় **disintegrators** অর্থাৎ তাঁহারা প্রধানতঃ ভাষাগত বিশ্লেষণ করিয়া শেক্সপীয়রের রচনাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, শেক্সপীয়রের নাটকের অনেক অংশ অপর লেখকের লেখা ! এই মুষ্টিমেয় লেখকগোষ্ঠি সাধারণ্যে বা বিদগ্ধসমাজে স্বীকৃতি পান নাই। বৈষ্ণবকাব্যের আলোচনায়ও এই শ্রেণীর সমালোচকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, বিদ্যাপতির এই বিখ্যাত পদটি বিদ্যাপতিরই নয়। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির উপর ততটা প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি কিন্তু এই পদটি বিদ্যাপতির বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তিনি মনে করেন, এই পদটি— এবং বিদ্যাপতির এই একটি মাত্র পদই—চণ্ডীদাসের কাব্যের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই ; প্রাসঙ্গিক আলোচনা হইতে মনে হয় তিনি ইহার মধ্যে চণ্ডীদাসোচিত ভাবের মহত্ত্ব ও আবেগের গভীরতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনাপদ্ধতি অন্য প্রকারের। তিনি 'কীর্ত্তিলতা' হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতির সমগ্র কাব্যের আলোচনা করিয়া, **disintegrators**-দের ভাষাগত যুক্তি খণ্ডন করিয়া এই পদটির মধ্যে বিদ্যাপতির প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণের সন্ধান করিয়াছেন :

'চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদে অনুরূপ সুরের গভীরতা মিলে, কিন্তু উহার প্রকৃতি বিভিন্ন। প্রেমের রহস্যময় বিপরীতধর্মত্ব, ইহার আনন্দবেদনায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত প্রকৃতি, ইহার সর্ব্বনাশা আকর্ষণ, সবভোলান মোহ এই সমস্ত পদে সার্ব্বভৌম ব্যঞ্জনার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু আলোচ্য পদের কল্পনার বিশাল, বিশ্বব্যাপী, অসীম কালে প্রসারিত, সৃষ্টিরহস্যোদ্ভেদকারী পরিধি (cosmic imagination) চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাসে নাই। চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসে গভীরতা আছে, বর্ত্তমান পদে গভীরতা ছাড়া বিরাট ব্যাপ্তি আছে।'*

---

*'বিদ্যাপতি', 'গ্রীয়ারসন সংগৃহীত বিদ্যাপতির পদের আলোচনা', 'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ' প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'-উপন্যাসের বিস্তৃত সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রহিয়াছে। এইখানে প্রসঙ্গতঃ তিনি সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ'—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। এই প্রবন্ধের পাঁচ বৎসর পরে তিনি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ লিখেন এবং সেইখানেও 'বিষবৃক্ষ' জাতীয় পারিবারিক উপন্যাসের সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পার্থক্য নির্দ্ধারিত করেন। এই দুইটি প্রবন্ধ একত্র করিয়া দেখিলে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে। পারিবারিক উপন্যাসে নায়কনায়িকার সুখদুঃখ এমন সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত হইতে পারে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার জন্য এবং নায়কনায়িকার চরিত্র ও জীবনের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্যের জন্য তাহা খুব তীব্রতা লাভ করিতে পারে। তবু এই নৈকট্য সত্ত্বেও এই জাতীয় চিত্রের পরিধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু এমন দুই চারজন লোক জন্মান যাঁহারা জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে আবদ্ধ, তাঁহারা আমাদের নিকটের লোক নহেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবনে কালের সুদূরবিস্তৃত ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়। ইঁহাদিগকে দেখিতে হইলে, 'দূরে দাঁড়াইতে হয়, অতীতের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিতে হয়।' তাঁহারা যে সুবৃহৎ রঙ্গভূমিতে নায়কস্বরূপ ছিলেন সেটা-সুদ্ধ তাঁহাদিগকে এক করিয়া দেখিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে ইহাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা।

তিনি 'রাজসিংহ'-উপন্যাসে এই সার্থকতা দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসের বিরাট রঙ্গভূমির চিত্র আঁকিতে হইলে মানবজীবনের কাহিনী খানিকটা খর্ব্ব হইয়া যায়। বিশ্লেষণের সাহায্যে ইহার কার্য্যকারণশৃঙ্খলা স্পষ্ট করা যায় না। 'রাজসিংহ'-উপন্যাসের রঙ্গভূমি বিস্তৃত। তাহার মধ্যে বহু ঘটনা ও বহু চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে, কাহাকেও লইয়া গ্রন্থকার বেশি সময় ক্ষেপণ করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক সাহিত্যিককে ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্ররহস্যকে বিশ্বাসযোগ্য করিতে হইবে, কোল্‌রিজের ভাষায়, আমাদের উদ্যত অবিশ্বাসকে নিরস্ত করিতে হইবে। 'রাজসিংহ'-উপন্যাসে ঘটনা যে ভাবে ইতস্ততঃ উপস্থাপিত হইয়াছে, চরিত্রগুলি যেমন বড় বড় মোটা টানে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের মনে খট্‌কা জাগাইয়াছে। এই খট্‌কা এই উপন্যাস সম্পর্কে প্রত্যেক পাঠকের মনেই লাগিবে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকৌশলের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা শুধু তাঁহার নিজের প্রতিভার

মৌলিকতার পরিচয় দেয় না, বঙ্কিমের উপন্যাসকেও নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করে। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের সমস্যা এড়াইয়াছেন ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে দ্রুত বেগ সঞ্চার করিয়া। এই উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্র যে দ্রুত তালে চলিয়াছে তাহা ইতিহাসের পদক্ষেপজনিত এবং সেই অগ্রসর গতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিয়াছে। ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক ঘটনাবলী এক বিরাট রঙ্গভূমিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পাত্রপাত্রী সবাই মৃত্যুর দোলায় দোলায়িত হইয়া আপনার অন্তরবাসী মহাপ্রাণীর আলিঙ্গন অনুভব করিয়াছে। ইহাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐক্যসূত্র। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বৃহৎ জাতীয় ইতিহাস ও জেব-উন্নিসার অনৈতিহাসিক মানব-ইতিহাসের মধ্যে ভাবের সংযোগও আবিষ্কার করিয়াছেন। ক্ষমতার স্পর্দ্ধায় মোগল সম্রাট মনে করিয়াছিলেন, ন্যায়পরতা অনাবশ্যক, বিলাসিনী জেব-উন্নিসাও মনে করিয়াছিল যে, সম্রাট-দুহিতার পক্ষে প্রেম অপ্রয়োজনীয়। উভয়ের বিশ্বাসই যে প্রবল ধাক্কা খাইল তাহাই এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ দুইটি অনুচ্ছেদে জেব-উন্নিসার জীবন ও চরিত্রের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা তাঁহার সৃজনী প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ রসবোধের সাক্ষ্য দেয়।

'রবীন্দ্রসৃষ্টি-সমীক্ষা'য় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'রাজসিংহ'-সমালোচনার চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে দুই একটি সূক্ষ্ম সূত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে এই উপন্যাসের যে সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন সেখানে আপন পথেই অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি প্রথমেই ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস ও উপন্যাসের, বাস্তব ও কল্পনার সংযোগের জটিলতার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।' এই উক্তি লইয়া সমালোচক একটু গোলযোগে পড়িয়াছেন। কিন্তু পরে যদুনাথ সরকার শতবার্ষিক সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমের হাতের কাছে যে সকল ইতিহাস ছিল তাহার মধ্যে অনেক বিষয় স্পষ্ট হয় নাই, তাহা পরস্পরবিরোধী মতে কণ্টকিত। এই সকল পরস্পরবিরোধী, খণ্ডিত, বিক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িয়া বঙ্কিম স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে রাজপুতের বাহুবলের একটি চিত্র আঁকিয়াছেন। যদুনাথ সরকার ঔরংজেবের রাজত্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঐতিহাসিক ; তিনি বলেন

যে, পরবর্ত্তী কালে রাজপুত-মোঘলের সংগ্রামের পূর্ণ ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণ সহযোগে তিনি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বঙ্কিম কল্পনার বেগে সত্যকে অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যদুনাথ সরকারের প্রবন্ধের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তবে তিনিও বলিয়াছেন যে, বঙ্কিম কাল্পনিক চিত্রের দ্বারা ইতিহাসের শূন্য-রন্ধ্র পূরণ করিয়াছেন। তিনি বিস্তৃত বিশ্লেষণের সাহায্যে ইতিহাস ও উপন্যাসের সংযোগ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং কেমন করিয়া একে অপরের শূন্য রন্ধ্র পূরণ করিয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ, বঙ্কিমচন্দ্রের মত ব্যাখ্যা করিয়া তিনি 'রাজসিংহ' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি উপন্যাসের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। ঐ সকল উপন্যাসে ইতিহাস শুধু পরিবেশ রচনা করিয়াছে; 'রাজসিংহ'-উপন্যাসে ইতিহাসই প্রধান বিষয়, ব্যক্তিগত জীবন-সমস্যা ইতিহাসের অনুবর্ত্তন করিয়াছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস ও উপন্যাসের মধ্যে যে সংযোগ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা ভাবগত ঐক্য; উভয়ত্র ব্যক্তিগত স্পর্দ্ধা দৈবের দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, এই উপন্যাসের ঐক্য কাহিনীগত ঐক্য, শুধু পৃথক্ ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে নৈতিক সাদৃশ্যের ঐক্য নয়। ইতিহাস ব্যক্তিজীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে; ইহার ফলে ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতা সংকুচিত হইয়াছে, কিন্তু এই সংকোচনের ফলেই ইতিহাসের প্রবল আকর্ষণে সাধারণ জীবন তাহার স্বভাব-মন্থর গতি হারাইয়া ঐতিহাসিক ঘটনার বেগবান্ প্রবাহের সহিত সমতালে চলিতে বাধ্য হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে গতিবেগপ্রাবল্যের কথা বলিয়াছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার নিগূঢ় আখ্যানগত কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক অংশ ও ঔপন্যাসিক অংশের মধ্যে নীতিগত সাদৃশ্যের সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু আখ্যান ও চরিত্রস্ফুরণের দিক্ দিয়া এই দুই অংশের মধ্যে বিরুদ্ধতাও আছে। এইখানেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ'-সমালোচনার বৈশিষ্ট্য সমধিক প্রকাশ লাভ করিয়াছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলি—বিশেষ করিয়া মবারক ও জেব-উন্নিসা—ইতিহাসের নাগপাশের মধ্যে আপনাদের স্বাধীন গতিতে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছে। ইতিহাসের পাষাণ প্রাচীর ইহাদিগকে আবেষ্টন করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাদিগকে অভিভূত

করিতে পারে নাই। তাহাদের সঙ্গে ঐতিহাসিক নেতা ঔরংজেব ও রাজসিংহের এইখানেই পার্থক্য। ইহারা—এবং চঞ্চল, নির্ম্মল ও মাণিকলাল—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া বৃহৎ ইতিহাস-যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিণত হইয়াছেন। কাহিনীবিন্যাসের কৌশলে এই দুই অংশ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। ইতিহাস ও উপন্যাসের সংযোগ ও বিরোধকে ভিত্তি করিয়া সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান ঐতিহাসিক উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন এবং ইহা যে কি ভাবে লেখকের সীমিত উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ কলাসৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে তাহাও দেখাইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তাঁহার জীবিত কালে এবং পরবর্ত্তীকালেও ইহাই তাঁহার সর্ব্বাধিক আলোচিত উপন্যাস। রোহিণীর মৃত্যু তাহার জীবন ও চরিত্রের সুসঙ্গত পরিণতি কিনা এই প্রশ্ন যখন আন্দোলিত হয় তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, উপন্যাস শুধু কাহিনী নয়। ইহা প্রধানতঃ জীবনসমস্যার চিত্র ও আলোচনা। এই উপন্যাস সম্পর্কে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তন্মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'সাহিত্যকথা' প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত তীক্ষ্ণধী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক যে কোন দেশে বিরল। তিনি প্রধানতঃ সাহিত্যসমালোচক ছিলেন না; তিনি ছিলেন দার্শনিক ও সৌন্দর্য্যতাত্ত্বিক। সাহিত্যের সৌন্দর্য্যকে তিনি মানুষের আত্মিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিলেন এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে, যে সকল প্রবৃত্তির বিকাশ সাহিত্য ও শিল্পে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে তাহাদের একটি হইল মমতা বা অপরের জন্য সহানুভূতি। এই দিক্ হইতেই তিনি ম্যাক্‌বেথ ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই দুই খানি গ্রন্থের বিচার করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থে তাঁহার আলোচনার বিষয়—ভ্রমর বা রোহিণী নহে—গোবিন্দলাল, যাহার সম্পর্কে অধিকাংশ সমালোচক নীরব। এই দিক্ হইতেও তাঁহার আলোচনা অভিনব। আমরা সাধারণতঃ মনে করি মানুষের সুখদুঃখ তাহার কর্ম্মফল। জীবনে অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, পাপী সৌভাগ্য লাভ করে, অপেক্ষাকৃত পুণ্যাত্মা ব্যক্তি শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হয়। জীবনে যে ন্যায় বিচার দেখিতে পাই না আমরা সাহিত্যে তাহার অনুসন্ধান করি। এইখানেই poetic justice বা কাব্যে সুবিচার-তত্ত্বের উদ্ভব। যাঁহারা এইরূপ

সস্তা সমাধানে সন্তুষ্ট নহেন তাঁহারাও বলিতে চাহেন যে, ট্র্যাজেডির নায়কদের ভুলভ্রান্তিই (hamartia) তাহাদের দুর্ভাগ্যের কারণ, কেহ কেহ আরও একটু সুর চড়াইয়া বলেন, Character is Destiny অর্থাৎ চরিত্রই ভাগ্যবিধাতা। এই শেষোক্ত সূত্র ধরিয়াই এ. সি. ব্র্যাড্‌লি তাঁহার শেক্সপীয়র-সমালোচনা লিখিয়াছেন এবং কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে এই সূত্র তাঁহার সমস্ত আলোচনাকে ঐক্য দান করিয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার বিচারে গোবিন্দলাল পাপ করিয়াছে, শাস্তি ভোগ করিয়াছে, কিন্তু সে পাপাত্মা নহে। (হয়ত রোহিণী সম্পর্কেও সেই কথা খাটে।) নীতিবাদীরা বলিবেন যে, গোবিন্দলাল পাপের শাস্তি পাইয়াছে, ইহাই তাহার সম্বন্ধে শেষ কথা। কিন্তু সাহিত্য এই সুলভ সিদ্ধান্ত মানিবে না, এইখানেই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব। 'নীতি-প্রচারক ও শাস্ত্রকার ও সমাজবিধাতারা যে কথাটা গোপন করিয়া মনুষ্যসমাজের চোখে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাহেন, মহাকবিগণ সেই কথাটাই খুলিয়া বলেন এবং সত্যবাদিতা যদি প্রশংসনীয় হয়, তবে সেই প্রশংসা এই শ্রেণীর মহাকবিগণের প্রাপ্য।' গোবিন্দলাল আমাদের পাঁচ জনের মতই লোক, কিন্তু 'যদি গোবিন্দলালের সঙ্গে কলিকাতার রাস্তায় ঘটনাক্রমে আমাদের চোখাচোখি হয়, তৎক্ষণাৎ আমরা ঘৃণায় চোখ ফিরাইয়া চলিয়া যাই। হয়ত পূর্ব্বে এক সময় ছিল, যখন গোবিন্দলালের বৈঠকখানায় প্রত্যহ বিনা নিমন্ত্রণে হাজির হইয়া তিন ঘণ্টা তাস পিটিয়া আসিতাম এবং বুড়া কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধের সময় লুচি মণ্ডার যথেষ্ট সদ্গতি করিয়া আসিয়াছি।' তবে গোবিন্দলালের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে ? অদৃষ্ট ? ঐরূপ ব্যাখ্যা ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি গ্রহণ করিতে পারিতেন ; কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর ইহাকেও কর্ম্মফলের মত শস্তা সমাধান বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি জগতের কোন ক্রূর বিধানকর্ত্তার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াছেন। মানুষ যে ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার ক্রিয়া আরও জটিল। মানুষের পিতামাতা, পূর্ব্বপুরুষ, প্রতিবেশিবর্গ, তাহার পরিবেষ্টনকারী সমগ্র জগৎ তাহার ভাগ্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহার দোষ এই যে, হয়ত তাহার প্রতিরোধ করিবার যথেষ্ট শক্তি নাই, অথবা সে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে নাই (hamartia)। হয়ত সে জানিত না যে, পিছন হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এক অপরিচিত ধাক্কা আসিয়া তাহাকে ভূমিশায়ী করিবে। গোবিন্দলালের

মত আমরা যাহাদিগকে মহাপাপী বলি তাহারা যে আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক তাহা নহে। কিন্তু ঘটনাচক্রে, অদৃষ্টদোষে—উপরে অদৃষ্টের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইল তদনুসারে—তাহারা উর্দ্ধ হইতে নিম্নে, নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে গড়াইয়া পড়িতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্যকে তত্ত্ব হিসাবে প্রচার করেন নাই, একজন বিশিষ্ট দুর্ভাগা লোকের অধঃপতনের মধ্য দিয়া জীবন্ত করিয়াছেন। তাহার চরিত্রের অতিসাধারণত্ব এবং ঘটনাচক্রের অনিবার্য্যতা তাহার কাহিনীকে সর্ব্বজনীনতা দান করিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন, 'তাহার (গোবিন্দলালের) ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তোমার আমার ভাগ্যেও যে কখনও ঘটিতে না পারে, এমন বিশ্বাসের কারণ নাই।' তারপর তিনি অধঃপতনের স্তরগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহার দয়া, তাহার পরোপকারবৃত্তি, আর একটু ছিদ্র যাহার মধ্য দিয়া দেবতাবিশেষ শরসন্ধান করিয়াছিলেন। এই ছিদ্র লইয়াও আমাদের উন্নাসিক হওয়ার কারণ নাই, যেহেতু মুনিঋষিরাও ইহার উপদ্রব এড়াইতে পারেন নাই। 'তারপর ঘটনার পর ঘটনা, ধাক্কার পর ধাক্কা, ঠিক সময় বুঝিয়া ও সুযোগ বুঝিয়া ধাক্কা। বারুণীতীরে কুহু ডাক আর উইল চুরি, আর রোহিণীর আত্মহত্যাচেষ্টা, আর ফুল্লবিম্বাদিঘটিত ব্যাপার, আর মিথ্যা অপবাদ, আর ভ্রমরের অভিমান, আর কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল।' এই ভাবে রামেন্দ্রসুন্দর প্রত্যেকটি ধাপ নির্দ্দেশ করিয়া গোবিন্দলালের অধঃপতনের অনিবার্য্যতা প্রমাণ করিয়াছেন এবং সব সময় একটি কথার উপর জোর দিয়াছেন যে, পাপাচারী গোবিন্দলাল তোমার আমার মতই সাধারণ লোক। সে পাপাত্মাও নয় আর ক্রূর দেবতার ক্রীড়নকও নয়। অথচ আমরা যাহারা গোবিন্দলালের মতই লোক কিন্তু গোবিন্দলালের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হই নাই, আমরা সবাই নিজেকে মুক্ত মনে করিয়া এই ভয়ংকর সত্য দেখিয়াও দেখি না। অথবা এই জাতীয় ব্যাপারের প্রতি নজর দিলেও কৌতুক অনুভব করি বা উল্লসিত হই। ইহা পরম আশ্চর্য্যের বিষয়, যদিও বকরূপী ধর্ম্মরাজের কাছে যুধিষ্ঠির যে পরম আশ্চর্য্যের কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে ইহার উল্লেখ করেন নাই। ইহাই, রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, গোবিন্দলালের কাহিনীর বৃহত্তর আবেদন। ইহা আমাদের মমত্ববোধকে জাগ্রত করে। এই কারণে ইহা শুধু সত্য নয়, সুন্দরও।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে বঙ্কিমপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

বলিয়া মনে করেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আলোচনার মত তাঁহার আলোচনা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত হয় নাই। তাঁহার আলোচনা বিস্তৃত, বিশ্লেষণধর্ম্মী এবং বাস্তবমুখী। তিনি উপন্যাসটিকে সমগ্রভাবে বিচার করিয়া ইহার কাহিনীসংস্থান, চরিত্রচিত্রণের বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও বর্ণনায় সাংকেতিকতা, নিয়তির ওতপ্রোতভাব—এই সমস্ত বিষয়ের তন্নতন্ন আলোচনা করিয়াছেন এবং এই আলোচনায় এই উপন্যাসের সামগ্রিক তাৎপর্য্য ও বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন কলাসৌন্দর্য্য বিধৃত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিলেই চলিবে। প্রথমতঃ, সমালোচক এই গ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্তের বার বার উইল পরিবর্ত্তন একটু খামখেয়ালি ব্যাপার মনে হইতে পারে। কিন্তু এই উইল পরিবর্ত্তন উপন্যাসের উপর সর্ব্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রত্যেকবারেই উইল পরিবর্ত্তন বিধি-লিপির ন্যায় উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ভাগ্যপরিবর্ত্তনও করিয়াছে; ভ্রমর-গোবিন্দলাল-রোহিণীর জীবনে যে বিপর্য্যয় আসিয়াছে তাহা অলঙ্ঘ্য-নিয়তি-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উইল চুরির ও উইল পরিবর্ত্তনের স্বাভাবিক পরিণতিরূপে আসিয়া পড়িয়াছে। এই স্বাভাবিকতা এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ; সমালোচক বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও তুলনার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, উপন্যাস হিসাবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ইহার সমকক্ষ 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ বাস্তবানুগামিতা; ইহার পরিবেশ বাঙ্গালী যৌথপরিবারের প্রতিনিধিস্থানীয়; ইহার চরিত্রের পরিণতি অধিকতর মনস্তত্ত্বসম্মত, ইহার ঘটনাবিন্যাস অনেক বেশি স্বাভাবিক, ইহার মধ্যে অন্তর্জগৎ ও বাহ্য জগতের সামঞ্জস্য সমধিক পরিস্ফুট। বাস্তবানুগামী হইলেও এই উপন্যাসের ভাষা ও বর্ণনা ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই উপন্যাসে বাহ্য জগতের বর্ণনা টমাস হার্ডির **ironic treatment of nature**-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রসাদপুরের উপকণ্ঠস্থিত নীলকুঠিতে গোবিন্দলাল-রোহিণীর জীবনযাত্রার যে সংক্ষিপ্ত চিত্র আছে তাহার সাংকেতিকতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন: 'প্রসাদপুরের বিজনপ্রাসাদে যে শেষ দিনের চিত্রটি আমরা পাই, তাহার উপর আগন্তুক বিপৎপাতের একটা পাণ্ডুর ছায়া পড়িয়াছে। প্রেমের প্রথম স্রোতোবেগ মন্দীভূত হওয়ায়, শীর্ণকায়া চিত্রার মতই একটা আগতপ্রায় দুর্দৈবের ম্লান স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সে অনিশ্চয়ের উদ্দেশ্যহীন পথ ধরিয়া চলিয়াছে।......গোবিন্দলালের প্রথম রূপমোহ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে

এবং নভেল পাঠ ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা এই ক্ষীয়মাণ দীপশিখায় তৈলনিষেকের ন্যায় বিরক্তিবিমুখ মনকে সতেজ রাখিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে। সমস্ত দৃশ্যটি যেন একটি অনাগত বিপদের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া আছে; এবং ভ্রমরের নামোচ্চারণ মাত্রই এই বাহ্যবিলাসভারাক্রান্ত, কিন্তু অন্তর্জীর্ণ জীবনযাত্রা যেন যাদুমন্ত্রবলে ইন্দ্রজালনির্মিত প্রাসাদের ন্যায়ই শতধা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বায়ুস্তর মধ্যে নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া গিয়াছে।' অতুলচন্দ্র গুপ্ত সমালোচকের 'কবিত্বে'র উপযোগিতা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু এই জাতীয় 'কবিত্ব' কবির কবিত্বকে সম্পূর্ণতা দান করে। ইহাই সমালোচনার অন্যতম সার্থকতা।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসের প্রশংসমান সমালোচনা লিখিয়াছেন।* ইঁহাদের সমালোচনার তুলনা করিলে শুধু দুই প্রধান সমালোচক নয়, দুই সমালোচনাপদ্ধতির পার্থক্য উপলব্ধি করা যাইবে। অতুলচন্দ্র গুপ্তের সমালোচনার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তবু নূতন প্রসঙ্গে ইহার পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি চরমপন্থী রসবাদী, ক্রোচের অনুগামী সমালোচক; তাই তিনি কাব্যসৌন্দর্য্যের অনপেক্ষিতত্বে বিশ্বাসী। তিনি শুধু রসজগতের পথ দেখাইয়াই নিরস্ত থাকিবেন, সেই জগতে প্রবেশ করিয়া সৌন্দর্য্য উপভোগ করা প্রত্যেক পাঠকের নিজস্ব অধিকার ও দায়িত্ব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইঁহাদের মতে রসের প্রধান লক্ষণ অনপেক্ষিতত্ব। সতীনাথ ভাদুড়ী সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া উপন্যাস লিখিয়াছিলেন; মনে হয় তিনি এই আন্দোলনের খুব নিকটে ছিলেন, তাঁহার স্পর্শকাতর মনে ইহা সাড়া জাগাইয়াছে। কিন্তু তবু কোন মতবাদের দ্বারা তিনি উত্তেজিত হয়েন নাই, কোন অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি অভিভূত হয়েন নাই। তাঁহার এই মানসিক দূরত্ব তাঁহার রচনার সৌন্দর্য্যের মূল উৎস; ইহাই সাহিত্যিক সত্যদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি; প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের ভাষায় বলা যাইতে পারে, এই দূরত্বের জন্যই লৌকিক অভিজ্ঞতা অ-লৌকিক রসে পরিণত হইয়াছে।

উপন্যাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যে গুণের দ্বারা অতুলচন্দ্র গুপ্ত আকৃষ্ট

*'দেশ'—৩০শে চৈত্র ১৩৫২; ত্রয়োদশ বৎসর, ২৩শ সংখ্যা। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ-সঙ্গমে'—কারা-সাহিত্য

হইয়াছেন তাহা ইহার প্রাচুর্য্য—শুধু লোকের ভিড় নয়, প্রত্যেকটি চরিত্রের স্বকীয়তা। যে কৌশলে ঔপন্যাসিক প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন চরিত্রকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমালোচক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই চরিত্র-গুলি যে মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত, যে আন্দোলন ইহাদিগকে একত্র করিয়াছে তাহা ইহাদিগকে জীবন্ত করে না; যে লক্ষণ বলে ইহারা সজীবতা লাভ করিয়াছে তাহা দুই একটি ছোটখাট দুর্ব্বলতা বা বৈশিষ্ট্য যাহা বড় বড় মতবাদকে ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—বিলু-নীলুর মার ছেলেদের পাতান জ্যাঠাইমার বিরুদ্ধে ঈর্ষ্যা, গান্ধীবাদী মেহেরচন্দজীর প্রত্যহই একই প্রার্থনাসঙ্গীত গান করা ও প্রত্যহই তাহার এক একটি লাইন ভুলিয়া যাওয়া, কমরেড সুখনলালের মুখ দিয়া চরকার শব্দের চমৎকার ক্যারিকেচার করা ইত্যাদি। চরিত্রের যে লক্ষণ মানুষকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বিলক্ষণতা দান করে গ্রন্থকার তাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার গ্রন্থে বাস্তবতার প্রতীতি কখনও ভঙ্গ হয় না। সমালোচক আরও কয়েকটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি কাহিনী-বর্ণনার ভঙ্গি; এক রাত্রির কাহিনী চারজনের মুখের কথায় বিবৃত হইয়াছে এবং এই কৌশলটি অতি নিপুণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই বলার মধ্য দিয়াই চারটি প্রধান চরিত্র ও অন্যান্য নরনারী জীবন্ত হইয়াছে আর জীবন্ত হইয়াছে আগষ্ট আন্দোলন—ইহার উন্মাদনা, সাহস, ভয়, মুক্তির উল্লাস ও নিষ্ফলতার নৈরাশ্য: আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই উপন্যাসের রঙ্গভূমি পূর্ণিয়া জেলা এবং অনেক চরিত্র অ-বাঙ্গালী; কিন্তু বিহারীরাও বাংলা সাহিত্যে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে এবং নূতন স্বাদ আনিয়াছে।

অতুলচন্দ্র গুপ্তের আলোচনা তীক্ষ্ণ মননশীলতায় উজ্জ্বল, তাঁহার দৃষ্টি অভ্রান্ত ও সূক্ষ্ম। ইহার সংক্ষিপ্ততা ইহার অন্যতম প্রধান গুণ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা এইরূপ ঝর্‌ঝরে, ঝক্‌ঝকে নয়। কিন্তু তাঁহার আলোচনার পরিধি আরও ব্যাপক, বিশ্লেষণ অনেক বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও গভীর। এই উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে চারিটি চরিত্র যাহাদের মধ্যে একজন আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষমাণ। কাহিনী যতই সুকৌশলে বিবৃত হউক, ইহার মধ্যে একটা মৌলিক অসঙ্গতি আছে। যে ভাবে ধৈর্য্যসহকারে চারটি চরিত্র অতীতস্মৃতি রোমন্থন করিয়াছে তাহার ফলে আসন্ন ট্র্যাজেডির তীব্রতা খানিকটা হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। ইহা বিশেষ করিয়া লক্ষিত হয় বিলু-নীলুর মায়ের আত্মকথায়; যাঁহার পুত্র আসন্ন ফাঁসির অপেক্ষা করিতেছে তাঁহার মন

অতীত ও বর্ত্তমানের ছোট বড় ঘটনার উপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবে ইহার মধ্যে মৌলিক অসঙ্গতি আছে। দ্বিতীয়তঃ, নীলুর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই বড় ভাইয়ের উপর এই চরম দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। অথচ নীলুর আত্মকথায় এই পারিবারিক বিশ্বাসঘাতকতার মনোবেদনা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব ধ্বনিত হয় নাই। কাহিনীর ঘটনাগুলি প্রধান পাত্রপাত্রীদের জবানীতে বিবৃত করার খানিকটা সুবিধা আছে—ইহাতে কাহিনী প্রত্যক্ষতা লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী'তে ও রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ দুই গ্রন্থের সমালোচনাপ্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, এই রীতির কতকগুলি অসুবিধাও আছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সেই অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সতীনাথ ভাদুড়ী মূল কাহিনীকে এক দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ইহাকে সংহতি দান করিতে পারিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন তাহা তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন, কিন্তু নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। বিলুর আসন্ন মৃত্যুদণ্ড কাহিনীকে প্রত্যক্ষতা দান করিয়াছে কিন্তু যে ট্র্যাজেডির প্রতীক্ষা ইহাকে সুসংহত করিয়াছে বিশ্রব্ধ রোমন্থন তাহার পরিপ্রেক্ষিতে একটু বেমানান হইতে বাধ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহা এই সুসম্বদ্ধ উপন্যাসের মৌলিক অনৌচিত্য।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত অন্যফলনিরপেক্ষ রসবাদে বিশ্বাসী; কাজেই গ্রন্থ যে সকল মতবাদকে আশ্রয় করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে তিনি এড়াইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। মাষ্টারমহাশয় ও তাঁহার বড় ছেলের বলিষ্ঠ বিশ্বাসই তাঁহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্রকে সঞ্জীবিত করিয়াছে এবং তাঁহাদের রাজনৈতিক জীবন ও পারিবারিক জীবন কেমন করিয়া একে অপরের রস জোগাইয়াছে বা জোগাইতে পারে নাই তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই উপন্যাসের মধ্যে স্মৃতিরোমন্থনের মধ্য দিয়া বিহার প্রদেশের গ্রাম্য-জীবন ও তাহার সংকীর্ণ মানসপরিধির মধ্যে বিপুল কূলপ্লাবী ভাবপ্রবাহের অভ্যাগম উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে পিতা ও মাতা এবং দুই ভাই বিলু ও নীলু—ইহাদের পার্থক্যনির্দ্দেশ। পিতার উৎসর্গীকৃত জীবনে উচ্চ আদর্শের প্রেরণা পারিবারিক জীবনের আকর্ষণ ও দাবিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাঁহার

স্ত্রীর হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ-ভালবাসা আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বহিরাগত আদর্শের সমন্বয় হয় নাই। তাই পারিবারিক জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি কতকটা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; গৃহ আশ্রমে পরিণত হইয়াছে, দেশসেবীদের পারিবারিক অন্তরঙ্গতা উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু মায়ের হৃদয়ে পারিবারিক নীড়নির্ম্মাণের আশা উন্মূলিত হয় নাই। এই পটভূমিকায় রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তে দুই ভাই বিভিন্ন কক্ষপথে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, অবশ্যম্ভাবী মতগত বিভেদ ও পারিবারিক নৈকট্য এক করুণ কঠোর ট্র্যাজেডি রচনা করিয়াছে। সমালোচক এই কেন্দ্রস্থ দ্বন্দ্বমিলন এবং আনুষঙ্গিক সঙ্গতি-অসঙ্গতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন মতবাদের চিত্রণে ঔপন্যাসিকের সাফল্যের বিচার করিয়াছেন। এমন কি কেমন করিয়া গণ-আন্দোলনের সমীকরণপ্রভাব সত্ত্বেও প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া পুরুষ ও মেয়ে বিভাগের কয়েদীদের আলাপ আলোচনায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ফুটিয়া উঠে, তিনি তাহাও দেখাইয়াছেন। এইরূপ গভীর বিশ্লেষণ ও বিচারের কাছে বিশুদ্ধ রসবাদীর উজ্জ্বলতা ফিকে দেখায়, বিশুদ্ধ মননশীলতা ভাসা-ভাসা মনে হয়।

॥ ৪ ॥

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার বৈশিষ্ট্যের মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হইল। তিনি বাংলা সাহিত্যের সমস্ত বিভাগের ও প্রায় সকল কালের সৃষ্টি সম্পর্কেই অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। এই বিপুল রচনাসম্ভারের বিস্তারিত পরিচয় একটি প্রবন্ধের পরিধিতে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু দুইটি প্রসঙ্গ সম্পর্কে কিছু না বলিলে আলোচনা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে।

তিনি সাহিত্যের প্রাথমিক সূত্র বা সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতে চাহেন নাই এই কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সমালোচকই—জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক—কতকগুলি প্রাথমিক সূত্রের দ্বারা প্রভাবিত বা চালিত হইয়া থাকেন এবং সেই প্রাথমিক সূত্রের মধ্যেই তাঁহার নিজের সমালোচনার মূলীভূত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। প্রধানতঃ ইংরেজ রোমান্টিক গীতিকাব্যের অধ্যাপক হইলেও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বাংলা উপন্যাসের

আলোচনা। এই আলোচনার মধ্যেই তাঁহার দৃষ্টির ব্যাপকতা ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণনৈপুণ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। উপন্যাস নিতান্ত আধুনিক কালের সৃষ্টি ; অ্যারিষ্টটলের পোয়েটিক্সে বা ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে ইহার সংজ্ঞা মিলিবে না। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রেও ইহার সর্ব্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ণীত হয় নাই। রূপকথা, পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ, বৌদ্ধ জাতক, লোকগীতি, ঈশপের গল্প, মুসলমানী গল্প প্রভৃতি কাহিনীসাহিত্যের আলোচনা করিয়া তিনি যে সংজ্ঞায় উপনীত হইয়াছেন তাহা তাঁহার আলোচনার মৌলিকতা ও ব্যাপকতার সাক্ষ্য দেয়। এই সংজ্ঞা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে ; এখানে ইহার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে :

'এই গল্প বলিবার বিশেষ একটি ভঙ্গিকে—গল্পের মধ্য দিয়া মানুষের প্রকৃত জীবনের ছবি আঁকিবার চেষ্টা, ঘটনা-সংঘাতে তাহার চরিত্রস্ফুরণের উদ্যোগ, সামাজিক মানুষের মধ্যে যে অহরহঃ একটা আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহারই সূক্ষ্ম আলোচনা, ও এই দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্য দিয়া মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে একটা বৃহত্তর, ব্যাপকতর সত্যকে ফুটাইয়া তোলা—ইহাকেই উপন্যাস বলা যাইতে পারে।'

কাল্পনিক, অতিরঞ্জিত গল্প বলার দিকে মানুষের একটা সহজাত প্রবণতা আছে। এই অতিরঞ্জন সাহিত্যিক কল্পনার সঙ্গে যুক্ত। অথচ গল্প যদি একেবারে অ-বাস্তব হইয়া যায় তাহা সবাই অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহার মধ্যে সাহিত্যিক রস থাকিবে না।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবের সোজাসুজি কোন সংজ্ঞা দেন নাই, কিন্তু তাঁহার আলোচনায় সাহিত্যে তিন স্তরের বাস্তবের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে এবং ইহাদের অনুধাবন করিলেই তাঁহার সমালোচনার সূত্র পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ, সাহিত্যের বাস্তবকে ব্যক্তির ও সমাজের প্রকৃত জীবনের অনুকৃতি হিসাবেই ধরিতে হইবে। অ্যারিষ্টটল **mimesis** শব্দটি যে অর্থেই প্রয়োগ করুন না কেন আমরা এই অর্থেই বলিয়া থাকি যে, সাহিত্য ও কাব্য জীবনের ইমিটেশন বা অনুকরণ করে। দ্বিতীয়তঃ, গল্প বলার সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরা অতিরঞ্জিত কাহিনী ও চরিত্রের অবতারণা করিলেও সেই কাহিনী ও চরিত্রকে এমন সরস ও জীবন্ত করা চাই যে তাহা বাস্তব বা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই বাস্তবের অপর নাম প্রত্যক্ষতা ; ইহাকে **probability** বা সম্ভাব্যতাও বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ—ইহাই সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয়

—সাহিত্যিক প্রকৃত জীবনের অনুকরণ করুন আর আজগুবি গল্প বলুন, তাঁহাকে জীবনের গভীরতর ও ব্যাপকতর সত্য উদ্ঘাটন করিতে হইবে। কবি-প্রতিভার রঞ্জনরশ্মি বাহ্য পরিচয়ের অস্থিমাংস ভেদ করিয়া একেবারে প্রাণশক্তির উৎসদেশে পঁহুছিবে। (বাংলা সাহিত্যের কথা—পৃঃ ২১৯) যে সাহিত্যিক কল্পনার অতিরঞ্জনের মধ্য দিয়া জীবনের গভীরতর সত্য প্রকাশ করেন তিনি রোমাণ্টিক আর যিনি যথাসম্ভব প্রকৃত জীবনকে অবিকৃত রাখিয়া সত্যকে ফুটাইয়া তোলেন তিনি রিয়ালিষ্ট বা বাস্তববাদী। অনুমান করা যায় যে, শব্দ ও অর্থের সহিতত্বকে ভিত্তি করিয়াই বৈয়াকরণরা 'সাহিত্য' শব্দের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, দেশে দেশে, কালে কালে, মানুষে মানুষে যে সংযোগ বা সহিতত্ব তাহাই সাহিত্য। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা পড়িয়া মনে হয়, বাস্তব ও রোমান্সের সহিতত্বই সাহিত্য। সাহিত্যিকের জীবনবোধ এই সহিতত্বের সেতুস্বরূপ। এই সূত্রকে অবলম্বন করিয়াই তিনি রূপকথা, প্রাচীন কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম উপন্যাস ও ছোট গল্পের একটানা আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য, কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রোমান্স ও বাস্তবের সবচেয়ে সুষ্ঠু সমন্বয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে তাঁহার বঙ্কিমসমালোচনার কিছু কিছু নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, দোষে-গুণে তাঁহার বঙ্কিম-সমালোচনা ব্র্যাড্‌লির শেক্সপীয়র-সমালোচনার সঙ্গে তুলনীয়।

তাঁহার রবীন্দ্র-সমালোচনাও উপন্যাস-সমালোচনার মতই আয়তনে বিপুল। তিনি 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোট গল্পের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন; ইহা ছাড়া বহু খণ্ড প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্র-প্রতিভার নানান্ দিক্ বিচার করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি 'রবীন্দ্রসৃষ্টি-সমীক্ষা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীর কালানুক্রমিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; প্রস্তাবিত তিন খণ্ডের দুই খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের রচনার কোন অংশই এই সার্ব্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হইতে বাদ পড়িবে না। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাঁহার আলোচনার দুই একটি বিশেষ দিক্ই উল্লেখ করা সম্ভব হইবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য আলোচনায় তিনি জোর দিয়াছেন ইহার ব্যাপকতা বা বাস্তবতার উপর। তাঁহার মতে, 'এত বিরাট্ পরিধির মধ্যে আর কোন কবির কল্পনার পক্ষবিস্তার হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আর শুধু ব্যাপ্তির দিক্ দিয়া নয়, প্রতিটি

যুগসংস্কৃতির মর্ম্মানুপ্রবেশেও তাঁহার সমকক্ষ মেলা কঠিন।' (সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে—পৃঃ ২১৩) এক সময়ে শেলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা হইত। তিনি উভয়ের সাদৃশ্য স্বীকার করিয়া ইঁহাদের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে তাহাও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। শেলির কবিতায় একটা স্বপ্নময় অবাস্তবতা ইন্দ্রধনুবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে ও উচ্ছ্বসিত বাণীতে পরিণত হইয়াছে। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ একটা গভীরতর বাস্তবতার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং মাটির পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন। শেলির আকর্ষণ অজ্ঞাত রাজ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রার দিকে, রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ আমাদের চির পরিচিত গৃহের দিকে। বরং নিসর্গসৌন্দর্য্যের কবি কীটসের সঙ্গেই তাঁহার সাদৃশ্য বেশি, কিন্তু তাঁহার কাব্যে যে বৈচিত্র্য, রহস্যময়তা ও ঊর্দ্ধমুখী অভীপ্সা আছে তাহা কীট্‌সে নাই। নিছক সৌন্দর্য্যোপাসনার কবিদের সঙ্গে এইখানেই তাঁহার পার্থক্য। (বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ১৫৯-৭৯) রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কবিতার দ্বারা মোহিত, প্রভাবিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইখানেও সেই একই পার্থক্য। কালিদাসের মেঘদূত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' কবিতায় কালিদাসের বর্ণনাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু এই অনুসরণের মধ্যে তাঁহার স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত হইয়াছে। 'কালিদাসের কাব্যে সমাপ্তি আসিয়াছে অলকার অলৌকিক সৌন্দর্য্যপরিবেশে বিরহিণী যক্ষপত্নীর ব্যথাতুর, প্রসাধনে উদাসীন অন্যমনস্কতার বর্ণনায়। যক্ষের উৎকণ্ঠা ও যক্ষপ্রিয়ার নীরব, প্রকাশকুণ্ঠ, উদাস-উন্মনা দুঃখমগ্নতা যেন উভয় দিকের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া একটি পরিপূর্ণ বিরহচিত্রকে রঙ-এ রেখায়, ভাবব্যঞ্জনায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আধুনিক কবি শুধু ভাবব্যঞ্জনায় সন্তুষ্ট নহেন, তিনি চাহেন অসীমাভিমুখী ভাবপ্রসারণ।' (রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা—১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫)

এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পুর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বাস্তবতা বিষয়ে একটি কথা বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কোন কোন সমালোচক তাঁহার কাব্যের বিরুদ্ধে অবাস্তবতার অভিযোগ তুলিয়াছিলেন। এই বিতর্কে বিপিনচন্দ্র পাল বৈষ্ণবকাব্যের তীক্ষ্ণ বাস্তবতার সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের মায়িকতার তুলনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ব্যাপক বাস্তবপ্রীতি। বৈষ্ণব কাব্যের ভক্ত সমালোচকগণ বাস্তবতা ও তীব্রতার মধ্যে পার্থক্য করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণবকাব্যের গুণ অধিক বাস্তবতা নহে

—রাধাকৃষ্ণের প্রেমের চিত্র বাস্তব চিত্র নয়—তীব্রতা ও ভাবস্থিরতা। রবীন্দ্র-কাব্যে অনুরূপ নিবিড়তা এবং স্থান ও কালের সহিত মানবহৃদয়ের অব্যভিচারী ভাবাসঙ্গ নাই। এখানে বৈষ্ণবকবিতার উন্মাদনা ও ঔপনিষদিক প্রজ্ঞার সমন্বয়ে ব্যাপক, রহস্যগহন, লীলাচঞ্চল ভাববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কাব্যরসিক ব্যাপকতা অপেক্ষা নিবিড়তাকে পছন্দ করিতে পারেন, অথবা তিনি উভয়বিধ রসের যথোচিত আস্বাদন করিতে পারেন, কিন্তু বিভিন্ন ভাবের বিলক্ষণতা সম্পর্কে তাঁহাকে সচেতন হইতে হইবে। (সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে, পৃঃ ২২১-২)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির আরও অনেক অপরিজ্ঞাত দৃষ্টান্তের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শুধু একটি এখানে উল্লেখ করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' রসিকতা ও গাম্ভীর্য্যের মিশ্রণের অপরূপ নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থেও সরসতা ও গাম্ভীর্য্যের মিলন দেখা যায়। এই দুই গ্রন্থের আঙ্গিক গঠন ও বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই; আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে ইহাদের মধ্যে তুলনারও কোন অবকাশ নাই। কিন্তু এই পার্থক্যের একটি কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভার সৃষ্টির বিচিত্রতা। কমলাকান্ত অপরূপ সৃষ্টি; তাহার চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে বৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়াছেন তাহাই তাহার ব্যঙ্গে, কৌতুকে, ভাবুকতায় প্রতিফলিত হইয়াছে। চরিত্রের অনন্যতা ও অনুভূতির তীব্রতার জন্য তাহার মন্তব্য অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে; এই বৈশিষ্ট্য 'বিচিত্র প্রবন্ধ' সমষ্টিতে লক্ষিত হয় না। কিন্তু এখানে নানা ভাব, নানা ভঙ্গির সমন্বয়ে আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত হইয়াছে। 'কমলাকান্তের একতারার পাশে রবীন্দ্রনাথ যেন সপ্তস্বরবিশিষ্ট বীণাযন্ত্র; প্রেরণার তারতম্যে, অঙ্গুলিস্পর্শের বিভিন্ন রীতিতে, মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য ইতরবিশেষে বিচিত্র সুরমূর্চ্ছনা এই তন্ত্রী হইতে নিঃসৃত হইয়া পাঠকচিত্তকে প্লাবিত করিয়াছে।' (রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা—২য় খণ্ড, পৃঃ ৭-৮)

'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা'য় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীর বিস্তৃত কালানুক্রমিক বিচার করিয়াছেন বলিয়া তিনি নানা আপাত-অবহেলিত বিষয়ে নূতন আলোকসম্পাত করিতে পারিয়াছেন, বিভিন্ন কালের রচিত কবিতা ও গদ্যের মধ্যে এবং একই কালে রচিত বিভিন্ন ধরণের রচনার মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। প্রথমোক্ত বিষয়ের দুই একটি দৃষ্টান্ত এখানে

উল্লিখিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে 'চৈতালি' ও 'কণিকা' একটু গৌণ স্থান অধিকার করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিণতির ইতিহাসে ইহাদের সার্থকতা আছে। 'চৈতালি' সুরবদলের সাক্ষ্য দেয়; ইহার মধ্য দিয়া কবির প্রৌঢ় জীবনের আরম্ভ; তাই এই গ্রন্থের কবিতায় উচ্ছ্বসিত, আবেশময় অনুভূতির সঙ্গে যুক্তিশৃঙ্খলাগ্রথিত, বাহুল্যবর্জ্জিত মিত ভাষণের সংযোগ হইয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে 'কণিকা'কে শ্লোকবদ্ধ হিতোপদেশ বলিয়া মনে হয় এবং বিশুদ্ধ রসবাদী অতুলচন্দ্র গুপ্ত ইহাকে খাঁটি কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই। কিন্তু বাস্তবচেতনা, পরিহাসরসিকতা, জীবনের অসঙ্গতির উপর তির্য্যক ব্যঙ্গ—এই সব উপাদান যে অভিনব, সংক্ষিপ্ত কাব্যপ্রকরণে বিধৃত হইয়াছে তাহাই ইহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিলে অপরিণত 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলির সংযত প্রকাশসুষমাও বিশিষ্ট তাৎপর্য্য লাভ করে। 'কল্পনা'র অনেক কবিতার সঙ্গে 'চিত্রা' প্রভৃতির সাধর্ম্ম্য লক্ষিত হয়, কিন্তু ইহার কতকগুলি কবিতায় লঘু চটুল কল্পনালীলার পরিচয় পাওয়া যায়। কালানুক্রমিক বিচারে দেখা যায় যে, 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' একই বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে, যদিও কবিতাগুলির রচনাকালের মধ্যে দীর্ঘতর ব্যবধান ছিল। এই দুই কবিতা-গ্রন্থকে পাশাপাশি রাখিয়া ইহাদের সাদৃশ্য ও বৈষম্য বিচার করিলে রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্য ও ঐক্যের ধারণা সুস্পষ্ট হয়।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা ও হাস্যরসসৃষ্টির সম্পর্কে কয়েকটি তাৎপর্য্যপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার একটু উল্লেখ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের নাটকের ত্রুটির কথা তিনি বলিয়াছেন—(১) তাঁহার নাটকে গীতরসের প্রাধান্য; (২) কথোপকথনে নাটকীয় সংঘাত ও পরিণতির অভাব। তিনি মনে করেন, গীতিকবিতার আতিশয্য নাটকের প্রকৃতিবিরোধী, কারণ 'নাটকের পাত্রপাত্রীর নিয়ন্ত্রিত কথোপকথনের দ্বারা এমন একটি তীব্র, ঘন বিরোধের ভাব ফুটাইতে হইবে যাহা গীতি-কাব্যের স্বতঃ-উৎসারিত একটানা প্রবাহের মধ্যে মিলে না।' (বাংলা সাহিত্যের কথা—পৃঃ ১৪২, ১৮৫) সাধারণ সূত্র হিসাবে এই মন্তব্য তর্কাতীত নয়। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে—বিশেষ করিয়া ইস্কাইলাসের নাটকে—গীতিকাব্য অনেকখানি জায়গা জুড়িয়াছে; শেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট প্রভৃতি নাটক কাব্যধর্ম্মী, আধুনিক কালে poetic drama নামে একটা বিশিষ্ট নাট্যপ্রকরণ গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইহা মানিতে হইবে

যে, গীতিকাব্য যদি নাটকের সংঘাত ও সংলাপকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তবে তাহা নাটকের 'অপকর্ষ-লক্ষণ' বলিয়া গণ্য হইবে এবং রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটক এই দোষে দুষ্ট, এই অভিযোগও ভিত্তিহীন নয়। ইহার সঙ্গে অপর ত্রুটিরও সম্পর্ক আছে। নাটকের একটি লক্ষণ এই যে, ইহার কথোপকথন-প্রবাহে একের উক্তি অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। (বাংলা সাহিত্যের কথা—পৃঃ ১৮৭) এই লক্ষণকে আশ্রয় করিয়াই ইব্‌সেন, বার্ণার্ড শ' প্রভৃতি নাট্যকারেরা তথাকথিত প্লটকে ছোট করিয়া discussion বা কথোপকথনকে প্রাধান্য দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে কথোপকথনের এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাধীনতা নাই ; তাই নাট্যরস তীব্রতা লাভ করে নাই।

সমালোচক কতকগুলি নাটকের উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাদের নাটকত্বের যে বিশ্লেষণ দিয়াছেন তাহা প্রণিধান করিয়া দেখার মত। তাঁহার একটি বিশ্লেষণ এখানে উল্লেখ করিব, কারণ সেখানে গীতিকাব্য কাব্যের বিশিষ্ট ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াই নাটকত্ব লাভ করিয়াছে এবং এখানে সমালোচকের বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য সর্ব্বাধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। নাটকের আকারে লিখিত হইলেও দীর্ঘ, উচ্ছ্বসিত উক্তিপূর্ণ 'চিত্রাঙ্গদা'কে গীতিকাব্য বলিয়াই সাধারণতঃ বিচার করা হইয়া থাকে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে ইহার মৌলিক নাট্যরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা মদনের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া অর্জ্জুনকে মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু অর্জ্জুন যে তাহার জন্য শপথ ভঙ্গ করিয়া নিজেকে অনর্জ্জুন করিয়াছে তজ্জন্য সে ব্যথিত হইয়াছে। আবার যে অর্ঘ্য সে অর্জ্জুনকে নিবেদন করিয়াছে তাহা যে সে স্বীয় চরিত্রবলে ও সহযোগিতার দ্বারা অর্জ্জন করে নাই, ইহার জন্য যে সে ঋণ করা রূপের উপরে নির্ভরশীল ইহাতেও সে দারুণ মনঃপীড়া অনুভব করিয়াছে। আবার রূপের একই প্রদীপ্ত শিখা অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার দুই বিভিন্ন প্রকৃতির অথচ মূলতঃ একই জীবনবোধকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। এই সকল বিচিত্র অনুভবের সংঘাত এই নাট্যকাব্যকে কাব্যনাটকে রূপান্তরিত করিয়াছে। (রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা—১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৮-৫০) শুধু কাব্যে নয় রবীন্দ্রনাথের নাট্যবোধ ছোট গল্প, এমন কি কোন কোন প্রবন্ধে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত পঞ্চভূতের ডায়েরি। ইহার বিষয় কতকগুলি অ্যাবষ্ট্রাকট বা অমূর্ত্ত তত্ত্বের আলোচনা, কিন্তু লেখকের নাট্যপ্রতিভা কয়েকটি মানানসই চরিত্র সৃষ্টি করিয়া এই আলোচনাকে নাট্যরসে সমৃদ্ধ করিয়াছে ; ইহা কৌতুকনাট্য, ডায়েরি ও

মননশীল প্রবন্ধের মধ্যবর্ত্তী এক নূতন রূপাঙ্গিক গ্রহণ করিয়াছে। (রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ১ম খণ্ড—পৃঃ ২৬১-৮৪)

রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি কৌতুকনাট্য লিখিয়াছেন, তাঁহার serious বা গুরুগম্ভীর নাটক ও উপন্যাসেও হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি ডন কুইক্সোট্, পিকউইক বা কমলাকান্তের মত কোন চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। অ্যারিষ্টফেনিস, রাবেলে, শেক্সপীয়র, মোলিয়ের, বার্ণার্ড শ' প্রভৃতির রচনা যেমন প্রবল হাস্যরসে তরঙ্গায়িত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথে তদনুরূপ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার সমস্ত সৃষ্টি কৌতুকহাস্যের স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত। তাঁহার জীবন-দেবতা এক কৌতুকময়ী অন্তরশক্তি; ইহারই লীলারহস্য তাঁহার কাব্যে ও জীবনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। 'ক্ষণিকা'র প্রায় সমস্ত কবিতা ও 'কল্পনা'র অনেক কবিতা কৌতুকরসসমৃদ্ধ। তবু বলা যাইতে পারে, গীতিকাব্যের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কৌতুকহাস্যের অবতারণা অনধিকার প্রবেশ বলিয়া গণ্য হইবে; সেইজন্য এই বিশেষ সুরটি গীতিকবিতায় খুব সুস্পষ্ট হয় নাই। ইহার উপস্থিতি খুব বেশি করিয়া অনুভব করা যায় গদ্যরচনায়, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, সর্ব্বোপরি ছোট গল্পে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, 'humour, স্নিগ্ধ পরিহাসরসিকতা তাঁহার গল্পগুলিতে একটি অবর্ণনীয় মাধুর্য্য ও উপভোগ্য কৌতুকরসের সঞ্চার করিয়া গম্ভীর বিষয়কেও সর্ব্বসাধারণের আস্বাদ্য করিয়াছে।...এই humour-সংযোগই "গল্পগুচ্ছের" রচনারীতিকে অন্যান্য গদ্যগ্রন্থের তুলনায় অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব ও সুরবৈচিত্র্য দিয়াছে।' (রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ১ম খণ্ড—পৃঃ ৩৩৮-৯).

॥ ৫ ॥

বাংলা সমালোচনার যে পরিক্রমা করা গেল তাহা হইতে একটি নেতিমূলক সিদ্ধান্তে আসা যায়—নাট্যসাহিত্যসম্পর্কিত আলোচনার অপ্রাচুর্য্য। ইহার একটি কারণ হয়ত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর কোন নাট্যকারের উদ্ভব হয় নাই। অথবা ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, উচ্চাঙ্গের সমালোচনা-চিন্তার উদ্রেক হয় নাই বলিয়াই উচ্চাঙ্গের নাট্যপ্রতিভার

স্ফুরণ হয় নাই। ম্যাথু আর্ণল্ড বলিয়াছেন, ক্রিটিসিজ্‌ম্ না হইলে সৃষ্টি সম্ভব হয় না। তিনি অবশ্য ক্রিটিসিজম্ বলিতে সাহিত্যসমালোচনা অপেক্ষা জীবন-সমালোচনার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই তর্কসঙ্কুল উক্তি ব্যাপক অর্থেও গৃহীত হইতে পারে ও গৃহীত হইয়াছে। তবে ইহা লক্ষণীয় যে, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের আলোচনায় অপ্রাচুর্য্য দেখা যায় না। বাংলা গদ্যসাহিত্যে প্রথম সমালোচনা রঙ্গলালের 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' পঠিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরে যে সমালোচনা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। অন্ততঃ মধুসূদন দত্তের পত্রাবলীর বিক্ষিপ্ত মন্তব্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিত প্রভৃতির বিচারে, রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য' প্রভৃতি গ্রন্থে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে, অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাব্য-জিজ্ঞাসায় এবং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনায় অমরত্বের আশ্বাস আছে।

———

নিবেদন

বর্ত্তমান গ্রন্থে অনেক ভুলত্রুটি থাকিয়া গেল। ইহার অনেকগুলিই মুদ্রাকর প্রমাদ নয়; গ্রন্থকারের অজ্ঞতা বা অনবধানতাজনিত ভ্রান্তি। ১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রোচের সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনী পাঠে দেখা যায় যে, ইতালি পরিভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রোচের আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। অবশ্য ক্রোচের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল এমন কোন নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যালোচনায় পাওয়া যায় না। ১১৯ পৃষ্ঠায় সিড্‌নি লী'র জীবনচরিত সম্পর্কিত যে গ্রন্থের উল্লেখ আছে তাহার নাম 'The Perspective of Biography', 'Principles of Biography' নয়।

'ধ্বন্যালোক'-গ্রন্থের প্রথম উদ্দ্যোতের পঞ্চম কারিকার ব্যাখ্যায় অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন, 'ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্।' বর্ত্তমান গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় যে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্য হইতে 'তু' বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ২২ পৃষ্ঠার ২৩ পংক্তিতে বিভাবাদিকে 'আনুষঙ্গিক' বলা হইয়াছে, 'অনুরঞ্জক' বা 'উদ্বোধক' বলিলে ইহা অভিনবের মতানুযায়ী হইবে।

৩৪ পৃষ্ঠায় ॥৪॥ সংখ্যক অনুচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ইহার সংখ্যা হইবে ॥৫॥ এবং এইভাবে এই পরিচ্ছেদের পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদগুলির সংখ্যা সংশোধিত করিয়া লইতে হইবে। ১৬৬ পৃষ্ঠার ১৯ পংক্তিতে 'বিবৃত' 'বিধৃত' হইবে। ২৬৬ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় 'spirit-from' 'spirit-form' হইবে।

মেঘদূতের 'শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং'—ইত্যাদি শ্লোকের সামান্য পাঠভেদ দেখা যায়। এই শ্লোকটি দুইবার উদ্ধৃত হইয়াছে, দুই জায়গায় দুই পাঠ অনুসৃত হইয়াছে। অবশ্য এই পাঠান্তর প্রস্তুত বিষয়ে অবান্তর। ২৮৯ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তির শেষে 'নয়' শব্দটি বাদ দিতে হইবে।

অন্য যে সকল ভুলত্রুটি রহিয়া গেল আশা করি তাহার জন্য অর্থ গ্রহণে কোন অসুবিধা হইবে না। তথ্যগত, তত্ত্বগত ও ভাষাগত ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বাধিত হইব এবং বারান্তরে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব।

নির্দেশিকা

ঈ

উ

ঊ

ঋ

এ

ঐ

ও

ক

খ

গ

ঠ

ড

ত

থ

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

স